বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অজিত দত্ত

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস

অজিত দত্ত

॥ জিজ্ঞাসা ॥
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

প্রকাশক—
শ্রীশকুমার কুণ্ড .
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র. ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

রাজশেখর বসু স্মরণে

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে এ-বিষয়ে উপযুক্ত সমালোচনা গ্রন্থের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস' বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে প্রথম আলোচনার গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু তাঁর বইটি ছিল সংক্ষিপ্ত, বাংলা সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছিল। তাঁর বইটি পড়ে মনে হয়, তৎকালীন ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে এ বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণামাত্র তিনি উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুলিখিত হলেও, এ-বইটি থেকে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের একটি সুসম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস অথবা বিভিন্ন ব্যঙ্গ ও হাস্যরসিক লেখকের রচনার আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

এর পরে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন বিশিষ্ট লেখকের হাস্যরস সম্বন্ধে দু' একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বহু কৃতী লেখকের কৌতুক ও ব্যঙ্গ রচনা এখনও পরিপূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে বলে মনে করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত বহু বই লিখিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর হাস্যরসাশ্রিত রচনাগুলি— বিশেষতঃ 'কমলাকান্ত' সম্বন্ধে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমরা আজও পাইনি। এই অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে গত বৎসর এ-বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ আলোচনাগ্রন্থ রচনায় হাত দিতে মনস্থ করি। কাজে হাত দিয়ে দেখা গেল, বিষয়টি অতি বিস্তৃত। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বিষয়টির গুরুত্বও কম নয়। বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রথম উন্মেষকালে, সাহিত্যে উচ্চ ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার আগে, ব্যঙ্গাত্মক ও নক্শা জাতীয় রচনারই প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল। আধুনিক কালে তো হাস্যরসাশ্রিত রচনার যথেষ্টই প্রসার ও উৎকর্ষ ঘটেছে। বর্তমান গ্রন্থে এই জাতীয় রচনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে

বিভিন্ন সময়ের হাস্যরসিক লেখকদের রচনাবলীর যথাসম্ভব পূর্ণ পরিচয় দেবার এবং এ-বিষয়ে তাদের আপেক্ষিক কৃতিত্ব ও মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে খুব বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নি। কেননা, সে-সময়ে,বিজয় গুপ্ত প্রমুখ অধিকাংশ লেখকের রচনায় হাসি উৎপাদনের জন্য মাঝে মাঝে যে-ধরণের রসিকতার অবতারণা করা হয়েছে, তা এতই স্থূল ও গতানুগতিক যে, সেগুলি উদ্ধৃত করে বইটিকে একটি তালিকায় পরিণত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মধ্য যুগের সাহিত্যের যতটুকু হাস্যরস আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেছি, সেটুকুই মাত্র এ-গ্রন্থে উপস্থিত করেছি।

এ-বইখানির আলোচ্য বিষয় বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস হলেও, এখানে যেসব লেখকের হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক রচনার আলোচনা করা হয়েছে, তাঁদের লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বাংলাসাহিত্যে তাঁদের স্থান এবং তাঁদের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকৃতিত্বের সকল দিকই আলোচনা করা আমি প্রয়োজন মনে করেছি। কারণ, আমার বিশ্বাস, কোনো লেখকের রচনা থেকে কেবলমাত্র তাঁর হাস্যরসটুকু আলাদা করে নিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। হাস্যরসে বা সাহিত্যের যে-কোনো বিভাগেই লেখকের কৃতিত্বকে ভালো করে বুঝতে হলে তাঁর সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাহিত্য-কৃতিত্বকেও বোঝা দরকার। অন্যথা, সাহিত্যে আবির্ভূত হাস্যরসাশ্রিত রচনাগুলির একটি বিবরণ উপস্থিত করা যায়, কিন্তু যথার্থ আলোচনা করা সম্ভব হতে পারে না। এ-কারণে, যে-সকল লেখকের রচনা আমি আলোচনা করেছি, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারে তাঁদের ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা এবং সাধারণ সাহিত্যিক গুণগুলিরও আলোচনা প্রয়োজন মনে করেছি।

রবীন্দ্রপূর্বযুগের আলোচনা অংশে বিভিন্ন লেখককে জন্মতারিখ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত করা হয়নি। যিনি যখন সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন, তখনই তাঁকে উপস্থিত করা হয়েছে। এর কারণ, সে সময়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ লেখকও কনিষ্ঠ লেখকের প্রভাবে বা প্রতিক্রিয়ারূপে সাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন, বয়ঃকনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ও অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্কৃতবহুল এবং অল্পশিক্ষিতের অনধিগম্য ভাষার প্রতিক্রিয়ারূপেই বয়োজ্যেষ্ঠ প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষার আবির্ভাব। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অগ্রজ হলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব আত্মসাৎ করেই তিনি রোমান্টিক নাটক রচনায় অবতীর্ণ হন। এ-সব কারণেই, রবীন্দ্রপূর্ববর্তী যুগের গদ্য পদ্য ও নাটকের আলোচনায় কোনো কোনো রবীন্দ্রকনিষ্ঠকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। এই লেখকদের রচনায় রবীন্দ্রনাথের অথবা রবীন্দ্রযুগের ভাষা মনোভাব বা চিন্তার কোনো লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের আলোচনায়, ঐ একই কারণে, রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা বয়সে অল্পবড় দু'একজন লেখককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং জন্মতারিখ অনুসারেই লেখকদের উপস্থিত করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এ-যুগের প্রায় সকল লেখকই, ভাষায় ভঙ্গিতে বা মনোভাবে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তা ছাড়া, এ-যুগের বিশিষ্ট লেখকদের পারস্পরিক প্রভাবও বহুধা বিস্তৃত হয়েছে। এই বিভিন্ন প্রভাবের বহুমুখী ধারা পৃথক্‌ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। একারণে এই অংশে জন্ম-তারিখ অনুসারে লেখকদের আলোচনাই সঙ্গত মনে করেছি। বিশেষতঃ এ-যুগের বহু জনপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখক বিলম্বে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের আলোচনা আমি কনিষ্ঠদের পরে উপস্থিত করতে অনিচ্ছুক ছিলাম। কেননা, কনিষ্ঠ লেখকদের প্রভাব এঁদের রচনায় সুপ্রকট নয়।

জীবিত লেখকদের কোনো বিস্তৃত আলোচনা বা তাঁদের রচনার মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আমি সংগত মনে করি নি। কিন্তু তাঁদের নাম ও তাঁদের রচনাবলীর উল্লেখ করেছি। জীবিত লেখকদের মধ্যে দু'একজন অতিপ্রবীণ কৃতী হাস্যরসিকের রচনা এখন বিস্মৃতপ্রায় বলে উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁদের কৃতিত্বের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

আমার এবং প্রকাশকের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বইটির মধ্যে কয়েকটি গুরুতর ছাপার ভুল রয়ে গেছে। এর মধ্যে দুটি অতি গুরুতর। ২৬ পৃষ্ঠায়

হোরেস ওয়ালপোল নামটি হিউ ওয়ালপোল হয়ে গেছে এবং ৩৩৬ পৃষ্ঠায় 'টুনটুনির বই' উপেন্দ্রকিশোরের একমাত্র প্রকাশিত কৌতুকাশ্রিত গ্রন্থ কথাটির থেকে 'কৌতুকাশ্রিত' শব্দটি বাদ পড়ে গিয়ে অর্থবিপর্যয় ঘটিয়েছে। 'শুদ্ধিপত্রে' এরূপ আরো কয়েকটি ভুলের তালিকা দেওয়া গেল।

এই গ্রন্থরচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন, সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অন্যান্য বিষয়ে, বিশেষ করে রাজশেখর বসু ও সুকুমার রায় সম্বন্ধে তথ্যাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স-এর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার. শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত সুবিমল রায় এবং শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়। সেজন্য এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

এই বইয়ের প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা'র স্বত্বাধিকারী আমার প্রীতিভাজন শ্রীশ্রীশচন্দ্র কুণ্ড এই বইটির দ্রুত এবং সুষ্ঠু মুদ্রণে বিশেষভাবে সাহায্য না করলে এত শীঘ্র বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হোত না। বইটির মুদ্রণ ও গ্রন্থনের পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের জন্য ধন্যবাদ তাঁরই প্রাপ্য।

বইটির রচনাকালে অধিকাংশ সময়ে আমাকে জাতীয় গ্রন্থাগারে কাজ করতে হয়েছে। সে-সময়ে সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমিয়কান্ত রায় এবং কর্মচারীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য কয়েকজনের কাছ থেকে নানারূপ সাহায্য পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১লা ভাদ্র, ১৩৬৭

অজিত দত্ত

"উঠ্‌ছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।"

সুকুমার রায়

"*Laugh, and the world laughs with you.*"

Ella Wheeler Wilcox

১

পশুজাতির সঙ্গে মানবজাতির একটি প্রধান পার্থক্য এই যে মানুষ হাসে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ারেরা হাসে না। পশুজগতেও দু'এক জাতের বনমানুষ হাসে বলে শোনা যায়, এবং তাদের আমরা মানবেতর প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠ বলে গণনা ক'রে থাকি। সুখ, আনন্দ, আমোদের অনুভূতি পশুপাখিরও থাকতে পারে, কিন্তু তা প্রকাশ করবার জন্য স্বতন্ত্র কোনো পন্থা তাদের জানা নেই। কিন্তু দুঃখ ও সুখ এমনকি অল্প দুঃখ, বেশি দুঃখ, আনন্দ, আমোদ, কৌতুক প্রভৃতিকে নানা ধরণের হাসি দিয়ে প্রকাশ করতে মানুষ ভালো ক'রেই জানে। মানুষের হাসি তাই বিভিন্ন ধরণের, বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। মানুষের জীবনে এই হাসির স্থান কান্নার চেয়ে কম নয়, সম্ভবতঃ বেশি। কারণ, অতি দুঃখী মানুষও কৌতুকজনক কোনো দৃশ্য দেখে বা কোনো মজার কথা শুনে হাসে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাস্যপরিহাসেও সে যোগ দেয়। দারুণ দুঃখেও ভাগ্যের পরিহাস স্মরণ ক রে মানুষ না হেসে পারে না। তাই কবি বলেন, "হায় কি হোলো — কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে" ! এমন যে মানবের বিশিষ্ট সম্পদ, মানবজীবন ব্যাপ্ত করা হাসি, সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে তার স্থান হওয়াটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। সাহিত্যের মধ্যে শিল্পী যখন হাসির উপকরণ সন্নিবেশ করেন, তখনই তাকে হাস্যরস বলা হয়। হাস্যরস একটি ব্যাপক নাম। সাহিত্যে এই হাস্যরসের প্রকৃতিভেদ ও স্তরভেদ আছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর দার্শনিক ও পণ্ডিতেরা হাস্যরসের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা ক'রে আসছেন। কেবল সাহিত্যের অন্তর্গত হাস্যরস নয়, কৌতুক-হাস্য জিনিসটা কী, কিসে মানুষের কৌতুকবোধ জাগ্রত এবং হাসির উদ্রেক হয়, এই কৌতুক-হাস্যের মাত্রা বা সীমারেখাই বা কতদূর, এ সবই সাহিত্যবেত্তা, আলংকারিক ও দার্শনিক সমাজের

আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। কারণ, এ-কথা সকলেই মানবেন যে, সুখে বা আনন্দে মানুষের হাসাটা যত স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য মনে হয়, কখনো আবার সুখাবহ ঘটনার আভাসমাত্র না থাকা সত্ত্বেও কোনো কিছু দেখে বা শুনে হঠাৎ হেসে ওঠাটা তত সহজে ব্যাখ্যা করা চলে না। সুখ, আনন্দ, আরাম প্রভৃতির সঙ্গে কৌতুক-হাস্য বা humour -কে এক ক'রে দেখা যায় না। পূর্বেই বলেছি কৌতুক-হাস্য নানা জাতের, নানা শ্রেণীর হতে পারে। এগুলির পার্থক্য বোঝাবার জন্য আমরা অনেকগুলি নাম ব্যবহার ক'রে থাকি। যথা, রঙ্গ, ব্যঙ্গ, তামাশা, ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ, ভাঁড়ামি, রসিকতা ইত্যাদি। এই সব সংজ্ঞা দ্বারা আমরা হাসির প্রকারভেদ ও স্তরভেদ বোঝাতে চেষ্টা করি। মোটামুটিভাবে এদের সবগুলিকে এক কৌতুক-হাস্যের পর্যায়ে ফেললে আলোচনার সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ-নাম ব্যবহার করেছেন। আমরাও এই কৌতুকহাস্য শব্দটিকে ইংরেজী humour-এর সমপর্যায়ে ফেলে কাজ চালাতে পারি।

প্লেটো-আরিস্টট্‌ল্ থেকে আরম্ভ ক'রে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় এমন খুব কম দার্শনিক ও পণ্ডিতের নাম করা যায়, যিনি কৌতুকহাস্য বা হাস্যরসের স্বরূপ এবং প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেননি। কিন্তু কোনো পণ্ডিতের কোনো ব্যাখ্যাই পরবর্তী পণ্ডিত, দার্শনিক ও লেখকদের দ্বারা বিনা দ্বিধায় পরিপূর্ণরূপে গৃহীত হয়নি। সে কারণে, আজ পর্যন্ত কৌতুকহাস্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্দিষ্টরূপে নিরূপিত হতে পারেনি। ঠাট্টা তামাশায় যখন আমরা সকলেই হাসি, এবং মজার গল্প প'ড়ে, মজার কথা শুনে, মজার দৃশ্য দেখে গুরুগম্ভীর হয়ে বসে থাকি না, তখন ও-জিনিসটার সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই মানতে হবে। কিন্তু আমরা তো দূরের কথা বড় বড় পণ্ডিতেরাও কৌতুক-হাস্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গলদ্‌ঘর্ম হন।

মানুষ কিসে মজা পায়, কেন সে কৌতুক বোধ ক'রে হাসে — এ প্রশ্নটা পুরোনো। কিন্তু এর উত্তরে শেষ কথাটি বলা হয়ে গেছে এমন মনে করা চলে না। পাশ্চাত্ত্যদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নাটককে আশ্রয় ক'রে সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। সে জন্য পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সাহিত্যবেত্তা মনীষীদের মতামত প্রধানতঃ কমেডি বা হাস্যরসাশ্রিত মিলনান্ত নাটককে

অবলম্বন ক'রেই ব্যক্ত হয়েছে। প্রতীচীর অন্যতম আদি তত্ত্বব্যাখ্যাতা আরিস্টট্‌ল্ কমেডি অর্থাৎ হাস্যরসাত্মক নাটক সম্বন্ধে বলেছেন, "Comedy is an imitation of character of a lower type, not however in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a subdivision of the ugly."—*Poetics*। অর্থাৎ নীচ ধরণের চরিত্রের অনুকরণ দ্বারাই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। এখানে নীচ বলতে ঠিক খারাপ কিছু বোঝাচ্ছে না, বরং একে কুৎসিতেরই একটি অংশ বলে গণ্য করা চলে। আরিস্টট্‌ল্ আরো বলেছেন যে হাসির উপকরণ হচ্ছে "Some defect or ugliness which does not imply pain."। পরবর্তী দার্শনিকেরা মূলতঃ এই উক্তিটি অবলম্বন ক'রেই কৌতুকহাস্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। সিসেরো আরিস্টট্‌লের মতই গ্রহণ করেছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে টমাস হব্‌স্ (Thomas Hobbes) এই মতের উপর ভিত্তি ক'রেই কৌতুক-হাস্যের কারণ ও উপাদান সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Leviathan*-এ তিনি লিখছেন, "Sudden glory is the passion which maketh those grimaces called laughter; and is caused by some deformed thing in another by comparison whereof they suddenly applaud themselves. And it is incident most to them, that are conscious of the fewest abilities themselves; who are forced, to keep themselves in their own favour, by observing the imperfections of other men. And therefore much laughter at the defect of others, is a sign of pusillanimity. For of great minds, one of the proper work is to help and free others from scorn; and compare themselves only with the most able." অর্থাৎ, অপরের দুর্দশা দেখে নিজের উৎকর্ষ উপলব্ধি ক'রে আত্মপ্রসাদেই মানুষ মজা পেয়ে হাসে। অধিকাংশ মানুষেরই ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও কৃতিত্ব অতি সামান্য, এবং সে বিষয়ে তারা যথেষ্টই সচেতন; কাজেই অন্যকে নাকাল হতে দেখলে অথবা অন্যের

অসম্পূর্ণতা দেখলে কোনো-না-কোনো বিষয়ে নিজেদের মহিমা উপলব্ধি করবার সুযোগ পায় বলেই মানুষ হাসে। অবশ্য এরূপ কারণে হাসা যে সংকীর্ণ মনের লক্ষণ হব্‌স্‌ সে কথা যোগ করতে ভোলেন নি। আত্মমহিমা উপলব্ধি অথবা আত্মপ্রসাদে হাসার যে ব্যাখ্যাটি হব্‌স্‌ দিয়েছেন, পরবর্তী অনেক দার্শনিক পণ্ডিতই তা গ্রহণ করেছেন। Descartes, Lammais, Meredith, Groos, এবং Bergson প্রভৃতি মোটামুটিভাবে এই মত সমর্থন করেছেন। অপরপক্ষে, Hegel, Kant, Schopenhauer, Herbert Spencer প্রভৃতি দার্শনিক এবং Voltaire, Jean Paul Richter, Carlyle, Thackeray এবং আধুনিক কালে Palmer, Perry, Leacock প্রভৃতি লেখক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ কৌতুক-হাস্যের অন্যান্য কারণ নির্দেশ করেছেন।

হব্‌স্‌ প্রমুখ পণ্ডিতদের মত যদি সত্য হয়, তাহলে অপরের প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব, এমন কি অন্যকে আঘাত দেওয়ার প্রবৃত্তি, হাস্যরসের মূলে আছে বলে মেনে নিতে হয়। অবশ্য হাসি নানা জাতের নানা শ্রেণীর আছে। আর, আত্মতৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ, এবং অপরের প্রতি অসূয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কাজেই কেউ জব্দ বা নাকাল হলে অনেকেই না হেসে পারে না, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কেউ চেয়ারে বসতে গেলে পিছন থেকে চেয়ার সরিয়ে নিয়ে লোকটিকে আছাড় খাওয়ানো একটি পুরোনো জনপ্রিয় রসিকতা। একজন মোটা লোক চৌকি ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলে প্রচুর হাসি উৎপন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় হাসির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, "অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ একশ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" কিন্তু এ-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে এ-জাতীয় হাসি অত্যন্ত স্থূল নিচু শ্রেণীর হাসি। শিক্ষিত সংস্কৃতিপরায়ণ ও বয়স্ক লোক এই রকম কিছু দেখে হেসে ফেল্লে নিজেই লজ্জিত বোধ করেন, এবং সাহিত্যে এ-জাতীয় রসিকতা প'ড়ে কিছুমাত্র মজা পান না। কাজেই হব্‌স্‌ প্রমুখ পণ্ডিতদের মত আংশিকভাবে মেনে নিয়ে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে অপরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ক'রে সেই আত্মপ্রসাদ থেকেও মানুষ হাসির

উপকরণ পায় বটে, কিন্তু এই আত্মপ্রসাদই হাস্যরসের একমাত্র উপাদান বা উৎস নয়।

এইজন্যই ভল্টেয়ার, অপরকে খোঁচা বা আঘাত দিয়ে নিজে যথেষ্ট মজা পেলেও, হাস্যরস সম্বন্ধে অন্যরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, "Laughter always arises from a gaiety of disposition, absolutely incompatible with contempt and indignation." জার্মান হাস্যরসিক Jean Paul Richter-ও এই জাতীয় মত পোষণ করতেন। আর Spinoza অপরকে আঘাত বা বিদ্রূপ ক'রেই হাস্যরস উৎপন্ন হয়, এ-মত সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে বলেছেন যে, "Laughter and jest are a kind of joy."

কাণ্ট্ হাস্যরসের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, তাতে কিছুটা নূতনত্ব আছে, কিন্তু সম্পূর্ণতা আছে কি না সন্দেহ। তিনি বলেছেন যে, কৌতুক-হাস্য হচ্ছে "an affection arising from the sudden transformation of a strained expectation into nothing." স্বাভাবিক ভাবে যেটা ঘটা উচিত সেটা ঘটলো না, কোনো একটি ঘটনার জন্য আমাদের প্রত্যাশা হঠাৎ শূন্যে মিলিয়ে গেল,— অর্থাৎ কোনো একপ্রকার অসংগতির আকস্মিক উপলব্ধি, হাসির কারণ বটে। Schopenhauer কথাটি অনেকটা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, "The cause of laughter in every case is the sudden perception of the incongruity between a concept and the real objects which have been thought through it in some relation, and laughter itself is just the expression of this incongruity." ছোটখাট অসংগতি যা মারাত্মক নয় বা গভীর দুঃখদায়ক নয়, তা নিঃসন্দেহেই হাস্যকর ; আবার জীবনের বড় বড় অসংগতি গভীর দুঃখদায়ক ও tragedyর উপকরণ-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকহাস্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই অসংগতির কথা বলেছেন। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেমটা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসংগত ঠেকে ; কারণ তাহা অনিবার্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা

করি না, কারণ সে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোক — সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে, ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। ... অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুকবোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে দুঃখবোধ হয়।"

অসংগতি অনেক সময়েই হাস্যরস উৎপাদন করে তাতে আর সন্দেহ কী? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেটুকু গতানুগতিক ও নিয়মিত অভিজ্ঞতার বাইরে, আমাদের অভ্যাসের গণ্ডি-বহির্ভূত যা কিছু আমরা দেখি-শুনি, তা বেদনাদায়ক না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসি জোগায়। একটা অস্বাভাবিক রূপে ঢ্যাঙা বা দেড় হাত লম্বা পরিণত বয়স্ক বামন দেখলে কার না হাসি পায়? তেমনি রাস্তায় ঘাটে ইংরেজী-ফরাসী-জার্মান ভাষা শুনে আমাদের হাসি পায় না বটে, কিন্তু বিকৃত ভাষা — যেমন পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, উড়ে বা খোট্টাই মিশ্রিত বাংলা, অথবা অন্য কোনো জাতের বিকৃত বাংলা শুনলে বাঙালী না হেসে থাকতে পারে না। খোনা, তোৎলা, ট্যারা লোকের মধ্যে যেটুকু অ-স্বাভাবিকতা আছে, তা বোধ হয় অতিমাত্রায় পীড়াদায়ক নয় বলেই, মানুষের হাসি আনে। তাই বাংলা সাহিত্যে "যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল" আদ্যিকাল থেকে হাসির উপকরণ জুগিয়ে এসেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সর মূলতঃ এই অসংগতি জিনিসটিকেই একটু নতুন ও চমক্‌প্রদ কথায় ঘুরিয়ে বলে তাকেই হাস্যরসের উপাদান বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা তখনই শুধু হাসি, যখন একটা বৃহৎ অনুভূতি প্রত্যাশা ক'রে থাকি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব সামান্য একটা অনুভূতিতে গিয়ে পৌঁছুই। এক কথায়, অনুভূতির জগতে পর্বত যখন মূষিক প্রসব করে তখন মানুষ না হেসে পারে না।

অনুভূতিগত প্রত্যাশার অকালমৃত্যুতে মানুষের হাসি পায় নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকেই হাস্যরসের একমাত্র উপাদান বলে নির্ণয় করা চলে না। অবশ্য স্পেন্সরের মত কাণ্ট-প্রমুখ পণ্ডিতদের মতেরই প্রতিধ্বনি। দার্শনিক হেগেলই প্রথম পূর্ববর্তী এইসব মতের সমন্বয় ও বিস্তৃতি দ্বারা হাস্যরসের এমন একটি

ব্যাখ্যা দেন, যা মোটামুটিভাবে হাস্যরসের যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে, এবং পরবর্তী পণ্ডিত ও সমালোচকেরা যা মূলতঃ গ্রহণ করেছেন।

পূর্ববর্তী দার্শনিক ও পণ্ডিতদের মত আলোচনা ক'রে হেগেল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, কারুর প্রতি বিদ্রূপ বা তাচ্ছিল্যের ভাব থেকেই যে হাস্যরস উৎপন্ন হয় এমন কথা বলা যায় না। কমেডিতে দর্শক যখন হাসে তখন সে হাসির চরিত্রটিকে লক্ষ্য করেই শুধু হাসে না, সেই চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই হাসে (The spectators laugh with the actor instead of at him)। অর্থাৎ অনেক সময়েই ঐ চরিত্রের সঙ্গে সে নিজেকে একাত্ম ক'রে ফেলে। হেগেল বলেছেন, "inseparable from the comic is an infinite geniality and confidence capable of rising superior to its own contradiction and experiencing therein no taint of bitterness nor sense of misfortune whatever." অনেকেরই মতে মানুষের মধ্যে হাসবার যে সহজাত আকাঙ্ক্ষা আছে, কৌতুকরসবোধ বা sense of humour তারই স্বাভাবিক পরিণতি। সেজন্য কার্লাইল, থ্যাকারে, পামার প্রমুখ আধুনিক লেখকেরা সকলেই এই বিষয়ে এক মত যে অপরের প্রতি অসূয়া, কোনোরূপ তিক্ততা, অপরকে খোঁচা দেওয়া বা আঘাত করা এসব প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান হতে পারে না। স্থূলরুচি লোকের কাছে এ-জাতীয় জিনিস খুব হাসির মনে হতে পারে বটে কিন্তু শিক্ষিত সূক্ষ্মরুচি মনে এগুলো ততটা হাসি আনে না। এ জন্যই কার্লাইল বলেন, "True humour springs not more from the head than from the heart; it is not contempt; its essence is love ... It is a sort of inverse sublimity, exalting, as it were, into our affections what is below us, while sublimity draws down into our affections what is above us, The former is scarcely less precious or heart-affecting than the latter; perhaps it is still rarer, and as a test of genius, still more decisive." এবং থ্যাকারে বলেন, "A literary man of the humoristic turn is pretty sure to be of philanthropic nature; to have a great sensibility to be

easily moved to pain or pleasure, keenly to appreciate the varieties of temper of people round about him and sympathise in their laughter, love, amusement, tears ... the best humour is that which is flavoured throughout with tenderness and kindness."

জন পামার তাঁর সেক্স্পীরীয় কমেডির আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে Falstaff জাতীয় চরিত্রের কার্যকলাপে ও কথায় আমরা যতই হাসি না কেন, তাদের আমরা মনে মনে পছন্দ করি, আমাদের সহানুভূতি থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। অর্থাৎ এদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাসি, হাসি দিয়ে আমরা এদের আঘাত করি না। বাংলা সাহিত্যেও উৎকৃষ্ট হাস্যরস যখনই পরিবেশিত হয়েছে, তখনই আমরা লেখকের সহানুভূতিশীল দরদী মনের পরিচয় পেয়েছি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত', 'সধবার একাদশী'র নিমে দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, আধুনিক কালে দার্শনিক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমালোচক, সকলেই এই মত পোষণ করেন যে, প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান খোঁচা, আঘাত বা বিদ্রূপ নয়, দরদ, ভালোবাসা, প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অসংগতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বচ্ছ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এ-সত্য অনেকদিন আগেই ধরা পড়েছিল। তাই তিনি বিশেষভাবে হাস্যরস সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও নানা সমালোচনা প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে তাঁর মতটি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ··· ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নাই।" এবং হাস্যরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখেছেন, "রহস্য পটুতায়, মনুষ্য চরিত্রের বহুদর্শিতায় — লিপি চাতুর্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোমের সমকক্ষ ··· ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং সুরুচির বিরোধী নহেন।" স্পষ্টই বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে যে দু'টি গুণ আবশ্যিক বলে মনে করতেন, তা সুরুচি ও পরদুঃখকাতরতা বা ব্যাপক মানব-সহানুভূতি। হাস্যরসের ক্ষেত্রেও তিনি এই দু'টি গুণ অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেন। এ-বিশ্বাস যে তাঁর মনে কত দৃঢ় ছিল, তাঁর নিজস্ব হাস্যরসাত্মক রচনা 'কমলাকান্তে' তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক কালের হাস্যরসিকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান লেখক অধ্যাপক স্টিফেন লীকক্‌ও গভীর মানবসহানুভূতি বা ব্যাপক দরদকে হাস্যরসের অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন। হাস্যরসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "Humour may be defined as the kindly contemplation of life, and the artistic expression thereof." —*Humour and Humanity*। এবং এই kindly কথাটির মধ্যেই হাস্যরসের সংজ্ঞার আসল কথাটি বা "essential element" নিহিত আছে বলে তিনি মনে করেন। আরিস্টটলের উক্তি "Some defect or ugliness which does not imply pain" উদ্ধৃত করে স্টিফেন লীকক্‌ বলেছেন যে, এই কথাটি দ্বারাই কৌতুকহাস্যের মূল তত্ত্বটি প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয়ে গেছে। লীককের মতে, এই উক্তিটির তাৎপর্য অতি গভীর — যা লীকক নিজে kindly শব্দটির দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

হাস্যরসের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে হেগেল, কার্লাইল, থ্যাকারে, পামার বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতের বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। বস্তুতঃ, আধুনিক কালে খুব কম দার্শনিক বা সাহিত্য-সমালোচকই বার্গ্‌সঁ-র এই কথায় সায় দেবেন যে "in laughter we always find an avowed intention to humiliate, and consequently to correct our neighbour."

তবে এ-কথাও মানা দরকার যে এইরকম গভীর দরদপূর্ণ দৃষ্টিতে জগৎ ও তার অসংগতি ও অসম্পূর্ণতাগুলিকে দেখে যিনি হাসতে এবং হাসাতে পারেন, "পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক" সে জাতীয় অত্যুচ্চশ্রেণীর হাস্যরসিকগণের সংখ্যা জগতে মুষ্টিমেয়। জগতের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক নিশ্চয় এঁরাই। কিন্তু পৃথিবীতে মানবের দৈনন্দিন চলা-ফেরা কথা-বার্তা দেখা-শোনায় এবং সাহিত্যশিল্পে এত যে হাস্যরসের স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার মধ্যে খুব সামান্যই এই স্তরের উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস বলে গণ্য হতে পারে। ম্যাক্স্‌ বীয়রবম তাঁর উপাদেয় প্রবন্ধ Laughter-এ বলেছেন যে জগতের বেশির ভাগ কৌতুকহাস্যই উৎপন্ন হয় খোঁচা দিয়ে, এবং যাঁরা আমাদের উপরে ক্ষমতার আসনে বসে আছেন তাঁদের খোঁচা দিতে পারলেই মজাটা যেন হয় বেশি। বাস্তবিকই ব্যাপক অর্থে হাস্যরস সকল প্রকার উপাদানই গ্রহণ ও আত্মসাৎ

করে। পূর্বেই বলেছি হাস্যরসের প্রকৃতিভেদ ও স্তরভেদ আছে। এবং যেহেতু হাস্যরসাত্মক সাহিত্য জীবনকেই অনুকরণ করে ও জীবন থেকেই রস সংগ্রহ করে, সেহেতু মানবমনের সকলপ্রকার আবেগই এর অন্তর্গত হতে পারে। সুতরাং হাস্যরস উৎপাদনের জন্য হাস্যরসিক একদিকে যেমন খেয়াল-খুশি বা আবোল-তাবোলের সাহায্য নিতে পারেন, তেমনি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের সাহায্য নিতেও তাঁর বাধা নেই। তিনি কোনো জিনিস বাড়িয়ে বলেন, কিছু বা কমিয়েও বলতে পারেন। তাঁর রচনা আদর্শবাদী হতে পারে, বাস্তববাদী হতেই বা বাধা কি? যে-আবেগ, যে-মত, যে- স্থান কাল ও পাত্রেই হাস্যরসের ছোঁয়া লাগে, তাই উজ্জ্বল, কোমল হয়ে আসে, তার অন্ধকার বা কঠিনতা কোথায় চলে যায় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না।

তবু, খাঁটি এবং উচ্চস্তরের হাস্যরস গভীর মানব-সহানুভূতি ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না, এ-কথা মানতেই হবে। উচ্চশিক্ষিত, সুসভ্য, সংস্কৃতিপরায়ণ মন ভিন্ন জাগতিক ও মানসিক অসংগতি-অসামঞ্জস্যের কৌতুকটি ঠিক ধরতে পারে কি না সন্দেহ। জগৎ ও জীবনের মূলে একটি মৌলিক মজা আছে — যা উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মনেই শুধু উপলব্ধ হয়। অধ্যাপক পেরী (H. T. E. Perry) এ সম্বন্ধে বলেছেন, " 'The greatest Comedy' it has been well said, 'is rooted not in the social order...but in the supreme human paradox that man, who lays claim to an immortal spirit, is nevertheless confined in a body and must rely upon the exercise of five imperfect senses for his perception of order, truth and beauty in his earthly pilgrimage.' Caught in this dilemma man half-consciously realizes the anomalous nature of his position on the terrestrial globe, and he laughs partly from discomfort, partly from exuberance and altogether from perplexity at the fate that has placed him here." জীবনের মূলেই যে মস্ত তামাশা! কোথায় বা "অমৃতস্য পুত্রাঃ", আর কোথায় পঞ্চেন্দ্রিয়বদ্ধ ক্ষীণজীবী মানুষ — যে প্রতি পদে, কার্যকলাপে এবং জীবনমৃত্যুতে পরিবেশ, কর্ম ও অদৃষ্টচক্রের দ্বারা আবদ্ধ।

তবু মানুষ লড়াই করে চলেছে। ডন কুইক্সোটের হাওয়া-কলের সঙ্গে লড়াইয়ের চেয়ে এ কি কম মজার? এই মজাটা যিনি অনুভব করেন তিনিই তুড়ি মেরে বলতে পারেন "হেসে নাও, দু' দিন বৈ ত নয়"। মনের অন্তস্তলে মানুষ এই বিরাট অসংগতি সম্বন্ধে সচেতন বলেই, ছোটখাট অসংগতিতে সে প্রাণ খুলে হাসতে পারে; এবং হাসাতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না ক'রে সে বলে, "এ সংসার রসের কুটি, খাই দাই আর মজা লুটি"।

এই যে জীবনের মৌলিক অসংগতি, এর থেকে কোনো মানুষেরই রেহাই নেই। তাই যতই বেশি লোকের সঙ্গে আমরা মিশি, ততই জীবনের নানা অসংগতির মজা বেশি করে অনুভব করতে পারি, ততই বেশি হাসতে পারি। এ বিষয়ে অধ্যাপক পেরীর উক্তি অনুধাবনযোগ্য; "The more one associates with other people, the more one will develop the social confidence and detachment necessary for a hearty sense of amusement at the basic conditions of human life, and that is perhaps why we are more likely to laugh in the presence of our fellow beings than when alone in the company of our private thoughts. Laughter thrives best when a group of varied people are brought together in such a way that their humanity is intensified and their individual differences are minimized as far as possible."
—*Masters of Dramatic Comedy and Their Social Themes.*

পূর্বেই বলেছি, হাস্যরসের ক্ষেত্র ও পরিধি অতি ব্যাপক। যদিও অসূয়াহীন দরদী মন নিয়ে জীবন ও জগতের অসংগতিগুলি দেখতে এবং দেখাতে পারলেই খাঁটি হাস্যরস উৎপন্ন হয়, তবু খোঁচা দিয়ে বা আঘাত দিয়েও যে কিছুটা হাসি আনা যায়, তা পৃষ্ঠে চপেটাঘাত ও শ্যালক সম্বোধন দ্বারা বন্ধুবান্ধবরাই অনেক সময় বুঝিয়ে দেন। খোঁচা বা আঘাত, অসূয়াপূর্ণ, বিদ্বেষসঞ্জাত ও রুচিহীন হয়েও যে কখনো হাসি উৎপন্ন না করে এমন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর কবি ও তরজাওয়ালাদের রচনায় যেটুকু হাস্যরস আছে, তা প্রায় সবই এই নিম্নস্তরের।

উচ্চস্তরের সাহিত্যেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বা satire জাতীয় রচনা প্রচুর হাসি জোগায়, তাতে সন্দেহ নেই। তবু খাঁটি satireকে হাস্যরসাত্মক রচনা বলে গণনা করা চলে না। ভল্টেয়ার, আনাতোল ফ্রাঁস, বার্নার্ড্ শ' প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত Satirist-গণকে কেউ হাস্যরসিক লেখক বলে অভিহিত করেন না। কারণ satire বা বিদ্রূপাত্মক রূপক রচনা বিদ্বেষপ্রসূত না হয়ে পারে না, এবং এর আঘাতও অতি প্রচণ্ড। তবে উচ্চশ্রেণীর satire-এ যে-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, এবং যে-আঘাত দেওয়া হয়, তা কোনো ব্যক্তির প্রতি নয়; কোনো প্রথা, আচার, মতবাদ, সমাজ বা আইন-কানুনকে লক্ষ্য করেই উৎকৃষ্ট বিদ্রূপাত্মক রচনার সৃষ্টি হয়। বিদ্রূপ যেখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা গালাগালির স্তরে নেমে আসে, সেখানে আর তা হাসির রচনা বলে গণ্য হয় না। বাংলা সাহিত্যে এ-জাতীয় রচনারও অভাব নেই, যার মধ্যে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা এতই প্রকট যে তা যেন —

"··· চিম্‌টি কাটে ঘাড়ে
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।"

অবশ্য ভালো ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপাত্মক রচনা পড়ে আমরা হাসি, অনেক সময় খুবই হাসি, কিন্তু তাকে প্রকৃত হাস্যরসের পর্যায়ে ফেলা চলে না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সার্থক রচয়িতা হাস্যরসের সাহায্য নেন বটে, কিন্তু কখনো আঘাত করতে বিরত হন না। এ যেন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুনের বাণ নিক্ষেপ। হাসির অন্তরালে আঘাতটি প্রচ্ছন্ন থাকে বলে সহসা টের পাওয়া যায় না, কী প্রচণ্ড এ-আঘাত। তাই Ronald Knox বলেছেন, "Satire borrows its weapons from the humourists. Yet the laughter which satire provokes has malice in it always." মেরেডিথ কমেডির হাসি বা সাহিত্যের কৌতুক-হাস্যকে "impersonal" এবং "of unrivalled politeness" বলে বর্ণনা ক'রে তার সঙ্গে তুলনায় বিদ্রূপাত্মক হাসির উল্লেখ ক'রে লিখেছেন, "The laughter of satire is a blow in the back or the face — *An Eassay on Comedy.*"। অবশ্য ব্যঙ্গ অসূয়াহীন ও সহানুভূতিময় হলে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ

"impersonal" (নৈর্ব্যক্তিক) অথবা এমন ব্যাপক হওয়া দরকার যে স্বয়ং লেখকও সেই ব্যঙ্গের পাত্র বলে গণ্য হতে পারেন।

'স্যাটায়ার' বা বিদ্রূপাত্মক রচনায় কৌতুক ভিন্ন অন্য যে বস্তুটির সাহায্য লেখকেরা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন, তা হচ্ছে wit। এই কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া মুস্কিল, এবং ইংরেজীতেও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই শব্দটির ব্যবহার খুব বেশিদিন হ'ল শুরু হয় নি। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইংলণ্ডে সাহিত্যিকরা এর বহুল ব্যবহার শুরু করেন; Davenport ও Hobbes এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। এর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে Pope এবং Addison এই শব্দটির যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন। অ্যাডিসন্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কোনো লেখক যখন বিভিন্ন বিচিত্র জাগতিক বিষয় ও বস্তুর মধ্যে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর, অথচ বুদ্ধির আনন্দবিধায়ক কোনো সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন, তখনই wit-এর সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যখন সাদৃশ্যের পরিবর্তে বৈপরীত্য দেখানো হয়, তাঁর মতে তখনও wit-এর উদ্ভব ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কবিতার এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, "My mistress' bosom is as white as snow — and as cold."

আধুনিক কালে মনস্তাত্ত্বিক সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড্ wit নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন *Wit and Its Relation to the Unconscious*-এ। Wit যে কমিকেরই একটা প্রকারভেদ, পূর্ববর্তী লেখকদের মত উদ্ধৃত ক'রে ফ্রয়েড তা দেখিয়েছেন। তাতে বোঝা যায় যে, অ্যাডিসন wit-এর যে-সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, পরবর্তী পণ্ডিতদের মত তার থেকে খুব দূরবর্তী নয়। তবে বিষয়টিকে এঁরা আরো বিশদ ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। K. Fischer বলেছেন, "The judgment which produces the comic contrast is wit ...Wit is a *playful* judgment ...Wit is nothing but a free play of ideas." Jean Paul Richter রসিকতা ক'রে বলেছেন, "Wit is the disguised priest who unites every couple." এবং Thomas Vischer এর উপর রং ফলিয়ে বলেছেন, "He likes best to unite those couples whose marriage the relatives refuse to

sanction."। Vischer অবশ্য বলেছেন যে এটাই wit-এর একমাত্র সংজ্ঞা নয়। তাঁর মতে আভ্যন্তরীণ বস্তু অথবা অন্য কোনোরূপে সম্পর্কিত নয়, এরূপ একাধিক ভাব বা ধারণার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা বা একীভূত করাই উইট্। Vischer এ-কথাও বলেছেন যে এরূপ অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য নয়, বৈসাদৃশ্যটাই প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু রিখ্‌টারের দেওয়া সংজ্ঞার সঙ্গে Vischer-এর বক্তব্যের বড় বেশি প্রভেদ নেই।

উইট্ সম্বন্ধে অন্যান্য লেখকেরা "the contrast of ideas", "sense in nonsense", "confusion and clearness" প্রভৃতি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং এর প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনো দিক থেকে যথার্থ। রিখ্‌টার আরো বলেছেন, "Brevity alone is the body and soul of wit," যা সেক্সপীয়রের সুবিখ্যাত উক্তিরই প্রতিধ্বনি :

"... brevity is the soul of wit,
And tediousness the limbs and outward flourishes."

—*Hamlet*, Act. II, Scene 2

আর Fischer বিষয়টিকে আরো প্রাঞ্জল করে দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "Wit must unearth something hidden and concealed."

ফ্রয়েড্ পূর্ববর্তী মনীষীদের এইসব উক্তির যাথার্থ্য মেনে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে উইট্ বস্তুটির উদ্ভব ও সার্থকতা বিচার করেছেন। কিন্তু আমাদের সে দুরূহ বিষয়ে অগ্রসর হবার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন প্রকারের wit-এর বহু দৃষ্টান্ত ফ্রয়েড উদ্ধৃত করেছেন এবং comic humour-এর সঙ্গে wit-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন। সে-সব ব্যাখ্যা অথবা Pope ও Addison-এর মতো True wit এবং False wit-এর সূক্ষ্ম সীমারেখা নির্ণয়ের চেষ্টা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে wit -এর টেক্‌নিক্ বা wit-রচনার বিবিধ কৌশলের যে-সংক্ষিপ্তসার ফ্রয়েড্ দিয়েছেন, সেটি প্রণিধানযোগ্য :

I. Condensation
   (a) With mixed word formation.
   (b) With modification.

II. The Application of the Same Material

(c) The whole and the part.

(d) Change of order.

(e) Slight modification.

(f) The same words used in their full or colourless sense.

III. Double Meaning

(g) Name and Verbal Significance.

(h) Metaphorical and Verbal Meaning.

(i) True Double Meaning (play on words).

(j) Ambiguous Meaning.

(k) Double Meaning with Allusion.

উপরের তালিকা থেকেও এই কথাই বোঝা যায় যে, wit জিনিসটি আসলে শব্দ এবং শব্দার্থ নিয়ে খেলা (playful judgment) ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই খেলা যে বিদ্যাবুদ্ধি-সমুজ্জ্বল মন দ্বারাই সম্ভব এ-ও স্বতঃসিদ্ধ কথা।

কাজেই, wit যেমন বুদ্ধির থেকে উৎসারিত, তেমনি এর আবেদনও প্রধানতঃ বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ের কাছে নয়। যেরূপ ধরণের বাক্‌চাতুর্য আবেগকে আন্দোলিত করার পরিবর্তে শিক্ষিত, মার্জিত, সংস্কৃতিপরায়ণ মনে বুদ্ধির আনন্দ-বিধান করে তাকেই আমরা wit বলে অভিহিত করতে পারি। ইংরেজিতে wit শব্দটির মূলগত অর্থ বুদ্ধি। Wit সৃষ্টিতে বা এর রসগ্রহণে বুদ্ধিরই প্রাধান্য ব'লে হাস্যরস যেমন সর্বসাধারণের উপভোগ্য, wit তা হতে পারে না। সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণের কাছে wit-এর পরিবেশন নিরর্থক ব'লে প্রকৃত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ পাঠকসমাজ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত wit-আশ্রিত হাস্যরসের বড় বেশি বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্যই আমরা দেখতে পাই, ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে wit-এর সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। অপরপক্ষে আধুনিক যুগে wit-প্রধান হাস্যরস অনেকে সৃষ্টি করেছেন, এমন কি কোনো কোনো লেখকের রচনারীতিই wit-এর মিশ্রণে উপভোগ্য হয়েছে।

তবে wit এবং humour বা কৌতুকহাস্যের স্পষ্ট সীমারেখা টানা বড়ই মুস্কিল। সাহিত্যে এবং শিক্ষিত বুদ্ধিমান্, সংস্কৃতিবান্ লোকের কথাবার্তায় wit এমনভাবে কৌতুকহাস্যের সঙ্গে মিশে থাকে যে যমজ ভাইয়ের মত এদের দুটিকে আলাদা করে বেছে নেওয়া অনেক সময় খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

তবু এ-কথাটা মনে রাখা দরকার যে, wit প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য, এবং কৌতুকহাস্য বা নিছক humour মুখ্যতঃ হৃদয়গ্রাহ্য। Wit অনেক সময়ই কথার মারপ্যাঁচে প্রকাশিত হয়, যাকে আমরা বলি বাক্‌চাতুর্য। কিন্তু humour বা কৌতুকহাস্য শুধু চতুর কথায় সীমাবদ্ধ নয়। তা পরিস্থিতি, ঘটনা, চরিত্র, বাক্যালাপ ইত্যাদি নানা জাতীয় বিষয়কে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠতে পারে। Wit এবং humour এর পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে একজন সমালোচক অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বলেছেন, "Wit is of the mind : neat nice, intellectual, sharp and gay ; humour is of the body : loose, broad, emotional, cheerful and jolly." অর্থাৎ wit হচ্ছে মনের ; তা' পরিচ্ছন্ন, চমৎকার, বুদ্ধিসঞ্জাত, তীক্ষ্ণ, ও খুশিতে ভরা এবং humour হচ্ছে শরীরের ;—তা শিথিল, প্রশস্ত, আবেগপ্রবণ, প্রফুল্ল এবং হাস্যময়। এই কথারই যেন প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে পাই, "ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক ; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই। ... সুখে আমরা স্মিতহাস্য করি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি।" এই উচ্চহাস্যেই হাস্যরসের প্রকৃত পরিচয়। Satire বা wit জাতীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য হাসি স্মিতহাস্য মাত্র।

কৌতুকহাস্য অনুভূতি বা হৃদয়কে আন্দোলিত করে বলে এ হাসি প্রাণখোলা হাসি। আর প্রাণখোলা হাসিরই অপর নাম উচ্চহাস্য। বুদ্ধির ক্ষেত্রে চমক্ লাগিয়ে যে হাসি উৎপন্ন হয়, স্বভাবতঃই তা মৃদুহাস্য, স্মিতহাস্য। কিন্তু এই দুই জাতের হাসির মাঝখানে কোনো স্পষ্ট বিভেদরেখা টানা বড় সহজ কথা নয়। উৎকৃষ্ট কৌতুকহাস্য, যা উচ্চহাস্যেই প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক, তা অনেক সময় স্মিতহাস্যেই প্রকাশিত হয়। আবার এর বিপরীত ঘটনাও

বিরল নয়। ইংরেজ বা পাশ্চাত্ত্য দেশীয় লেখকেরা কৌতুক-হাস্যের আলোচনা প্রসঙ্গে laughter শব্দটিই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এই laughter যে অনেক সময় smile-এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, স্মিতহাস্য দ্বারা যে কখনো কখনো আমরা উচ্চহাস্যই প্রকাশ করি, এ-বিষয়ে তাঁরা অনবহিত নন। Ashly Thorndike বলেছেন, "Humour in the vast sense of the word is indeed appropriate and comprehensive to include the widest range of response in smile and laughter. It also indicates the most superior of emotions connected with the comic. Comedy imitates the action of man so as to appeal largely to our sense of humour."

প্রকৃতই, হাস্যরসের উপাদানরূপে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ঠাট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র জিনিসের সমাবেশ ঘটে ব'লেই, নানা জাতের হাসি উৎপন্ন হয়। তা ছাড়া সব মানুষ একরকম হাসে না। বয়স্ক বা প্রবীণ লোক এবং সম্মানিত, উচ্চসংস্কৃতি-বান্ বা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চহাস্য খুব কমই করেন। ম্যাক্স বীয়রবম তাঁর Laughter প্রবন্ধে লিখেছেন, "I utter a coarse peal of laughter. At least, I say I do so. In point of fact I have merely smiled. Twenty years ago, ten years ago, I should have laughed, and have professed to you that I had merely smiled ... There is no dignity in laughter, there is much of it in smiles. Laughter is but a joyous surrender, smiles give token of mature criticism."

আমাদের দেশের প্রাচীন প্রাজ্ঞরাও ধীর এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উচ্চহাস্য বেমানান ব'লে মনে করতেন। তাঁরা অবশ্য স্মিতহাস্য আর উচ্চহাস্য, হাসিকে শুধুমাত্র এই দুইভাগে বিভক্ত ক'রেই সন্তুষ্ট হন্ নি। "সঙ্গীত সর্বস্ব"কার জগদ্ধর (পঞ্চদশ শতাব্দী) ছ' রকম হাসির উল্লেখ করেছেন,

"স্মিতং চ হসিতং চৈব বিহসিতং সাহসিতম্।
ভবেৎ প্রহসিতং চাপি তথাঽতিহসিতং ভবেৎ।
ষড্ভাবসংশ্রিতং হাস্যমেবং ষড্বিধমুচ্যতে॥"

এবং তিনি বলেছেন যে,

"স্ত্রীনীচবালমূর্খাদি বিষয়ো হাস্য ইষ্যতে।
প্রহাসশ্চাতিহাসশ্চ ধীরাণাং নৈব দৃশ্যতে॥
স্মিতং বিহসিতং চৈষাং প্রবলেষ্বপি হেতুষু।
বিপর্যাসেন বৈষম্যং নাটকাদৌ বিশেষতঃ॥
স্মিতং চ হসিতং চাপি বিশিষ্টানাং প্রকীর্তিতাম্।
মধ্যমানাং বিহাসশ্চাবহাশ্চৈব দৃশ্যতে।
প্রহাসোঽপ্যতিহাসশ্চ মন্দানামিহ জায়তে।
বিরুদ্ধৈশ্চেটিতৈস্তৈস্তৈর্বিকৃতরূপভূষণৈঃ॥"

অর্থাৎ নাটকাদিতে স্ত্রীনীচবালমূর্খাদি বিষয়েই হাসি কাম্য। ধীর চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রহাস বা অতিহাস কখনোই দেখানো উচিত নয়। হাসবার খুব প্রবল কারণ উপস্থিত হলেও এঁরা অতিমৃদুহাস্য মাত্র করতে পারেন। মধ্যম চরিত্রগুলি আর একটু বেশি হাসতে পারে, তবে অধম চরিত্রগুলির খুব প্রাণ খুলে হাসতে বাধা নেই।

খালি নাটকের পাত্রপাত্রীদের ক্ষেত্রে নয়, হাসি জিনিসটাই যে একটু নীচস্তরের, এবং প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের অর্থাৎ ভারিক্কি লোকদের জন্য নয় এ-বিষয়ে প্রাচীনেরা খুবই অবহিত ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্লেটো এবং আরিস্টটল্ হাস্যরস সম্বন্ধে নামমাত্র আলোচনা করেছেন। এতেই বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁদের কিছুটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে।* আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা হাস্যকে কি চোখে দেখতেন তারও কিছু পরিচয় উল্লেখ করা যেতে পারে। "সঙ্গীতরাজ"-প্রণেতা কুম্ভকর্ণ (পঞ্চদশ শতাব্দী) লিখেছেন:

"বালকাদিবচোবেষবৈষম্যে জনিতা হি যা।
চেতসো বিকৃতিঃ স্বল্পা স হাসঃ কথিতঃ খলু॥"

তিনি আরও বলেছেন: "দীর্ঘস্বরহিতো হাস্যঃ"। বালকাদির বাক্য বা বেশ-

* একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরিস্টট্ল্ comedy সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তা পাওয়া যায়নি। কাজেই হাস্যরস সম্বন্ধে কতটা এবং কিরূপ আলোচনা তিনি করেছিলেন, তা সঠিকভাবে জানা এখন আর সম্ভব নয়।

ভূষার বৈষম্য হেতু চেতনার যে স্বল্প-বিকার ঘটে, তাই হাসি। এবং তা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেই জন্য সংস্কৃতে হাস্যরস অন্যতম রস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বটে, কিন্তু কোনো মর্যাদা লাভ করেনি। বস্তুতঃ, হাস্যরসের আলোচনায় আলংকারিকেরা স্থান, সময় ও চিন্তার অপব্যয় করেন নি বল্লেই হয়; রসের তালিকার মধ্যে হাস্যরসের উল্লেখমাত্রই তাঁরা যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। এমন কি নাট্যকাব্য ভিন্ন অন্য কাব্যে এ রসের ব্যবহারের কথা তাঁরা একেবারেই বলেন নি; আর নাটকেও, কি ভাবে কোথায় কে লোক হাসাবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে হাস্যরসকে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছেন।

অবশ্য নাট্যশাস্ত্রকারেরা প্রহসনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, কিন্তু হাস্যরসপ্রধান এই শ্রেণীর নাটকের পাত্র-পাত্রী ধরণ-ধারণ সবই নির্দিষ্ট ক'রে দিতে এঁরা ভোলেন নি। 'দশরূপক'-কার ধনঞ্জয় দশ প্রকার নাট্যরূপকের নাম করেছেন। যথা, — নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসন, ডিম, ব্যায়োগ, সমবকার, বীথী, অঙ্ক এবং ইহামৃগ। সংস্কৃত যুগের পণ্ডিত ও মনীষীরা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আনন্দ পেতেন; তাই তাঁরা প্রহসনকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন — শুদ্ধ, বিকৃত বা সংকীর্ণ, এবং উভয়ের মিশ্রণজাত সংকর। এই ত্রিবিধ প্রহসনে কি কি জাতীয় চরিত্র হাসি যোগাবে, ধনঞ্জয় তা স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন।

> "তদ্বৎ প্রহসনং ত্রেধা শুদ্ধবৈকৃতসংকরৈঃ।
> পাখণ্ডিবিপ্রপ্রভৃতি চেটচেটীবিটাকুলম্॥
> চেষ্টিতং বেষভাষাভিঃ শুদ্ধং হাস্যবচোন্বিতম্।
> কামুকাদি বচোবেষৈঃ ষণ্ডকঞ্চুকি তাপসৈঃ॥
> বিকৃতং সংকরাদ্বীথ্যা সংকীর্ণং ধূর্তসংকুলম্।
> রসস্তু ভূয়সা কার্যঃ ষড়্‌বিধো হাস্য এব তু॥

দেখা যাচ্ছে, নীচচরিত্রের বেষভাষা এবং হাস্যময় সংলাপ দ্বারাই মাত্র প্রহসন তৈরি হতে পারতো। অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও যে কয় প্রকার নাট্যরূপকের সন্ধান প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মেলেনা অথবা খুবই কম মেলে, প্রহসনও তার মধ্যে একটি। কার্যতঃ সংস্কৃত নাটকে বিদূষকই ছিলেন একমাত্র চরিত্র, যিনি কিছু কিছু রসিকতা করবার অধিকারী, এবং তিনিও কেবলমাত্র

সেই সকল নাটকেই অবতীর্ণ হতে পারতেন, যে-সব নাটকের নায়ক মরজগতের মানুষ রাজা, দেবতা নন। "Vidusaka is found only in the luxurious company of princes. Whenever the hero is a mortal king, historical or traditional, the Vidusaka appears on the stage." —*Drama in Sanskrit Literature,* R. V. Jagirdar। নাটকে অবতীর্ণ হয়ে তিনি যে রূপে দেখা দিতেন সেটি একটি আস্ত ভাঁড়ের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্থার ব্যারিডেল কীথ্‌ বিদূষকের এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন : "··· ludicrous alike in dress and behaviour. He is a misshapen dwarf, bald-headed, with projecting teeth and red eyes, who makes himself ridiculous by his silly chatter in Prakrit, and his greed for food and presents of every kind." এই অপরূপ ব্যক্তিটি "refers to hunger and eatables (Jagirdar),— এটাই তার চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য। তখনকার দিনে খাওয়ার-কথাই মজা জমাবার প্রধান উপায় ছিল, নাটকের বিষ্কম্ভক-গুলিতেও এর কিছু কিছু পরিচয় আছে। আর, এই বিষ্কম্ভক — রসবৈচিত্র্য (relief) আনবার জন্য নাট্যশাস্ত্রকারেরা যার প্রয়োজন স্বীকার করেছিলেন — তা ঠিক কোথায়, অর্থাৎ নাটকের কোন্ জায়গায় বসাতে হবে, সে-সম্বন্ধেও স্পষ্ট নির্দেশ দিতে তাঁরা ভোলেন নি।

এই ক্ষুদ্র "বিষ্কম্ভক"ই বলতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের একমাত্র আশ্রয়। এক বিদূষক সর্বপ্লাবী বীর, করুণ ও শৃঙ্গার রসের মধ্যে কোনো রকমে হাস্যরসের পতাকাটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে পুরোপুরি হাস্যরসাত্মক কোনো রচনা নেই বল্লেই হয়। হাসির লেখা বা হাসির লেখক বল্লে আজ আমরা যা বুঝি, সেরূপ জিনিসকে প্রাচীন পণ্ডিতরা প্রশ্রয় দেন নি। তাঁরা হাস্যরসটাকে চাট্‌নি-র মত মনে করতেন। পুরোপুরি চাট্‌নি দিয়ে খাওয়ার কথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি পুরোপুরি হাসির রচনার কথাও তাঁরা ভাবতে পারতেন না। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে রসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "রস ইতি কঃ পদার্থঃ ? অত্র উচ্যতে ; আস্বাদ্যত্বাৎ। কথম্ আস্বাদ্যো রসঃ ? অত্র উচ্যতে ; যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতম্ অন্নম্ ভুঞ্জানা

রসান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষাঃ হর্ষাদিন্‌শ্চাপি অধিগচ্ছন্তি তথা নানাভাব-অভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগ্-অঙ্গোসত্ত্বোপেতান্ স্থায়ী ভাবান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকারঃ।"

কেবল সংস্কৃতে নয়, প্রাচীন-সাহিত্য মাত্রেই হাস্যরসের সম্বন্ধে কিছুটা অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করা যায়। এইজন্য মেরেডিথ স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, "Comedy, we have to admit, was never one of the most honoured of the Muses."

প্রকৃতই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পূর্বে সাহিত্যে হাস্যরস তার প্রকৃত মর্যাদা লাভ করেনি। এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত হাস্যরসিককে উপযুক্তরূপে তাঁর শিল্প পরিবেশন করতে হলে এমন এক শ্রেণীর দর্শক বা পাঠকের প্রয়োজন যাঁরা রুচি, রসবোধ ও সহৃদয়তায় সভ্যতার একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নত হয়েছেন। বর্বরজনের কাছে হাস্যরস পরিবেশনের কোনো সার্থকতা নেই। মেরেডিথ্ ঠিকই বলেছেন, "A society of cultivated men and women is required, wherein ideas are current and perceptions quick, that he (the comic poet) may be supplied with matter and an audience. The semi-barbarism of merely giddy communities, and feverish emotional periods repel him."। মানবসভ্যতার অগ্রগতি যে ক্রমশই হাস্যরসের উপযোগী মনো-ভাব ও রুচি তৈরি করে চলেছে ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলেই তা প্রতীয়মান হয়। বিবর্তনের পথ ধরে যতই পিছনের দিকে চলা যায়, ততই হাসির অভাব চোখে পড়ে। পশুপাখী সরীসৃপ হাসে না। বনমানুষ হয়তো একটু আধটু হাসে, অসভ্য, আদিম, বর্বর জাতিরা বোধহয় অপেক্ষাকৃত কমই হাসে। কেননা, যে ব্যাপক ও বহুমুখী দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে বিচিত্ররূপে দেখলে হাসির উপাদান চোখে পড়ে, সভ্যতাহীন মানুষের জীবনে দৃষ্টির সে ব্যাপকতা আমরা আশা করতে পারি না। লীকক্ বলেছেন যে, আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্ জাতি হাসতে জানে না বল্লেই হয়; এবং এও সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, যত দিন যাচ্ছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি হচ্ছে, ততই হাস্যরসের চাহিদা এবং উৎকৃষ্ট হাস্যরসিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, মানবজীবনে হাসির প্রকৃত প্রয়োজন, তাৎপর্য ও গুরুত্ব প্রাচীন পণ্ডিতেরা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি, এবং সেই জন্য হাস্যরসকে তাঁরা যথেষ্ট অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করেছেন। ফলে, প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে এই রস নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে সাহস পান নি। হাস্যরস যদি সাহিত্যে বীররস, করুণ রস, শৃঙ্গার রস প্রভৃতির সমান মর্যাদা পেত, তবে পৃথিবীতে আরো বহু হাস্যরসাত্মক রচনার উদ্ভব হত কি না কে বলতে পারে? দুঃখের বিষয়, অন্যান্য রসের মত হাস্য-রসেও গভীর মানব-সহানুভূতিই যে প্রধান উপাদান এ-কথা, কি আমাদের দেশে, কি পাশ্চাত্ত্য দেশে, কোথাও স্বীকৃত হয় নি। বরঞ্চ খোঁচা বা আঘাতই যে হাস্যরস উৎপন্ন করে এ-কথাই আধুনিক কালের পূর্বপর্যন্ত দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলে এসেছেন। স্টীফেন লীককের মতে গুরুগম্ভীর দার্শনিকরা যদি হাস্যরস সম্বন্ধে এত আলোচনা না করতেন, তাহলেই ভালো হত, কারণ "With honourable exceptions, books on humour are written by people who haven't any. The work is left to writers on philosophy and psychology, and it is amazing how dull scientific people can be when they try."—*Humour and Humanity.*

প্রকৃতপক্ষে আজ পর্যন্তও হাস্যরস তার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে মনে করা যায় না। Tragedy বা বিয়োগান্ত করুণরসাত্মক রচনার যে মর্যাদা, হাস্যরসাত্মক রচনার তার অর্ধেকও নেই। যে কাঁদাতে পারে, তাকে কে না মাথায় তুলে নাচে? কিন্তু যে হাসির আনন্দে জীবনকে সতেজ নবীন করে তোলে, তাকে কে তত বড় আসন দেয়? পৃথিবীর এটাই নিয়ম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন :

> "দেখ ব্রহ্মা করেন সৃষ্টি এবং ধ্বংস মহেশ্বর,
> তবু শিবেরই দেউল গাঁয়ে গাঁয়ে, কই ব্রহ্মার নেই ঘর।"

Oliver Wendel Holmes বলেছিলেন, "The clown knows very well that the women are not in love with him but with Hamlet, the fellow in the black cloak and plumed hat. The

wit knows that his place is at the tail of the procession," আব্রাহাম লিঙ্কনের সময় আমেরিকায় টমাস করুইন (Tom Corwin) একজন হাস্যরসিক সিনেটার ছিলেন। তিনি বলেছেন, "The world has a contempt for the man who amuses it. You must be solemn, solemn as an ass. All the great monuments on earth have been erected on the graves of solemn asses."

অথচ হাসি, কৌতুক, ফুর্তি এগুলি যে মানবজীবনে খুব বড় জিনিস এতে কি সন্দেহ আছে? ম্যাক্স বীয়রবমের মতে "··· only the emotion of love takes higher rank than the emotion of laughter. It is said that the mental symptoms of love are wholly physical in origin. They are not the less ethereal for that. The physical sensations of laughter, on the other hand, are reached by a process whose starting point is in the mind. They are not the less 'gloriously of our clay'." হাসি মানুষের প্রাণকে সজীব রাখে, মনকে সতেজ করে। আমরা যাকে ভালোবাসি, তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কতই না চেষ্টা করি। কৌতুক করার প্রবৃত্তিও মানুষের স্বভাবজ। তবে কৌতুকের ধারণা হয়তো সকলের এক নয়। কেউ স্থূল, কেউ মাঝারি, কেউ অতি সূক্ষ্ম রসিকতায় মজা পায়। যারা খোঁচা দিয়ে, আঘাত ক'রে মজা পায়, তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে অনেক বেশি। কারণ, অধিকাংশ মানুষ এখনো সভ্যতার নিম্নস্তরে রয়েছে। বোধহয় আদিম মানুষ পশু অথবা শত্রু বধ করাটাই সবচেয়ে বড় কৌতুক বলে মনে করতো। সত্যই, আদিম যুগে কৌতুকবোধের সঙ্গে বেশ কিছুটা নিষ্ঠুরতা জড়িত ছিল, এমন মনে করা বোধহয় অসংগত নয়। অনেক ছোট ছেলেদের মধ্যে ফড়িংয়ের ঠ্যাং ছিঁড়ে, পাখির পাখা কেটে মজা করবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এটা অতি-প্রাচীন কালের কৌতুকবোধের জের হতে পারে।

সাহিত্যে এখনো ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আমরা সহ্য করি — এমন কি উপভোগ করি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন, "স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন (বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ অপরের দুঃখ ও অপরকে পীড়নের কথা বলেছেন)

আমাদের চেতনার উপর আঘাত করে বলিয়া আমরা কিছুটা সুখ অনুভব করি", এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, "তৃষার্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল"। কিন্তু যে-ব্যক্তি এত তৃষ্ণাকাতর যে, একগ্লাস জলের পরিবর্তে একঘটি জল চাইছে, তাকে আধখানা বেল এনে দেওয়া নিতান্ত স্বল্প পীড়ন নয়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে জলপাইয়ের মত স্বাদু এবং কবিতার মত প্রাণ-জুড়ানো জিনিস নিয়ে এলেও ফল যে কী ভয়াবহ হতে পারে 'অবাক জলপান' নাটকে সুকুমার রায় তা দেখিয়েছেন। *Ruthless Rhymes* রচয়িতা Harry Graham প্রমাণ করেছেন যে সাহিত্যে ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও পীড়নও কখনো কখনো হাসি উৎপাদন করতে পারে। *Ruthless Rhymes*-এর প্রত্যেকটি কবিতাই এর উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হতে পারে। যথা

"Grandpapa fell down a drain,
Couldn't scramble out again.
Now he's floating down the sewer,
There's one grandpapa the fewer."

অনেক 'লিমেরিক' জাতীয় ছড়াতেও এ ধরণের নিষ্ঠুরতা দিয়ে কৌতুক করতে দেখা যায়। যথা

"There was young lady of Riga ,
Who went for a ride on a tiger ;
They returned from the ride
With the lady inside ;
And a smile on the face of the tiger."

—Langford Reed.

যদিও রবীন্দ্রনাথ কৌতুক উৎপাদনে অল্প পীড়নের উপযোগিতার কথা বলেছেন, তবু তাঁর নিজস্ব ছড়াতেই ঘোরতর পীড়নের দ্বারা তিনি আমাদের হাসাতে দ্বিধা করেন নি—

"বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা —

পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে
গালেতে গালপাট্টা।
শালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠলো জ'মে
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলো গাঁট্টা,
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয় —'ঠাট্টা'।"

বাংলাতে এরকম নিষ্ঠুর ছড়া আরো অনেক আছে। ইংরেজির ছায়ায় রচিত নিম্নলিখিত নিষ্ঠুর ছড়াটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল—

"তিন বুড়ো পণ্ডিত টাক্‌চূড়ো নগরে
চ'ড়ে এক গাম্‌লায় পাড়ি দেয় সাগরে।
গাম্‌লায় ছেঁদা ছিল আগে কেউ দেখনি
গানখানি তাই মোর থেমে গেল এখনি।"

পাঠ্য সাহিত্যে এ জাতীয় কাল্পনিক নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়ন কৌতুকের বিষয় হতে পারে বটে, কিন্তু দৃশ্য-কাব্য বা নাটকে এবং বাস্তব জগতে প্রকৃতই স্বল্প-পীড়নের বেশি কিছু হাসির উপকরণ হতে পারে না। রঙ্গমঞ্চে একজন রসিকতা করে আরেকজনের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করলে তাতে মজা লাগতে পারে, কিন্তু একটা দা এনে কোপ বসালে বিপর্যয় ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত ছড়াটি পড়ে আমরা হাসতে পারি, কিন্তু ঐরূপ ঘটনা প্রকৃতই ঘটলে, তার ফল করুণ তো হবেই, এরপর কতদূর গড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আসলে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, মজা, রঙ্গ, কৌতুক, ঠাট্টা, তামাশা, বাক্‌চাতুর্য বা কথার মারপ্যাঁচ, একটু আধটু আঘাত ও পীড়ন, সবই হাস্যরসের উপাদানরূপে সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে পারে। উচ্চস্তরের হাস্যরসের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তা মানুষের প্রতি দরদ থেকেই উৎপন্ন হয়। এ-দরদ এত গভীর যে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস অনেক সময় করুণ রসে পর্যবসিত হয়। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে মানুষের ক্লান্তিহীন সংগ্রামে নিত্যই যে অসংগতি জমে ওঠে, গভীর সমবেদনা দিয়ে দেখতে না জানলে তার মজাটি ঠিক উপলব্ধি করা যায়

না। তাই পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসের অন্তরালে করুণ রসের একটি নিরবচ্ছিন্ন, নীরব ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন্ বলেছেন, "Playful pain — as you say — that is what humour is. The minute a thing is over-tragic it is comic."। প্রকৃতই, উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস করুণরস থেকে বড় বেশি দূরবর্তী নয়। জন পামার এ-নৈকট্য অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, "Even the participants in a comedy or tragedy can themselves be aware of the antithesis, Persons involved in a comical situation often exclaim : 'If this were not so terribly funny, it would be really tragic. Persons involved in a tragical situation exclaim just as often : If this were not so dreadfully serious it would be really funny."। বাস্তবিকই নিতান্ত হাসির ব'লেই 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কমলাকান্ত, 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দত্ত, 'কঙ্কাবতী' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র বৈকুণ্ঠ করুণরসাত্মক বলে গণ্য হয়নি। নতুবা এরূপ গভীর বেদনাময় সৃষ্টি সহজেই পাঠকের চোখের জল আনতো।

উঁচুদরের সাহিত্যসৃষ্টিতে হাস্যরস এবং করুণরসকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে রাখা প্রকৃতই শক্ত। যাঁরা এ দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে চান, তাঁরা জীবনকে বোধহয় ঠিক সমগ্রভাবে দেখেন নি। মানবজীবনে হাসি আর কান্না পাশাপাশি, এমন কি এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, যে তার দুঃখটুকু বাদ দিয়ে হাসিটুকু গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যই হিউ ওয়ালপোল এই দু'টিকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দেখতে গিয়ে মহা ভুল করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "The world is a comedy to those who think, a tragedy to those who feel."। অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে গেলে দুনিয়াটা খুবই মজার, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে দেখলে এ জগৎ বিষাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু পামার দেখিয়েছেন যে, "There *are* two sides, the comic and the tragic, to almost every predicameat. Walpole's clear cut opposition ... presupposes that the heart is idle

when the brain is active, and that the head ceases to function when the heart is in control. It denies that a man may laugh and be sorry at the same time, relish the humour of his own distresses, deride the fool and yet acknowledge a companionship in his folly."। বাস্তব জীবনে এরূপ মুহূর্ত আমাদের অল্পই আসে যখন কেবলমাত্র বুদ্ধিই জাগ্রত থাকে, অনুভূতি সুপ্ত বা স্তিমিত হ'য়ে পড়ে ; আবার এমন অবস্থাও কল্পনা করা শক্ত, যখন আমরা বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে আড়ালে রেখে কেবলমাত্র অনুভূতি নিয়ে থাকতে পারি। এই জন্য প্রিয়-জনের মূর্খতায় অনেক সময় আমরা হাসি, আবার সে মূর্খতা-জনিত বিপর্যয়ে দুঃখবোধ করি। ভাগ্যের বিড়ম্বনা লক্ষ্য ক'রে অতি দুঃখেও মানুষের হাসি পায়, আবার সুখের দিনেও বিষাদময় স্মৃতিতে আমাদের চোখে জল আসে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রাচীন মনীষী প্লেটোর নিকট এই সত্য ধরা পড়েছিল ; কেননা তিনি বলেছেন, "The true artist in tragedy was an artist in comedy also." —*Apology and Symposium*। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের আলংকারিকেরা, তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ শক্তি সত্ত্বেও, এ জাতীয় একটি কথাও বলেন নি।

২

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই ছেড়ে দিতে হয়। চর্যাপদগুলিতে কোনরূপ হাস্যরস আমরা আশাই করতে পারিনা, সে গানগুলি ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব সাংকেতিক ভাষায় বিবৃত করেছে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রকৃত হাস্যরসের সাক্ষাৎ কমই পাওয়া যায়। সেখানে কৃষ্ণ ও বড়ায়ির দ্বারা যেটুকু কৌতুক করার চেষ্টা আছে, তা এতই স্থূল যে আজকাল আর তা আমাদের হাসি উদ্রেক করে না। কৃত্তিবাসে কান্নার ছড়াছড়ি আছে, কিন্তু হাস্যরসের বিশেষ দেখা পাওয়া যায় না। অথচ কৃত্তিবাসের যে কৌতুকরসবোধ ছিল না এমন নয়। হরধনু ভঙ্গের পর সীতাকে বিবাহ ক'রে নিয়ে যাবার পথে পরশুরাম এসে কিশোর রামচন্দ্রের পথ আটকালেন।

"কুপিত পরশুরাম কহেন বচন॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া যে দেখাইলা গুণ।
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ॥
এতেক কহিয়া ধনু দিলেন তখন।
জানকী ভাবেন নম্র করিয়া বদন॥
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ।
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥
আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি।
না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী॥"

উপরের উদ্ধৃতিতে প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান আছে। এটুকু যিনি লিখেছেন, তিনি ইচ্ছে করলে বা চেষ্টা করলে তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশন করতে পারতেন না, এমন মনে হয় না। ভারতীয় সাহিত্যে হাস্য-রসের যদি তেমন মর্যাদা থাকতো, তাহলে সে-চেষ্টা কৃত্তিবাস নিশ্চয়ই করতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের যে নিদারুণ

অভাব দেখা যায়, তার আরো একটা কারণ, আমার মনে হয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব। ইংরেজ অভ্যুদয় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত, নাটক বাংলাদেশে সংস্কৃতেই লেখা হয়েছে। পঞ্চালিকা বা পাঁচালী কাব্য নৃত্য বাদ্য এবং কিছু কিছু অভিনয় সহযোগে গাওয়া হোত ব'লে, এগুলি আখ্যায়িকা কাব্য হলেও মাঝে মাঝে এতে নাটকীয়তা প্রবেশ করেছে, এবং সংস্কৃত ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে relief বা রসবৈচিত্র্য আনবার জন্য কোথাও কোথাও হাস্যরস স্থান পেয়েছে। গীতি কবিতা এবং আখ্যায়িকা কাব্যের মত বাংলায় যদি প্রাচীনকাল থেকেই নাটক রচনার ধারাটিও চলে আসতো তবে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক-বিষ্কম্ভকের উত্তরাধিকারে কিছু হাস্যরসও বাংলায় আসতে পারতো, এরূপ অনুমান করা বোধহয় অসংগত নয়।

অপরপক্ষে, বর্তমানে সমস্ত আদিযুগ ও মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা যেটুকু হাস্যরসের সন্ধান পাচ্ছি তা নিতান্ত নগণ্য। আধুনিক কাল, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত, আমাদের সাহিত্যে হাস্যরস যেটুকু আছে, পরিমাণে বা গুণে তা উল্লেখযোগ্য নয়। মধ্যযুগের পাঁচালী বা মঙ্গল কাব্যগুলি অনেকটা গতানুগতিক পদ্ধতিতে লেখা হোত, এ-কথা সকলেই জানেন। স্বপ্নাদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে, বারমাস্যা, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, বাসরঘরের বর্ণনা, পতিনিন্দা, চৌতিশা প্রভৃতি বাঁধাধরা বিষয়ের পথ ধরেই এই কাব্যগুলি চলতো। ফলে, এই কাব্যগুলিতে হাস্যরস অবতারণার যেটুকু চেষ্টা দেখা যায়, তাও ঐ গতানুগতিকতার পথে। খুব সূক্ষ্ম উচ্চশ্রেণীর নয়, বেশ মোটা ধরণের হাসিরই মাত্র ক্বচিৎ সাক্ষাৎ মেলে ;— এবং সে হাসির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে — ভোজন, বাসরঘরে নারীগণের হাস্যপরিহাস, বাঙাল কথা ইত্যাদি। সত্যই, অনাধুনিক বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের এতই অভাব এবং কান্নার এত বেশি ছড়াছড়ি যে, বাঙালী হাসতে জানে না এইরূপ একটা অপবাদ প্রচলিত হয়েছে।

তবে, এই গতানুগতিকতাবদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেও দু'একটি প্রীতিকর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। সে ব্যতিক্রম সম্ভব হয়েছে একমাত্র প্রতিভার দ্বারা। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদি ও অন্তে আমরা দুই প্রতিভাশালী কবির সাক্ষাৎ পাই যাঁরা গতানুগতিকতার কাঠামোর মধ্যে থেকেও তাতে

নানা নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আমদানি করতে পেরেছেন। এ দু'জন কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র।

মুকুন্দরামের প্রতিভার একটা বিশেষত্ব এই যে, তা গতানুগতিক বিষয়কেও নূতনত্ব দিয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের দু'টি গল্পের কোনোটিতেই কাহিনী বা পাত্র-পাত্রীর কোনো পরিবর্তন করবার উপায় মুকুন্দরামের ছিল না। তথাপি তাঁর আঁকা চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ও জীবন্ত। বাংলার প্রাচীন লেখকদের মধ্যে একমাত্র মুকুন্দরামই জীবনকে সমগ্রভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে দেখেছেন ; গভীর মানব সহানুভূতিও তাঁর কাব্যের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। সে-কারণে হাস্যরস পরিবেশনের বিশেষ কোনো সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও, যেটুকু কৌতুকহাস্য তিনি আমাদের দিয়েছেন, মধ্যযুগের সাহিত্যে তার তুলনা পাওয়া ভার।

চণ্ডীমঙ্গলে কাহিনী দু'টি। প্রথমটি কালকেতু ব্যাধের কাহিনী। কালকেতু নীচজাতি — ব্যাধ, অতি দরিদ্র। শিকার ক'রে যেটুকু মাংস পায়, সেটুকু বিক্রি করতে পারলে, তবেই খাওয়া জোটে। কালকেতু পশুপাখি শিকার ক'রে আনে, স্ত্রী ফুল্লরা তাই ফেরি ক'রে বেড়ায়। এই দরিদ্র পরিবারের উপর চণ্ডীর কৃপা হল, এবং কালকেতুকে দিয়েই চণ্ডী তাঁর পূজা প্রচার করতে মনস্থ ক'রে তাদের কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। কিভাবে তিনি এলেন, এবং এসে তাঁর ভুবনমোহিনী রূপ এবং দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথা দ্বারা ফুল্লরার ঈর্ষা উদ্রেক ক'রে কিরূপে তিনি অকারণ একটি দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি করলেন, সেও এক কৌতুককর কাহিনী। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেবী নিজ পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে একটি মহামূল্যবান্ আংটি দিলেন যা বিক্রি ক'রে সে একটা রাজ্য পত্তন করতে পারবে। কিন্তু আংটি যত দামিই হোক, নগদ টাকা না পাওয়া পর্যন্ত ফুল্লরা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। কাজেই দেবীকে শেষ পর্যন্ত কিছু টাকাও দিতে হোল। দেবী একটা পুরোনো কুয়ো দেখিয়ে দিলেন, যার মধ্যে সাত ঘড়া ধন পাওয়া গেল। কালকেতু দু'কাঁধে দুঘড়া করে মোহর নিয়ে ঘরে তুলছে, দেবী কুয়োর কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। দু'বারে চার ঘড়া ধন তোলা হ'ল। শেষবারে কালকেতু কিছুতেই আর তিন ঘড়া একসঙ্গে নিতে পারছে না দেখে দেবীর দয়া হল, তিনি নিজেই এক ঘড়া

মোহর কাঁখে ক'রে কালকেতুর পিছে পিছে চললেন। কিন্তু কালকেতুর মনে কি শান্তি আছে?

"মনে মনে কালকেতু করিল যুকতি।
ধন ঘড়া লৈয়া পাছে পালায় পার্বতী॥"

যে-দেবী এত ধনরত্ন দিলেন তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেরই দেওয়া এক ঘড়া মোহর নিয়ে সট্‌কে পড়বেন, এ কি ভাবা যায়? তা' যায় বৈকি! কালকেতুর মত দরিদ্র ব্যাধ যে কোনোদিন একটা মোহর চোখে দেখেনি তার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করাই শক্ত যে দেবতাই হন বা যিনি হন এক ঘড়া মোহর হাতে পেয়েও তিনি সেটা নেবেন না। এটি হাস্যরসের উদাহরণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ হাস্যের পিছনে জন্ম-দরিদ্রের মনের স্বাভাবিক যে প্রতিক্রিয়াটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, তাতেই শিল্পী হিসাবে কবিকঙ্কণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়।

মুকুন্দরামের সৃষ্ট ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীল এই দুই চরিত্রের মধ্যেই হাসির উপকরণ আছে, কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত পুরোদস্তুর Villain বলে তার চরিত্রে কপটতা ও ভণ্ডামি যত ফুটেছে, হাস্যরস তত প্রকাশ পায় নি। এদিক থেকে মুরারি শীল আলোচনার যোগ্য। মুরারি শীলও ভণ্ড, কপট, মিথ্যাচারী — কিন্তু তার ভণ্ডামিটাই হাসির, যেমন আমরা পরবর্তী কালে ঠক্‌চাচার চরিত্রে দেখি। টেকচাঁদের ঠক্‌চাচা আসলে কবিকঙ্কণের মুরারি শীল ও দুর্বলা দাসী, এবং ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীরই আত্মিক বংশধর।

দেবী চণ্ডীর কাছ থেকে মূল্যবান্ অঙ্গুরী পেয়ে কালকেতু সেটি ভাঙাতে মুরারি শীলের বাড়ি গেছে। মুরারি ধনী বেনে হলেও কৃপণের একশেষ, গিন্নিটিও তথৈবচ। কালকেতুর কাছ থেকে ধারে এরা একসের মাংস কিনেছে, এখনো দাম দেয়নি — এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। তাই কালকেতুর সাড়া পেয়েই মুরারি শীল ঘরে লুকিয়েছে, আর গিন্নি তাড়াতাড়ি এসে বলছে, কর্তা তো বাড়ি নেই তাই মাংসের দাম আজ দিতে পারবো না। কালকেতু মাংসের দাম চাইতে আসেনি। সে বল্লে, আমি দামের জন্য আসিনি, একটা আংটি বিক্রি করতে এসেছিলাম। তা খুড়ো যখন বাড়ি নেই তখন "যাই অন্য বানিয়ার বাড়ি"।

ততক্ষণে মুরারি শীল লুকিয়ে সব শুনেছে। একটা আংটি ভাঙাতে

পারলে কিছু লাভ হয়, এ সুযোগ মুরারি শীল ছাড়তে রাজি নয়। তাই তাড়াতাড়ি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনের দরজায় এসেই — যেন বাইরে থেকে ফিরলো এমন ভাব দেখিয়ে,

"বান্যা বলে ভাইপোএ . ইবে নাহি দেখি তোএ
এ তোর কেমন ব্যবহার।"

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় উপাখ্যান ধনপতির কাহিনী। এ কাহিনীর দুর্বলা দাসীর চরিত্রটি যেমন বাস্তব, তেমনি কৌতুককর। পরবর্তীকালে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যে একে আদর্শ করেই হীরামালিনীর চরিত্র এঁকেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুন্দরের কাছে হীরার বাজারের হিসাব দেওয়ার বর্ণনাটি সর্বজন-পরিচিত। কিন্তু কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতি সদাগরের কাছে দুর্বলা দাসী বাজারের যে হিসেব দিচ্ছে, সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয় —

"হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুর্বলার প্রাণ,
লেখাপড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গণি
এক দণ্ড কর অবধান।
হাটমাঝে পরিবেশে আসি হরি মহাযশে
ডাকে মীনরাশের কল্যাণ,
আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাইল পঞ্জি
দিনু তারে কাহনেক দান।
কান্ধেতে কুশের বোঝা নগরে কুশারি ওঝা
বেদ পড়ি করয়ে আশিষ,
ইছিয়া তোমার যশ দিনু তারে পণ দশ
দক্ষিণাও ধারি বহুদিশ!"

এরপর প্রত্যেক জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলার পর —

"প্রবেশ করিতে হাট দেখা পাইল রাজভাট
কায়বার পড়ে উর্ধ্বহাত,
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিনু পণ দশ
কড়ি কানা পড়িল পণ সাত।

হাটে ভ্রমে অনুদিন　　শেখ ফকীর উদাসীন
ব্যয় হইল সপ্তদশ বুড়ি,
সঙ্গে ভারি দশ জন　　দিনু তারে দশ পণ
আমি খাই চারি পণ কড়ি ॥"

আজকালকার দিনে ঝি এসে এ-ভাবে বাজারের হিসেব দিলে কোনো ধনপতিরই পোষাতো না, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

এরপর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধবাসরে আমরা উপস্থিত হতে পারি। নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে সম্ভ্রান্ত বেনেরা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। সবচেয়ে মান্যজন হিসাবে চন্দন ও ফুলের মালা প্রথমেই ধনপতি দিলেন চাঁদবেনেকে। শঙ্খদত্ত ধূসদত্তকে সাক্ষী মেনে এর প্রতিবাদ করলেন। তাতে ধনপতি বললেন,

"ধনে শীলে কুলে মানে চান্দ নহে বাঁকা,
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা।"

এ-কথা শুনে নীলাম্বর দাস হেসে বললেন "ধন হৈতে হয় কিবা কুলের প্রকাশ।" এবং টিপ্পনী কাটলেন

"ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁঢ়,
ধন হেতু চান্দ বান্যা সভা মধ্যে ষাঁড়।"

এখন একবার ধনপতির অন্তঃপুরেও উঁকি দেওয়া যাক। ধনপতির দুই স্ত্রী — লহনা ও খুল্লনা। খুল্লনা সদ্যবিবাহিতা তরুণী, ধনপতির কাছে তারই খাতিরটা বেশি। ঈর্ষায় লহনা অগত্যা বশীকরণ ঔষধের সাহায্যে স্বামীকে বশ করতে মনস্থ করেছে। লহনা কি-কি ওষুধের ব্যবস্থা করেছে মুকুন্দরাম তার একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি শেষ করে মুকুন্দরাম যে মন্তব্যটি করেছেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি অতি কৌতুকজনক চিত্র ফুটে উঠেছে। মুকুন্দরাম স্বয়ং দুই গৃহিণী নিয়ে সংসার করতেন, কাজেই এ-জাতীয় বশীকরণ ওষুধপত্রের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তাই লহনার ওষুধের তালিকাটি শেষ ক'রে মুকুন্দরাম বলছেন,

"ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ,
বুড়াকে না করে গুণ এসব ঔষধ ॥"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যকৌতুকের সাক্ষাৎ

কমই পাওয়া যায়। কেননা, মধ্যযুগের সাহিত্যে আখ্যায়িকার মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণার দ্বারা কাহিনীকে সরস ক'রে তুলবার রীতি বা ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। তবুও যে আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে এবং পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রের রচনায়, কি চরিত্র-চিত্রণে, কি কথোপকথনে, কি বর্ণনা-বিবরণে হাস্যরসের দেখা পাই, তার কারণ, মধ্যযুগের সকল কবির মধ্যে এই দুই কবিই জীবন ও মানুষকে সমগ্রভাবে দেখেছিলেন এবং দরদ দিয়ে দেখেছিলেন, তাই তাঁদের চরিত্রগুলি জীবন্ত, আর তাদের কার্যকলাপ কথাবার্তা সবই দোষে গুণে হাসি কান্নায় মেশানো। এই দুই কবি, সংসার এবং মানবকে যেভাবে দেখেছিলেন (তাঁদের রচনায় তাঁদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পদে পদেই পাওয়া যায়), সেই ভাবেই তাঁরা সংসার ও মানুষ এমন কি দেবতাকেও আঁকতে দ্বিধা করেন নি। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যে এই দুই কবির মধ্যেই হাস্যরসের যথাসম্ভব বিকাশ ঘটেছে।

কবিকঙ্কণের পূর্বেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা মাণিক দত্তের বর্ণনায় মাঝে মাঝে কৌতুকময় ভঙ্গির দেখা পাওয়া যায়। যেমন ব্যাধ কালকেতুর বর্ণনা —

"কালকেতু শয়তানের ঘোড়া
বিয়ানে খায় বেজি পোড়া।...
দাড়ি নাই দুইটা গোপ সারা
মূড়া গাণ্ডিপ মধ্যে দেয় চাড়া।"

কিন্তু এ সব ছোটখাট দৃষ্টান্ত ছাড়া মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃত হাস্যরসের দেখা কমই মেলে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী অংশ চৈতন্য জন্মের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পর অবশ্য এর বহুল প্রচার ও প্রসার ঘটে। কিন্তু এ-অংশে হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা করা যায় না। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতী বা সখীদ্বারা কখনো কখনো ব্যঙ্গোক্তির দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব নিতান্তই প্রণয়লীলার অঙ্গ, তার সঙ্গে হাস্যরসের কোনো সংশ্রব নেই।

চৈতন্য-পরবর্তীকালে তাঁর অসাধারণ জীবনকে আশ্রয় করে যে চরিত-

সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে আমরা কিছুটা হাস্যরস আশা করতে পারতাম। কিন্তু সেখানেও হাস্যরসের সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়। তবে চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস কৌতুকপ্রিয় বালক নিমাইয়ের কার্যকলাপের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে কিছু কিছু হাসির উপকরণ আছে সন্দেহ নেই। যেমন গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের উপর নিমাই যে অত্যাচার করতেন, বৃন্দাবন দাস তার এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন

"কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া॥
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীতা পুথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কানে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
... ...
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষবাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল॥"

বৃন্দাবন দাসের কাব্যে চৈতন্যের শৈশব ও বাল্যকালের আরো অনেক কৌতুকজনক ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন, শৈশবে ছেলেচোরদের পথ ভুল করিয়ে নাকাল করার গল্প, এবং বাল্যকালে সহপাঠীদের খেপিয়ে মজা পাওয়ার কথা। যেসব সহপাঠী নিমাইয়ের কাছে পড়া বুঝতে আসতো না, তাদের তিনি সর্বদাই খেপাতে ভালোবাসতেন। এই সহপাঠীদের মধ্যে আবার কড়চা রচয়িতা মুরারি গুপ্তের উপর তাঁর রাগটা ছিল বেশি, কেননা মুরারি গুপ্ত লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, কোনো কিছু বুঝে নেবার জন্য বোধহয় কখনোই তাঁকে নিমাইর দ্বারস্থ হতে হোত না। সেই রাগে —

"প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা দিয়া গিয়া নাড়ী কর দঢ়॥
ব্যাকরণশাস্ত্র এই বিষম অবধি।

কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি ॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥"

পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে যে-কাব্যধারা বাংলাদেশে বয়ে চলেছিল, তার মধ্যে মানবের সমগ্র রূপটি ফুটিয়ে তুলবার অবকাশ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ের পর তাঁর জীবনী-কাব্য রচিত হতে আরম্ভ করায় সাহিত্যে দেবদেবীর স্থানে মানুষ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। অতএব এই চরিত-সাহিত্যে মানবিকতার পূর্ণ রূপায়ণ অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। এ সাহিত্যে মানবচরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলে হাস্যরসেরও যথেষ্ট স্থান হোত সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত-সাহিত্যে প্রথম থেকেই মানব অবতার বা দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিল বলে এখানে ভক্তিরসোচ্ছ্বাসে অন্য সকল রসই অল্পবিস্তর প্রচ্ছন্ন হয়েছে। চরিতকারগণের মধ্যে বিশেষ ক'রে বৃন্দাবন দাসই শ্রীচৈতন্যের জীবনের খুঁটিনাটি ছোটবড় কৌতুককর ঘটনা ও কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। শৈশব থেকে শ্রীচৈতন্যের কৌতুকপ্রিয়তার দৃষ্টান্তগুলি বৃন্দাবন দাসের কাব্যে সবই দেওয়া হয়েছে। এমন কি পূর্ববঙ্গে গিয়ে বাঙাল ভাষা নিয়ে চৈতন্যদেব যে রসিকতা করেছিলেন বৃন্দাবনদাস সে কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি :

"সবার সহিত প্রভু হাস্যকথা রঙ্গে।
কহিলেন যেমত আছিলা বঙ্গে রঙ্গে ॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥"

—চৈ. ভা., আদিখণ্ড।

কিন্তু তবু 'চৈতন্যভাগবতে' শ্রীচৈতন্যেরই কৌতুকরসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, বৃন্দাবন দাসের নয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনের, বিশেষতঃ তাঁর শৈশব ও বাল্যের খুঁটিনাটি ঘটনা এবং তাঁর তুচ্ছতম কার্যকলাপও ভক্ত বৃন্দাবন দাসের পক্ষে লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য ছিল বলেই যেন তিনি তা করেছেন। বৃন্দাবন দাস নিজে কখনো কোথাও হাস্যরস পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না ; এমন কি শ্রীচৈতন্যের কৌতুককর কার্যকলাপের উপর কোনো মন্তব্য

অথবা টিপ্পনী প্রয়োগ ক'রে তাকে আরো বেশি সরস ও জীবন্ত ক'রে তুলবার চেষ্টা করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল।

এ-সব কারণে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনাই হাস্যরসের স্বল্পপরিসর আশ্রয়-স্থল বলে গণনা না ক'রে উপায় নেই। অতএব, এখন আমরা মধ্যযুগের শেষে ভারতচন্দ্রে এসে পৌঁছতে পারি।

ভারতচন্দ্রের রচনার যা প্রধান দোষ বা গুণ, তা তাঁর অতিবৈদগ্ধ্য। বাংলা, সংস্কৃত ও পারসীতে সমান ব্যুৎপন্ন এই কবি এমন সময় জন্মেছিলেন, যখন পুরাতন আস্থা ও বিশ্বাসগুলি আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল, অথচ নূতন আশ্বাস বা প্রত্যয় তার স্থান পূরণ করতে অগ্রসর হয় নি। সকল প্রকার পুরাতন আদর্শ তখন মৃতকল্প বা মরণোন্মুখ। কিন্তু নূতন জীবনাদর্শ তখনও দেখা দেয় নি। যে স্থান ও পরিবেশে ভারতচন্দ্রের রচনা উৎসারিত হয়েছিল, তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। রাজসভার বিলাসী, শিক্ষিত ও বিদগ্ধ, কিন্তু নীতিবোধ-বর্জিত, আদর্শহীন এবং গভীর রসগ্রহণে অক্ষম যে সম্প্রদায়ের কাছে ভারতচন্দ্র তাঁর কবিত্ব পরিবেশনের ভার পেয়েছিলেন, তাদের রুচি ও বোধের উপযোগী করেই তাঁকে তাঁর কাব্য গড়তে হয়েছে। তার ফলে, ভারতচন্দ্রের কবিতা কোনো আদর্শে বাঁধা পড়ে নি, কোনো নীতিতে সীমায়িত হয় নি, কোনো জীবনদর্শনে জমাট বাঁধে নি। ভারতচন্দ্রের কবিতা বিশ্বাসের দার্ঢ্যহীন তরল বৈদগ্ধ্যেই পর্যবসিত। এই বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের ভাষা ছন্দ ও অলংকারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য সরস চটুল বাক্‌ভঙ্গির চাতুর্যে। ধর্ম ও দেবতা, জগৎ ও জীবন সব কিছুর প্রতিই ভারতচন্দ্র একটি ব্যঙ্গময় অবিশ্বাসী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন বলে, তাঁর সমস্ত রচনার মধ্য দিয়েই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের একটি ধারা বয়ে চলেছে।

তাই ভারতচন্দ্রের রচনায় কি শিব-পার্বতীর বিবাহে এবং কোন্দলে আর কি হীরামালিনী ও বিদ্যা এবং সুন্দর প্রভৃতির কথোপকথনে, সর্বত্রই একটি ব্যঙ্গ ও পরিহাসের প্রচ্ছন্ন ধারা প্রবাহিত। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, ভারতচন্দ্রের মধ্যে যতখানি হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়, তার অধিকাংশ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান্ লোকেরই অধিগম্য। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি

ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ অভিজাত সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টিই তাঁর কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। তাই আজও শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান উচ্চশ্রেণীর লোকের কাছেই তাঁর রচনা সর্বাধিক আদৃত।

উপরে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলা হল, তার থেকে সহজেই এ সিদ্ধান্তে পৌছনো যায় যে, ভারতচন্দ্রের রচনায় যে হাস্যরসের সন্ধান মেলে তা বুদ্ধিগ্রাহ্য — অর্থাৎ wit জাতীয়। Wit শব্দটি সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। আশাকরি এ-কথা এখানে পুনরুল্লেখ করা অবান্তর মনে হবে না যে, বাক্‌চাতুর্য বা কথার কারিকুরি দ্বারা বুদ্ধিতে সুড়সুড়ি দিয়ে হাসানো — পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা যাকে verbal effects বলেছেন — তাই wit-এর মূল কথা। তবে এ-বিষয়ে সকল পণ্ডিতই একমত যে সেক্সপীয়র যে বলেছেন 'brevity is the soul of wit', এর চেয়ে খাঁটি কথা আর হতে পারে না। কথাবার্তায় একটি দুটি শব্দোচ্চারণেই wit প্রকাশ পায়, তাকে ব্যাখ্যা ক'রে, বিস্তার ক'রে বলতে গেলে আর মজাটা থাকে না। লেখাতেও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তরূপেই wit প্রকাশিত হয়। সে-কারণে wit-আশ্রিত রচনা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত এবং epigram জাতীয় হয়ে দাঁড়াতে চায়। স্বল্পপরিসরে "unexpected play upon words", এই সংজ্ঞা যদি গ্রহণ করা যায়, তবে ভারতচন্দ্রের রচনা wit-এ কত সমৃদ্ধ তা পদে পদেই দেখা যাবে। এই wit-এর প্রাধান্য হেতুই ভারতচন্দ্রের রচনা মাঝে মাঝেই epigram-এর রূপ ধারণ করেছে এবং প্রবাদরূপে প্রচলিত হয়েছে। যেমন

"অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম সার।"
"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।"
"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"
"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"
"আছিল বিস্তর রস প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥"
"প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় হে।
তার তাপে বালি তপ্ত কভু সহ্য নয় হে॥"

কথা নিয়ে খেলা করার ঝোঁক ভারতচন্দ্রের এতই বেশি ছিল যে গুরুগম্ভীর

পরিবেশেও ভারতচন্দ্র এর মোহ ছাড়তে পারেন নি। যেমন 'অন্নদামঙ্গলে' 'দক্ষের শিবনিন্দা' —

"গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়
না করে অতিথিসেবা।
সতী ঝি আমার গৃহিণী তাহার
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥"

এমন কি শোকের বর্ণনাও ভারতচন্দ্রের বাক্‌চাতুর্যের ফলে পাঠকের মৃদুহাস্যই উদ্রেক করে। যেমন 'রতিবিলাপ'-এর এই পংক্তিগুলি —

"শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন॥"

এই শেষের পংক্তিটি wit-এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'কপালে রহে' কথাটিতে 'কপাল' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, 'কপাল দহে'তে কপাল ঠিক সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নি; আবার 'আগুনের' বলতে ঠিক অগ্নিই বোঝাচ্ছে বটে কিন্তু 'কপালে আগুন' কথাটিতে 'আগুনে'র ঠিক সে-অর্থ আর নেই। একেই সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্ Double Meaning পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং Metaphorical and Verbal Meaning বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতচন্দ্রের রচনার আদ্যোপান্ত এরূপ বাক্‌চাতুরিতে ভরা। Wit বস্তুটি চিরকালই শিক্ষিত মার্জিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরিপুষ্টি লাভ করেছে। সর্বদেশেই এটা লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্র স্বয়ং অভিজাত বংশজাত এবং শিক্ষিত সংস্কৃতিবান্ অভিজাত সম্প্রদায়ের কবি, সুতরাং তাঁর কবিতায় এ-জাতীয় রচনা-চাতুর্যের সাক্ষাৎ পদে পদেই পাওয়া যাবে এটা অস্বাভাবিক নয়।

নিছক কৌতুক-রসে ভারতচন্দ্র কিছু স্থূল এ-কথা মানতে হবে; অবশ্য সেটা হয়তো যুগধর্ম ও পরিবেশ প্রভাবে। যেমন, শিববিবাহকালে এয়োস্ত্রীদের সামনে গরুড়ের আবির্ভাব দ্বারা শিবের কটিবন্ধের সাপগুলি তাড়িয়ে তাঁকে বিবস্ত্র ক'রে যে মজা করা হয়েছে, সেটা আমাদের কাছে

একটু অসংগত মনে হয়। তবে এই ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে মেয়েদের মধ্যে 'কন্দল' বা ঝগড়ার চিত্রটি উপভোগ্য তো বটেই, নারীজাতির কলহপ্রিয়তার প্রতি ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গটুকুও কম মজার নয়। শিবকে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত দেখেই নারদ —

"দাড়ি নয়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥
আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥"

সকল প্রকার রসিকতার মধ্যে যে-হাস্যরস কথার কারিকুরিতে প্রকাশ পায় তার প্রতিই যে ভারতচন্দ্রের বেশি ঝোঁক ছিল, তা 'জরতীবেশে অন্নদার ব্যাস ছলনা' এবং 'অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা'য় ঈশ্বরী পাটনীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে সুপরিস্ফুট।

ভারতচন্দ্রের হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণরূপে হীরা মালিনীর চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের ভাষায় "পরধনহরা" এই সুন্দরের কাছ থেকে বাজার করবার জন্য দশটা টাকা পেয়ে তাকে নির্বোধ মনে করেই ক্ষান্ত হয় নি, যেরূপ নির্লজ্জভাবে বাজারের হিসাব দিয়ে অধিকাংশ টাকা আত্মসাৎ করেছে, তা খুবই কৌতুককর।

"পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোঁটা ॥
যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গি ॥"

এইরূপ ভূমিকা এবং

"লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।

শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল কড়ি ॥
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥”

এইরূপ উপসংহারের মাঝখানে হীরা মালিনী যে বাজারের হিসাব দিয়েছে, তা হীরারই উপযুক্ত। বাস্তবিকই, কপটতা ও ধূর্ততায়, মিথ্যাভাষণে ও সুবিধাসন্ধানে হীরা মালিনী বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় চরিত্র। কিন্তু এ চরিত্রসৃষ্টির কৃতিত্ব পুরোপুরি ভারতচন্দ্রকেই দেওয়া শক্ত। কেননা, হীরা আসলে কবিকঙ্কণের তুর্বলা দাসীরই আধুনিক সংস্করণ। ভারতচন্দ্র অনেক খণ্ড কবিতাও লিখেছিলেন, এবং সেগুলির মধ্যেও কৌতুক ও ব্যঙ্গ অতি উপভোগ্যরূপে ছড়ানো রয়েছে।

ভারতচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ ছিলেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের রচনায় হাস্যরসের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক আজু গোঁসাই নিজেকে রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন এবং সুযোগ পেলেই রামপ্রসাদ এবং তাঁর রচনাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না। আজু গোঁসাইর এই সব ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে কিছু কিছু হাস্যরসের সন্ধান মেলে।

আজু গোঁসাইর প্রকৃত নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তা অযোধ্যা, অচ্যুত কি রাজচন্দ্র ছিল আজ আর সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই, জানবার প্রয়োজনও নেই। কেননা আজু গোঁসাই নামেই তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছেন। যতদূর জানা যায় ইনি একটু পাগলাটে স্বভাবের লোক ছিলেন। রামপ্রসাদ শাক্ত আর আজু গোঁসাই বৈষ্ণব, সে হিসাবে উভয়ের মধ্যে কিছুটা দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিলই। তার উপর তুজনেই কবি এবং একই গ্রামবাসী। কাজেই ছন্দোবন্ধ উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যে উভয়ের কোন্দল তৎকালীন লোকের কাছে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। তু' একটি দৃষ্টান্ত দিলে এঁদের দ্বন্দ্বের কৌতুকটি পরিস্ফুট হবে। রামপ্রসাদ একটি গান লিখেছিলেন,

“এ সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥”

এর উত্তরে আজু গোঁসাই গান বাঁধলেন,

"এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি ॥"

রামপ্রসাদের আর একটি গান আছে :

"ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধজলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনী কূলে ॥"

আজু গোঁসাই এর উত্তর দিলেন :

"ডুবিসনে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥
একে তোমার কফোনাড়ী।
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি ॥
হলে পরে জ্বরজ্বারি।
যেতে হবে যমের বাড়ী ॥"

রামপ্রসাদের কালীকীর্তনে ভগবতীর গরু চরানোর কথা আছে —

"কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্ধ্বমুখে রব ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু ॥"

এর উপর মন্তব্য ক'রে রচিত গোস্বামী মহাশয়ের গানটি বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়েছে।

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি পাঠায় রে ॥"

পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করবার সুযোগ পেলে যে এঁরা কেউ ছাড়তেন না, তার আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার আজু গোঁসাইকে লক্ষ্য ক'রে রামপ্রসাদ বলেছিলেন, "কর্মের ঘাট, তৈলের কাঠ আর পাগলের ছাট মলেও যায় না।" আজু গোঁসাই সেই কথাটাই একটু বদলে রামপ্রসাদকে ফিরিয়ে দিলেন, "কর্মডোর স্বভাব চোর আর মদের ঘোর মলেও যায় না।"

তান্ত্রিক রামপ্রসাদের মদ্যপান নিয়ে খোঁচা দেবার সুযোগ পেলে আজু গোঁসাই ছাড়তেন না। একবার আজু গোঁসাই রামপ্রসাদকে লক্ষ্য ক'রে একটি গানে লিখেছিলেন—"ও তুই মদের ঝোঁকে কোত্তে পারিস মাঝগাঙেতে ভরাডুবি।" এরই উত্তরে রামপ্রসাদ তাঁর সুপরিচিত গানটি লেখেন—

"সুরাপান করি না আমি।
সুধা খাই জয় কালী বলে॥
আমায় মন-মাতালে মাতাল করে।
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥"

এত বাগ্‌দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই দুই কবির মধ্যে যে সত্যই কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়াঝাঁটি ছিল এমন মনে হয় না। বরং এঁদের রচনা একান্ত অসূয়াহীন বলেই মনে হয়।

ভারতচন্দ্রের আর একজন কনিষ্ঠ সমসাময়িক 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' রচয়িতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের রচনা প্রাচীন পাঁচালীকাব্যেরই ধারাবাহী। সেখানে হাস্যরসের সন্ধান অল্পই মেলে। তবু দৃষ্টান্তরূপে 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' থেকে এ ক'টি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"কহিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক পিছু,
দেশভাষা কন কতগুলি।
যখন বলেন শুন শুনিতে শুনায় হুন,
বালকের নাম পোলাপুলী॥
তুম্বা আঁছলা ঝুলা ঝুলি, পোলাপুলী কতগুলি
লইয়া আইসেন সেইখানে।
গুড়াকু তামাকু কোটা, কার সঙ্গে ডাবা দুটা,
গল্প হয় কত টানে টানে॥"

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের পর ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আসর দখল ক'রে ছিলেন কবিওয়ালারা। কবিওয়ালাদের অভ্যুদয় ও ব্যাপক জনপ্রিয়তার অব্যবহিত পূর্বে রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু সঙ্গীত রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, এবং তাঁর গানগুলি কবিত্বেও সমৃদ্ধ। কিন্তু নিধুবাবুর টপ্পায় হাস্যরস সন্ধান করা বৃথা। এর পর কবিওয়ালাদের হাতে খেউড়-সংযুক্ত হাফ-আখড়াই গানের সৃষ্টি হলে সেখানে দুই কবির দলে পারস্পরিক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালি হওয়াটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব খিস্তি-খেউড় গালাগালির অধিকাংশই সংরক্ষিত হয় নি; এবং যা রক্ষিত হয়েছে, তারও অনেকখানিই হাস্যরসাত্মক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা ঠাট্টা-পরিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়, যা স্থূল হলেও, হাস্যরসরূপে গণনীয়। যেমন, কবিওয়ালা ঠাকুরদাস সিংহ একবার এণ্টনি ফিরিঙ্গিকে বলেছিলেন,

"শোনো হে এণ্টুনি, আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ?"

এণ্টনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,

"এসে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি,
হয়ে ঠাক্‌রে সিং-এর বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।"

কবিগানে দু'জন সদল কবির সংগীত-সংগ্রামটাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। এর খেউড় অংশে কবিরা পরস্পরকে বাক্‌যুদ্ধে জব্দ করবার চেষ্টা করতেন। এ-বাক্‌যুদ্ধের অধিকাংশই অবশ্য গালাগালি, কিন্তু এতে যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি বা ready wit-এরও প্রয়োজন হত। ফলে, খুব পরিচ্ছন্ন না হলেও, এক জাতের হাসি কবিওয়ালারা জোগাতে পেরেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

নীলু ঠাকুর বা নীলমণি চক্রবর্তীর একটি কবির দল ছিল। নীলু ঠাকুরের দাদা রামপ্রসাদ ঠাকুরও এই দলে গান গাইতেন। নীলুর মৃত্যুর পর রামপ্রসাদই এই দলটি রেখেছিলেন। একবার বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসুর সঙ্গে রামপ্রসাদের লড়াইয়ে রামপ্রসাদ রাম বসুকে গালি দিয়ে

বলেন, "নেইকো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরষ।" রাম বসু এর জবাব দেন,—

"তেম্‌নি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্।
যেমন ঢাকের পীটে বাঁয়া থাকে, বাজে নাকো একটি দিন॥
যেমন রাতভিখারীর ধামা বওয়া থাকে একজন।
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন॥
কর্মে অকর্মা ঐ রামপ্রসাদ শর্মা
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী, (ভাইরে)
ঠিক যেন ধোপার বিশ্‌কর্মা।
যেমন বিশ্বে শূন্য বিশ্বেভূষণ সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন॥

এই গানটির আরো পদ আছে। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, "ইহার সমুদয় শুনিলে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।" গানটি প'ড়ে কিন্তু আমাদের সে-রকম সাংঘাতিক ধরণের হাসি পায় না। এতে মনে হয় যে, কবিদের খেউড়ের আসরে যে-সব ব্যঙ্গাত্মক ও ঠাট্টাভরা গান গাওয়া হোত, তার মধ্যেকার হাসিটুকুকে গাইয়েরা তাঁদের নানা অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দিয়ে বাড়িয়ে তুলবার কৌশলটি জানতেন বলেই তা তৎকালিক শ্রোতৃসমাজে এত হাসি জোগাতে পারতো। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে সেকালের শ্রোতাদের নিম্নরুচির কথাও মনে রাখতে হবে।

এই দু'টি গান থেকে আরো একটি কথা প্রমাণ হয়। তা এই যে, কবিওয়ালারা এরূপ প্রচণ্ডরূপে পরস্পরকে আক্রমণ করলেও, এঁদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তিগত রেষারেষি অথবা ঈর্ষা-অসূয়া ছিল না। নিতান্ত লড়াইয়ের প্রথা হিসাবেই এঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করতেন। কেননা, রাম বসু নীলু ঠাকুরের দলের জন্য অনেক গান বেঁধে দিতেন, কিন্তু কোমর বেঁধে আসরে নামলে গালাগালিতে কেউ পশ্চাৎপদ হতেন না।

রামসুন্দর রায় নামে এক কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবিওয়ালা খেউড় ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রচনায় খুব দক্ষ ছিলেন। ইনিও নীলু ঠাকুরের দলে গান বাঁধতেন, এবং একবার গালির চোটে হরু ঠাকুরের শিষ্য ভোলা ময়রার মত সুবিখ্যাত

কবিওয়ালাকেও জব্দ করেছিলেন। এ-গানটি সম্বন্ধেও ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, "কেহ পাঠ করিলে শুনিতে শুনিতে হাসিতে হাসিতে নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়।" নীলু ঠাকুরের গাওয়া এই গানটি উদ্ধৃত করছি,—

"সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।
ভজিস্ ঢেঁকি বলিস কিনা গৌর অবতার।...
তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস্ পচা ভুর।
সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর?"

রামসুন্দর রায় রাম বসুর মত জবরদস্ত কবিওয়ালাকেও প্রচণ্ড আক্রমণ করতে ছাড়েন নি—

"আকড়া সাজায়েছে ভালো, মাকড়া রাম বাউল।
দিয়ে এড়ুয়া বেঁকি নূপুর পায়, ভেড়ুয়া যেন নেচে যায়,
মেড়ুয়াবাদির মত ওটার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল।"

ভোলা ময়রাও আর একজন শক্তিশালী কবিওয়ালা ছিলেন। এঁর ব্যঙ্গ এতই তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি বলেছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।" * এঁর রচনার নমুনা হিসেবে দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"বামুন বলে আমি বড় কায়েৎ বলে দাস
বদ্দি বলে ক্ষত্রি আমি (ঢাকা জেলায় বাস)।"

একশ' দেড়শ' বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সব গান এবং আরো নানারূপ শ্রাব্য ও অশ্রাব্য খেউড় শুনে কতই না আমোদ পেতেন! কবিওয়ালারা দল বেঁধে বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে যখন পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতো, তখন রাজা-জমিদার থেকে চাষী-দিনমজুর পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি যেত। কিন্তু আজ, শুধু এর

* ভারতী, ১৩০৪, বৈশাখ। গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী ভোলা ময়রা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী ভবতোষ দত্ত। পৃঃ ৪২০।

অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নেই বলেই নয়, কোনো কারণেই শিক্ষিত জনসাধারণ এ ধরণের ব্যঙ্গকে খুব বেশি আদর করবে ব'লে কল্পনা করা যায় না। এই কথাই আগে বলেছি। উচ্চশ্রেণীর হাস্যরস এবং শিক্ষিত, মার্জিতরুচি, সংস্কৃতিবান্ পাঠক বা শ্রোতা, এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। উচ্চশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের কাছে যে-ধরণের হাস্যরসের সমাদর, অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর জনসমাজে তা পুরোপুরি গৃহীত এবং আদৃত হতে পারে না। (শ্রেণী শব্দটি এখানে রাজনৈতিক বা সামাজিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, শিক্ষা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি, রুচি প্রভৃতি বিষয়েই বলা হয়েছে।) আজও সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনের জন্য যে-ধরণের রসিকতার শরণ নিতে হয়, তা বেশ মোটা রকম। যেমন, এখনো সিনেমা-থিয়েটার অথবা "হাস্যরসিক"দের আসরে হাসি জমাবার কয়েকটি বাঁধাধরা বিষয় হচ্ছে, (১) বাঙাল কথা, (২) বিকৃত হিন্দি কথা, (৩) তোৎলামি, (৪) দাম্পত্যকলহ বা শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে রসিকতা, (৫) নবীন নবীনাদের হালচাল, (৬) বাড়িওয়ালার সঙ্গে বচসা (সাম্প্রতিক), ইত্যাদি। সবদেশেই লোক-মনোরঞ্জনের জন্য এ-জাতীয় স্থূল রসিকতার প্রয়োজন হয়। কারণ, সাধারণ লোক সূক্ষ্ম ও গভীর রসিকতার মর্ম গ্রহণ করতে পারে না। ম্যাক্স্ বীয়রযম ঠিকই বলেছেন, "The public can achieve no delicate process of discernment in humour. Unless a joke hits it in the eye, drawing forth a shower of illuminative sparks, all is darkness. Unless a joke be labelled 'Come! why don't you laugh?' the public is quite silent. Violence and obviousness are thus the essential factors."।

শুধু কবিওয়ালাদের খেউড়ে নয়, লৌকিক সাহিত্যে এ জাতীয় মোটা রসিকতা বাংলায় আরো জন্মেছিল সন্দেহ নেই, সর্বদেশে সর্বকালেই প্রচুর জন্মায়। কিন্তু এ সব জিনিস কালক্রমে প্রায় সবই হারিয়ে যায়। উনিশ শতাব্দীর এরূপ যে দু'একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে, অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে তা উদ্ধৃত করেছেন। পল্লীকবি

"নাড়া" রামানন্দের গাঁজা ও তামাকু সম্বন্ধে গান দু'টির মধ্যে শেষেরটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"মা মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই। ধুয়া।
উঠি অতি নিশিভোরে হুঁকাটি লয়িয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।
কয়্যা যাব তনয়েরে মৈলে যখন শ্রাদ্ধ করে
কুশ পট্যো টেন্যা ফেল্যা কোঁচরে তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই।
দ্বিজে রামানন্দে ভনে স্থান দিও শ্রীচরণে
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা যাই॥"

দিগম্বরের 'ভণ্ডরামের পদ'টিও উল্লেখ করা চলে

"পৃথিবীতে ভাঁড় যত তাহা বা কহিব কত
সংসার ভাঁড়ের কথা শুন
দেখিঞা অজ্ঞান জনে প্রণয় করে তার সনে
জানাইতে আপনার গুণ।
মিছামিছি করে ঠাট গোলমালে চণ্ডীপাঠ
ভেক ধর্যা সাধুর কাছে যায়
নাহি জানে হিতাহিত মিছামিছি করে প্রীত
[না] জানিঞা আপনাকে খায়।"

অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবির লেখা 'হটুরাম চক্রবর্তীর খেদ' থেকেও অধ্যাপক সেন দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন; কিন্তু সেটি এরূপ অশ্লীল যে আমরা তার সামান্য একটু নমুনা দিয়েই ক্ষান্ত হলাম—

"হটুরাম চক্রবর্তী গেঞেতে পলসাঞী
ষাটি বৎসর বয়ক্রম বিয়া হল্য নাঞী।...
কানা খোঁড়া যদি একটা লিখিত দয়া করি
আমার সেই হত্য সাত রাজার ধন ইন্দের অপছরি।
মেগের প্রতি যত ভক্তি করে সর্ব্ব লোকে
আমি কি তা করিব নাক বল্যেছিলাম তাকে।...

পাট-পড়শী বৌড়ি হয় ভ্রাতৃবধূ যারা
ছি ছি আইবড় বট্‌ঠাকুর বল্যে নাম রেখেছে তারা।”

লোক-সাহিত্যে নানা জাতীয় ঠাট্টা তামাশা কৌতুক প্রভৃতির উদ্ভব হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এখনো ছেলে ভুলানো ছড়া ও প্রবাদ প্রভৃতির মধ্যে এরূপ অনেক কৌতুক ছড়ানো আছে দেখা যায়।

দাশু রায় ও গোপাল উড়ে প্রভৃতির পরই মুখে মুখে গান বেঁধে গাওয়ার তৎকালীন পদ্ধতির অবসান হ'ল বলা যায়। শ্রীরামপুর ছাপাখানা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের উদ্ভব প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার স্থলে পাঠক এসে সাহিত্য-সমজদারের স্থান অধিকার করলো। তাই ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদের ধারাবাহী হলেও, তাঁর রচনার মধ্যেই প্রথম নূতনত্বের আভাস সূচিত হতে আরম্ভ করে।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) আবির্ভাব নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং প্রাচীন-পন্থী হলেও পূর্বতন সাহিত্যকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার মত ইতিহাস-চেতনা তাঁর ছিল। আবার নবযুগের কবিদের অনেকেই তাঁর শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীশদের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু, আর একজন।...আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।” আসলে, ঈশ্বর গুপ্ত পুরাতন ও নূতন যুগের মধ্যবর্তী কবি। তিনি কবিওয়ালাদের সগোত্র হয়েও যুগপরিবর্তনের কিছু কিছু আভাস পেয়েছিলেন। বাল্যকালে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেননি, এবং ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নি। একদিকে ভারতচন্দ্র অপরদিকে কবিওয়ালাদের আদর্শে তাঁর কবিতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথম যৌবনেই তিনি কলকাতার নব্য ইংরেজি শিক্ষিত অভিজাত সমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বন্ধুত্ব লাভ

করেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষাও তিনি কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন, এমন কি Tom Paine-এর *Age of Reason*-ও নাকি অনুবাদ করেছিলেন (ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত)। কিন্তু তবু শৈশব ও বাল্যের পরিবেশ এবং শিক্ষার প্রভাব তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি ; ফলে মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ছিলেন অনেকটা রক্ষণশীল বা সেকেলে। তাই তিনি বাঙালী মেয়েদের ইংরেজি লেখাপড়া শেখা খুব পছন্দ করেন নি। ধর্ম-বিশ্বাসেও তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, এবং সেক্ষেত্রে কোনরূপ আক্রমণ, নিন্দা বা নূতন ধরণের ভাষ্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, আবার অন্যদিকে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার এবং আরো নব আদর্শ প্রণোদিত অনেক সভার সভ্য ছিলেন। তবু, ঈশ্বর গুপ্ত সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ কবি, নবাগত আদর্শবাদ তাঁর রচনাকে স্পর্শও করেনি। নবযুগের হাওয়ার স্পর্শে তাঁর মধ্যে তীব্র নীতি-বোধ জাগ্রত হয়েছিল, এবং এগুলি তাঁর অসংখ্য নীতি-কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ নীতিকথা এবং আদর্শপ্রণোদিত কাব্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তবু, নীতিমূলক কবিতা, যা ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ববর্তী সমগ্র কাব্যসাহিত্যে অনুপস্থিত, তাও নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ ও নীতিগত উন্নত মনোভাবের সংস্পর্শেই ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়।

হাস্যরসের স্রষ্টা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি সমস্ত জগৎকে একটি কৌতুকময় দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাছে সমস্ত জগৎটাই ছিল রঙ্গভরা। ভালোমন্দ সব কিছুকে অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই ঈশ্বর গুপ্ত তৎকালীন সাহিত্যে অদ্বিতীয়। তাঁর আগে গম্ভীর, করুণ, গতানুগতিক বর্ণনা বাংলায় আমরা অনেক পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের জীবনে এবং জীবনের চারপাশে যে এত মজা ছড়িয়ে আছে, ঈশ্বর গুপ্ত দেখিয়ে দেবার আগে আমরা তা জানতে পারিনি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, ঈশ্বরগুপ্তের রচনার "অনেকটাই ইয়ারকি", কিন্তু এ-ও বলেছেন যে, "বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি দুর্লভ সামগ্রী আছে।"

আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হাস্যরসিক লেখক

হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের আরো বেশি সম্মান প্রাপ্য। কেননা, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যে খুব সূক্ষ্মতা বা গভীরতা ছিল না বটে, কিন্তু তিনি জগতের সেই মূল কৌতুকটি ধরতে পেরেছিলেন, অধ্যাপক পেরী যাকে বলেছেন, "The supreme human paradox."।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।" তিনি যে বঙ্গদেশ না বলে দুনিয়া বলেন নি, তার কারণ, তাঁর জগৎটাই বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মত মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী সে-যুগেও বিরল ছিল, তাই তিনি বাংলার সব কিছু নিয়েই কৌতুক-তামাশা করেছেন। বাংলার পৌষপার্বণের পিঠে পুলি, বাঙালীর মেয়ে, বাংলার ফল, এমনকি বাংলার..তোপসে মাছ পর্যন্ত তাঁর কৌতুক-বাণ থেকে রেহাই পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন, "তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি"।

ভগবান থেকে শুরু ক'রে সব বিষয় নিয়েই ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ কৌতুক করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গে বিন্দুমাত্র অসূয়া বা আঘাত দেবার চেষ্টা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার এই গুণে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে বিন্দু মাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ।"

ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ প্রাচীন জগতের মানুষ ছিলেন ব'লে হিন্দুত্ব ও বাঙালীত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের গোঁড়ামি একটু বেশি ছিল। এর কারণ আগেই আলোচনা করেছি। ঈশ্বর গুপ্তের বিবেচনায় যা মেকি হিন্দুত্ব এবং নকল বাঙালীয়ানা — তা তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাই তাঁর হাস্যোজ্জ্বল পদ্যে যেটুকু রোষ প্রকাশ পেয়েছে, তা সবই এই দুই বিষয় অবলম্বন ক'রে। আধুনিক হালচাল তিনি মেনে নিতে পারতেন, কিন্তু হিন্দুত্ব ও বাঙালীত্বের অবহেলা সহ্য করা তাঁর অসম্ভব ছিল। যেমন 'বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্তি' উপলক্ষ্য ক'রে তিনি লিখছেন,

> "হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে ?
> উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে ॥···
> যদ্যপি আহার হেতু ইচ্ছা তোর হয়।

আয় ভাই ঘরে আয় কিছু নাই ভয় ॥…
আহার বিহারে ভাই ভয় কার কাছে ?
ধর্মসভা নাহি লয় ব্রহ্মসভা আছে ॥”

এবং 'আচার ভ্রংশ' কবিতায় লিখছেন,

“কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখেশুনে মুখে আর নাহি সরে রব ॥…
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত ॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥…
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে ?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে ॥”

আবার বাঙালীর অবাঙালীত্বেও ঈশ্বর গুপ্তের রোষ কম ছিল না।

“যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
এখন 'এ বি' শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চামচে ধোর্‌বে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই আর কিছুদিন বেঁচে থাক্‌লে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।” (দুর্ভিক্ষ)

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত 'satirist'। প্রধানতঃ হাস্যরসিক (humourist) হলেও এই সব কবিতার মধ্যে satirist ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার নব্য শিক্ষিতদের দ্বারা বেদ-বেদান্তের

আধুনিক ভাষ্যের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গোক্তি "বেকন পড়িয়া পড়ে বেদের সিদ্ধান্ত।" আজও বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে পরিগণিত হতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে, তাঁর নিরানন্দ দাম্পত্য জীবনের কথা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন…ঈশ্বর গুপ্তের ছিল, কবিতায় দেখিতে পাই।" ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের একদিকে যে বিফলতা ও শুষ্কতা ছিল, তা প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর বাস্তব এবং অগভীর (superficial) দৃষ্টিভঙ্গিতে। কিছুটা অবিশ্বাসী বা cynical দৃষ্টিভঙ্গিও ঐ একই কারণে তাঁর কবিতায় ফুটেছিল, কিন্তু তীব্র হাস্যরস-বোধ তাঁর রচনাকে সকল প্রকার তিক্ততা থেকে মুক্ত রেখেছিল।

নীলকরদের সম্বন্ধে রচিত কবিতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি রচনা-ছলে ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের তৎকালীন আন্দোলনকারীদের প্রতি যে বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি নিঃসন্দেহে বঙ্গসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ রচনা।

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মাম্‌লা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।" (নীলকর)

তখনকার নব্য এবং উগ্র ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের 'কাণমলা'-টিও কম উপভোগ্য নয়—

"যখন আসবে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?"

(দুর্ভিক্ষ)

বাঙালী মেয়েদের মেমসাহেবিয়ানা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের পংক্তি ক'টির রস এখনো ফিকে হয় নি।

"সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্॥
সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জশী ক্ষেমী রামী যামী শামী গুল্‌কি॥"

(ইংরাজী নববর্ষ)

মেমসাহেবদের সম্বন্ধে তাঁর ব্যঙ্গ, যা লেখবার সাহস স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না ব'লে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাও উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুমি মাছি।
তোর মত গুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি॥"

(ইংরাজী নববর্ষ)

এমনকি স্বয়ং ভগবান নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ঈশ্বরচন্দ্র ছাড়েন নি।

"মুখ হয়ে মুখ নাই বিমুখ হয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে নীরব রয়েছ॥
কহিতে না পার কথা কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা 'হাবা আত্মারাম'॥" (নির্গুণ ঈশ্বর)

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সকল রচনাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক নয়, নিছক হাস্যরসাত্মক পদ্যও তাঁর কম নেই। অনেক কবিতা বিশেষতঃ খাদ্যাদি নিয়ে তিনি যেসব পদ্য রচনা করেছিলেন, তা নির্জলা কৌতুক ভিন্ন আর কিছুই নয়। যথা, 'এণ্ডাওয়ালা তোপসে মাছ' সম্বন্ধে তাঁর পদ্য,

"কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥...
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।

মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে ॥...
প্রাণে নাহি দেরী সয় কাঁটা আঁস বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা ॥...
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেট ভ'রে খেতে যেন পাই একদিন ॥
(এণ্ডাওয়ালা তপ্স্যা মাছ)

পৌষ-পার্বণের পিঠের বর্ণনা দিতে গিয়ে পিঠে প্রস্তুতকারিণী অন্তঃপুরিকাদের যে-বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, সেটি যেমন বাস্তব তেমনি কৌতুকাবহ। পিঠে তৈরির পর্ব শেষ হলে সেগুলি পাতে এসে পড়বার পর —

"লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটেগুলি ফোটে ॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরাগে শুদ্ধ তাই চুষি ॥" (পৌষ পার্বণ)

আনারস সম্বন্ধে গুপ্ত কবি বলছেন

"ফেলিয়া পোনের আনা এক আনা রাখে।
সেই হেতু 'আনা রস' লোকে বলে তাকে ॥
অরসিকে নাহি করে রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা না জানে বিশেষ ॥
কৃপণের কর্ম নয় তোমার আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার ॥
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোখখেকো লোকে ॥" (আনারস)

এবং তাঁর সুবিখ্যাত 'পাঁটা' কবিতায় লিখেছেন

"রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল ॥
মজা দাতা অজা তোর কি গাহিব যশ।
যত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস ॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।

আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥
হাড় কাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাং।
সে সময় বাদ্য হয় ছ্যাড়াং ড্যাড্যাং ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
একা সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা ॥" (পাঁটা)

খাওয়ার কথায় ঈশ্বর গুপ্ত যেরূপ উৎসাহ সহকারে রসিকতা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী হাস্যরসিকেরা সে উৎসাহ পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন। বস্তুতঃ, বাংলায় এমন একজন উল্লেখযোগ্য হাস্যরসিক লেখকের নাম করা শক্ত যিনি খাওয়ার বিষয় নিয়ে কিছু রসিকতা করতে ছেড়েছেন। নাটুকে রামনারায়ণ থেকে শুরু ক'রে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (উহু সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (অম্বল-সম্বরা কাব্য প্রভৃতি), সুকুমার রায় (খাই খাই), রাজশেখর বসু (রাজভোগ) প্রভৃতি অজস্র 'খাদ্যরসাশ্রিত' লেখার নাম করা যায়। প্রাচীন কালে বিদূষকও খাওয়ার কথা বলে লোক হাসাতে ভালোবাসতো। বাঙালী সাহিত্যিকেরা সে ধারা বজায় রেখেছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত আবোল-তাবোল জাতীয় গানও লিখেছিলেন, তাঁর "বোধেন্দু বিকাস" নাটকের এই গানটি তার দৃষ্টান্ত—

দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার,
হলো পূর্ণিমেতে অমাবস্যা, তেরো পহর্ অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল বামী বোষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী ॥
আর্ ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক্ পূজোর্ দিন এবার ॥
ঐ সূয্যিমামা পূর্বদিকে অস্তে চলে যায়,
উত্তুর দক্ষিণ কোণ থেকে আজ
বাতাস লাগ্‌চে গায় ॥
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া

শিং উঠেছে দুটো তার ॥
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে
কাশীধামে হাহাকার ॥"

('বোধেন্দু বিকাস' নাটক)

কথা নিয়ে কৌতুকের খেলা করতে ঈশ্বরগুপ্ত ভালোবাসতেন এবং এ-কাজে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। এ-গুণ তিনি ভারতচন্দ্রের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, সন্দেহ নাই। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান।" অবশ্য ঈশ্বরগুপ্তের হাস্যরস অতি উচ্চ শ্রেণীর হাস্যরসের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু উইট্-এর মিশ্রণে তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনা এমন একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে যে, সেকেলে ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করা সত্ত্বেও, তাঁর ব্যঙ্গ-রচনাগুলি আধুনিক শিক্ষিত মনের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরস উচ্চস্তরের হাস্যরসের মধ্যে গণ্য না হবার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়গোচর এই যে বাস্তব পৃথিবী ও তার জনসমাজ, তার বাইরের এবং দৃশ্যমান্ অসংগতিগুলি নিয়েই তিনি রসিকতা করেছেন; অন্তর্জগতে যে অসংগতি ও দ্বন্দ্ব, যার থেকে গভীর দুঃখ ও উদ্দাম হাস্য দুয়েরই সৃষ্টি হয়, সেখানে তিনি পৌছুতে পারেন নি। তাই ঈশ্বর গুপ্তের হাস্যরস কিছুটা স্থূল, তাই তিনি বস্তুবদ্ধ কবি। হাস্যরস বা যে-কোনো রসেরই গভীরতম এবং সূক্ষ্মতম প্রদেশ তাঁর নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের যেখানে যেখানে পৌঁছেছিল, সেরূপ সব জায়গা থেকেই তিনি কিছু কৌতুক আহরণ করতে পেরেছেন, এ-ও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলায় গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিল। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধরণের রঙ্গমঞ্চে ইংরেজি নাটকের অনুকরণে নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার চেষ্টাও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই শুরু হয়। ফলে, বাংলা সাহিত্য, যা এতকাল শুধু পদ্যকে আশ্রয় ক'রে ছিল, তা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গদ্য পদ্য ও নাটক, এই তিন রূপে প্রকাশিত হল। বাঙালীর নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ, নবতর কল্পনা যদিও তখনো কোনো নির্দিষ্ট আকার নেয় নি এবং সুসম্বদ্ধ হয়নি, তবু পুরাতন প্রথা, সংস্কার, শিক্ষা ও রীতি-নীতির প্রতি লোকে ক্রমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল; অপরদিকে সদ্য ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য ইঙ্গবঙ্গ সমাজ এবং তাদের অন্ধ অনুকারীদের উগ্র ও নকল সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধেও তারা সচেতন হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক কোন আদর্শ ও রীতিনীতি আচরণীয় এ সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণা তার মনে তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ, ভাবের দিক থেকে বিচার করলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব পর্যন্ত বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল বাঙালীর জীবনদর্শন ছিল negative বা নেতিবাচক; কোনো positive বা স্থির আদর্শে তা সুগঠিত হয়নি। সুতরাং সে যুগের সাহিত্যিক তাঁর চারদিকে যা দেখেছেন ও শুনেছেন, তাতে নিন্দা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু জীবনের মহিমা তাঁর দৃষ্টিতে তখনো ধরা পড়েনি। সে কারণে, সে সময়ের বাঙালী সাহিত্যিক গদ্য পদ্য বা নাটক, যে বাহনই গ্রহণ করুন না কেন, তাঁর রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের, caricature ও satire এর ভাগই বেশি। রঙ্গলালের মত যে সব লেখক উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা আদর্শ প্রচারে যত সফল হয়েছেন, সাহিত্য রচনায় ততটা সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি।

ঐ একই কারণে, অর্থাৎ বাঙালী-মানস ভাবাদর্শের কোনো সুনির্দিষ্ট

স্তরে পৌঁছয়নি বলে, সে কালের রচনার একটা বৃহৎ অংশ নকশা জাতীয়। পদ্যে হয় বিদ্রূপ-ব্যঙ্গময় রসিকতা এবং অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি, না-হয় প্রাণহীন আদর্শ ও নীতিমূলক মহাকাব্য ও খণ্ড কবিতা ; নাটকে হয় প্রহসন বা নকশা, নয়তো ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি জনপ্রিয় বাংলা কাব্যের নাট্যরূপ ; আর গদ্যে, হয় শিক্ষা প্রচার অথবা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত নিবন্ধ, নতুবা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় নক্শা জাতীয় রচনা, এই নিয়েই ছিল বাংলা সাহিত্য।

নাটক ও কবিতায় মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র এবং গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্বকীয় কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শকে সমন্বিত ক'রে বাংলা সাহিত্যে ভাবের গভীরতা ও স্থৈর্য আনলেন ; ফলে একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে সরুচির একটি উন্নত মানও এঁদেরই রচনার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। শিক্ষা যতই বিস্তৃত হল, ভাব যতই গভীর হল, চিন্তা যতই সুসম্বদ্ধ হল, আদর্শ ততই উন্নত হল, এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নক্শার স্থানে ভাবসমৃদ্ধ কাব্য, উপন্যাস, গল্প এবং নাটকের আবির্ভাব হতে লাগলো। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব পর্যন্ত সময়টা শিক্ষা-বিস্তার ও সমাজ-সংস্কারের যুগ। এই সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থই প্রধানতঃ এই দুই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নক্শা জাতীয় যে সাহিত্য এ সময়ে বহুলভাবে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল, তাদেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন বাঙালী সমাজের নানা নিন্দনীয় বিষয়কে আঘাত করা। এই জন্য, এ সময়ের গদ্য, পদ্য ও নাটক সাহিত্যের সকল বিভাগেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচাটাই বেশি, নিছক কৌতুক অল্প।

তবু, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ বা কৌতুকরসের সন্ধানও প্রচুর পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের পর তাঁর এই কৌতুকময় রচনার ভঙ্গিটি অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)।*

* দীনবন্ধু মিত্রের জন্মতারিখ সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতবৈষম্য আছে। শিবরতন মিত্র সম্পাদিত "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকে" দীনবন্ধুর জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ দেওয়া আছে ঃ "নদীয়া জেলার অন্তর্গত পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে ১৮২৯ খৃঃ (১২৩৬ সাল) জন্মগ্রহণ করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ "সন ১২৩৮ সালে দীনবন্ধু

অবশ্য, কেবল পদ্যরচনার ক্ষেত্রেই দীনবন্ধু মিত্রকে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ব'লে বর্ণনা করতে পারি। নাটক-রচনায়, বিশেষ ক'রে প্রহসনে, দীনবন্ধু যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা অভূতপূর্ব এবং অসাধারণ, এবং সেক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয় প্রতিভাই জাজ্বল্যমান্। কিন্তু তাঁর কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব অতিস্পষ্ট। দীনবন্ধুর অধিকাংশ কবিতাই 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল, এ-কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রধান কৃতিত্ব তাঁর নাটক ও প্রহসনে। কৌতুক ও ব্যঙ্গে তাঁর যে অসামান্য দক্ষতা ছিল, তা তাঁর প্রহসনগুলিতেই যথার্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে। নাট্য সাহিত্যের কথা বলবার সময় আমরা বিষয়টি আলোচনা করবো। কিন্তু আপাতত কবিতার কথা বলতে গিয়ে এ-কথাই মনে হয় যে ঈশ্বর গুপ্তের সে অসূয়াহীন, বিদ্বেষবর্জিত কৌতুক করার ভঙ্গিটি একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রই ভালোরূপে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' বাদ দিলে, অধিকাংশ কবিতাই হাস্যরসাত্মক — অন্তত একটি কৌতুকময় ভঙ্গি তাঁর কবিতাগুলির সাধারণ বর্ণনার মধ্যেও একটি হাস্যের আমেজ এনেছে।

দীনবন্ধুর উপরে উল্লিখিত কবিতার বই দু'খানি তেমন প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের লেশমাত্র নাই।" 'সংবাদ প্রভাকরে' পর পর দু'বছর দীনবন্ধু মিত্র জামাই ষষ্ঠীর উপর কবিতা লিখেছিলেন, এবং দুটিই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথম কিস্তির "জামাই ষষ্ঠী" থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশে দু'টি জিনিস

জন্মগ্রহণ করেন"। দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের দেওয়া জন্মতারিখ "১২৩৬ চৈত্র"। "সাহিত্য-সাধকচরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী ১৮৩০ সালে দীনবন্ধুর জন্ম বলে নির্দিষ্ট করলেও, বাংলা তারিখ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্পষ্টতঃই দুটি তারিখের একটি ভুল। বাংলা ১২৩৮ অর্থ ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ। আবার শিবরতন মিত্রের দেওয়া তারিখের মধ্যেও একটি ভুল; ১২৩৬ চৈত্র অর্থ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ, ১৮২৯ হওয়া অসম্ভব। মনে হয়, শিবরতন মিত্রের দেওয়া ইংরেজী তারিখটি ভুল, বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া বাংলা তারিখটি ভুল। ললিতচন্দ্রের তারিখটিই নির্ভরযোগ্য। দীনবন্ধুর জন্ম—চৈত্র ১২৩৬; ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ।

লক্ষণীয়। একটি দীনবন্ধুর পদ্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব, দ্বিতীয়, তাঁর কৌতুকময় বর্ণনার ভঙ্গিটি।

"জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবুড়ি ষষ্টি করি করে।
জামাই জামাই বলি ফেরে ঘরে ঘরে॥
পর রে পোশাক সব হও রে ত্বরিত।
চলরে শ্বশুরবাড়ী আমার সহিত॥...
পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।
কামিজ পীরণ পেংগি কত গায় দিল॥...
শ্বশুর দুহিতাগণ যেখানে যে ছিল।
এক বিনা একে একে সকলে আইল॥
কৌতুক করিতে সুখে নন্দায়ের সনে।
আইল শালাজগণ গজেন্দ্র গমনে॥...
কোন রামা বলে মা গো বোবা কি জামাই।
আর জন বলে দিদি ভাবিতেছি তাই॥
কেহ বলে আই আই বলি লাজ খেয়ে।
আমাপানে রহিয়াছে একদৃষ্টে চেয়ে॥...
অভাগা অনূঢ়া যারা, তারা মনোদুখী।
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর ষষ্ঠী সুখী॥"

মনে রাখতে হবে সেকালের পদ্য বর্ণনা-প্রধান। 'জামাই ষষ্ঠী' প্রভৃতি কবিতায় দীনবন্ধু মিত্র বর্ণনার সঙ্গে একটি কৌতুকের সুর মেশাতে পেরেছিলেন। কালেজীয় কবিতাযুদ্ধেও দীনবন্ধু মিত্র যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, তা সকলেই জানেন।

গুরুগম্ভীর বা গভীররসাত্মক কাব্যে না হলেও ব্যঙ্গ-কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের ধারা অনুসরণ করেছিলেন আর একজন কবি — হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩)। সমসাময়িক অন্য কবিদের মধ্যে রঙ্গলাল অতিমাত্রায় 'সীরিয়াস' গুরুগম্ভীর আদর্শবাদী কবি। বিহারীলাল অত্যধিক ভাবপ্রবণ — হাস্যরস তাঁর কাব্যেও অনুপস্থিত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৌতুকরস-বোধ তাঁর প্রহসন দু'খানিতেই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু কাব্যে তিনি বীররস

ও করুণরস উৎপাদনেই মনোনিবেশ করেছিলেন। মাইকেলের মত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও নবযুগের ইংরেজীশিক্ষিত কবি। তিনিও পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং মাইকেলের অনুসরণ ক'রে মহাকাব্য লিখতেই প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের একটা দিক ছিল ঈশ্বর গুপ্তের সগোত্র। সমসাময়িক সমাজ, রীতিনীতি এবং ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখতে তিনি ভালোবাসতেন এবং এ জাতীয় রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখিয়েছিলেন। দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের রঙ্গের দিকটা নিয়েছিলেন, হেমচন্দ্র নিলেন ব্যঙ্গটি। প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনের পাঠক হেমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলিই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করবেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, "সাময়িক ঘটনামূলক সরস ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলিতেই হেমচন্দ্রের রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।" এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। এই কবিতাগুলির ভাষা সরল, ছন্দ নিপুণ এবং যুগোপযোগী আর কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বলে এগুলি বেশ সুখপাঠ্য। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতাটিতে হেমচন্দ্র লিখছেন,

"কে যায় কে যায় অই উঁকি ঝুঁকি চেয়ে ?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বুলে তামাকুরস — রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা — গালে ভরা গুল,
বলিহারী কিবা শাটী দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে, শান্তিপুরে, কল্কে চুড়িদার।
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে —
মুখের সাপটে বড় বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ — পা-ছড়ায়ে-বসা,

আঁচলের খুঁট্টি তুলে অঙ্গমলা ঘষা !
নমস্কার তার পায় পাড়ায় বেড়ানী
পেট্টি ভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রিদিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান, নিয়ে যান, আর যান চেয়ে —
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !"

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের বাংলা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র জন্য লেখা "খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য' থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি

"বাঙ্গালি অপূর্ব্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সম্বাদপত্র লেখে ;
মল্লভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে !
বিড়ালে করিলে তাড়া মূষা যদি দেয় সাড়া
অমনি লেখনী ধরে বীর !
সাত সর্গে উপাখ্যান সাঙ্গ করি তেজীয়ান্
বঙ্গভূমি করয়ে অস্থির।
ঘরে যদি শিশু কাঁদে সম্পাদক ঘোর নাদে
ছুটে গিয়া কার্নিসে দাঁড়ায়,
বগলে কাগজ আঁটি কলম ঢাকের কাঠী
বর্গী এলো বলিয়া চেঁচায়।"

বাঙালী চরিত্রের ভীরুতা এবং উদ্যমহীনতা নিয়ে পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-সব ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছেন, এখান থেকেই তার সূত্রপাত। ঐ একই বিষয় অবলম্বন ক'রে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি পুরো ব্যঙ্গকাব্যই রচনা ক'রে ফেলেছিলেন।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য ব্যঙ্গ-কবিতা, যা তৎকালে, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা

অর্জন করেছিল, তার মধ্যে 'হায় কি হোল', 'বাজিমাৎ' এবং 'ইলবার্ট বিল' উপলক্ষ ক'রে লেখা 'নেভার নেভার' প্রভৃতি কবিতার নাম করা যেতে পারে। সমসাময়িক সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা ব্যঙ্গ-কবিতাগুলিতে হেমচন্দ্রের বিশিষ্ট ধরণটা বেশ স্পষ্ট।

"হায় কি হোল? কলম ছুঁতে হাসি এল দুখে!
ভেবেছিলুম মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে!
এলো হাসি — হাসিই তবে ঢেউ খেলিয়ে চল্যে
ছড়াক খানিক রসের কথা হায় কি হলো বঁল্যে।
হায় কি হলো দেশের দশা রিপনরাজার ভুরে?
সাদা-কালো সমান হবে,— সবার মুণ্ডু ঘুরে!
আসল কথা রইল কোথা কেউ না সেটা খোঁজে;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,— হাওয়ার সঙ্গে যোঝে!
সফেদ কালা মিশ্ খাবে না, সমান হওয়া পরে।
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু কর্যে?"

উপরের উদ্ধৃতির শেষ পংক্তিটি পরাধীন বাংলায় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং রাজনৈতিক বক্তাদের মুখে ঘন ঘন শোনা যেত। এই কবিতাটির আরো দু'টি পংক্তি রাজনীতির বাজারে খুব জনপ্রিয় ছিল,

"পরের অধীন দাসের জাতি 'নেসেন' আবার তারা?
তাদের আবার 'এজিটেসন্'— নরুন উঁচু করা!"

স্যার রিচার্ড টেম্পল দ্বারা কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হলে তাই নিয়ে রঙ্গ করে হেমচন্দ্র যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটিও এককালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল

"ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাক্‌ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়ম্বর।
এক্‌ট জারি হবে নূতন পয়লা সেতম্বর॥
বলিহারি স্থবেদারি সুসভ্য কেতায়।
ভেল্কিবাজি ইংরাজের হদ্দ মজা হায়

ইল্‌বার্ট বিল উপলক্ষ করে লেখা হেমচন্দ্রের 'নেভার—নেভার' কবিতাটিও খুব বাহবা পেয়েছিল।

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান্,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেশুয়িক মিলার্ —
'নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার্ নেভার্।'
'নেভার' সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের 'জানানা' ?
বিবিজান! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না॥
হিপ্‌ হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে — তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—'নেভার—নেভার' !!"

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ (পরে রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) কলকাতায় এলে তখনকার জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভবানীপুরে তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং বাড়ির মহিলারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। ঘটনাটি হিন্দু সমাজের অনেক চাঁইয়ের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রকেও খুব বিচলিত করেছিল, এবং এ-ঘটনা উপলক্ষ ক'রে তিনি 'বাজিমাৎ' কবিতাটি লিখেছিলেন,

"বেঁচে থাকো মুখুয্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥
'ফিক্র' দানে, এক তড়াতে কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো — কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥"

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ছদ্মনামে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার গান' কবিতাটিতে কলকাতার গণ্যমান্য বহু নাগরিক, যথা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সকলকে নিয়েই হেমচন্দ্র রসিকতা করেছেন — এবং ভূমিকা করেছেন কলকাতা শহরের বন্দনা ক'রে।

"যার রাস্তা ঘরে সহর ফুঁড়ে কলের পানি ছোটে,
যার দুধের কেড়েয় খাঁটি পানি তিন পো ছেড়ে ওঠে।
আহা ভাগীরথীর দুকূলযোড়া রূপের ছটা যার,
কলির সহর কলকাতা তোর পায়ে নমস্কার।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন,

"ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস্',
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরই 'ফিনিস্'।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ-অলঙ্কার,
'দিক্‌পাল' তোমার মত দেশে নাই আর।"

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি পড়ে এই ধারণা জন্মে যে এ-জাতীয় রচনায় যদিও তিনি ঈশ্বর গুপ্তকেই অনুসরণ করেছেন, তবু কোনোমতেই ঈশ্বর গুপ্তের তুল্য কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। প্রথমতঃ, এঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি সবই সাময়িক ঘটনা নিয়ে লেখা, এবং সেগুলির মধ্যে এমন গুণ নেই যে সাময়িক বিষয় অবলম্বন করেও কালোত্তীর্ণ রস সঞ্চার করতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনাও অনেক সময় সাময়িক ঘটনার উপরই লেখা হয়েছে। কিন্তু রচনার গুণে সংকীর্ণ সাময়িকতা ব্যাপক সাধারণ কৌতুকে পরিণত হয়েছে। যেমন, তোপ্‌সে মাছ, পৌষপার্বণ, বড়দিন, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা কবিতাগুলি। এতদিন পরে আজও এ পদ্যগুলির রস আমাদের উপভোগের বাইরে নয়। এমন কি বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা আজও যখন উগ্র মেম-সাহেবি করে, তখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে সুর মিলিয়ে "বেলাক্ নেটিভ্ লেডি শেম্ শেম্ শেম্" বলে আমরা স্বচ্ছন্দে হাসতে পারি। কিন্তু হেমচন্দ্রের মিউনিসিপাল বিল, ইলবার্ট বিল, যুবরাজের অভ্যর্থনা প্রভৃতি বিষয়ক কবিতাগুলি আমাদের মনে বিশেষ সাড়া জাগায় না। আসলে হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতা সেই শ্রেণীর যাকে আমরা নেহাৎ "তারিখযুক্ত" বলে বর্ণনা করতে পারি। তারিখ পেরোলে এ সব রচনার আর বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না।

হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গরচনার দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, তা মোটেই অসূয়ামুক্ত নয়, বরং হাসির চেয়ে ভর্ৎসনা ও নিন্দার ভাগ বহুগুণে বেশি। ঈশ্বর গুপ্তের

ব্যঙ্গে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিলনা। এর কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "ঈশ্বর গুপ্ত 'কবির লড়াইয়ে' শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।" "ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যেটুকু ক্রোধ মাঝে মাঝে প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিন্দা করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত কবি নন, তিনি উচ্চশিক্ষিত। তৎসত্ত্বেও, কিংবা হয়তো সেই জন্যই, ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি তাঁর বিরক্তি ও ক্রোধকে প্রচ্ছন্ন করতে পারেন নি। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতা পড়লে মনে হয় যেন তিনি চটে গিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। প্রসন্ন কৌতুকের ভাবটি তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঠক উপরের উদ্ধৃতিগুলি প'ড়ে দেখতে পারেন। বিশেষ ক'রে 'বাজিমাৎ', 'বাঙ্গালীর মেয়ে' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এ-কথার সমর্থন পাবেন।

আগেই বলেছি, গদ্য ভাষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং নাটকের উদ্ভব ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রভৃতি পদ্যের চেয়ে এই দুই শিল্পকেই বেশি আশ্রয় করে ছিল। ফলে, এ সময় বহু প্রহসন এবং হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক গদ্য রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে কিন্তু পদ্যের ক্ষেত্রে তত বেশি কৃতী হাস্যরসিকের দেখা পাওয়া যায় না।

হেমচন্দ্রের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬) গদ্য ও পদ্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। বিহারীলাল প্রমুখ তৎকালীন বহু কবিসাহিত্যিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু এই বহুমুখী প্রতিভাশালী পুরুষ প্রধানতঃ ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গীত ও রেখাচিত্রেও (sketching) এঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। গণিত, অক্ষরতত্ত্ব, ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ও চিন্তার পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম বাংলায় একটি শর্টহ্যাণ্ড বা 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' উদ্ভাবন করেন। 'গীতাপাঠ', 'প্রবন্ধমালা', 'চিন্তামণি', 'নানা চিন্তা' ইত্যাদি নামে ইনি ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে কয়েকখানি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এঁর রূপক কাব্য। ইনি ছন্দোবন্ধে উপনিষদের একটি সুন্দর সরল অনুবাদও করেছিলেন।

যদিও কৌতুক রচনার দিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বেশি মন দেন নি, তবু ইনি

যতটুকু লিখেছেন, তার মধ্যে আমরা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, প্রকৃত কৌতুক হাস্যের সন্ধান পাই। রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে রচিত 'যৌতুক না কৌতুক?' ঠিক হাস্যরসাত্মক রচনা নয়। কিন্তু তাঁর 'গুম্ফ আক্রমণ কাব্য' এবং ছোট ছোট কবিতার মধ্যে প্রচুর কৌতুক আছে। 'গুম্ফ আক্রমণ কাব্য' তিনটি ছোট ছোট সর্গে সমাপ্ত একটি অতি ক্ষুদ্র কাব্য। এর বিষয়টি এই— একজন যুবক এবং এক প্রবীণ পক্বগুম্ফযুক্ত ব্যক্তি দুই বন্ধু বোলপুরে যাচ্ছিলেন। ট্রেনে একটি গোঁফযুক্ত বয়স্ক ব্যক্তি তাঁদের সহযাত্রী হলেন, এবং আলাপ পরিচয় হওয়ার পর প্রবীণ যাত্রীটির কাঁচাপাকা গোঁপ দেখে

"মহাজন গোঁফ-নিষ্ঠ, হইলেন গোঁপাকৃষ্ট,
মন্ত্রবলে যেন সর্পধরা।
সভ্যতার বাঁধ টুটি, কহিলেন, মুখ ফুটি,
কথাগুলি উপদেশ ভরা॥
"অমন সুন্দর গোঁপ, ওতে না দিলে কলোপ,
ভবে আসি কি তবে করিলে।
তোমার ও-গোঁপখানি, সামান্য ত নাহি মানি,
তপস্যায় কারো ভাগ্যে মিলে!
ব্যয় মাত্র পাঁচ টাকা, একটি না রবে পাকা,
ইথে কেন করিছ কার্পণ্য।
নেড়া-গির্জে যাবা মাত্র, মিলিবে অতি সুপাত্র,
গুণী মাঝে যিনি অগ্রগণ্য॥
তার হস্তে তব মোচ, পেয়ে কলপের পোঁচ,
অমনি হইবে কালো মিষ।
অনায়াসে হবে ধন্য, যুবা মধ্যে হবে গণ্য,
বয়ঃক্রম উনিশ কি বিশ॥
পাঁচটি টাকার তরে, গোঁপ থাকে অনাদরে,
ইহা ত পরাণে নাহি সয়।
টাকায় কি আসে যায়, টাকা কি গো সঙ্গে যায়!
সৎকাজে করিয়া লও ব্যয়॥

আমার এ গোঁপখানি এ তো অতি ক্ষুদ্র-প্রাণী,
তোমার উহার তুলনায়।
কটাক্ষেতে কলপের, চেহারা ফিরেছে এর,
ব্যাপারটি ভেলকীর প্রায়॥"

প্রাচীন যাত্রীটির এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা আরো হয়েছে। চৌদ্দ বছর আগে দক্ষিণ প্রদেশে আর এক ভদ্রলোক তাঁর কাচাপাকা গোঁপে কলপ লাগাবার জন্য জীবন দুর্বহ করেছিলেন, এবং অবশেষে কলপের পাত্র সঙ্গে দিয়ে কলপ লাগাবার এক মুসলমান ওস্তাদকে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। কাজেই অযাচিত উপদেশদাতা এই ভদ্রলোক মেমারি ষ্টেশনে নেমে যাবার পর ঝালাপালা হয়ে

"... সাধু বলে "পাপ গোঁপ
কামাইলে যায় যে যন্ত্রণা !"
বিপ্র (যুবা বন্ধুটি) কহে হাস্য ভরে এমনো কি কাজ করে
গোঁপ তুল্য আছে কি রতন।
কালো গোঁপ মনোলোভা, বাড়ায় মুখের শোভা
পাকিলেই বিজ্ঞের লক্ষণ॥
গোঁপের অবহেলায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়,
তা দিলে যোগায় আসি তূর্ণ।
মহা মহা গুম্ফী যাঁরা দিক্‌পাল-সমান তাঁরা,
অবনী তাঁদের যশে পূর্ণ॥
একি মোর পাগ্‌লামি ! গোঁপের মাহাত্ম্য আমি
বচনে কি ফুরাইতে পারি ?
পঞ্চমুখে পঞ্চানন, চেষ্টা পেয়ে ক্ষান্ত হ'ন,
বাণী হন বাণীর ভিখারী॥"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছোট ছোট কৌতুক কবিতাও অনেক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলেত যাওয়ার সময় তৎকালীন যুবকদের বিলেত যাবার আগ্রহ লক্ষ্য করে দ্বিজেন্দ্রনাথ শিখরিণী ছন্দে যে কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেটি তাঁর য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

"বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,

অরণ্যে যে জন্যে পৃহগ-বিহগ-প্রাণে দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা হুট করি,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কুর্ত্তা বুট পরি,
সিগারে উদ্গারে মুহুর মুহু ধূম লহরী
সুখস্বপ্নে আপ্নে মুলুকপতি মানে হরি হরি।"

'দীন দ্বিজের রাজ-দর্শন না ঘটিবার কারণ'টি তিনি মন্দাক্রান্তা ছন্দে বর্ণনা করেছিলেন

"টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥
ইচ্ছা সম্যক্ তব দরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি॥"

বাংলা বর্ণমালা সংস্কার প্রসঙ্গে "ঙ" "ঞ" অক্ষরটি বর্জন করা বিষয়ে বলতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ এই পদ্যটি লেখেন —

"কাজ নাই, কর্ম নাই, ছড়াইয়া ঠ্যাঙ,
ভাবে ভোর হঞিয়া ডাকেন কোলা ব্যাঙ॥
চৈতন্য-চরিতে দে'ন মাঝে মাঝে ডুব।
হ'ঞা খা'ঞা পেয়ে তথি আড্ডা জমে খুব॥"

যদিও "স্বপ্নপ্রয়াণ" উচ্চাদর্শময় রূপক কাব্য, তবু এতেও মাঝে মাঝে হাস্য-রসের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা, দানবরাজের নিকেতনে বিষাদরাজ গন্ধর্ব হাহাহুহু সিংহাসনে ব'সে মন্ত্রীকে বলছেন,

" 'তুমি যেন ঠিক হৃষীকেশ॥
বারো-মাস অনন্ত-শয্যায় লীন,
একরতি চেতন কেবল হয় বেতনের দিন!'
মন্ত্রী বলে, 'ভূপ
বেতন কিরূপ
ছু-চক্ষে না দেখিলাম বৎসরেক তিন'।"

রাজা—

"ছিলে শুধু অস্থি
হইয়াছ হস্তী,
বেতন পেলে কি আর থাকিবে পৃথিবী?"

তৎকালীন ব্যঙ্গকাব্য-প্রসঙ্গে আর একজন কবির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, হাস্যরসিক কবি হিসাবে যাঁর বিশেষ কোনো কৃতিত্ব না থাকলেও, কেবল একটিমাত্র 'প্যারডি' বা ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতির জন্য যিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করেছেন। এঁর নাম জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২—?)। যদিও প্যারডি আসলে এক জাতীয় caricature এবং সে হিসাবে কিছুটা হাস্যও উৎপন্ন করে, তবু বাংলায় যে অজস্র প্যারডি হয়েছে এ গ্রন্থে তা আলোচনার প্রয়োজন দেখিনা। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ ক'রে জগদ্বন্ধু ভদ্র 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' নামে যে ৭২ পংক্তির প্যারডিটি রচনা ক'রে বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ করেছিলেন, সেটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' যে-স্মরণীয় কাব্যের অনুকৃতি, সেখানি বাংলা নবযুগের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সার্থক কাব্য, এবং বাংলা সাহিত্যের চির-কালীন শ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্যতম। অতএব প্রথম মহাকাব্যের প্রথম প্রশংসনীয় অনুকৃতি রূপে বাংলা সাহিত্যে 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্যে'র একটি স্থান আছে। কায়ার মাহাত্ম্যেই ছায়াতেও কিছুটা গৌরব প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' রচনায় জগদ্বন্ধু ভদ্র যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে বহু বহু কবি এই ছন্দটির প্যারডি করেছেন। আধুনিক কাল পর্যন্ত অমিত্রাক্ষরের প্যারডি রচনা একরূপ ফ্যাশান হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে সময়ে এইরূপ উৎকৃষ্ট 'প্যারডি' লেখা সহজ ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সুবিখ্যাত কবিও এ-ছন্দকে ঠিক আয়ত্ত করতে সমর্থ হননি। সে-ক্ষেত্রে জগদ্বন্ধু ভদ্রের প্যারডিটি যে খুবই প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় তাতে আর সন্দেহ কি?

জগদ্বন্ধু ভদ্র 'কবিতাকুসুমাঞ্জলি' 'ঢাকা প্রকাশ' 'ভারতরঞ্জন', 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' প্রভৃতিতে কবিতা লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত হন।

হাস্যরসাত্মক রচনার দিকে যে এঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল, অথবা প্যারডি রচনায় যে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবু বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন দ্বারা মাইকেল সাহিত্য-জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, স্পষ্টতঃই জগদ্বন্ধু ভদ্রও তার মধ্যে জড়িত হয়েছিলেন এবং পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ তাঁর কানে কিছুটা ধরা দিয়েছিল। নতুবা তিনি এরূপ একটি প্যারডি রচনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এই ছন্দে তিনি যে মোটামুটি দক্ষতা লাভ করছিলেন তার প্রমাণ, তাঁর 'তপতী উদ্বাহ' কাব্য — যা আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছিল।

'ছুচ্ছুন্দরীবধ- কাব্য' এখন লুপ্তপ্রায়, দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে রচনাটির একটু পরিচয় দিচ্ছি।

"দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে — দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত — দুর্জ্জয় —
পললাশী বজ্রনখ — আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর প্রহারে,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্ক্কক্ষারুহের তলে বিদ্রুত গমনে —
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্ব লাঞ্ছিত,
সুআশুগ ইরম্মদ গমে সনসনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িছে পশ্চাৎ ভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গ গৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(ক্ষ্মাধ্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্য মাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক মণ্ডলী।

কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহু দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে —
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে —
দারু-বিনির্ম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া-শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরি সঙ্কীর্ত্তনে।"

এ-অনুকৃতিতে অমিত্রাক্ষর রচনায় জগদ্বন্ধু ভদ্র যতটুকুই কৃতিত্ব দেখান বা না দেখান, মাইকেলের mannerism বা মুদ্রাদোষগুলিকে ইনি ঠিকই ব্যঙ্গ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা'য় রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "আমি ইংরাজীতে হোমর প্রভৃতি কবির অনুকরণ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে এইরূপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্য্যাদা করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। শুনিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাস্যকর অনুকরণে বিরক্ত না হইয়া তাহা পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

এর পর পদ্যে হাস্যরস পরিবেশনে যিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। ইন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গদ্যলেখক, গদ্য সাহিত্যে হাস্যরস আলোচনার সময় আমরা তাঁর রচনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করবার সুযোগ পাবো। ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত হয় পদ্যের মধ্য দিয়ে, 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' নামে অতি ক্ষুদ্র একখানি কাব্য লিখে। 'প্রথম উদ্গার—অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।' 'দ্বিতীয় উদ্গার — মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।' 'তৃতীয় উদ্গার—বই লেখা' এবং 'চতুর্থ উদ্গার — আমার কত ক্ষমতা।' এই চার উদ্গারে বইটি শেষ। এর প্রথম সংস্করণের দাম ছিল আড়াই পয়সা — এ থেকেই বইটির আকার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। রচনাটি কাঁচা, হাস্যরসও খুব উঁচুদরের নয়। ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পদ্যগ্রন্থ 'ভারত-উদ্ধার কাব্য'কে সমকালীন ব্যঙ্গ-রচনার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

'ভারত-উদ্ধার কাব্য' পাঁচ সর্গে সমাপ্ত। তৎকালে 'মহাকাব্য' রচনার যে হিড়িক পড়েছিল, কাব্যের সূত্রপাতেই ইন্দ্রনাথ তাকে বিদ্রূপ করেছেন। কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা; উদ্দেশ্য এই ছন্দকে ব্যঙ্গ করা। তখনকার দিনে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে রসিকতা করা একটা ফ্যাশান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রথম সর্গে প্রস্তাবনা এবং সরস্বতী বন্দনা। লেখক গতানুগতিক পদ্ধতিতে পূর্ববর্তী কবিদের বন্দনা করতে নারাজ, কেননা পরপদধ্যান তিনি "বর্দ্ধাস্তিতে" পারেন না। বাকি চার সর্গে নায়ক বেকার বিপিনকৃষ্ণ ও তদ্বন্ধু কামিনীকুমারের দেশোদ্ধারের সঙ্কল্প, উপায় উদ্ভাবন এবং পরিশেষে গোরাসৈন্যদের যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে স্বাধীনতা লাভের কাহিনী। বিপিনকৃষ্ণের নেতৃত্বে দেশোদ্ধারে ব্রতী "আর্য্য-কার্য্যকরী সভা" কিরূপ বেশভূষা ক'রে দেশোদ্ধারের উদ্যোগ করেছেন, তার বর্ণনাটি উপভোগ্য।

"কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পরিয়া পিরান, গায় কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার ব্রতে উৎসৃজিলা তনু।"

এইরূপ বেশভূষা ক'রে ভারতোদ্ধার-ব্রতী বাহিনী নানা জায়গায় গিয়ে দেশোদ্ধারের আয়োজন করতে লাগলো। প্রচুর সুঁদরি কাঠ সংগ্রহ ক'রে গোপনে কাঠের বাঁটওয়ালা হাজার হাজার বঁটি তৈরি হোল, কারণ দেশোদ্ধারকারীদের প্রতিজ্ঞা —"বঁটাইয়া দিব যত পাষণ্ড ইংরাজে।" অসংখ্য বাঁশের পিচকারিও তৈরী করা হোল। চিৎপুরের খাল থেকে ফোর্ট-উইলিয়াম পর্যন্ত মস্ত সুরঙ্গ কাটা হোল, আর প্রচুর লঙ্কা সংগ্রহ ক'রে তার এক বিরাট স্তূপ সুরঙ্গের মুখে রেখে পট্‌কার সল্‌তে তার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হোল। এর পর যুদ্ধের নির্দিষ্ট দিন ঘনিয়ে এলো। যুদ্ধের সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নায়ক বিপিনকৃষ্ণ যুদ্ধের দিন সকালে স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে একেবারে কেঁদেই ফেল্লে।

স্ত্রী তো অবাক্। স্বামী দেশোদ্ধারের জন্য যুদ্ধে যাচ্ছে শুনে পত্নী বললে,

"বলি প্রাণনাথ
দেশ তো দেশেই আছে, কি তার উদ্ধার?"

যাই হোক, সব কথা বুঝিয়ে বলার পর অবশেষে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে যুদ্ধে যেতে দিতে রাজী হয়ে বল্লে,

"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"

এর পর বিপিনকৃষ্ণের নেতৃত্বে বাঙালী বীরেরা কেউ বঁটি, কেউ বালিগোলা জলের পিচকিরি নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হল। ব'লিগোলা জল গোরা সৈন্যদের চোখেমুখে ছিটিয়ে আর সল্‌তে জ্বেলে লঙ্কার স্তূপে আগুন দিয়ে এই বীরেরা

"কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।"

এবং এই ভাবে ইংরেজ পরাস্ত ক'রে তারা দেশ স্বাধীন করলো।

এই কাব্যখানি যদিও বাংলা সাহিত্যের একখানি ব্যঙ্গাত্মক ক্ষুদে "মহা"কাব্য, অর্থাৎ দীর্ঘ আখ্যায়িকা কাব্য, তবু কি কাব্য হিসাবে, কি রসিকতা বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হিসাবে, এ-রচনাটিকে খুব উচ্চশ্রেণীর বলে গণনা করা চলে না। এর অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মাইকেলীয় অমিত্রাক্ষর নয়, মিলহীন পয়ার মাত্র। এর গতানুগতিক যতিপাত ও দুর্বল শব্দপ্রয়োগেই কবির ছন্দ রচনায় অপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সে-সময়ে কোঁচা-ঝোলানো বাঙালী বাবুরা যেরূপ বাক্য দ্বারাই দেশ স্বাধীন করবার আয়োজন করতেন, সেই বাক্‌সর্বস্ব কর্মভীরু বাঙালী সমাজের প্রতি বিদ্রূপ হিসাবে তৎকালে এ-কাব্যখানি পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল, সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্যে', দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় এই সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু এই

বিদ্রূপের কুইনিনে ইন্দ্রনাথ যতখানি পুরু ক'রে হাসির আবরণ দিয়ে ঢেকেছিলেন, অন্য কোনো কবিই তা করেন নি।

পদ্য ও গদ্যলেখক হিসাবে সংক্ষেপে তাঁর সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তাঁর মনোবৃত্তি ও মতামত ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল ও গোঁড়া। প্রায় সকল প্রকার নূতনত্বেরই ইনি বিরোধিতা করেছিলেন, এমন কি বর্ধমান শহরে যখন জলের কল হওয়ার প্রস্তাব হয়, তখন ইনি তারও বিরোধিতা করতে ছাড়েন নি। নবাগত ব্রাহ্মধর্মের উপর ছিল তাঁর বিষম রাগ। তাঁর রচিত উপন্যাস দু'টিতে, এবং তাঁর সম্পাদিত ও লিখিত 'পঞ্চানন্দে' ব্রাহ্মদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে এবং ক্রমাগত তাঁদের আক্রমণ করতে ইনি এবং এঁর শিষ্যরা কখনো বিরত হন নি। 'পঞ্চানন্দ' বলতে তখন লোকে ইন্দ্রনাথকেই বুঝতো। এই 'পঞ্চানন্দে'র ক্রমান্বিত ব্রাহ্ম আক্রমণে এক শ্রেণীর রক্ষণশীল গোঁড়া সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা খুব বেড়েছিল। যে-লোক সঙ্গত ভাবে বা অসঙ্গত ভাবে ক'সে গালাগালি দিতে পারে, তার যে বহু ভক্ত জোটে, এটা সর্বযুগেই দেখা যায়। কিন্তু এর প্রতিবাদও কিছু কিছু হয়ে থাকে। এবং সেকালেও যে হয়েছিল, তার প্রমাণ, 'পঞ্চানন্দে'র ব্রাহ্ম-নিধন অভিযানকে বিদ্রূপ ক'রে কোনো এক অজ্ঞাতনামা লেখক ১২৯৩ সনে (১৮৮৫-৮৬) 'মহাকবি ধূর্জটি' এই ছদ্মনামে 'একাদশ অবতার' নামে একখানি ব্যঙ্গ-কাব্য লিখেছিলেন। নানাদিক থেকে এ বইখানিকে আমি উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করি। কারণ, যদিও লেখক অজ্ঞাতনামা, তবু বইটির রচনা প্রশংসনীয়। বইখানির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অতি পরিচ্ছন্ন, এর মধ্যে স্থূলতা বা কুরুচির পরিচয় — যা তৎকালীন ব্যঙ্গ-রচনায় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় — একেবারেই নেই।

প্রথমে 'প্রস্তাবনা', তৎপর 'বিজ্ঞাপন' অংশ বাদ দিলে কাব্যখানি বারো সর্গে বিভক্ত। প্রস্তাবনায় বলা হচ্ছে —

"দুর্দান্ত ব্রাহ্মের দল দৈব-বলে বলী,
যুঝি কলিরাজ সনে ঘোরতর রণে
অস্থিরিলা যবে তাঁয় ; ভয়ে ভঙ্গ দিয়া

পলাইলা কলিদেব-অনুচর যত ;
টলিল আসন তাঁর ঘন থরথরি ;
কি চেষ্টা করিলা তবে কলিরাজ পুন,
উদ্ধারিতে নিজরাজ্য ; কহ বীণাপাণি।
আশার ছলনে মুগ্ধ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি তোমায় সভয়ে শ্বেতভুজে
ভারতি, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে তবে কবি মহামতি,—
হিন্দুর ভরসা আশা।…
কহ দয়াময়ি,
কেমনে নিরয়পুর অন্ধকার করি
হইলেন অবতীর্ণ কলিটোলা ধামে
কলির দেবতাগণ, কেমনে বা নাশি
ব্রাহ্মরূপ দৈত্যদলে, হিন্দুর ধরম,
করিলেন রক্ষা সবে ;—তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে
(অব্যর্থ ভাষার অস্ত্র) খেদায়ে কেমনে
ব্রাহ্মদংশগণে হায়, গাভীরূপে স্থিতা
রাখিলা হিন্দুর ধর্ম্ম — কালের গতিতে
সম্প্রতি ত্রিপাদ-ভগ্ন। কেমনে বা শুনি,
ঘৃণিত বাঙ্গ(া)লিকুলে জন্মিলেন আসি
একাদশ অবতার।"

বইটিতে ব্রাহ্মধর্ম বা সমাজকে সমর্থন ক'রে কোনো কথাই বলা হয় নি, কেবল ব্রাহ্মদের কবল থেকে দেশকে রক্ষার জন্য অবতীর্ণ একাদশ অবতার 'পঞ্চানন্দের' ব্রাহ্মনিধন অভিযানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দ্বাদশ সর্গ কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা ক'রে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ; বিশেষতঃ তাঁর অমিত্রাক্ষর মোটেই অপটু রচনা নয়। ইনি যথেচ্ছভাবে মাইকেল মধুসূদনের রচনা থেকেও হুবহু গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞাপন অংশ

থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাঠক দেখতে পাবেন যে, এই কবির রচনায় রীতিমত মুন্সিয়ানা আছে।

"হে মানব, হেরিবারে সাধ থাকে যদি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য এক ঠাঁই ; বসন্তের ফুল,
নিদাঘ তপন, কিম্বা শারদ চন্দ্রমা,
চাও যদি দেখিবারে ; বাসনা যদ্যপি
দেখিতে হিমাদ্রিশৃঙ্গ তুষার-মণ্ডিত,
অথবা কৌমুদীদীপ্ত সুনীল সাগর ;
পড় এই মহাকাব্য।...
"দেখিলে তো বিজ্ঞাপন কমলবাসিনি,
মন্দ কি হয়েছে দেবি ? কিবা বোধ হয়,
ভুলিবে না স্বল্পবুদ্ধি বাঙ্গালির জাতি,
হেন বিজ্ঞাপন গুণে ? অবশ্য ভুলিবে।...
"কাব্যই লিখিব তবে। নহি এ কার্য্যের
অযোগ্য কিছুতে আমি। পড়িয়াছি দেবি,
রামায়ণ, ইলিয়াড, ওষ্ঠ-অগ্রে আছে,
ব্যাস, দান্তে, কালিদাস, ভার্জ্জিল, মিণ্টন,
আরও কত ছোট বড় স্বদেশী বিদেশী।
পড়িয়াছি ঘনরাম সবুজ-মলাট,
দীর্ঘ প্রস্থ বেধ লয়ে মোটের উপর
নবতি-দু'ইঞ্চি ঘন। আকৃতিতে ছোট,
রয়েছে কবিতারূপে কিন্তু যার মাঝে,
জগতের যত জ্ঞান হইয়া ঠাসিত।"

বঙ্গবাসীর "পঞ্চানন্দ" হিন্দুধর্মের যে ধ্বজা উড়িয়ে চলতেন, এবং ব্রাহ্মরাই হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করলো বলে যে প্রচার করে বেড়াতেন, 'একাদশ অবতার' তার অতি শক্তিশালী অথচ কৌতুকময় উত্তর। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সেকালের অনেক গণ্যমান্য ব্রাহ্মের নাম এতে উল্লিখিত আছে। কাব্যটির কাহিনী এই ; নিরয়পুরে মহারাজ কলি পাত্রমিত্র নিয়ে বসে আছেন, এমন

সময় তাঁর মন্ত্রী শনৈশ্চর মর্ত্ত্য থেকে ফিরে এসে উত্তেজিত হয়ে ব্রাহ্মদের অহিন্দু কার্যকলাপের বর্ণনা দিলেন। মর্ত্ত্যলোকে গিয়ে সাতাশটি মুদ্রা গচ্ছা দিয়ে এসে শনৈশ্চরের মেজাজ খুব খারাপ। তখন ব্রাহ্ম-নিধনের জন্য একাদশ অবতাররূপে 'পঞ্চানন্দে'র সৃষ্টি হোল। 'পঞ্চানন্দ' দলবল নিয়ে ব্রাহ্ম-নিধনের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 'বিবেক'কে মাথায় এক ডাণ্ডার বাড়ি মেরে তিনি নিধন করলেন। অবশেষে একদিন নিদ্রিত ব্রাহ্মপুরী অবরুদ্ধ হোল, এবং সাংঘাতিক সব 'পাঞ্চানন্দ' অস্ত্রে ব্রাহ্মদিগকে ঘায়েল করবার জন্য 'পঞ্চানন্দ' স্বয়ং দল বল নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এমন সময়ে অদূরে রোঁদদেওয়া লালপাগ্‌ড়ি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র ফেলে 'পঞ্চানন্দ' ও তাঁর সৈন্যসামন্ত চোঁচা দৌড় দিলেন। সেই সব মারাত্মক অস্ত্রের ভগ্নাবশেষ হয়তো খুঁজলে এখনো ধাপার মাঠে পাওয়া যাবে।

'মহাকবি ধূর্জটি' কোন্ কবির ছদ্মনাম তা আর আজ আমাদের জানা নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি একথা প্রমাণিত হয় যে ইনি সেকালের একজন সুপরিচিত লেখক, তবে আশ্চর্য হবার কারণ ঘটবে না।

এই সময়ের আরো দু'চারখানি কৌতুক বা ব্যঙ্গাত্মক রচনা ব'লে কথিত কাব্যগ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। যথা "সায়ের" শ্রীনেহালচাঁদের 'পৌষ-পার্ব্বণ' নামে 'বিচিত্র রস কাব্য' (১৮৮৩)। এটিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, এবং কৌতুককাব্য হিসাবে ব্যর্থ। 'গাধাবলি' নামে এ সময়ের আর একখানি কৌতুককাব্য পাওয়া যায়। হরিমোহন রায় কর্তৃক সংশোধিত এবং অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এই বইটির আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নেই। ১২৮৭ সালে (১৮৭৯-৮০) প্রকাশিত এ-বইটি প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে "নীতিরসে পরিপুরিত" এবং এর দ্বারা "দেশের কতকগুলি জঘন্য রীতি সংশোধন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য" ছিল। এ ভিন্ন কৌতুক উৎপাদনও যদি লেখকের উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তবে বলা যায় যে, লেখকের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েচে। বইটিতে ছোট ছোট পদ্যে পয়ার এবং মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দে পৃথিবীর যত প্রকার গাধা আছে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির মধ্যে কৌতুকের উপাদান ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু

লেখক তাকে কোনো কাজেই লাগাতে পারেন নি। দু'চারটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

"একের নামের পত্র অন্যে খুলে পড়ে।
নরগাধা সেইজন তাহা নাহি নড়ে॥"
"কেহ পরামর্শ করে হইয়া নির্জ্জন।
গাধা সেই চেষ্টা করে করিতে শ্রবণ॥"
"অধিক বয়সে পত্নী গত হয় যার।
যদি উপযুক্ত পুত্র বশে থাকে তার॥
সে যদি বিবাহ সুখ বাঞ্ছে পুনর্ব্বার।
তবে তারে গাধা বলে সবে বারবার॥"
"ধনরত্ন নাহি চায় ধনির নিকটে যায়,
শিখিয়াছে তোষামদ বিবিধ প্রকার,
বাবু আনা বেশ ধরে, জল উচু নিচু করে,
এ জগতে গাধা কেবা সমান তাহার॥"

রবীন্দ্রাগজ কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০) কৌতুক বোধের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও প্রকৃতপক্ষে হাস্যরসাত্মক তিনি কিছুই লেখেন নি, তবু কবিতায় কৌতুক করার দিকে তাঁর একটু ঝোঁক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর 'ডায়মণ্ড কাটা মল' 'নর্ম্মদানন্দিনীর চাট্‌নী,' 'বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া', প্রভৃতির নাম করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের কৌতুক-মিশ্রিত কবিতাগুলি সবই তাঁর ব্যক্তিগত কোনো-না-কোনো ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে লেখা। এগুলিকে ঠিক হাস্যরসাত্মক রচনা বলা যায় না, কিন্তু এগুলির মধ্যে একটু কৌতুকের আমেজ আছে। যেমন 'বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া' (শেফালীগুচ্ছ)। কবিতাটির বিষয় এই যে কবি একদিন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মাত্রাধিক সিদ্ধি খেয়ে মত্ত হয়েছিলেন এবং তখন তাঁর শ্যালক শ্যালিকারা তাঁকে সং সাজিয়ে নানা কৌতুক করেছিল। তাঁর সেই clown বা সং সাজার কাহিনীটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি যে ভূমিকা করেছেন, সেই প্রথম অংশটুকু দেবেন্দ্রনাথের কৌতুক-মিশ্রিত রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কে আমি? তোমরা বুঝি ভাবিয়াছ আমি
বৌমাষ্টারের কিম্বা গোপাল উড়ের
যাত্রাদলে, সাজি রঙ্গে কেলুয়া ভুলুয়া,
হাসাই দর্শকবৃন্দে, মুখভঙ্গি করি?
আমার সে অঙ্গভঙ্গি হেরি, হর্ষে সারা
হয়, সারা লোক? শোক ও বিষাদ ত্যজি
শোনে মোর বিচিত্র সঙ্গীত? রসরঙ্গে
ভরা, হেরি নেত্র মম, হাসির ফোয়ারা
চৌদিকে ছুটিয়া উঠে? যথা কাতুকুতু
দিলে, হাসে লোক! কিম্বা যেমতি দৈবাৎ
হঠাৎ পড়িয়া গেলে বর্ষার পিচ্ছিলে,
জোয়ান ঠাকুরদাদা, নাতি ও নাতিনী
একরাশ, হেসে উঠে, হাততালি দিয়া,
কে কাহার গায়ে পড়ে বুড়ার নাকালে!
কিম্বা যথা, হাসে যত ছাত্রবৃন্দ, যবে
কেমিষ্ট্রীর প্রফেসর, নিপুণ কৌশলে
সৃজিয়া লাফিং গ্যাস্, করেন কৌতুকে
কক্ষটিরে বৃন্দাবনী রঙ্গরসে ভরা?
না গো না, এ সব নয়!"

সমালোচকদের লক্ষ্য ক'রে দেবেন্দ্রনাথ দু'চারটি তীব্র ব্যঙ্গের কবিতাও লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলির মধ্যে হাসি নেই।

এরপর রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করতে হয়। কিন্তু হাস্যরসাত্মক কবিতায়, গদ্যে ও প্রহসনে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক কৃতিত্বের পরিচয় একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করা প্রয়োজন। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অল্প কনিষ্ঠ, তাঁর সমকালীন কৃতী হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনা ক'রে আমরা এ অধ্যায় শেষ করবো।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হাস্যরসবোধ ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩)। ইনি নাট্যকার নামেই বাংলাদেশে

সুপরিচিত, কিন্তু হাসির কবিতায় এঁর কৃতিত্ব নাটক অপেক্ষা বোধহয় অনেক বেশি। নাটক মঞ্চে সাফল্য লাভ করলে যত সহজে বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হয়, কবিতার পক্ষে তত সহজে সেরূপ খ্যাতি লাভ করা সম্ভব হয় না। তবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা, বিশেষতঃ তাঁর হাসির গানগুলি, এককালে বাংলাদেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাস্যরস-বোধ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবজ ছিল, তাই তাঁর লঘু রচনায় এমন একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, যার ফলে মনে হয় যেন তিনি এগুলি নিতান্ত অবলীলাক্রমে লিখেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যঙ্গ-কবিতা, হাসির গান এবং প্রহসন অনেক লিখেছেন। তাঁর প্রহসনগুলির আলোচনা আমরা যথাস্থানে করবো — তাঁর হাস্যরসাত্মক এবং লঘু কবিতাগুলিই আপাতত আমাদের আলোচনার বিষয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কবিতার বই 'আর্য্যগাথা' "প্রকৃতিবিষয়িণী গীত সমষ্টি", অতএব এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়, কিন্তু 'আষাঢ়ে বা গুটিকতক হাসির গল্প' আমাদের আলোচনার বিষয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যেরূপ তীব্র এবং অসাধারণ হাস্যরসবোধ ছিল, বাঙালী সাহিত্যিকগণের মধ্যে তা' বিরল। হাস্য ও কৌতুকবোধের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চরিত্রে আর একটি জিনিস খুব প্রবলরূপে বিদ্যমান্ ছিল। সেটি, তাঁর কাছে যা অন্যায় ও নিন্দনীয় ব'লে মনে হোত তাকে প্রচণ্ড আঘাত করবার প্রবৃত্তি। এই জন্য হাস্যরসের অতি সুদক্ষ শিল্পী হয়েও দ্বিজেন্দ্র-লাল নিছক হাসির রচনা বেশি লেখেন নি। 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' এর অধিকাংশ কবিতা অতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পূর্ণ এবং অনেক সময় তিক্ততাময়।

'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলি বাঙালীর জীবন ও সমাজ নিয়ে লেখা এইরূপ গুটিকয়েক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কবিতার সমষ্টি। এ-জাতীয় হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক গদ্য-গল্প বা নক্শা রচনার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন পাদ্রী রিচার্ড হ্যারিস বার্হাম রচিত *Ingoldsby Legends* থেকে। ১৮৪০ সালে বার্হামের নক্শা-পদ্যগুলি গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয় এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন, "বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে *Ingoldsby*

Legends এর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাংলা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি।"* কিন্তু 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলির ব্যঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আষাঢ়ে'র প্রথম কবিতা 'কেরাণী, থেকে একটু উদ্ধৃতি নেওয়া যেতে পারে।

"খেটে, খেটে, খেটে
মুখে চারটি অন্ন গুঁজে, চাপকান গায়ে এঁটে,
আপিসে যাই উর্দ্ধশ্বাসে একটু না থেমে।
ওছট্ এবং ধূলো খেয়ে, দুপর রোদে, ঘেমে ;
হুঁকো টেনে কোসে,
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে,
দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোষে' ঘোষে',
মাথায় বেরোল ঘাম ; — এবং ঠোঁটে লাগলো কালি,
গোঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি।"

এ-কবিতাটিকে কে হাসির কবিতা বলবে ? বরং 'শ্রীহরি গোস্বামী (চূড়ামণির অভিশাপ)' — নামক অনাচারগ্রস্ত হিন্দুয়ানির চাঁইদের বিদ্রূপ ক'রে লেখা তিন প্রস্তাবে সমাপ্ত দীর্ঘ কবিতাটিতে, কিংবা 'অদল বদল', 'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা', 'ভট্টপল্লীতে সভা', 'কলি যজ্ঞ' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে ব্যঙ্গের অনেকটা হাস্যময় প্রকাশ ঘটেছে। 'অদল বদল' নামক কবিতার 'মর্ম্ম'টি পড়লে, 'আষাঢ়ে' গ্রন্থের ব্যঙ্গের ধরণটা বোঝা যায়।

"১। হিন্দু বিবাহটা হয় ত খুবই আত্মিক,
শুদ্ধ সেটা চুক্তি নয় — তা অবশ্যই ঠিক ;
কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বালিকাকে বিয়ে করায়
আধ্যাত্মিকতাটা একটু বেশী দূরই গড়ায় ;
সেরূপ বিবাহটা নিশ্চয় আত্মার মোক্ষসেতু।
কিন্তু হয় তা প্রায়ই গৃহে অশান্তির হেতু॥
২। ঘোম্‌টা যে জিনিষটা সেটা ভালই, তা ব'লে ;
সেটি ঠিক একটি গজ লম্বা না হলেও চলে।"

* নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭

'আষাঢ়ে' (১৩০৫) যখন প্রকাশিত হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 'আর্য্যগাথা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮২, ১৮৯৩)। তবু 'আষাঢ়ে'র প্রথম প্রকাশের সময় দ্বিজেন্দ্রলাল নাম গোপন করেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার ও অনাচার এবং ধর্মের নামে বিবিধ দুষ্কর্ম ও পাপকে তিনি যেরূপ তীব্রভাবে বিদ্রূপ করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হবে তা তিনি তখন অনুমান করতে পারেন নি।

'আষাঢ়ে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে ইহার ভাষা ভঙ্গী বিষয় সমস্তই নিজে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন।" বাস্তবিকই, ব্যঙ্গাত্মক পদ্যরচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের একটি নিজস্ব স্টাইল ছিল। তাঁর ভাষা, ছন্দ ও মিলপ্রয়োগে যথেষ্ট নূতনত্ব দেখা যায়। 'আষাঢ়ে'র পদ্য গল্পগুলিতে ছন্দ একটু শিথিল, ছন্দ-স্পন্দন অনেকটা অনিয়মিত ও উচ্ছৃঙ্খল, একথা সত্য। কিন্তু এ শৈথিল্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা কবির অক্ষমতা জনিত নয়। তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, এবং ভূমিকায় লিখেছিলেন, "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামে অভিহিত করা সংগত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি-যাত্রা বর্ণনা করিতে মেঘনাদ বধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?" প্রকৃতই, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় যা প্রথমেই চমক্ লাগায় তা তাঁর বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষা ছন্দ ও মিলের সম্পূর্ণ সঙ্গতি। কিন্তু রচনার কৃতিত্ব সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করতে হয় যে, হাস্যরসের দিক থেকে বিচার করলে 'আষাঢ়ে' বইখানিতে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের খোঁচা হাসিকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে।

হাস্যরসাত্মক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর 'হাসির গান'এ (১৩০৭)। এ-বইয়ের অনেক কবিতায় উৎকৃষ্ট এবং খাঁটি হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং এই সব কবিতায় ছন্দ ও মিল আশ্চর্য কৌশলে বিষয়ের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলেছে। সব চেয়ে চমক্‌প্রদ দ্বিজেন্দ্রলালের মিল। 'আষাঢ়ে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেই মিলগুলি

বন্দুকের ক্যাপের মত হাস্যোদ্দীপনায় পূর্ণ।" 'হাসির গান'-এর হাস্যরস বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে এই মিলগুলির জন্য। সকলেই জানেন, আকস্মিকতা অথবা অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে আমাদের হাস্যরস উদ্দীপ্ত হয়। 'হাসির গানে' পদে পদে এইরূপ অপ্রত্যাশিত মিলের ছড়াছড়ি। ছন্দ ও মিলের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের যে আশ্চর্য দখল ছিল 'হাসির গানে' তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'হাসির গান'-এর অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিতে সুর যোজনা ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল এগুলিকে গানে পরিণত করেছিলেন এবং গ্রন্থের নামকরণও তদনুযায়ীই করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ গানের মত এ-গানগুলির রস সুরের উপর নির্ভর করে না। কবিতা হিসেবেই এগুলি অত্যন্ত সুখপাঠ্য।

'হাসির গান'-এর কবিতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ বিদ্রূপাত্মক,— ইংরেজ শাসনের নানাবিধ গ্লানি, উগ্র সাহেবিয়ানা, হিন্দু সমাজের নানাবিধ ত্রুটি প্রভৃতিকে এ-সব কবিতায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'ইরাণ দেশের কাজী', 'জিজিয়া কর', 'খুস্‌রোজ', 'যায় যায় যায়', 'বিলেতফের্তা', 'চম্পটির দল', 'নতুন কিছু করো', 'হ'ল কি', 'নবকুলকামিনী' প্রভৃতি কবিতা এই দলের। 'ইরাণ দেশের কাজী' 'বিলাতফের্তা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। এগুলিতে হাসি আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদ্রূপের তীব্রতা সে হাসিকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন করেছে। যেমন,

"পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদায় ;
এইটি কি আর সইবে না ক — দু ঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা ; দিবি দু'ঘা দে না বাবা !
দু'ঘা বেশী, দু'ঘা কমে, এমনি কি আসে যায়।" (জিজিয়া কর)

"আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলিতি বাঁদর।" (বিলাতফের্তা)

এ-সব কবিতায় বিদ্রূপের সঙ্গে তীব্র ক্ষোভ ও ভর্ৎসনা এমন স্পষ্টরূপে জড়িত যে হাস্যরস উপযুক্তরূপে ফুটে উঠতে পারেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় কৌতুকরসবোধ যেমন প্রবল, আঘাত করবার প্রবৃত্তিও তেমনই — কিংবা

ততোধিক তীব্র। ফলে, হাস্যরসাত্মক রচনায় যে মহৎ কৃতিত্ব তাঁর অনায়াস-লভ্য ছিল, সে-সম্ভাবনাকে অনেকস্থলে তিনি নিজেই খর্ব করেছেন। তবু হাস্যরস সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল বৃহৎ সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বহু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তিনি নিজে যে রক্ষণশীল মনোভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, এমন মনে হয় না। গোঁড়ামি ও ব্রাহ্মণত্বের অহংকার দ্বিজেন্দ্রলাল কোন দিনই বোধহয় একেবারে ছাড়তে পারেননি। 'আমরা ছেড়েছি টিকির আদর', 'ব্যাখ্যা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে।', 'এখন ঘোষের নিকট বোসের নিকট (হিন্দু) ধর্ম্মশাস্ত্র শিখি গো।' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক পংক্তিগুলি পড়ে স্পষ্টই মনে হয়, ব্রাহ্মণ্যগর্ব তাঁর খুবই ছিল এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে ধর্মশাস্ত্র পঠন-পাঠন নিন্দনীয় বলে তিনি মনে করতেন।

এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক গান বা কবিতাগুলি ছাড়া 'হাসির গান'-এ কিছু সংখ্যক হাসির কবিতা আছে, যা নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক রচনা। কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মধ্যে নয়, বাংলা হাস্যরসাত্মক কবিতার ক্ষেত্রে এগুলির তুলনা মেলা ভার। এর মধ্যে কতকগুলি ব্যঙ্গাত্মক, কতকগুলি নিছক হাসির। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

"ঐ যায় — পুরাণ, তন্ত্র, বেদ, মন্ত্র, শাস্ত্রফাস্ত্র পুড়ে,
ঐ যায় — গীতা মর্ম, ক্রিয়াকর্ম, হিন্দুধর্ম উড়ে ;
রৈল শুধু — গেটে, শিলার, ডারুইন, মিল, আর
ছেলের খরচ, মেয়ের 'বিয়া' ;
রৈল শুধু — ভার্যার দ্বন্দ্ব, ড্রেনের গন্ধ, জোলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।"
(যায় যায় যায়)

"দেশটা দেখ যাচ্ছে ভ'রে ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকে,
হচ্ছে সব তুল্য পাপী, দিচ্ছে কারে শাস্তি কে ;
মান্‌ছে না কেউ শাস্ত্রগত মিথ্যাও কি সত্যও ;
ধর্ম যদি রাখতে চাও প্রত্যূষেতে প্রত্যহ
সালসা খাও।

সালসা খাও, বসবে হয়ে উচ্চ মণিমঞ্চবান্ ;
বিদ্যা হবে পঞ্চানন ও মূর্ত্তি হবে পঞ্চবাণ ;
শত্রু দলে কমবে, শ্যালীসংখ্যাদলে বাড়বে খুব ;
ভার্য্যাসনে দ্বন্দ্বরণে গাত্রজোরে পারবে খুব ;
সালসা খাও।" ("সালসা খাও")

"উহু, সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া ;
উহু, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! কত না বুদ্ধি করিয়া।...
ওহো, না রাখিত বাঁধি সন্দেশ আদি, সংসারে এই সমুদয়,
ওহো, হয়ে মুনিঋষি, ছুটে কোন দিশি, যেতাম হয়ত মহাশয় !
পেলাম না শুধু — হরি হে !
— খাইতে হৃদয় ভরিয়ে ;—
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর সন্দেশ থাকে পড়িয়ে ;
ওহো, মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চখে বহে' যায় দরিয়া।"
(সন্দেশ)

"বিম্বাধরা হোক্ কি কাক্রীবদোষ্ঠা,
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক,
সুপংক্তিদন্তা কি গজেন্দ্রদংষ্ট্রা,
বংশীধর নাসা কি চাইনিজ নাক ;
কেবল — যদি সে করে কম তর্ক ও ক্রন্দন,
তার উপর হয় যদি সুচারু রন্ধন,—
তার উপর ডাকে আমায় সোহাগে—
"পোড়ারমুখো মিন্সে, ও হতভাগা।"
তা হলে হাঃ হাঃ — সে ত সোনায় সোহাগা !"
(স্ত্রীর উমেদার)

"পার ত জন্মো না কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পার্বে না ক তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল ;

তাই দিল মোরে, কালো ক'রে রোদে ধরে,
মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল।…
পরে, মিলে আমার আটটা মামায় — বাবার সেই আট শালায়,
হতে না হতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠশালায়।
হায় গো! বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা।
সে কেবল ফেললাম বলে জন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলা।"
(বিষ্যুৎবারের বারবেলা)

এই শ্রেণীর খাঁটি হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে 'চা', 'চাষার প্রেম', 'প্রাণান্ত', 'প্রণয়ের ইতিহাস', 'বুড়োবুড়ী' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

'হাসির গান'-এর অন্তর্গত অপর এক শ্রেণীর কবিতা অসূয়া প্রণোদিত বলে সেগুলির আলোচনা না করাই ভালো। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় একটি মহৎ দোষ, তাঁর সংযমের অভাব। যা তিনি নিন্দনীয় মনে করতেন বা অপছন্দ করতেন তাঁর রচনার মধ্যে তাকেই তিনি নির্বিচারে আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়েছেন। এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর অসূয়া বা ক্রোধকে তিনি কখনো প্রচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করেন নি। ফলে অনেক সময় প্রচুর হাসির উপাদান থাকলেও তা উপভোগ্য তো হয়ই নি, এমনকি প্রকৃত সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে কি না তাও সন্দেহ। যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি সাহিত্যের প্রাণ, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে আয়ত্ত করতে পারেন নি বলেই, বহু গুণ সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যে মহৎ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর রচনায় বিদ্বেষ ও ক্রোধ কোথাও কোথাও অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যা তাঁর রচনার অনুরাগী মাত্রকেই পীড়িত করে। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা লিখেছিলেন, তা দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো কোনো রচনা পড়ে সকলেই অনুভব করেছেন, সন্দেহ নেই। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "বাঙ্গলা সাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অদ্বিতীয়। তাঁর গানে হাস্যরস, ভাবে কথায় সুরে, তালে লয়ে পঞ্চীকৃত হয়ে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। হাসির গান তাঁর সঙ্গে জুড়ীতে গাইতে পারে, বঙ্গ সাহিত্যের আসরে এমন গুণী আর একটিও নেই। কান্নার মত হাসিরও নানাপ্রকার বিভিন্ন রূপ আছে, এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর মুখে হাসি নানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে কেবল আমাদের মিষ্টি

হাসিই হাসতে হবে, একথা আমি মানি নে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্র বাবু যে বলেছেন যে, কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটার প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে শুধু তার উপটুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না। হাসতে হলেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে, তা নয়,— দাঁতখিচুনী বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে।" (সাহিত্যে চাবুক, বীরবলের হালখাতা)

উচ্চস্তরের হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এই অপ্রীতিকর অথচ যথার্থ কথাগুলি লেখবার অবকাশ না হলেই সুখের বিষয় হোত।

৪

যদিও যাত্রা ও পাঁচালী প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল, তবু আধুনিক কালে নাটক বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিলেতি নাটক ও রঙ্গমঞ্চের প্রভাবেই উদ্ভূত হয়। কলকাতায় সর্বপ্রথম বিলেতি ধরণের রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন হেরাশিম লেবেডেফ্ নামে এক রুশ ভদ্রলোক। ইনি ১৭৮৭ সালে কলকাতায় এসে বাংলা ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন, এবং কয়েক বছরের মধ্যেই এ-ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে *The Disguise* এবং *Love is the Best Doctor* নামে দু'খানি ইংরেজী নাটককে বাংলায় অনুবাদ করেন। *The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* নামে বাংলা ও হিন্দী ভাষার একখানি ব্যাকরণও ইনি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। তাঁর 'ছদ্মবেশী' নাটকখানি ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫ এবং ২১শে মার্চ ১৭৯৬ তারিখে তাঁরই নির্মিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে। কিন্তু লেবেডেফ্ আর বাংলা নাটক রচনায় হাত দেন নি।

এই সময়ে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাংলার সংস্কৃতির শোচনীয়তম অবস্থা। পূর্বতন ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অধঃপতন ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতি, যা ফারসী-সংস্কৃত-বাংলা শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং নবাব-জমিদারের সভা আশ্রয় ক'রে ছিল, তা ক্রমশঃ প্রায় লোপ পেতে বসেছিল; এবং অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত হঠাৎ বড়লোকদের প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্তরের লৌকিক রুচি ও আমোদ বাংলার পূর্বতন সংস্কৃতির স্থান দখল করতে অগ্রসর হয়েছিল। ফলে, বাংলাদেশ তখন ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের ঐতিহ্য ত্যাগ ক'রে গোপাল ভাঁড়ের পূজায় মত্ত। তাই সে-সময়ে বাংলায় ভাঁড়ামি-রসিকতা এবং রুচিহীন ঠাট্টা তামাশার যত আদর, গম্ভীর বা গুরুরসাত্মক রচনার আদর তার সিকিমাত্রও ছিল কি না সন্দেহ। এই

কারণে, এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উপকরণ তৎকালীন সমাজে যথেষ্টই ছিল ব'লে, রুচিহীন রসিকতা এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক নক্শারই সে যুগে চাহিদা ছিল। তাই সাহিত্যে, গদ্যে পদ্যে ও নাটকে, সেই জিনিসেরই প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

এ-বিষয়টি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবু এখানে তা পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন হ'ল এই কারণে যে, লেবেডেফ্ লক্ষ্য করেছিলেন, বাঙালী গম্ভীর বা গুরুরসাত্মক সাহিত্যের চেয়ে ছ্যাবলামিই বেশি পছন্দ করে। সেহেতু তাঁর নাটকও তিনি সেই রুচি অনুযায়ীই রচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed."। অতএব তিনি অনুবাদের জন্য দু'খানি প্রহসনই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "তাই আমি ওই নাটক দুইটি নির্বাচন করিয়াছিলাম এবং তাহার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে ঢুকাইয়া দিয়াছিলাম একদল পাহারাওয়ালা—"চৌকীদার", নটী (?)—"কানেরা", চোর—"ঘুনিয়া", আইনজীবী—"গোমস্তা", এবং বাদ-বাকির মধ্যে একদল ছিঁচকে লুঠেরা।"*

সে যুগে হাসি-ঠাট্টা-ভাঁড়ামির কিরূপ চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল, তার বহু উদাহরণই দেওয়া যায়। নাটকের ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায় একেবারে প্রথম যুগে 'কৌতুক সর্বস্ব নাটক', 'হাস্যার্ণব' প্রভৃতি দু একটি সংস্কৃত প্রহসনের পাঠ্য অনুবাদে। ইংরেজী নাটকের অনুকরণে বাংলায় নাটক রচনার চেষ্টা প্রথম দিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। জি, সি, গুপ্তের 'কীর্তি-বিলাস', তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন', হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব-বিয়োগ', নাটক হিসাবে কোনোটিই কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ইংরেজী নাটকের যে অজস্র অনুবাদ পূর্বোক্ত নাট্যকারগণ এবং শ্যামাচরণ দাস দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রকালী ঘোষ প্রভৃতি করেছিলেন তাও সার্থক হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণ শুধু এই নয় যে, প্রথম যুগের নাটক নান্দী-প্রস্তাবনা পয়ার-ত্রিপদীতে ভারাক্রান্ত ছিল, আরো একটি কারণ এই যে, তখনো কোনো গম্ভীর বিষয়কে গ্রহণ করবার মত দর্শক বা শ্রোতা বাংলায় তৈরি হয় নি। অবশ্য

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড, সুকুমার সেন।

রচনার দুর্বলতা তো ছিলই। গদ্য ভাষা তখনো অপরিণত। তা ছাড়া, তৎকালীন নাট্যকারেরা পাঠ্যাকারে নাটকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু নাটক রচনায় প্লটের যে বাঁধুনি, কথোপকথনের যে সঙ্গতি ও তাৎপর্য এবং চরিত্র-সৃষ্টির জন্য যে নিরপেক্ষ শিল্পদৃষ্টি প্রয়োজন, তার কোনো কিছু সম্বন্ধেই অভিজ্ঞ ছিলেন না। নাটক রচনার সঙ্গে অভিনয়-কলা যে কিরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাও তাঁদের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত ছিল। তাঁদের বোধহয় ধারণা ছিল যে, নাটক লেখাটা লেখকের কাজ, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করার কাজটা পুরোপুরিই নটনটীর। রচনা অভিনয়োপযোগী না হলে যে কোনো নট-নটীই অভিনয়ে প্রাণসঞ্চার করতে পারে না, এটা শিখতে বাঙালী নাট্যকারের আরো কিছুদিন সময় লেগেছিল।

মৌলিক বাংলা নাটকের মধ্যে প্রথম মঞ্চে সাফল্য লাভ করলো রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২—১৮৮৬) 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এ বইখানিকে প্রকৃত নাটক না বলে নক্‌শা-নাটক নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। কেননা, এর মধ্যে প্লটের কোনোই বাঁধুনি নেই,—অসৎ ঘটকের চক্রান্তে তিন কুলীন কুমারীর অপাত্রে বিবাহ এইটুকুই নাটকের কহিনী। নান্দী ও প্রস্তাবনা তো আছেই, এ ভিন্ন তৎকালীন গদ্য গ্রন্থ এবং নাট্য-সাহিত্যে সর্বত্রই যা থাকতো, পয়ার ও ত্রিপদীর ছড়াছড়ি। এত দোষ সত্ত্বেও 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'কেই যে বাংলা প্রহসনের আদি বলে গণ্য করা হয়, তার কারণ, রামনারায়ণ তাঁর ব্যঙ্গের বিষয়রূপে তদানীন্তন বাঙালী সমাজের একটা জ্বলন্ত সমস্যাকে বেছে নিয়েছিলেন। বিষয়ে, ভাবে, ভাষায় এর মধ্যে বিজাতীয়তা একবিন্দুও ছিল না, তাই এ-বিদ্রূপে তখনকার বাঙালী প্রাণ খুলে যোগ দিতে পেরেছিল। রামনারায়ণের প্রহসনগুলির সাফল্যের আরও একটা বড় কারণ এই যে, তাঁর মধ্যে প্রকৃত কৌতুকবোধ ছিল, এবং একটু স্থূল হলেও হাস্যরস তাঁর রচনায় বেশ ফুটেছিল।

রামনারায়ণ অনেক নাটক লিখেছিলেন, এবং তৎকালে নাটকের নিদারুণ অভাবহেতু নাটক লিখে যশ ও অর্থ দুই-ই প্রচুর অর্জন করেছিলেন। নাট্য রচনায় তাঁর সাফল্যের জন্য তিনি যে 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে

প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, একথা সকলেই জানেন। তিনি অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকও লিখেছিলেন এবং কতকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত 'রত্নাবলী' অভিনয়ের সময় নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করার ভার মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর পড়ে, এবং এই সূত্রেই মধুসূদন বাংলা নাটক তথা বাংলা সাহিত্য রচনার দিকে আকৃষ্ট হন।

রামনারায়ণের প্রকৃত কৃতিত্ব তাঁর প্রহসনে; এবং প্রহসনগুলির মধ্যে প্রধানতঃ তাঁর 'কুলীন-কুল-সর্বস্বে'। 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান', 'বুঝলে কি না' প্রভৃতি অন্য যে-সব প্রহসন তিনি লিখেছিলেন, সেগুলির কাহিনী অতি ক্ষীণ, বিষয়ও সব সময় খুব রুচিসম্মত নয়। এর মধ্যে দু'খানি প্রহসনেরই বিষয় লাম্পট্যের সংশোধন, একটিতে স্বামীর, অপরটিতে প্রতিবেশীদ্বয়ের। এই সব নাটক ও প্রহসনের মধ্যে অনেকগুলি মঞ্চে সাফল্য লাভ করেছিল। এ-সাফল্যের একটি কারণ রামনারায়ণের রচনার সরলতা। বাংলা গদ্য ও পদ্য -রচনায় রামনারায়ণের বেশ হাত ছিল। যদিও তার মধ্যে নাটকোচিত প্রাণশক্তি ততটা ছিল না। রামনারায়ণের কথোপকথন সুলিখিত কিন্তু নির্জীব, মাইকেলের ভাষায় "d—d cold prose!"

রামনারায়ণের প্রহসনগুলির মধ্যে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'ই শ্রেষ্ঠ। এটির থেকে গদ্য ও পদ্য রসিকতার একটু ক'রে নমুনা দিলেই পাঠক তাঁর কৌতুকের ধরণটির পরিচয় পাবেন।

ঘটক অনৃতাচার্য গ্রহাচার্যের কাছে কুলীনকন্যাগণের বিবাহের জন্য একটি বিয়ের দিন দেখাচ্ছে।

"অনৃতাচার্য। একটী বিবাহের উত্তম দিন দেখে দাও।

গ্রহাচার্য। (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহাশয়! ২৯শে বৈশাখ উত্তম দিন আছে।

অনৃ। (স্বগত) এ কি বিপদ হইল, কুলীন কন্যার বিবাহ তাহার আবার দিন? বিলম্ব হইলে বরের গুণ সকল প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে বিবাহ হওয়া দুষ্কর, অথবা অন্য ঘটক আসিলে, ঘটকালি বিদায়ের সঙ্কোচ হইবে। অতএব কপটতা প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহাচার্যকে

প্রতারিত করি। (প্রকাশে) কি হে গ্রহাচার্য্য! কি বলিতেছ? ২৯শে বৈশাখ কবে?

গ্রহা। এই বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস।

অনৃ। সব অশুদ্ধ। এ বৎসরে সংক্রান্তিই নাই; কেবল পৌষ মাসে এক পিষ্টক সংক্রান্তি আছে, এতাবন্মাত্র; আর শ্রীরামপুরের পঞ্জিকামতে ভাদ্রে অরন্ধন সংক্রান্তির সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য সংক্রান্তি ত দেখিতে পাই না। তুমি সংক্রান্তি আবার কোথা পাইলে? সে দিনে কি আপনিই সংক্রান্তি হইবে?

গ্রহা। মহাশয়, আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন?

অনৃ। না না, তুমি কি উপহাসের যোগ্য পাত্র। ভাল, যাহা কহিয়াছ, বিস্মৃতিক্রমেই হইয়া থাকিবে। ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। বল দেখি আজ কি বার?

গ্রহা। অদ্য শনিবার।

অনৃ। (ঈষৎ ক্রোধে) আঃ শনিবার ত সকলি জানে, শনিবার কতক্ষণ আছে?

গ্রহা। এ কি, ভাল লোকের নিকটে আসিয়াছি। শনিবার আবার কতক্ষণ থাকে?

অনৃ। দূর বেটা, গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড, পাঁজি দেখতে জানিস না? অদ্য শনিবার ৯ দণ্ড ২৬ পল ছিল, পরে মঙ্গলবার হইয়াছে।

গ্রহা। আপনি কি অনবধানতায় কহিতেছেন?

অনৃ। (সক্রোধে) কি বেটা, আমার অনবধানতা? আমি সর্ব্বশাস্ত্র এককালে উদ্‌যাপন করিয়াছি। শাস্ত্রে কহে, 'শনি মঙ্গলবার, দিনে দিনে সার' দেখ দেখি, শনি মঙ্গলবারের যোগ আছে কিনা?"

(দ্বিতীয় অংক)

এ রসিকতা আজকাল আমাদের কাছে খুব উঁচুদরের না মনে হতে পারে, কিন্তু তখনকার দিনে যে জাতীয় অশ্লীল বা রুচিবিহীন ভাঁড়ামি ও ছ্যাবলামি দ্বারা লোক হাসাবার চেষ্টা করা হোত, সে তুলনায় এ-হাস্যরস যে খুবই পরিচ্ছন্ন, একথা স্বীকার করতে হবে।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' কুলীন কন্যার বিবাহবিষয়ক নাটক। বিবাহ থাকলেই খাওয়া থাকবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। অতএব এ গ্রন্থে রামনারায়ণ ত্রিপদী-ছন্দে উত্তম, মধ্যম ও অধম ফলারের বর্ণনা দিতে ভোলেন নি। তাঁর হাস্যরসের দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে সেটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু' চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাক ভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুঁতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরী ভরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাথে
উত্তম ফলার তারে কই॥
সরু চিঁড়ে শুকো দই, মর্তমান ফাকা দই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে বৈদিক ব্রাহ্মণ কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥
গুমো চিঁড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই,
পেটভরা যদি নাহি হয়।
রোদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তারে কয়॥"

'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'কে 'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ নাটক' বলে গণ্য করবার মত কি যুক্তি আছে জানিনা। তবে, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয় অবলম্বন করে বাঙালীর পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশে কিছুটা নাটকীয়তা সৃষ্টি করবার কৃতিত্ব অবশ্য রামনারায়ণেরই প্রাপ্য। চরিত্রানুযায়ী

ভাষা সৃষ্টি দ্বারা নাটকের কথোপকথন অংশকে বাস্তবানুগ ক'রে তোলার চেষ্টাও সর্বপ্রথম রামনারায়ণই করেন। কিন্তু, যে কথা পূর্বে বলেছি, তাঁর নাটকে প্লটের বাঁধুনি নেই, কাহিনীর গতি নেই, চরিত্রের বিকাশ নেই এবং কথোপকথনে ধার নেই বলে, সেগুলিকে যথার্থ নাটক বলে অভিহিত করা অসমীচীন। সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় রামনারায়ণের রুচিবোধ নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ছিল বলা যায় না, যদিও বর্তমান কালের পাঠকের কাছে তা কিছুটা স্থূল মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

সে-যুগের সাহিত্যের তথাকথিত রুচিবিকৃতি সম্বন্ধে এখানে দু'একটি কথা বলা দরকার। সেকালের সমাজজীবনের উচ্চস্তরেও এমন অনেক হালচাল, কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও কথাবার্তা প্রচলিত ছিল, যা অনুচিত জেনেও লোকে মেনে নিত, তার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পারিবারিক গুরুদণ্ড দিতে অগ্রসর হোত না। মদ্যপান ও বারাঙ্গনা-সাহচর্য দ্বারা কোনো ভদ্রলোক উচ্চ সমাজে অপাংক্তেয় হোত না, এবং শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজেও যে ভাষা উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা এ যুগে সম্পূর্ণই অসম্ভব। সে-যুগের ভাষার অশ্লীলতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সেকালের বাঙ্গালীদের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ ধর্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই 'বদ্‌জোবান' আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগপ্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্মাত্মা এবং অধর্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম।" সেকালের গদ্য এবং বিশেষ ক'রে নাটক প্রধানতঃ ব্যঙ্গাত্মক ও বাস্তবধর্মী ব'লে তার মধ্যে সমসাময়িক হালচাল-রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গে রুচিও প্রতিফলিত হবে, এ নিতান্ত স্বাভাবিক। বিশেষ ক'রে নাটকে জীবন্তচরিত্র সৃষ্টির জন্য কালোপযোগী এবং চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার না করলেই নয়। প্রথম যুগের নাট্যকারদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র তাঁদের প্রহসনগুলিতে কালোচিত চরিত্র এবং চরিত্রোচিত ভাষার যথাযথ ব্যবহার করেছিলেন বলেই তাঁরা সে-যুগের সার্থকতম নাট্যকার। রামনারায়ণের কৃতিত্ব এ বিষয়ে এঁদের সঙ্গে কোনোমতেই তুলনীয় নয়।

কিন্তু 'কুলীনকুলসর্বস্ব' এঁদের রচনার পূর্ববর্তী ব'লে এর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর। রামনারায়ণের অন্যান্য প্রহসনে 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র মত হাস্যরস ফোটে নি। কি নাটক হিসাবে, কি হাস্যরসের বিচারে, সেগুলি 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অপেক্ষা দুর্বল।

সেই নক্‌শা-প্রহসনের যুগে রামনারায়ণের সাফল্যে প্রলুব্ধ হয়ে একদল অক্ষম সাহিত্যযশঃপ্রার্থী প্রহসন রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-প্রহসনগুলি, কি রচনার দিক থেকে, কি হাস্যরসের দিক থেকে, আলোচনার অযোগ্য। এ সব প্রহসনের বিষয় ছিল বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়। কিন্তু এগুলিতে হাস্যোৎপাদনের চেষ্টা যেটুকু আছে, তা প্রায় সবই, হয় অশ্লীলতার অবতারণা, নতুবা রামনারায়ণের অনুকরণ দ্বারা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' প্রথম ভাগ (১৮৫৮)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-নাটকখানিরও বিষয় কুলীনসমাজের বহুবিবাহপ্রথার কুফল। নাটকটি উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে রচিত হয়েছিল। হাস্যরস উৎপাদনের চেষ্টায় গ্রন্থকার রামনারায়ণের কাছে কতখানি ঋণী, নিচের উদ্ধৃতিতে তা পরিস্ফুট হবে।

"সর্বনাথ। (সূর্যকান্তকে সম্বোধন করিয়া)। গণক মহাশয়! আজ মাসের কওঁই?

সূর্যকান্ত। (বিলক্ষণ করিয়া পঞ্জিকা দেখিয়া)। আজ প্রথম পাঁচদণ্ড ফাল্গুন মাসের ১৫ই, ছিল; পরে এই কতক্ষণ হইল ১৭ই পড়িয়াছে। (পুনর্ব্বার ভালরূপে পঞ্জিকা দেখিয়া)। হাঁ হাঁ এই যে বটে বটে! "বাণ বিদ্ধি বহ্নি ক্ষয়" আবার আজই ত্র্যহস্পর্শ, ১৭ই, ক্ষয় হইয়া ২৬শে, পড়িবে, বটে বটে, বটে তো, তবেই আজ মাসদগ্ধা হইল, অন্য কোন কর্ম্মই করিতে নাই। বিশেষতঃ আদ্য চ্ছাদ্দটা নিতান্তই নিষুদ্ধ।"

এ-রসিকতা 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র রসিকতার প্রতিধ্বনি, এবং উভয়ই ঈশ্বরগুপ্তের 'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে' গানটির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে আর একখানি নাটকের উল্লেখ ক'রে আমরা নাট্যাকারে

গ্রথিত এই আবর্জনাসমূহের আলোচনা শেষ করতে পারি। "সহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দে চতুর্ধুরীণ মহাশয়ের কৌতুহলার্থ" নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি বিরচিত 'কলিকৌতুক' নামে নাটকখানিতে যেটুকু হাসি জমাবার চেষ্টা আছে, তা এরূপ অশ্লীল যে দে চতুর্ধুরীণ মহাশয় সপারিষদ বসে সেটা কেমন ক'রে শ্রবণ করেছিলেন, তা আমাদের কাছে একান্ত বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হয়। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন অজস্র প্রহসন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' মন্তব্য করেছিলেন, "হাস্যরস বিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে।" এই সময়কার প্রহসনগুলি সম্বন্ধে এ উক্তি আরো বেশি প্রযোজ্য।

এরপর আমরা আধুনিক যুগের প্রথম নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মাইকেল মধুসূদন পুলিশ আদালতে দোভাষীর কাজ করার সময় তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাকের চেষ্টায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদে নিযুক্ত হন। এই নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে। এই অভিনয়-সূত্রে বাংলা নাটকের দুরবস্থা দেখে মধুসূদন নাটক রচনা করবার সঙ্কল্প করেন, এবং নাটক রচনার মধ্য দিয়েই বাংলার সাহিত্যাকাশে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এর পরবর্তী দু' বছর ১৮৬০-৬১ সালে মধুসূদনের সাহিত্য-প্রেরণা অজস্র রচনায় উৎসারিত হয়েছিল। ১৮৬০ সালে তাঁর দু'খানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী নাটক', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' এবং 'মেঘনাদবধে'র একাংশ রচিত হয়। পরবর্তী বৎসর, ১৮৬১ সালে, মধুসূদন 'মেঘনাদবধে'র অবশিষ্টাংশ, 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লেখেন। অমিত্রাক্ষরের জন্ম হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে।

মাইকেল মধুসূদনের হাস্যরসের নিদর্শন মাত্র তাঁর দু'খানি প্রহসনে সীমাবদ্ধ। এই প্রহসন দু'টি পড়লে মাইকেলের হাস্যরসবোধের তীক্ষ্নতা এবং

হাস্যরসোৎপাদনে তাঁর দক্ষতা উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য, মধুসূদনের প্রহসন দু'টি তীব্র বিদ্রূপাত্মক। সে যুগের গ্লানিময় সামাজিক পরিবেশে বিদ্রূপময় হাস্যের উদ্ভবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। তা ছাড়া মাইকেল চিরদিনই স্পষ্টবক্তা (তুলনীয় — 'চাঁড়ালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে') তাই তিনি বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা প্রচ্ছন্ন করতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি।

এ প্রহসন দু'টি লেখার পর মধুসূদন প্রহসন রচনায় বিরত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যে-কালে হাস্যরসাত্মক রচনার প্রাচুর্য এবং গভীর রসাত্মক রচনার নিদারুণ অভাব ছিল, সে-সময়ে এইরূপ লঘু রচনা লেখার জন্য তিনি দুঃখই প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে প্রহসন লেখায় তাঁর যথেষ্টই উৎসাহ ছিল বটে ("The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours."— মধুসূদনের চিঠি), কিন্তু পরে একটি চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি লিখেছিলেন, "As a scribbler, I am of course proud to think that you like my Farces, but, to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the National taste, and therefore we ought not to have Farces."

বলা বাহুল্য, মাইকেলের বিশ্লেষণ যথার্থ। বাঙালীর জাতীয় রুচিকে ভাঁড়ামি ও ছ্যাবলামির মলিনতা থেকে, এবং বাংলা সাহিত্যকে নক্শা জাতীয় রচনার অগভীর ধারা থেকে মুক্ত করতে হলে ভাব-গভীর আদর্শ-প্রণোদিত সাহিত্য ও শিল্পের উজ্জীবন ছাড়া যে আর পথ ছিল না এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সেকালের নাট্যাকারে রচিত ভাঁড়ামি ও ছ্যাবলামি যে তিনি কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি, তার প্রমাণ শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি লিখেছিলেন,

"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

ভাবগভীর ও আদর্শ-প্রণোদিত সাহিত্য রচনায় মাইকেল মধুসূদনের কৃতিত্ব যে কত মহৎ এবং তাঁর প্রভাব কত দূরপ্রসারী তা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ, নাটক ও কাব্যের মধ্য দিয়ে মাইকেলই প্রথম বাংলা সাহিত্যে ভাব ও আদর্শের গভীরতা ও স্থৈর্য আনলেন, এবং তিনিই নবভাবানুযায়ী কাব্যের ভাষা ও ছন্দ, এবং নাটকের গঠনকৌশলের আদর্শ স্থাপন করলেন। মধুসূদন শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহৎ কবি নন, তিনিই প্রথম সার্থক নাট্যকার। আবার প্রথম যথার্থ প্রহসন রচনা করবার কৃতিত্বও তাঁরই।

এতকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ নাটক-প্রহসনে, মজার মজার কথা বলে কৌতুক করাই হাস্যরস উৎপাদনের একমাত্র পন্থা ব'লে ধরে নেওয়া হোত। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক থাকলে সে, নতুবা বিষ্কম্ভক-প্রহসনে নীচ চরিত্ররা কথোপকথন দ্বারা হাস্য উৎপন্ন করতো। আধুনিক কালের পূর্বে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী হাস্যরসাত্মক চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা হাস্যরস উৎপাদনের আর একটি পথ খুলে দেন। মুকুন্দরামের এ-কৃতিত্বের সুযোগ গ্রহণ করে এ-পথে মৌলিক সৃষ্টিতে অগ্রসর হবার মত প্রতিভা সমগ্র মধ্যযুগে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আগে আর আবির্ভূত হয় নি।

কিন্তু প্রকৃত হাস্যরস কেবলমাত্র কথোপকথন ও অঙ্গ-ভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে তা হয় ভাঁড়ামি, নতুবা উইট্-এ পর্যবসিত হয়। হাস্যরসের যে ব্যাপকতা, তা মানব জীবনের মত সাহিত্যেরও সর্বাংশে সঞ্চারিত হয় বলেই এ-রসের আবেদন এত বিস্তৃত ও গভীর। চরিত্র, পরিবেশ, ঘটনা, কথোপকথন, বর্ণনা, বাচনভঙ্গি, এবং সংসার ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে জাত বিবিধ প্রকার বৈষম্যই হাস্যরসের উপাদান হতে পারে, এবং উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসিক এ সবই যথাযথভাবে কাজে লাগান, তাঁর রসিকতা কেবলমাত্র কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না।

হাস্যরসের এই ব্যাপকতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপলব্ধি করেছিলেন, সেইজন্য 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রভৃতির মত তাঁর প্রহসনের হাস্যরস শুধুমাত্র সংলাপ-জাত রসিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নাটকে প্রকৃতপক্ষে ঘটনা-পরিবেশ বা situation এবং চারিত্রিক অসংগতিই হাস্যরস উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন মধুসূদনের এ-বোধ পূর্ণমাত্রায় ছিল।

তদুপরি নাট্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নাটকে ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ দেখানো হয়, এবং বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্নমুখী স্বার্থের সংঘাতে কথোপকথন জীবন্ত হয়। এই বিষয়ে মধুসূদন অবহিত ছিলেন বলেই, তাঁর নাটকে লোক-হাসানো ভাঁড়ামি-পূর্ণ কথোপকথন বেশি না থাকলেও, পরিবেশ এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে সংলাপ এমন নিখুঁত সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে যে তার ফল হয়েছে আরো বেশি হাস্যময়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন দু'খানিকে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যথার্থ নাটক বা প্রহসন বলে গণনা করা হয়। নাটক রচনায় যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন, সেই নিরপেক্ষ শিল্পদৃষ্টি ছিল বলেই তাঁর প্রহসনের চরিত্রগুলি এরূপ জীবন্ত। তাঁর নববাবু, বাবাজী, গৃহিণী, ভক্তপ্রসাদ, হানিফ, পুঁটি ও ফতেমা — এরা সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, কেউই টাইপ-চরিত্রে পর্যবসিত হয় নি। মাইকেলের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছিল ; তার ফলে গভীর রসাত্মক কাব্যের মত সমসাময়িক সমাজচিত্র অঙ্কনেও তিনি সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন।

মধুসূদন যে-সমাজ ও যে-মানুষগুলিকে তাঁর প্রহসন দু'টিতে ব্যঙ্গ করেছিলেন, সে-সমাজ ও সে-সব চরিত্র তাঁর চোখে দেখা। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে এদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা এর আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সে-দিক থেকে তাঁর বিষয় নির্বাচনে খুব একটা মৌলিকতা ছিল বলা যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রচনা-কৌশল তাঁর নাটকে যে বাস্তবতা এনে দিয়েছিল তা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যসাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ ছিল। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নববাবু, কর্তা, গৃহিণী, বোদে প্রভৃতি এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে ভক্তপ্রসাদ, হানিফ ও ফতেমা চরিত্র এরূপ বাস্তব ও জীবন্ত যে, মনে হয় যেন এদের আমরা চিনি। এইজন্যই রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্বন্ধে লিখেছিলেন, " 'ইয়ং বেঙ্গাল' অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোদ্ঘাটনই বর্ত্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে আমরা এই বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নব বাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।"

এই দুই প্রহসনে চরিত্রগুলি আরো বেশি প্রাণময় হয়ে উঠবার কারণ এই যে, প্রত্যেকটি চরিত্রের ভাষা ও বক্তব্য সেই চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত। যার মুখ থেকে যে-কথা যেমন ভাবে বেরুনো স্বাভাবিক মধুসূদনের প্রহসনে ঠিক সে-কথা সে তেমন ভাবেই বলেছে। এই বিষয়ে মাইকেলের অব্যবহিত পরে দীনবন্ধু মিত্র নাটক-প্রহসনে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তার মূলে মাইকেলের প্রভাব অনেকখানিই ছিল। 'নীলদর্পণে'র তোরাপ চরিত্রে যে হানিফের চরিত্রের যথেষ্ট ছায়া পড়েছে, এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় স্বল্পাঙ্কিত পুলিশ-সার্জেণ্টের চরিত্রটি পর্যন্ত মধুসূদনের রচনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

"সারজেণ্ট। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাকব্রুট্। ইয়েহ্ ব্যেগ্‌মে আওর কিয়া হেয় ডেকেগা। (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন)।

সার। দেট্‌স্ রাইট। ইউ স্থটি ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও — দোহাই ধর্ম্ম অবতার, আমি ও টাকা চাইনে। ...... আমি টাকা কড়ি কিছুই চাইনে; তুমি না হয় টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা। (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল দেন্, হাম ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় ডেও।"

তারপর বন্ধুদের আসরে নববাবু। যিনি এর আগে বাপের কাছে কেঁচো হয়ে ছিলেন, তিনি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় এসে মদ্য, স্ত্রীলোক ও ইয়ার বন্ধুর সংস্পর্শে কিরূপ বিষধর হয়ে উঠেছেন দেখুন।

"নব। দেখ ভাই, আজ আমাদের একসকিউজ কর্ত্তে হবে, আমার একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) হ্যাট্‌স এ লাই।

নব। হোয়াট, তুমি আমাকে লায়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এখনি শুট্ করবো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লীং! — ও আমাকে লাইয়র বল্‌লে — আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যেবাদী বল্‌লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু — লাইয়র — এ কি বরদাস্ত হয়?"

জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় নববাবুর বক্তৃতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-বক্তৃতার মধ্যে মধুসূদন তৎকালীন নব্য ইঙ্গবঙ্গ বাবুদের মনোভাব ও চিন্তাধারা পরিপূর্ণ রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন, অথচ স্থান কাল ও বক্তার সঙ্গে তা এমনই খাপ খেয়েছে যে, বক্তৃতা দ্বারা নাটকীয়তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

"নব। জেণ্টেলম্যান, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা — আমরা সকলে এর মেম্বর — আমরা এখানে মীট কর্‌্যে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি — এও উই আর জলি গুড্ ফেলোজ্।

সকলে। হিয়ার্, হিয়ার্, উই আর জলি গুড্ ফেলোজ্।

নব। জেণ্টলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এ দেশের সোসীয়াল রিফরমেসন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার, হিয়ার।"

এই নাটকখানিতে মধুসূদনের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক নাট্যকারোচিত দৃষ্টির পরিচয় জাজ্বল্যমান্। মধুসূদন নিজে নব্য ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এই নাটকে একটি নিরপেক্ষ শিল্পদৃষ্টি (detachment) রক্ষা করতে পেরেছিলেন, নাটকের বিষয় বা চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেকে কোথাও জড়িয়ে ফেলেননি। এ-নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনায় রুষ্ট ও ভীত হয়ে তৎকালীন ইঙ্গবঙ্গ সমাজ যেন তেন প্রকারেণ বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয়

বন্ধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় মধুসূদনের চিত্রটি কিরূপ যথাযথ ও নিখুঁত হয়েছিল।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটি, সব দিক বিচার ক'রে, আরো সুরচিত মনে হয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় চরিত্রগুলি নিখুঁত বটে, কিন্তু তা যেন কেবল রেখায় আঁকা কয়েকটি অসম্পূর্ণ ছবি। কোনো চরিত্রই আমরা বেশিক্ষণ দেখিনা, অনেকবার দেখিনা। কিন্তু 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে আমরা চরিত্রগুলিকে ভালো করে সম্পূর্ণ ক'রে খুঁটিয়ে দেখবার অবকাশ পাই। তা ছাড়া 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যে সমাজ ও মানুষগুলিকে দেখি, তা মধুসূদনের অতি-পরিচিত ছিল। কিন্তু হানিফ গাজী ও ভক্তপ্রসাদ, ফতেমা ও পুঁটি চরিত্র তাঁর নিজ সমাজের গণ্ডির বহির্ভূত হলেও তা প্রায় নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন মাইকেলের এ প্রহসনখানির প্রশংসা করেন নি, যদিও তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সুখ্যাতিতে কার্পণ্য করেন নি। বলা বাহুল্য, এটা কিছুই আশ্চর্য নয় ; কারণ এই দু'খানি নাটক লিখে মধুসূদন একখানির দ্বারা নব্যপন্থীদের এবং অপরখানি দ্বারা প্রাচীনপন্থীদের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন।

ভক্তপ্রসাদ অত্যাচারী ও কৃপণ জমিদার, আবার যৎপরোনাস্তি লম্পট। বিশ্বাসী ভৃত্য গদাধর তাঁর লাম্পট্যের প্রধান সহায়, দ্বিতীয় সহায় গদাধরের পিসী কুট্টনী পুঁটি। ভক্তপ্রসাদ এরূপ লম্পট যে, একদিকে সে গরিব প্রজা হানিফের সুন্দরী স্ত্রী ফতেমাকে 'ঠিকঠাক' করতে চর পাঠাচ্ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই পীতাম্বর তেলীর মেয়ে পৌত্রীস্থানীয়া পঞ্চীকে দেখে তাকে সংগ্রহ করবার জন্য 'এতে যত টাকা লাগে আমি দেব' বলে কুট্টনী পাঠাবার আয়োজন করেছে। সে পরমভক্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, দিবারাত্রি মালা জপ করে। তাই মুসলমান মেয়ের সংস্পর্শ সম্বন্ধে একটু দ্বিধাও আছে।—

"ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক — তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে ;— বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ?"

হানিফের চরিত্রটি অতি সুচিত্রিত। ভক্তপ্রসাদের প্রতি তার ব্যবহার, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ভক্তপ্রসাদকে বাগে পেয়েও যে সে এক মুষ্ট্যাঘাত ক'রেই ছেড়ে দিল, একজন বিশিষ্ট সমালোচকের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। কিন্তু প্রথমে কর্তার এই কুৎসিৎ মতলব জানতে পেরে হানিফের যতটা রাগ হয়েছিল, ততটা রাগ পরে আর থাকবার কথা নয়। বিশেষতঃ, ভক্তপ্রসাদ তার মতলব হাসিল করতে পারেনি, উল্টে যৎপরোনাস্তি নাকাল হয়েছে। তা ছাড়া, তখনকার গরিব মুসলমান প্রজা, মুখে যাই বলুক, জমিদারের সম্বন্ধে তার খুব একটা সমীহ আছেই। এক্ষেত্রে, হানিফের একটি মুষ্ট্যাঘাত-প্রয়োগ অসংগত মনে হয় না। অবশ্য এরপর বাক্যবাণে ভক্তপ্রসাদকে জর্জরিত করতে হানিফ-দম্পতি ত্রুটি করেনি।

"হানি। ... আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে?

ভক্ত। সর্বনাশ! — বলিস্ কি হানিফ? ও বাচ্‌পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম।...

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?— নাড়্যের মেয়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু? — এই মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম,

আরো কি কি হচ্ছেলাম ; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।"

দুঃখের কথা, বিষয়টিই নাটকখানিকে কিছুটা অপাংক্তেয় করেছে, এবং এর কথোপকথনের বাস্তবতা এটির প্রতি আধুনিক রুচিসম্পন্ন সমাজের ঔদাসীন্য আরো বেশি বাড়িয়ে তুলেছে।

রুচির দিক থেকে বিচার করলে, মাইকেলের প্রহসনগুলি সমসাময়িক অন্যান্য নাটকের চেয়ে নিম্নস্তরের নয়। বরং রামনারায়ণ তর্করত্ন বা দীনবন্ধু মিত্র স্থানে স্থানে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, মাইকেল ততদূর রুচিহীন ভাষা ব্যবহার করেন নি। তবু, লাম্পট্যের নগ্নচিত্র আমাদের আধুনিক রুচিতে বাধে। রামনারায়ণও তাঁর দু'খানি প্রহসনে লম্পট-চরিত্র এঁকেছেন। সাহিত্যের বিষয়-নির্বাচনে এ-জাতীয় রুচিবিকৃতি আগে থেকেই চলে এসেছে এবং সেকালের পাঠক সমাজ তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। নতুবা 'নববিবিবিলাসে'র মত অশ্লীল বইয়ের তিনটি সংস্করণ হওয়া সম্ভব হোত না। বিদ্রূপাত্মক রচনায় এ-জাতীয় বিষয়ের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সেকালকার সমাজের নৈতিক হীনতার ফলে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ভিক্টোরীয় যুগের প্রভাব, বিদ্যাসাগর প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকগণের চেষ্টা, ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার-আন্দোলন এবং সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের কঠোর নীতিনিষ্ঠা ও নৈতিক শাসনের ফলেই বাংলা সাহিত্য থেকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও নিম্নরুচি দূর হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনায় অসাধারণ কৃতী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে আলোচনা করেছেন, তা এমনই সুন্দর ও যথার্থ যে তার দ্বারা দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিভা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বরগুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত, এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত — সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা, প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন

মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসংগত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণ-মাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।" দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এ-উক্তি বঙ্কিমোচিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তিরই নিদর্শন। তবু এ সম্বন্ধে আরো দু'একটি কথা বলা দরকার।

দীনবন্ধুর বাস্তবতাবোধ এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সকল ঘটনা, চরিত্র, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি সর্বাঙ্গসুন্দর বল্লে অত্যুক্তি হয় না। নাটকের একটি প্রধান গুণ এই যে তা দর্শকের কাছে সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। সাময়িকভাবে দর্শক সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান যে তাঁর দৃষ্ট ঘটনা ও চরিত্রগুলি বাস্তবিক পক্ষে কাল্পনিক ও নটনটী দ্বারা অভিনীত। তাই নাটকের চরিত্র-গুলির সুখে-দুঃখে, হরিষে-বিষাদে, এবং সদসৎ কার্যকলাপে দর্শকের মন প্রচণ্ড ভাবে আলোড়িত হয়। তীক্ষ্ণ বাস্তবতা-বোধ এবং গভীর আদর্শচেতনা এই দুইয়ের সমন্বয়েই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ নাটকের সৃষ্টি হয়। সেক্সপীয়রের নাটক-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ কথার যাথার্থ্য পরিস্ফুট হবে। মানবচরিত্র সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের অন্তর্দৃষ্টি যে কত গভীর ছিল, কিরূপ চরিত্র কি অবস্থায় কেমন আচরণ করা স্বাভাবিক এ সম্বন্ধে সেক্সপীয়র প্রমুখ মহৎ নাট্যকারগণের জ্ঞান কত নিখুঁত, সে-বিষয়ের আলোচনা বাহুল্য মাত্র। শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারদের নাটকে ঘটনা যেরূপ কার্যকারণসঙ্গত, চরিত্রগুলিও তেমনি দোষে গুণে বাস্তবানুগ। অতএব, মানবচরিত্রে গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে সার্থক নাট্যকার হওয়া যায় না। দীনবন্ধু মিত্রের এ-গুণ পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর আঁকা নিমচাঁদ, নদেরচাঁদ, জগদম্বা প্রভৃতি চরিত্র যেরূপ সম্পূর্ণ অসংগতি-শূন্য, বাংলা সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি — বিশেষতঃ নাটকে — আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের নাটক-রচনায় আর একটি গুণ এই যে, বাস্তবানুযায়ী ঘটনাক্রম ও চারিত্রিক বিবর্তনের সঙ্গে একটি মহৎ আদর্শ প্রণোদিত শিল্পদৃষ্টি নাটকের পরিণতিকে কোনো এক মহৎ বাণী বা আদর্শের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বস্তুতঃ, বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে আদর্শনিষ্ঠা সম্পূর্ণ সুসংগতিই নাটককে মহত্তম সার্থকতায় মণ্ডিত করে। Reality যখন higher realityতে পৌছয়, তখনই শ্রেষ্ঠ নাটকের সৃষ্টি হয়। কালিদাসে

নাটকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, সেক্সপীয়র প্রমুখ নাট্যকারগণের রচনাতেও এ সত্যের সমর্থন মেলে। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপ যতখানি বাস্তব-জীবনের দর্পণ-স্বরূপ, ততখানিই জীবন্ত ও ত্রুটিহীন, কিন্তু যখনি তিনি কাল্পনিক আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন, তখনি তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ দীনবন্ধু যে-যুগে জন্মেছিলেন, সেই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা-প্রণোদিত আদর্শবাদের যুগে তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দীনবন্ধুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় বাস্তববাদী ; বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর স্বভাবজ ছিল। যুগ-প্রভাবে তাঁকে আদর্শবাদ গ্রহণ করিতে হয়েছিল। শিল্প-প্রেরণার মূলে এই অন্তর্বিরোধ তাঁর সৃষ্টিকে অসম্পূর্ণ করেছে। তিনি বাংলায় নিখুঁত নাটক লিখেছেন, কিন্তু মহৎ নাটক লিখতে পারেন নি। তিনি ছিলেন নাট্যশিল্পের অদ্বিতীয় শিল্পী, কিন্তু সূক্ষ্ম ও গভীর রসসৃষ্টি তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই কারণে প্রহসনগুলিতেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সধবার একাদশী' কেবল দীনবন্ধুর রচনার মধ্যে নয়, আজও বাংলা নাট্য-শিল্পে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

দীনবন্ধু মিত্র সবসুদ্ধ আটটি নাটক লিখেছিলেন। এর মধ্যে 'নীলদর্পণ' 'নবীন তপস্বিনী' 'লীলাবতী' ও 'কমলে কামিনী' গম্ভীররসাত্মক নাটক এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' এবং 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' প্রহসন। আপাত দৃষ্টিতে প্রহসন চারটিই আমাদের আলো-চনার বিষয়ীভূত ব'লে মনে হলেও, তাঁর অন্য নাটকগুলিতেও প্রচুর হাস্যরস ছড়ানো আছে। প্রকৃতপক্ষে, হাস্যরসাশ্রিত চরিত্র এবং সংলাপের জন্যই সেগুলি পাঠযোগ্য এবং অভিনয়যোগ্য। অবশ্য 'নীলদর্পণ' নাটকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। সে-কারণে নাটক হিসাবে উঁচুদরের না হলেও, এর অন্তর্গত নীলকরের অত্যাচারের চিত্রটি এমনই বাস্তব ও যথাযথ যে এর 'দর্পণ' নাম যেমন সার্থক, এর উদ্দেশ্য সাধনেও এটি তেমনি সফল হয়েছিল। তা ছাড়া, সমগ্র নাটক হিসাবে এ নাটকটির মূল্য যাই হোক না কেন, এই প্রথম প্রকাশিত নাটকেই দীনবন্ধুর বাস্তবদৃষ্টি ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ; এবং মানবচরিত্রে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং

ব্যাপক মানব-সহানুভূতির পরিচয়ও এই নাটকেই পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়েছিল। নতুবা তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী, রোগ সাহেব প্রভৃতির মত চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব হোত না।

চাকরির খাতিরে বাংলাদেশের বহু জায়গা দীনবন্ধুকে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। বিশেষ ক'রে উড়িষ্যা, ঢাকা, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে তাঁকে অনেকদিন ক'রে থাকতে হয়েছিল। ফলে, বিবিধ ভাষায় তাঁর এরূপ দখল জন্মেছিল যে নাটক-প্রহসনে এ-সব স্থানীয় ভাষা তিনি নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। নানা জায়গায় ঘুরে বহু প্রকার মানুষও তিনি দেখেছিলেন অনেক, এবং তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ফোটোগ্রাফারের মত তাঁর মনের মধ্যে তাদের নিখুঁত ছবিগুলি তুলে রাখতে পেরেছিলেন। তাই দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে এত বহুবিধ জীবন্ত চরিত্রের সমাবেশ দেখতে পাই।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় প্রকাশিত নাটক 'নবীন-তপস্বিনা' প্রহসন না হলেও হাস্যরসের প্রাচুর্য হেতু আমাদের আলোচ্য। 'নবীন-তপস্বিনী'র মূল কাহিনীটি এই নাটক রচনার দশ বছর আগে 'বিজয়-কামিনী' নামে উপাখ্যান-কাব্যরূপে লিখে দীনবন্ধু 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।" যদিও এ নাটকের নায়ক-নায়িকা ছদ্মবেশিনী তপস্বিনীর পুত্র বিজয় এবং সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা কামিনী, তবু জলধর-জগদম্বাই এ-নাটকের প্রধান চরিত্র। এবং জলধর-জগদম্বার কাহিনী যেহেতু হাস্যরসের প্রস্রবণ, সেহেতু এই বইটিও আমাদের আলোচ্য। 'নীলদর্পণ' ভিন্ন দীনবন্ধুর সকল নাটকেই প্রচুর হাস্যরস আছে, এবং নাটক হিসাবে তাদের মূল্য যাই হোক, সেগুলি হাস্যরসিক দীনবন্ধুর প্রতিভার পরিচয় দেয়।

'নবীন-তপস্বিনী'র কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের উপাদান বাস্তব, কল্পনা ও সেক্সপীয়রের ছায়ায় মেশানো। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "নবীন-তপস্বিনীর বড়রাণী ছোটরাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। ··· প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোসগল্প' হইতে সারদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন

তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত প্রকৃত। হোঁদল কুঁতকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; 'জলধর' 'জগদম্বা' *Merry Wives of Windsor* হইতে নীত।"

'নবীন-তপস্বিনী' নাটকটিতে দীনবন্ধুর শক্তি ও দুর্বলতা, দুইই প্রকাশ পেয়েছে। মনে রাখতে হবে দীনবন্ধু মাইকেল মধুসূদনের মত বাংলাদেশের অন্যতম আদি নাট্যকার। তখনও নাটকের ভাষা নির্দিষ্ট হয়নি এবং যথোচিত রূপ নেয়নি। রামনারায়ণ প্রমুখ পূর্ববর্তী নাট্যকারেরা সংলাপে সাধুভাষাই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র ব্যঙ্গাত্মক, হাস্যরসাত্মক বা নীচ চরিত্রের মুখে চল্‌তি বা স্থানীয় কথ্যভাষাই ব্যবহার করেছেন, রুচি-বিগর্হিত নীচ-নাগরিক ভাষা (Slang) ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হননি। এ-বিষয় তাঁর সহজাত বস্তুনিষ্ঠাই তাঁকে অনুপ্রেরিত করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু উচ্চ, আদর্শবাদী, কাল্পনিক চরিত্রের মুখে তিনি সে ভাষা বসাতে সাহস করেন নি। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃত নাটক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সংস্কৃত নাটকে উচ্চ-চরিত্র নীচ-চরিত্র এবং পুরুষ ও নারীর ভাষায় অনেক প্রভেদ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দীনবন্ধু সেই প্রভেদ রক্ষা ক'রে চলেছেন ব'লে তাঁর উচ্চ চরিত্রগুলির ভাষা আড়ষ্ট। নাটকে এই ত্রুটি অতি গুরুতর, কেননা সংলাপের মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলি ফুটে ওঠে, সংলাপ যথাযথ না হলে চরিত্র আড়ষ্ট ও নির্জীব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যে-সব চরিত্রের মুখে দীনবন্ধু যথাযথ ভাষা ব্যবহার করেছেন, সে-গুলি যে বাংলা নাট্যসাহিত্যে আজও শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য, এতেই প্রমাণ হয় যে চরিত্রসৃষ্টির সকল উপাদানই তাঁর আয়ত্তে ছিল। কেবল উচ্চ ও নীচ চরিত্রের মুখে ভিন্নজাতীয় ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর কিছুটা সংস্কার থাকাতে, কোথাও কোথাও তাঁর চরিত্রগুলি আড়ষ্ট মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন, "তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামী আর নিমচাঁদের মাতলামীর মত থাকে না।" ভাষা ব্যবহারের ত্রুটির জন্যই 'নবীন-তপস্বিনী' নাটকে বিজয় ও কামিনীর চরিত্র দীনবন্ধু যেমন চেয়েছিলেন সেরূপ আকর্ষণীয় হয়ে

ওঠে নি, 'লীলাবতী' নাটকে সেই কারণেই ললিতমোহন ও লীলাবতীর চরিত্র নিষ্প্রাণ মনে হয়।

নাট্যরচনায় দীনবন্ধুর অপর ত্রুটি, উচ্চাদর্শ স্থাপনের চেষ্টা ও আদর্শচরিত্র অঙ্কনের প্রয়াস তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণে বাধা জন্মিয়েছে। 'নবীন তপস্বিনী'তে রাজা রমণীমোহন ও বিজয় বড় বড় আদর্শের কথা বলে, তাই তারা আড়ষ্ট, নিষ্প্রাণ। দীনবন্ধু কেবল হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র ও পরিবেশই সৃষ্টি করতে পারতেন, অন্য জাতীয় চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল না, এরূপ একটা মত প্রচলিত আছে। কিন্তু একথা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। 'নবীন-তপস্বিনী'তে বিদ্যাভূষণ চরিত্র হাস্যরসাত্মক না হয়েও অস্বাভাবিক নয়; 'নীলদর্পণে' তোরাপ চরিত্র ব্যঙ্গাত্মক না হয়েও জীবন্ত ও নিখুঁত; আদুরী ও ক্ষেত্রমণি চরিত্র সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। আসলে দীনবন্ধু ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যিক। দোষে গুণে রক্তমাংসে গড়া যে মানুষগুলি তিনি দেখেছিলেন, নির্ভুল রেখায় তাদের তিনি এঁকে রেখেছেন; উচ্চ আদর্শে মূর্তিমান, কাল্পনিক যে মানুষ তিনি দেখেন নি, সে মানুষ তিনি আঁকতেও পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে, দীনবন্ধুর কল্পনা শক্তি ছিল না। তাঁর সকল রচনার মূলে ছিল "(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি।" দীনবন্ধুর 'স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি' তাঁকে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক এবং তাঁর 'সামাজিক অভিজ্ঞতা' তাঁকে সার্থক নাট্যকার করেছে। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনে তাই জীবন্ত মানুষের স্বাভাবিক কার্যকলাপ দর্শকের কাছে সত্যবৎ প্রাণময় হয়ে ওঠে।

'নবীন-তপস্বিনী'তে জলধর-জগদম্বা-মল্লিকা-মালতীর কাহিনীই প্রধান। মল্লিকা-মালতীর হাতে মালতীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী রাজমন্ত্রী জলধরের নাকাল পুরো-পুরি হাস্যরসাত্মক আখ্যান, এবং এটিই 'নবীন-তপস্বিনী'র শ্রেষ্ঠাংশ। এটি *Merry Wives of Windsor* থেকে নেওয়া, কিন্তু দীনবন্ধু এর সঙ্গে "হোঁদলকুৎকুৎ"-এর প্রাচীন কাহিনীটি সংযুক্ত করেছেন। একজন সমা-লোচকের মতে জলধর-এর কাহিনী দীনবন্ধু নিয়েছিলেন টেকচাঁদের 'মদ-খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়'-এর অন্তর্গত আগড়ভমের কাহিনী

থেকে। কিন্তু এ-অনুমান আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের মত দীনবন্ধুও ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন। সেক্সপীয়রের অবিস্মরণীয় ফলস্টাফ চরিত্র থেকে উভয় লেখকই উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, এরূপ অনুমান করাই স্বাভাবিক। টেকচাঁদ আগড়ভমের মধ্য দিয়ে "পক্ষীর দল"কে বিদ্রূপ করার সুযোগ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু জলধর-কাহিনীর সঙ্গে লোক-প্রচলিত হোঁদলকুৎকুতের গল্পটি সংযুক্ত ক'রে লাম্পট্যের শাস্তি দেখিয়েছিলেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও আগড়ভম ও জলধর এক জাতীয় নয়। আগড়ভম গাঁজা-গুলিখোর নীচ চরিত্র, জলধর সম্ভ্রান্ত রাজমন্ত্রী। দীনবন্ধু তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র হিসাবে সেক্সপীয়রের চরিত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক, টেকচাঁদের মধ্যস্থতায় তাকে গ্রহণ করবার কোনো প্রয়োজন দীনবন্ধুর ছিল না।

এই সমালোচক দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'ও টেকচাঁদের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। অবশ্য পূর্ববর্তী লেখকের কিছু প্রভাব পরবর্তী লেখকের উপর পড়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু 'নীলদর্পণ' রচনার প্রেরণা দীনবন্ধু টেকচাঁদের থেকে পেয়েছিলেন, এমন মনে হয় না। বরং বঙ্কিমচন্দ্র যে-কথা বলেছেন সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়, "উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীল বিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে 'নীল-দর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।" বাস্তবিকই, দীনবন্ধু মিত্র, যাঁর কল্পনাশক্তি দুর্বল এবং বাস্তব দৃষ্টি প্রখর ছিল, নিজের চোখে না দেখলে, নীলকরদের অত্যাচারের ঐরূপ হৃদয়গ্রাহী সত্যবৎ চিত্র আঁকতে পারতেন কি না সন্দেহ।

'নবীন তপস্বিনী' নাটকের মূল কাহিনীর চরিত্র সংখ্যা অল্প, অন্তর্বর্তী প্রহসনের পাত্রপাত্রীর সংখ্যাই বেশি। এবং নাটকটির অধিকাংশ অধিকার ক'রে আছে হাস্যরসাত্মক ঘটনাবলী, যার পরিণতি হোঁদলকুৎকুৎ সাজিয়ে জলধরের নাকাল। কিন্তু জলধর ও আগড়ভমের চরিত্রের পার্থক্য এই যে, জলধর যতটা উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসাত্মক চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে, আগড়ভম

ততটা পারে নি। এর কারণ দীনবন্ধুর তীব্র মানবসহানুভূতি। তিনি জলধর চরিত্রটিকে নানাভাবে হাস্যাস্পদ করলেও নিজের সহানুভূতি থেকে তাকে বঞ্চিত করেন নি। তাই জন পামার ফলস্টাফ্ চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, জলধরের চরিত্র সম্বন্ধেও সেকথা প্রযোজ্য। আমরা জলধরের সঙ্গে সঙ্গেই হাসি, আমাদের সহানুভূতি থেকে কখনোই সে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় না। দীনবন্ধুর সকল হাস্যরসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতেই এ গুণ লক্ষ্য করা যায়। যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা হাসাহাসি করুন, দীনবন্ধু তাঁর সৃষ্ট ব্যঙ্গের পাত্রকে তাঁর সর্বব্যাপী সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেন নি। রোগ সাহেব, উড্ সাহেব এর ব্যতিক্রম, কিন্তু এরা হাস্যরসাত্মক চরিত্র নয়। তাই নানাজাতীয় চরিত্রকে ব্যঙ্গ করলেও দীনবন্ধুর এ-ব্যঙ্গ গভীর সমবেদনা প্রসূত বলে তা উচ্চস্তরের হাস্যরসই সৃষ্টি করে। এই কারণেই দীনবন্ধুকে আমরা খাঁটি এবং শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক বলে গণনা করতে পারি, কিন্তু তাঁকে satirist বলতে পারি না।

দীনবন্ধুর তৃতীয় নাটক এবং প্রথম প্রহসন 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। সেই বছরই, এর আগে, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নামে তাঁর আর একখানি প্রহসন প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সধবার একাদশী বিয়ে পাগলা বুড়োর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা তৎপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।" 'সধবার একাদশী' প্রথম প্রহসন হলেও এর আগেই 'নবীন তপস্বিনী' লিখে দীনবন্ধু নাটকীয় হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অনেক বিশিষ্ট সমালোচক ও অভিনেতাই 'সধবার একাদশী'কে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে গণ্য করেছেন।* বাস্তবিকই, কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি সংলাপে, কি হাস্যে, কি বেদনায়, এরূপ একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক বাংলায় আর খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। এটি যে কেবল সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট তাই নয়, নাটকোচিত সকল গুণের সমাবেশে মঞ্চেও এটি সর্বাপেক্ষা সার্থক হয়েছে।

'সধবার একাদশী'র প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমচাঁদ দত্ত। একে ঘিরে আর যত চরিত্র এবং যত ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে, সবই যেন এই চরিত্রটির দোষ-

* স্বর্গীয় শিশিরকুমার ভাদুড়িও এই মত পোষণ করতেন।

গুণ, কমিক ও ট্র্যাজিক দু'টি দিক ভালো ক'রে দেখাবার জন্য। নিমচাঁদের পাশাপাশি যে-ক'টি মাতাল চরিত্র আছে, তার মধ্যে অটলবিহারী নিমে দত্তর মতই মদ্যপ, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি লম্পট ও দুশ্চরিত্র, তা'ছাড়া মূর্খ এবং অশিক্ষিত ; ভোলা শিক্ষাহীন, বুদ্ধিহীন, পরপ্রসাদলোভী স্তাবক ও কামুক ; নকুলেশ্বর উকিল, কিন্তু নিমচাঁদেরই মত নেশাখোর ও বেশ্যাসক্ত ; অথচ সর্ববিষয়ে নিমচাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্র হয়েও সমাজ ও পরিবার থেকে এরা বিচ্যুত নয়। আর নিমে দত্ত কি শিক্ষায়, কি চরিত্রে, কি বুদ্ধিতে, কি ন্যায়-অন্যায়ের বিচারশক্তিতে এদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হয়েও 'না ঘরকা, না ঘাট্‌কা'। কারণ এই তেজস্বী ভণ্ডামিহীন যুবক দু'নৌকায় পা রেখে চলতে জানে না। ব্রাণ্ডির বোতলকে লক্ষ্য ক'রে নিমচাঁদ ঠিকই বলেছে "হৃদবিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? তুমি সতীনে পড়লে বটে, কিন্তু তোমার সপত্নীর যাতনা ভোগ কত্তে হবে না ; তুমি আমার সুয়া রাণী, আমি অহর্নিশি তোমার অধরসুধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না।" অন্যদিকে 'ঘটিরাম' ডেপুটি কেনারাম ঘোষ — বুদ্ধিহীন, পুঁথিগত-বিদ্যাসম্বল ও গোপন লাম্পট্যে লিপ্ত। সে নিমচাঁদের তুলনায় সর্বাংশে হীন চরিত্র হয়েও তার পদমর্যাদাগুণে সমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজ করেছে। এই সব পার্শ্বচরিত্র নিমচাদ চরিত্রের ট্র্যাজেডিটি যেন আরো বহুগুণে তীব্র ও মর্মস্পর্শী ক'রে তুলেছে। নিমচাঁদ চরিত্রের প্রধান এবং বলতে গেলে একমাত্র দোষ, সে মদ্যপ। এর আনুষঙ্গিকরূপে বারাঙ্গনা-সংসর্গেও তার আগ্রহ আছে বটে, কিন্তু এর কারণ লাম্পট্য-প্রবণতা নয়। তার পক্ষে অটলের মত নির্লজ্জ মিথ্যাচারী হওয়া অসম্ভব। একই বাড়িতে স্ত্রী এবং বেশ্যা উভয়কে নিয়ে থাকতে অটলের সঙ্কোচ নেই, এবং অপরের স্ত্রীকে জোর ক'রে সংগ্রহ করবার পাশবিক চক্রান্তের মূল হয়েও নির্লজ্জের মত সে স্ত্রীকে বলতে পারে "তোমার দোষেই তো এটি ঘট্‌লো — তুমি গোকুল বাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কেন কোমরে দিলে?" নিমচাঁদ মদ খায়। কিন্তু আসলে মদই নিমচাঁদকে খেয়েছে। এখন 'কমলি নেহি ছোড়তা', ছাড়তে চাইলেও যে আর মদ ছাড়া যায় না, সে বিষয়ে নিমচাঁদ যথেষ্টই সচেতন। মদের আসক্তি যে তাকে তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য থেকে চ্যুত করছে সে আত্মগ্লানি

তাকে সর্বদা পীড়িত করে। বাস্তবিক পক্ষে সে অটলের মত "Bloody bawdy villain, remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain" নয়। তাই তার স্বগত বিলাপ শোনা যায়, "হা! জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্মাকর মদিরা হস্তে নিপাতিত কল্যে? ··· আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দে শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না।" আসলে স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবশতঃই নিজেকে অধঃপতিত জেনে সে স্ত্রীর সংসর্গ ত্যাগ ক'রে বারাঙ্গনা সাহচর্যই সার করেছে। সে মদ্যপ এবং পতিত হয়েও এতদূর হীন চরিত্র নয় যে ভদ্র-ঘরের মেয়ে অথবা বধূর উপর আক্রমণ সমর্থন করবে। তাই গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে আনবার প্রস্তাবে সে অটলকে বলেছে, "গৃহস্থের মেয়ে বার করবার মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোক্‌লো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাবকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও।" এর উত্তরে অটল যখন বলেছে, "তুই তবে তোর মেগের কাছে যা", তখন নিমচাঁদ বলছে, "Thou stickest a dagger in me অটল, কি গালাগালিই তুই দিলি।" কারণ নিমচাঁদের জীবনে এর চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই যে সে তার স্ত্রীর কাছে যেতে পারছে না, সে-যোগ্যতা সে হারিয়েছে। সে কথা স্মরণ করতে যে বেদনা বোধ হয়, তা ছুরিকাঘাতের মতই তীব্র। এর পরের সংলাপ —

"অটল। ··· গোকুল বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আসবে, সেই সময়ে তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস্‌, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈঠকখানায় আনিস্‌।

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে?···

I dare do all that may become a man;
Who dares do more is none."

এর থেকে আমরা এই দেখি যে নিমচাঁদ মনুষ্যত্বহীন নয়, এবং সে

ভদ্রলোক। এই ভূতের দলের মধ্যে সেই যে একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি তার প্রতি উক্তিতেই তা বোঝা যায়। মদের লোভে সে অটলের বাড়িতে পড়ে থাকে বটে, কিন্তু অটলের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তার মনে কোনো ভুল ধারণা নেই, এবং সেকথা অটলের মুখের উপর বলতেও সে দ্বিধা করে না। গোকুলের স্ত্রী অটলের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে শুনে সে বলছে, "মূর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েছে? আমার ত কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালি দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না।"

এই স্পষ্টবক্তা কৃতবিদ্য মাতাল নিমচাঁদ সর্ববিষয়ে হীন হয়েও আমাদের সহানুভূতি, করুণা, এমন কি স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক সৃষ্টির এই-ই লক্ষণ; থ্যাকারে বলেছেন, "the best humour is that which is flavoured throughout with tenderness and kindness." 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্রে লেখকের সেই "tenderness and kindness" এর উজ্জল দৃষ্টান্ত মেলে। নাট্যকার এবং হাস্যরসিক হিসাবে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্বের মূল কথাই তাঁর সর্বব্যাপী সহানুভূতি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি।··· পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্কজীবনসুখ, বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহবিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের এ-উক্তির তাৎপর্য এই যে, দীনবন্ধু স্ব-সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গেই সহজ সহানুভূতি দ্বারা একাত্ম হয়ে যেতে পারতেন, প্রত্যেকটি চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিই সহানুভূতির সঙ্গে প্রকাশ করতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এরই অপর নাম detachment বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিধাতা যেমন চোরকে বলেন চুরি করতে, গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে, শ্রেষ্ঠ নাট্যস্রষ্টাও তেমনি নিজে নির্লিপ্ত থেকে ভালো-মন্দ

প্রত্যেক চরিত্রকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠবার সুযোগ দেন। আবার শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকেরও প্রধান গুণ এই সহানুভূতি — যা হেগেল, কার্লাইল, থ্যাকারে, পামার ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেখিয়েছেন। এই সহানুভূতির গুণেই নিমচাঁদ দত্তকে নিয়ে আমরা যতই হাসাহাসি করি না কেন, তার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে হয়। উচ্চস্তরের হাস্যরস যে করুণরসের কত কাছাকাছি, 'সধবার একাদশী'তে তার দৃষ্টান্ত মেলে।

এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছেন, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত — সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না, একথা মেনে নেওয়া শক্ত। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ-চরিত্র হাস্য ও করুণরসে সমুজ্জ্বল এবং স্রষ্টার অকৃত্রিম সমবেদনায় জীবন্ত। 'নীলদর্পণে'ও করুণরস সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর দক্ষতার পরিচয় আছে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন, "গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।" আর 'সধবার একাদশী'ও নিতান্তই স্থূল লাঠিয়ালের মাথার খুলি ফাটানো বিদ্রূপ নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট সূক্ষ্মতা বা subtlety আছে। নিমচাঁদ চরিত্রের আপাতদৃষ্ট হাসির অন্তরালে আর এক গভীর বেদনাময় করুণ নিমচাঁদ চরিত্র বিরাজ করছে, যা স্থূল দৃষ্টি নিয়ে আঁকা যায় না, স্থূল দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় না। পার্শ্বচরিত্রগুলি এই চরিত্রের ট্র্যাজেডি আরো বাড়িয়ে তুলছে। একজন সমালোচকের মতে "কতকগুলি অনাবশ্যক চরিত্রের সমাবেশ এই নাটকের গুরুতর ত্রুটি। মূল নাট্যকাহিনীর মধ্যে রামমাণিক্য ও ভোলার কোন স্থান নাই। তবে নানাদিক হইতে মাতলামির কুফল দেখাইবার জন্য নাট্যকার এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির কতকগুলি চরিত্র আনিয়া একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। স্থূল হাস্যরস ছাড়া ইহাদের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই।" মনে হয়, লেখক এই পার্শ্বচরিত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। 'সধবার একাদশী'তে তথাকথিত 'নাট্যকাহিনী' অতি ক্ষীণ, নেই বল্লেই হয়। সমস্ত নাটকটি একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র — নিমে দত্তকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। সেই চরিত্রের প্রকৃত ট্র্যাজেডিটি স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলার জন্য এ-পার্শ্ব-চরিত্রগুলির নিতান্তই প্রয়োজন ছিল। এই সব চরিত্রের তুলনায় নিমচাঁদের

শিক্ষা, বুদ্ধি ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য ছিল এইটে দেখানো যে সর্ববিষয়ে হীন এই চরিত্রগুলি সমাজ ও সংসারে যথাস্থানে সগৌরবে বিরাজ করছে, আর নিমচাঁদ এদের তুলনায় সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও গৃহচ্যুত, সমাজচ্যুত, মূর্তিমান ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির মূল নিমচাঁদেরই চরিত্রে নিহিত। সে বিবেক-সম্পন্ন পুরুষ, 'moral courage এর ছেলে', তাই সে ভাঙতে রাজি আছে কিন্তু মচকাতে রাজি নয়। এই ভূতের দলের মধ্যে একমাত্র সে-ই তার অধঃপতন সম্বন্ধে সচেতন, তাই তার স্বগতোক্তি —"তুমি স্কুল থেকে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত।" "I must weep, but they are cruel tears."। তাই সমাজ, গৃহ ও স্ত্রী তাকে ত্যাগ না করলেও, তার বিবেকই তাকে 'ঘরছাড়া দিকহারা' করেছে। এবং এখানেই নিমচাঁদ-জীবনের চরম ট্র্যাজেডি প্রকাশ পেয়েছে। পার্শ্বচরিত্রগুলি বাদ দিলে এ ট্র্যাজেডি এমন ক'রে ফুটতো বলে মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সধবার একদশীর প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি ; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা, নিমচাঁদ ইহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু কেহ কেহ যে মনে করেন, নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিকৃতি, তাহা সত্য নহে।" 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দত্ত মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল, এরূপ একটা কথা সেকালে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলিত ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। কেবলমাত্র 'যা রটে তার কিছুটা বটে' বলেই নয়, অন্য কারণেও এ-গুজব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য নিমচাঁদ মাইকেল মধুসূদনের 'প্রতিকৃতি' কোনোমতেই হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু লোকোত্তর প্রতিভাশালী হয়েও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের দরুণ মধুসূদনের জীবন যে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। স্বভাবতঃ পরদুঃখকাতর দীনবন্ধুকে এই ব্যর্থতা নিশ্চয়ই ব্যথিত করেছিল। সেই বেদনায় অনুপ্রেরিত হয়ে নব্যবঙ্গীয় উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের প্রতিনিধি রূপে মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রের খারাপ দিকটার, অর্থাৎ তাঁর অসংযম ও মদ্যপ্রিয়তার অবাঞ্ছনীয় পরিণামের দৃষ্টান্তরূপে দীনবন্ধু

যদি নিমচাঁদ চরিত্র সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তাতে অনুচিত বা বিস্ময়কর কিছু নেই। বিশেষতঃ, নিমচাঁদের উক্তি "I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English." আসলে মাইকেলেরই উক্তির অতিরঞ্জন। মধুসূদনের এরূপ আরো দু'একটি কথা নিমচাঁদের মুখে শোনা যায়। সর্বোপরি, দীনবন্ধু যে এই চরিত্রটির নামকরণে 'মধু'র ঠিক উল্টো কথাটি বেছে নিয়েছিলেন, তা আমার কাছে একেবারে তাৎপর্যহীন মনে হয় না। দীনবন্ধু অবশ্য ঠিকই বলেছিলেন, "মধু কি কখনও নিম হয়?" বাস্তবিকই মধু নিম নয়। কিন্তু মধুসূদনের চরিত্রের একটা দিক নিমচাঁদ চরিত্রের প্রেরণা জুগিয়েছিল, এ-ধারণার মূলে কিছু সত্য থাকা বিচিত্র নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র বলেছেন, " 'সধবার একাদশী'র যেমন অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছুদিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই, ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।" স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে যাঁরা 'সধবার একাদশী'কে যথাযথরূপে পাওয়া গেছে বলে আনন্দিত আমি তাঁদেরই দলে। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে নীতি ও রুচি অতি নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। সেই অধঃপতিত সাহিত্যিক রুচিকে উন্নত করার দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্র স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর কঠোর শাসনের ফলেই বাংলা সাহিত্য থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি ও কুরুচি দূর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়েও, কখনো কখনো তিনি, তৎকালীন প্রয়োজনে, সমসাময়িক সাহিত্যকে শিল্প বা সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করবার আগে নৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে অগ্রসর হয়েছেন। এইজন্যই তিনি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অনুরাগী হয়েও ঈশ্বরগুপ্তের মত কবি "আর জন্মিয়া কাজ নাই" বলে মন্তব্য করেছেন এবং নিমচাঁদের মাতলামি বাদ দিলে নিমচাঁদ

আর নিমচাঁদের মত থাকে না জেনেও তিনি এই রচনার বিলোপ কামনা করেছেন। সমাজনীতির মর্যাদা রক্ষার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কলাবিদের স্বাভাবিক আদর্শ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছেন, রোহিণী চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রও এ-অভিযোগ করে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ধর্মনীতি সমাজ-নীতি ও রুচিকে শিল্পকলার উপরে স্থান দেবার প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমানে আমরা 'সধবার একাদশী'কে সমস্ত মাত্‌লামি ও 'অশ্লীলতা' সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বলে গ্রহণ করতে পারি।

দীনবন্ধুর পরবর্তী প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। বায়াত্তুরে বুড়ো রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, গ্রামের জমিদার, সমাজের চাঁই, কৃপণ ও স্বার্থপর, বুড়ো বয়সে বিপত্নীক হয়ে বিয়ে করবার জন্য খেপেছে। ঘরে তার দুটি বিধবা মেয়ে ও দৌহিত্র বর্তমান। কৃপণ এবং রুক্ষ স্বভাবের জন্য সে সকলের অপ্রিয়, ছোট ছোট ছেলেরা তাকে দেখলেই তার নামের সঙ্গে ডুম্‌নী বুড়ি পেঁচোর মার নাম সংযুক্ত করে খেপায় —

"বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।"

পাড়ার ছোকরাদের হাতে বিয়ে পাগলা রাজীবলোচনের নাকাল এই প্রহসনের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, " 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল"। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'রহস্য-সন্দর্ভে' এই প্রহসনটির সমালোচনায় লিখেছিলেন, "ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা শক্তি ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিতা না থাকলে সেই রূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর।" বলা বাহুল্য 'প্রত্যুৎপন্নমতিতা' শব্দটির দ্বারা রাজেন্দ্রলাল উইট বোঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতই দীনবন্ধুর সৃষ্ট হাস্যরসাত্মক চরিত্রগুলির সংলাপে উইট এবং হিউমার উভয়ের যে সমন্বয় ঘটেছে, তাঁর প্রহসনগুলির ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'সধবার একাদশী'র কাহিনী যেরূপ অনেকাংশে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুরূপ, 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র কাহিনীর সঙ্গেও সেইরূপ 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কাহিনীর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে, মাইকেল

মধুসূদনের প্রহসন দু'টি তীব্র বিদ্রূপাত্মক, আর দীনবন্ধুর প্রহসন হাস্যরসের প্রস্রবণ। তৎকালীন সমাজের কতকগুলি গুরুতর ত্রুটিকে তীব্রভাবে আঘাত করাই মধুসূদনের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিতে ব্যঙ্গ থাকলেও কোনো আঘাত নেই। অবশ্য, একটি 'মরাল' বা নীতি সবগুলি প্রহসনেরই মধ্য দিয়ে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু সদ্য-আবির্ভূত নবযুগের সকল সাহিত্যে তা থাকা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কেননা সেটাই সাহিত্যের — এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজ ও ব্যক্তিগত নীতির — আদর্শ প্রতিষ্ঠার যুগ। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনার কোথাও রূঢ় ব্যঙ্গ নেই। তাঁর সর্বব্যাপী পরদুঃখকাতরতার ফলে তাঁর ব্যঙ্গের পাত্রপাত্রীরা পাঠকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তেও দেখি রাজীবলোচন সর্ববিষয়ে নিন্দার পাত্র হয়েও পাঠকদের সহানুভূতি থেকে একেবারে বিচ্যুত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন যে, দীনবন্ধু "বিবাহবিষয়ে ভগ্নমনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন"।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাভাবিক ও যথাযথ এবং সংলাপও রসোজ্জ্বল। নাটকটির একমাত্র দোষ, ক'নে-বেশী রতার মুখে লম্বা লম্বা পদ্য। পদ্য আওড়ানোতে রাজীব এবং ঘটকও বেশ পটু। সেকেলে প্রথা অনুযায়ী দীনবন্ধু তাঁর পাত্রপাত্রীদের মুখে দীর্ঘ পয়ার ত্রিপদী অমিত্রাক্ষর পদ্য ব্যবহার না করলেই ভালো করতেন। একে তো অমিত্রাক্ষর ছন্দ দীনবন্ধু একেবারেই আয়ত্ত করতে পারেন নি ; দ্বিতীয়তঃ, এরূপ দীর্ঘ পদ্যের ব্যবহারে তাঁর নাটকগুলির গতি ও নাটকীয়তা বহুলপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'নবীন তপস্বিনী'তে বিজয়ের মুখে ৮৯ পংক্তি পয়ার স্বগতোক্তি এবং তপস্বিনীর মুখে ৩১ পংক্তি পয়ারোক্তি যারপরনাই নিন্দার্হ। সুখের বিষয় দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিতে পদ্যাংশ অপেক্ষাকৃত কম, তবু যেটুকু আছে সেটুকুও না থাকলেই ভালো হোত। সংস্কৃত নাটকে কথায় কথায় পদ্য ব্যবহারের রীতি ছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃত নাটক কাব্যেরই প্রকারভেদ ব'লে গণ্য হোত, আধুনিক যুগের নবীন নাটকের সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল ছিল না। তা ছাড়া সংস্কৃতে এত দীর্ঘ পদ্য নাটকে ব্যবহৃত হোত না।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীবলোচন জীবন্ত চরিত্র। মধুসূদনের ভক্ত-

প্রসাদের চেয়ে রাজীব আরো বেশি বাস্তব এই কারণে যে, শেষ পর্যন্ত দীনবন্ধু তাকে অনুতপ্ত reformed চরিত্রে পরিণত করেন নি। কেবল রাজীব নয়, রামমণি, পেঁচোর মা, পাড়ার ছেলেরা, সকলেই বাস্তব জগতের রক্তমাংসের মানুষের মতই সত্য। নাটকটির সংলাপ যেমন চরিত্রানুগত তেমনি হাস্যরসময়। একটু উদ্ধৃত করি।

"বালকগণ। বুড়ো বাম্‌না বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

নসিরাম। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েছে, ইনিস্পেক্‌টার বাবু এয়েচেন, সকালে সকালে স্কুলে যা।

(বালকদের প্রস্থান)

মহাশয়ের অদ্য স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজীব। আমাকে পাগল করেচে।

নসি। অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহ শূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী। তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে দেব।

নসি। যে মেয়েটি স্থির হয়েছে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্যন্ত হবে।

রাজী। কোন্ মেয়েটি?

নসি। আজ্ঞা — ঐ পেঁচোর মা।

রাজী। দূর ব্যাটা পাজী গর্ভস্রাব, যমের ভ্রম — ভাঁড় হাতে করগে, তোর লেখা পড়া কাজ কি। দেখি তোর কাকা জমিগুলো কেমন করে খায়, রাজীব এমন ঠক্ নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। পাজি — আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

(সরোষে রাজীবের প্রস্থান)"

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক 'লীলাবতী' প্রহসন নয়। তবু আমাদের বিষয়ের

অন্তর্গত। কারণ এর মধ্যে হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ ভ্রাতৃযুগল বেশ কিছুটা হাস্যরস উৎপন্ন করেছে। বইটির উৎসর্গ-পত্রে দীনবন্ধু বলেছেন —"অপরিমিত আয়াস সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি।" এবং বঙ্কিমচন্দ্র এই নাটকটি সম্বন্ধে বলেছেন, " 'লীলাবতী' বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প।" এই দুই উক্তির থেকে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, দীনবন্ধু আয়াস সহকারে তাঁর স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠা দমন করে এ-নাটকটিকে আদর্শপ্রধান ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। এবং বঙ্কিমচন্দ্র — যাঁর চোখে দীনবন্ধুর রচনার রুচিবিকৃতিই প্রধান ও বলতে গেলে একমাত্র দোষ বলে মনে হোত — এ নাটকটিকে দীনবন্ধুর রচনার মধ্যে সবচেয়ে সুরুচিপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। নতুবা, একমাত্র 'কমলে কামিনী' ছাড়া এটিকে দীনবন্ধুর অন্য সব নাটকের চেয়েই নিকৃষ্ট না মনে করে পারা যায় না। লম্বা লম্বা পদ্যের অ-নাটকোচিত সংলাপ একদিকে নাটকের গতি শিথিল করেছে, অন্যদিকে বড় বড় আদর্শের বুকনি নাটকটিকে অবাস্তব করেছে। যতক্ষণ গাঁজাগুলিখোর হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ ও উড়ে চাকর রঘুয়া উপস্থিত থাকে, ততক্ষণই নাটকটির প্রাণ থাকে, অন্যত্র সবই যেন নিষ্প্রাণ মনে হয়। নায়ক-নায়িকা ও শারদাসুন্দরীর চরিত্র যেন নীতিশিক্ষার বই থেকে তুলে আনা। তা ছাড়া 'লীলাবতী' নাটকের কাহিনীটিও নিতান্ত জটিল ও অসম্ভাব্য।

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক 'জামাই বারিক' একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। পদ্মলোচনকে নিয়ে তার দুই স্ত্রীর ঝগড়া যেমন স্বাভাবিক তেমনি কৌতুকাবহ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, " 'জামাই বারিকে'র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত" ; বইটি পড়েও এ-ধারণাই বদ্ধমূল হয়। কেননা এমন বাস্তব সতীনের কোন্দল বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নি।

"বগ। হ্যাঁরা ও হাড়হাবাতে প্যাত্না, তুই নাকি আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিস্ — একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ। বিন্দি পোড়াকপালীর আচ্ছা অষুধ, বেশ ধরেছে।

পদ্ম। কে বল্লে ?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল। তোমার নাকি মৃত্যু ঘুন্‌য়ে এসেছে

তাই এমনি ক'রে অপমানের কথাগুণো মুখ দিয়ে বার কচ্চো, তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দির বাঁদর।

বিন্দু। বগি, তুই বিন্দি বিন্দি করিস্ নে, বল্‌চি ভাল — তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে, আমার নাম কর্‌বি বেড়ীপেটা হবি।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ তুই আপনি বল্লি, না বিন্দি তোকে বলালে? কথা কস্ নে যে — বিন্দির দিকে দেখছিস্ কি — তুই যেমন তারি মতন (মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত)

পদ্ম। বাবারে গেছি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বল্‌বি আরো গাল দিবি? হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাঁড়া একচকো, পথেপড়া, আটকুড়ীর ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়াণীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারী — খুব করেছে বুড়ো বলেছে, আরো বলবে, আর দশবার বল্‌বে — বুড়োরে বুড়ো বলবে না তো কি খুঁকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেছে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে।"

পদ্মলোচনের ডান দিকটা বড় স্ত্রী বগলাসুন্দরী আর বাঁ দিক ছোট স্ত্রী বিন্দুবাসিনী ভাগ ক'রে নিয়েছে। তাই বড় গিন্নি তার এক অঙ্গে তেল মাখিয়ে দেবার পর অন্য স্ত্রী বাকি অর্ধাঙ্গে তেল মাখিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত হরগৌরী হয়ে বসে থাকা ছাড়া পদ্মলোচনের গত্যন্তর নেই। কিন্তু তার চেয়েও বিপদ আছে —

"বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বস্‌লেম। (পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন) ওকে বিষ খাইয়ে মারবো তবু তোকে দেব না — ভাতার যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি তো ঝাঁটার বাড়ি খাবি —

বগ। ছোঁব না তো কি তোকে ভয় কর্‌বো, এই ছুঁলেম। (পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কিল্)

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কিল মার্‌লি, আমি তোর পায় দুই কিল মারি। (পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কিল)

বগ। তবে তোর পায় তিন কিল — (বাঁ পায় তিন কিল)

বিন্দু। তোর পায় এই চার কিল। (ডান পায় চার কিল)

বগ। বটে রা সর্বনাশি, তবে দেখবি নাকি কেমন করে তোকে রাঁড় করি — (বঁটি লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ)

বগলার প্রস্থান।

পদ্ম। পা-টা একেবারে গিয়েছে, দু আঙ্গুল কোপ বসেছে — উত্থান শক্তি রহিত।"

স্ত্রীদের ভয়ে পদ্মলোচন অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। এদিকে দুই স্ত্রী জেগে বসে আছে স্বামীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। ইতিমধ্যে চোরের প্রবেশ —

"চোর। এরা সব ঘুম্‌য়েছে, এই বেলা মাল সরাবার সময় — বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি একদিন আমার ঘরে যেতে নেই ; আমি ঘুম্‌য়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড়রাণীর ঘরে যান,...

বগলার প্রবেশ

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ার বাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চো কোথায় ; এদিকে এস ; আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করেচিস ; ওকেও যেমন দেখিস্ আমাকেও তেমনি দেখতে হয়।...

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে — দুই আবাগী কাটাকাটি

করে মরচিস্ না কি? মর্ আপদ যাক্; আমি বলি ঘুম্য়েছে, ঘুম কোথা বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদ্য়েছে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?"

'জামাই বারিক' এক বড়লোক ব্যক্তির একদল বারিক (ব্যারাক)-বাসী ঘরজামাইয়ের বিবরণ এবং তাদের মধ্যে একজনের এই ঘৃণ্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কাহিনী। শোনা যায়, কলকাতার কোনো নামজাদা বড়লোকের বাড়ির ঘরজামাই রাখার প্রথা লক্ষ্য ক'রে এই বইটি লেখা। এই জামাই চরিত এবং দুই স্ত্রীর বিবরণের মধ্যে অভয়কুমার-কামিনীর কাহিনীটি দীনবন্ধু খুব কৃতিত্বের সঙ্গে গেঁথেছেন। জামাই-বারিকের বর্ণনায় প্রচুর হাস্যরস আছে, যদিও এ-বর্ণনা অত্যধিক অতিরঞ্জিত বলে কিছুটা অবাস্তব মনে হয়।

"তৃতীয় জামাই। ... আমি আজ দশ দিন জামাই বারিকের বরেগা গুণচি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোস্‌মেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি, পাঁচি আমার নামের পাসখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব, তা বলে, তোমার নামের পাস দিতে চান না।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) কদিন এখানে ছিলাম না এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখছি যে — পাসগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য তার তার নামের পাস পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।"

পঞ্চম জামাইয়ের বেল্লিকের রামায়ণ কথা আর ষষ্ঠ জামায়ের মাণিক-পিরের গান — দুইয়ের মধ্যেই যথেষ্ট মজা আছে। যথা

"ওরে কদুকুমড়ো রাক্‌লে ফেলে, তুশ্চু নেরেল ব্যাল,
আজগুবি দুনিয়ার খেলা সর্ষের মধ্যি ত্যাল। মাণিকপির...
মুসল্‌মানের মোল্লা রে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু। মাণিকপির...

আস্‌মানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ,
আর দিনের বেলায় সূর্য্ ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ। মাণিকপির…
পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিক্‌লি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়। মাণিকপির…”

‘জামাই বারিক’ একটি নিটোল হাস্যরসাত্মক প্রহসন। যদিও ‘সধবার একাদশী’র নিমচাঁদ দত্তের মত চরিত্রসৃষ্টির মহৎ কৃতিত্বের পরিচয় এ-প্রহসনে নেই, তবু কি নাটকীয়তায়, কি হাস্যরস-সৃষ্টিতে এ প্রহসনটিকে দীনবন্ধুর পরিণত রচনা বলে সহজেই বোঝা যায়। নাটকটিতে একদিকে বারিকবদ্ধ জামাইদের হাস্যকর অবস্থা, অপরদিকে তাদের ও তাদের স্ত্রীদের দুঃখ একসঙ্গে সমান তীব্রতায় ফুটেছে বলে, এখানেও উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটক ‘কমলে কামিনী’ অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনা হলেও এখানেও তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ হাস্যরস সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বক্কেশ্বর চরিত্রে এর নিদর্শন মেলে।

এর পর ‘কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ’ নামে দীনবন্ধু আরো একখানি ক্ষুদ্রকায় বিদ্রূপ-নাটক রচনা করেন। কিন্তু এটি বিশেষভাবে একদল ইংরেজের স্তাবককে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল বলে এর মধ্যে শুভ্র হাস্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণ শ্লেষই বেশি ফুটেছে। কি কারণে জানা নেই, এ নাটকটি ‘সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ’ দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

এই সময়ে নাটক-প্রহসন রচনার একটা হিড়িক পড়েছিল। স্বনামে বেনামে বহু লেখক প্রহসন রচনা করেছিলেন, অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে’ এগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এর অনেকগুলিতে কিছু কিছু হাস্যরস থাকলেও যুগোচিত সার্থক প্রহসনের সন্ধান অল্পই মেলে।

‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র প্রতিষ্ঠাতা শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)* ‘অমিয়নিমাইচরিত’, ‘কাঁলাচাঁদ গীতা’, ‘শ্রীনিমাই সন্ন্যাস’ প্রমুখ বহু বৈষ্ণব

* বঙ্গভাষার লেখক রচয়িতার মতে শিশিরকুমার ঘোষের জন্ম ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ।

ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা রূপেই সুপরিচিত। কিন্তু ইনি নানা দিকেই প্রতিভা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। গান বাজনা — বিশেষতঃ নানা-প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত তিনি ভালো জানতেন। ছবি আঁকাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর মহৎ কৃতিত্বের কথা সকলেই জানেন। কিন্তু একথা হয়তো সর্বসাধারণের জানা নেই যে, হাস্যরসবোধও এঁর তীব্র ছিল, এবং ইনি নিজে দু'খানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসনও রচনা করেছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম থেকেই রাজনীতি-প্রধান সংবাদ পত্র হলেও, শিশিরকুমার এ পত্রিকায় রসরচনার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান রক্ষা করতেন, বস্তুতঃ রসরচনা ছিল অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। হেমচন্দ্রের 'খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য' এখানে প্রকাশিত হয়েছিল, জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য'ও এই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেই প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "রসসাহিত্য রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট ঋণী। তিনি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম।…'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ।" ব্যক্তিগত স্বভাবেও শিশিরকুমার অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন, 'আমার জীবন'-এ নবীনচন্দ্র সেন সেকথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

নাটক ও রঙ্গমঞ্চেও শিশিরকুমার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকালে ইনি সহায়সম্বলহীন কিন্তু উৎসাহী প্রতিভাশালী যুবকদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তিনি 'নয়শো রূপেয়া' (১৮৭৩) ও 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৪) নামে দু'খানি প্রহসন রচনা করেছিলেন। তিনি ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টরও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

'নয়শো রূপেয়া' প্রহসনটির বিষয় পণপ্রথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীর সামাজিক সমস্যার মধ্যে পণপ্রথার দরুণ মেয়ের বিয়ের সমস্যাই বোধহয় প্রবলতম ছিল। তাই এ-সমস্যা নিয়ে বহু করুণ ও

বিদ্রূপাত্মক রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিশিরকুমারের রচনাকে হাস্যরসাত্মক না বলে বিদ্রূপাত্মক বললেই ঠিক হয়। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকরূপে বিদ্রূপাত্মক আক্রমণে তিনি সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন, এই প্রহসন দুটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বাজারের লড়াই' নামে ছোট প্রহসনটিতে নতুন মিউনিসিপালিটির বাজার বসিয়ে মতিলাল শীলের বাজারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে চালাবার নানারূপ হাস্যকর চেষ্টার বর্ণনা আছে। এ বইটির বিদ্রূপ যে অনেকাংশে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা এ-নাটকের পাত্রপাত্রীদের নাম থেকেই বোঝা যায়। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হগ সাহেব ছাড়া, মতি শীলের পুত্র হীরালাল শীল এবং কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি চরিত্রের সাক্ষাৎ এ প্রহসনটিতে পাওয়া যায়। এটিকে ঠিক প্রহসন না বলে নাট্যাকারে হগ সাহেবের কার্যকলাপের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বলে অভিহিত করলেই ঠিক হয়।

রবীন্দ্রাগ্রজ বহুমুখী প্রতিভাশালী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) সমসাময়িক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কোনো কোনো নাট্যকারের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও তাঁদের অনেক আগেই নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে, তাঁর চব্বিশ বৎসর বয়সের সময়। সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সব নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'পুরুবিক্রম' ১৮৭৪, 'সরোজিনী' ১৮৭৫, 'এমন কর্ম আর ক'রবোনা' (অলীক বাবু) ১৮৭৭, 'অশ্রুমতী' ১৮৭৯ এবং 'স্বপ্নময়ী' ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যরচয়িতা রূপে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক প্রকাশিত হবার পর। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইহার কিছুদিন পরেই (১৮৮১) গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য সেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা যদি সাহিত্যে সীমাবদ্ধ হোত তবে তিনি তাঁর অনুজের মতই হয়তো মহৎ কৃতিত্ব ও বিশাল খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিবিধ শিল্পকলা, যথা অভিনয়, নাট্যরচনা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, প্রভৃতি সব বিষয়েই সমান অনুরাগ নিয়ে জন্মেছিলেন। এবং তাঁর প্রতিভা বিভিন্ন শিল্পে সমানভাবে বন্টিত হয়েছিল।

সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে একটি সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার আসর গড়ে উঠেছিল। এই সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন দু'জন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর খুড়তুতো ভাই গুণেন্দ্রনাথ। নাটকের দিকে ঝোঁক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। গুণেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। অভিনয় ও সঙ্গীতপ্রিয়তা ঠাকুর বাড়ির একটি বৈশিষ্ট্য। শৈশব থেকেই যাত্রা পালা দেখে দেখেই হয়তো অভিনয় ও নাট্যকলার প্রতি এঁদের প্রবল আকর্ষণ জন্মেছিল। দুর্গাপূজোর তিন দিন বাড়ির উঠোনে যাত্রা হোত। এই যাত্রাপালাগুলি বালক ও শিশু দর্শকদের মনে যে গভীর রেখাপাত করতো, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। "এই যাত্রায় "কেলুয়া ভুলুয়া সং" ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। "শুম্ভ নিশুম্ভ"র পালায় যখন রক্তবীজ সাজঘর হইতে "রে রে রে রে" করিয়া ডাকাতি হাঁক দিতে দিতে আসরে আসিত, তখন ছেলেদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ডাকাতদের মত তাহার লম্বা চুল, ইয়া চৌগোঁপ্পা, মালকোঁচামারা রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে ঢাল তরোয়াল —সে এক ভীষণ চেহারা।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি)। 'শিশু'র 'বীরপুরুষ' কবিতায় এই ছবিটিরই যেন প্রতিফলন দেখতে পাই! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিষ্ণু গায়কের গান হইত।" (ঐ)।

কাজেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিনয় ও গান-বাজনার দিকে ঝোঁক বাল্যাবধিই উৎসাহ পেয়েছিল। আর বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির সমাগমে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি অনেকদিন আগে থেকেই সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ফলে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে সাহিত্য ও নাট্যশিল্প উভয়ের প্রতি সমান

ঝোঁক ও উভয় বিষয়ে সমান দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর কৈশোরেই এই প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল তাঁর "অদ্ভুতনাট্য" রচনায়, যা রবীন্দ্রনাথ ভুলক্রমে তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের প্রতি আরোপ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "একদিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

"ও কথা আর ব'লোনা, আর ব'লোনা,
বলছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে, হাসবে লোকে!
হাঃ হাঃ হাঃ — হাসবে লোক।" *

হাঃ হাঃ হাঃ — এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানায় ঐরূপ "হাঃ হাঃ হাঃ" সুরে অধিকাংশ সময়ে অট্টহাস্য হইত আর ধুপধাপ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় এই "অদ্ভুতনাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু বড়দাদা এই শান্তিহানির বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।" (জ্যো, জী, স্মৃ,)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল কাজে অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন সঙ্গী। এঁর সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন "গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, এক সঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম। ... গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় আমোদ পাইতেন।" এই "বড় বড় কল্পনার" মধ্যে নতুন ধরণের নাটকসৃষ্টির কল্পনাও যে ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "অদ্ভুতনাট্য" রচনাতেই

* গানটি ঈশ্বর গুপ্তের রচনা। শেষ লাইনটি মাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক সংযোজিত।

তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রের যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স তখন তিনি ও গুণেন্দ্রনাথ একটি নাট্যসমিতি গঠন করেন। এ-বিষয়ে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে আছে "তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীত চর্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয়ে তাঁহার গুনুদাদারও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। অভিনয়, তাহার আয়োজন, অভিনয়োপযোগী নাটক নির্বাচন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল।···সমিতির নাম হইল Commitee of five. কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিবাবু, অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) এবং জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনে এই নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন।" এই Committee of Fiveই ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শে একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটকের জন্য দু'শো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। "গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন যাহাতে ছেলেমানুষী অথবা কোনরূপ "ধাষ্টামো" না হয়, সেজন্য তাঁহারাই এবার এ-কার্য্যের সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন।" (জ্যো, জী, স্ম,) রামনারায়ণ তর্করত্ন "নবনাটক" লিখে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন, এবং নাটকটি ঠাকুরবাড়িতে একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল।

'নবনাটকে'র জন্য রামনারায়ণকে পুরস্কার দেওয়ার পর "এখন হইতে 'বড়'র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন।" ফলে ঠাকুর বাড়িতে অভিনয় ও নাট্যরচনার যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সন্দেহ নেই।

'নবনাটক' অভিনয়ের পাঁচ বৎসর পরে (১৮৭২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনটি প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সর্বপ্রথম প্রহসনের একটু ইতিহাস আছে। ১৮৬৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন। এর অল্পদিন আগে, ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে, কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজের

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর দল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর মতামত পোষণ করতেন ; এই দুই বিষয়ে নব্যপন্থীদের হালচাল অনেকের কাছে কিছুটা উগ্র মনে হোত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তখন পর্যন্ত এসব বিষয়ে কতকটা রক্ষণশীল মতামত পোষণ করতেন, তাই 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' অতি স্বাধীনা নারীকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে এ-নাটকটিতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নি। তিনি বলেছেন, "এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম, তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হওয়ার পর, প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম Indian Mirrorএ আমার উপর কিছু না কিছু আক্রমণ থাকিতই। আক্রমণকারীদের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল।" কিন্তু তারকনাথ পালিত বইটি পড়ে এর মধ্যে কোন দোষ দেখতে পান নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রহসনটির সুখ্যাতি করেছিলেন। পূর্ববর্তী 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'সধবার একাদশী' প্রহসন দু'টির উল্লেখ ক'রে এটির সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন "ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। ... ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না।" বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দনীয় মনে না করলেও, গ্রন্থকার নিজেই স্ত্রী-স্বাধীনতাকে এভাবে আক্রমণ করার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লিখিয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য "কিঞ্চিৎ জলযোগে"র দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।" (জ্যো. জী. স্মৃ.)

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' রচনা হিসাবে খুব উচ্চস্তরের না হলেও মঞ্চে এটি সাফল্য লাভ করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে ক'টি মৌলিক নাটক

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছিল, কোনটিই ব্যর্থ হয়নি। অমৃতলাল বসু বলেছেন, "গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদনের নাটক প্রহসনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই — বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের তখন এমনই দুর্দশা। এই সময়ে 'পুরুবিক্রমে'র ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশ হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম।··· ন্যাশানাল থিয়েটারে 'পুরুবিক্রমে'র অভিনয় সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল।"* পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী "আমার অভিনেত্রী জীবন" নামক স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, "সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জম্‌ত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখতেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হয়ে যেতেন।" † জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলির মঞ্চে এই সাফল্যের কারণ, লেখকের অভিনয়-প্রতিভা ও নাট্যশিল্প সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। অভিনয়-প্রতিভা তাঁর সহজাত ছিল, তাছাড়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সাহিত্যে — বিশেষ ক'রে ফরাসী নাট্যসাহিত্যে — তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সতেরোখানি সংস্কৃত নাটক বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন — এর মধ্যে অনেকগুলির অন্য কোনো অনুবাদ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আবার অপরদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ফরাসী হাস্যরসিক নাট্যকার মলিয়ের (Moliere) এর 'মারিয়াজ ফোর্সে' ও 'লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম' নামে দু'খানি প্রহসনেরও তিনি স্বাধীন অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রোমান্টিক ও দেশাত্মবোধময় করুণ নাটকগুলি বাদ দিলে হাস্য ও অদ্ভুতরসাত্মক রচনার দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল, মনে হয়। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম দু'টি রচনায়, কৈশোরের 'অদ্ভুতনাট্য' ও প্রথম যৌবনের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনে। ফরাসী থেকে তিনি যে অজস্র গল্প অনুবাদ করেছিলেন তার অধিকাংশই হয় হাস্যরসাত্মক, না-হয় রোমান্টিক শ্রেণীর। ফরাসী নাটকের মধ্যে

* 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে মন্মথনাথ ঘোষ কর্তৃক উদ্ধৃত।

† ঐ

তিনি একমাত্র মলিয়ের-এর প্রহসনই অনুবাদ করেছিলেন, অন্য কোনো নাটক অনুবাদ করেন নি। আসলে রোমান্টিক এবং হাস্যরসাত্মক, এই দু'জাতের সাহিত্যের দিকেই তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল ; তাই দেখা যায়, তাঁর সকল মৌলিক রচনাই, হয় রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, না-হয় প্রহসন। করুণরস ও হাস্যরসের সমন্বয় শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক প্রতিভার একটি লক্ষণ, ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে জন্য তাঁর কোনো কোনো নাটক হাস্যরসাত্মক হয়েও শেষ পর্যন্ত প্রায় করুণরসে পর্যবসিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে এ দুই রসের সমন্বয় না হলেও, সমাবেশ ঘটেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়ের-এর বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং প্রহসন রচনায় মলিয়ের-দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মলিয়ের-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মানব-জীবনের সকল জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার মধ্য থেকে তার কৌতুকটুকু তুলে ধ'রে দেখাতে পারতেন, এবং সে কৌতুক এত দূর টেনে নিয়ে যেতে পারতেন যে তা ট্র্যাজেডির সীমারেখার কাছাকাছি চলে যেত। মলিয়ের-এর প্রহসনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ব্যক্তি-চরিত্রের চেয়ে টাইপ-চরিত্রই ফোটানো হয়েছে ব'লে তার আবেদন সর্বকালীন ও সর্বমানবিক। অবশ্য মলিয়ের তাঁর সমকালীন ফরাসী সমাজের বহু অনাচার ও মূর্খতাকে বিদ্রূপ করেছিলেন, এবং তদ্দ্বারা বহু শত্রুও সৃষ্টি করেছিলেন, তবু তাঁর ব্যঙ্গের পাত্রপাত্রীদের কোনো দেশকালে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁর সমসাময়িক কালের কোনো কোনো ব্যক্তি বা বিষয়কে বিদ্রূপ ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু সর্বকালীন টাইপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা করা হয়েছে বলে তার মধ্যে কোন জ্বালা নেই, কিন্তু প্রচুর হাস্যরস আছে। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তিনখানি প্রহসনের মধ্যে তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' সবচেয়ে বিদ্রূপাত্মক রচনা হলেও, নব্যব্রাহ্মদল ছাড়া আর কেউই এর মধ্যে নিন্দনীয় কিছু খুঁজে পাননি। তার কারণ, উগ্ররূপে স্বাধীনা স্ত্রী এবং অনতিসচ্চরিত্র স্বামী সকল সমাজেই থাকতে পারে, এবং তাদের নিয়ে কৌতুক করাও অস্বাভাবিক নয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সবসুদ্ধ তিনখানি মৌলিক প্রহসন রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'এমন কর্ম্ম আর ক'রবো না' (অলীক বাবু) নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অলীক প্রকাশ — যে সর্বদাই মিথ্যে কথা বলে এবং মিথ্যে ছাড়া কিছু বলতেই পারে না, আর হেমাঙ্গিনী — যে নভেল প'ড়ে প'ড়ে নিজেকে সর্বদাই উপন্যাসের নায়িকারূপে কল্পনা করে, এই প্রহসনের নায়ক-নায়িকা। অলীকের মত গুলবাজ চালবাজ মিথ্যেবাদী চরিত্র সকল দেশে সকল সমাজেই দেখতে পাওয়া যায়। এবং অতিরিক্ত নাটক-নভেল পড়া (আধুনিককালে সিনেমা দেখা) মেয়ে, যে সর্বদাই নিজেকে উপন্যাসের নায়িকা বা সিনেমার হিরোয়িনরূপে কল্পনা করে, তাও কোনো সমাজেই দুষ্প্রাপ্য নয়। সেকালে সদ্য-উদ্ভূত বঙ্কিমী উপন্যাসের যুগে এ ধরণের চরিত্র হয়তো একটু বেশি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অলীকপ্রকাশ ও হেমাঙ্গিনী এই দুই টাইপ-চরিত্রকে বিশেষরূপে সেকালের বাঙালী সমাজেরই দৃষ্টান্ত ব'লে মনে হয় না।

অনুবাদের তুলনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার সংখ্যা অল্প। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ভিন্ন তিনি ব্রহ্মদেশীয় একটি নাটক, বিভিন্ন ফরাসী লেখকের অনেকগুলি গল্প ও কবিতা, মলিয়ের-এর দু'টি প্রহসন, ফরাসী পর্যটক পিয়ের লোটির কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনী এবং ইংরেজী থেকে 'জুলিয়াস সীজার' প্রভৃতি নাটক ও কয়েকটি নিবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মৌলিক রচনার মধ্যে 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী' ও 'স্বপ্নময়ী', এই চারখানি ঐতিহাসিক নাটক ; 'পুনর্বসন্ত', 'বসন্তলীলা' ও 'ধ্যানভঙ্গ' নামে তিনখানি গীতিনাট্য ; 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'এমন কর্ম আর ক'রবো না' (অলীক বাবু) ও 'হিতে বিপরীত' এই তিনটি প্রহসন এবং অনেকগুলি প্রবন্ধ। তাঁর সন্ধানী মনের কৌতূহল যে কত বিষয়ে ছড়ানো ছিল, প্রবন্ধগুলির নাম থেকেই তা বোঝা যায়। যথা, ভারতবর্ষীয় দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, নীলের বাণিজ্য, মারাঠী ও বাঙ্গালা, ভারতে নাট্যের উৎপত্তি, আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি, শিরোমিতি বিদ্যা, ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ নাট্যকার। 'ভারত সঙ্গীত-সমাজে' তাঁর গীতিনাট্যগুলির অভিনয় খুব সফল হয়েছিল, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর

অন্য নাটকগুলির সফলতার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রহসনগুলিতে, যেখানে অভিনেতা ও নাট্যশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে হাস্যরসিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমন্বয় হয়েছিল।

হাস্যরসসৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। দুঃখের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাবলী অধুনা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য, এবং তাঁর মৌলিক প্রহসনের সংখ্যাও অত্যল্প, তাই বাঙালী পাঠক ও নাট্যামোদী সমাজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'অলীকবাবু' মঞ্চস্থ হলে এখনও দর্শকদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে। কি অভিনয়-যোগ্যতায়, কি পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্ন হাস্যরসে এরূপ প্রহসনের তুলনা বাংলা সাহিত্যে অল্পই মেলে। হাস্যরসপ্রবণতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মগত ছিল, এবং ফরাসী সাহিত্য, বিশেষ ক'রে মলিয়েরের প্রভাব তাঁর সৃষ্ট হাস্যরসে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল, যা বাংলার অন্যান্য হাস্যরসিকদের মধ্যে দুর্লভ। যেমন তাঁর হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সর্বকালীনতা এবং সর্বমানবিকতা। মাইকেল মধুসূদনের নববাবু, ভক্তপ্রসাদ প্রভৃতি চরিত্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের রাজীব, নিমচাঁদ, আদুরী, বগলা, বিন্দু, পদ্মলোচন প্রমুখ চরিত্রগুলিকে তৎকালীন বাঙালী সমাজের অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করা যায়। তাই, এই সব চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ হলেও কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা সমাজ এর দ্বারা কিছু পরিমাণে আহত হওয়া সম্ভব। কিন্তু 'অলীকবাবু'তে যে-হাস্যরস এবং যে-ব্যঙ্গ পরিবেশিত হয়েছে, তা সকল লোক ও সকল সমাজই পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারে। অলীকবাবুর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ সেন এই কথাই বলেছেন, "বাঙ্গলায় অনেকগুলি সুন্দর প্রহসন আছে—'একেই কি বলে সভ্যতা', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির কৌলীন্যগৌরব কে না স্বীকার করে?··· কিন্তু অলীকবাবু ইহাদের সকলগুলি হইতে স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষ বা সমাজবিশেষ প্রহসনের লক্ষ্য হইয়া থাকে। সমাজের কোন কুপ্রথা বা কুরীতি, ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন দোষ বা গুণ অতিরঞ্জিত

করিয়া, তাহার হাস্যজনক, বিদ্রূপাত্মক বিকাশই প্রহসনের কার্য্য। আমরা যে কয়েকখানি প্রহসনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদেরই ভিতর প্রহসনের এই ধর্ম বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ··· কিন্তু সমালোচ্য প্রহসনে এরূপ কোন ব্যঙ্গ বা অপর উদ্দেশ্য নাই। ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহার ভিতর একটি সুস্থ, সরল, উজ্জ্বল, বালক-সুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। ··· এ কল্পনার ভিতর বিশাল বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের গূঢ় অভিসন্ধি নাই। না থাকিলেও — বা নাই বলিয়াই, ইহা অমূল্য।” (প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি)

‘অলীক বাবু’ নাটকখানি ঠাকুর বাড়িতে কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল, এবং রবীন্দ্রনাথ তাতে অলীকপ্রকাশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রিয়নাথ সেন বলেছেন, এ-অভিনয় অতি সুন্দর হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাস্যরস আমাদের তৎকালীন অন্যান্য হাস্যরসিকের রচনা থেকে স্বতন্ত্র। তার কারণ, তাঁর ব্যঙ্গে বিদ্রূপের জ্বালা নেই। তাঁর ব্যঙ্গ টাইপ্-চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে, এ-বিদ্রূপ নিছক হাস্যরসে পরিণত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টির দ্বিতীয় কৌশল অত্যধিক অতিরঞ্জন। অলীক বাবু যে অতিরঞ্জিত চরিত্র একথা কাউকে ব'লে দিতে হয় না। মিথ্যেবাদী চালবাজ লোক সংসারে অনেক আছে বটে, কিন্তু অলীকপ্রকাশের মত চালিয়াৎ লোকের অস্তিত্ব প্রায় কল্পনাতীত। হেমাঙ্গিনী সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। প্রিয়নাথ সেন এই জন্যই বলেছেন, “অনেক লোক মিথ্যা কথা কহে, কিন্তু অলীকপ্রকাশের ন্যায় কে কবে অদ্ভুত মিথ্যা বলিয়াছে?”

বলা বাহুল্য, ব্যক্তি অপেক্ষা টাইপ চরিত্র সৃষ্টি ক'রে তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির অতিরঞ্জন দ্বারা হাস্যরস উৎপাদনের এ-কৌশল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়েরের থেকে লাভ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অতিরঞ্জন অল্প স্বল্প অতিরঞ্জন নয়; আর এই মাত্রাধিক অতিরঞ্জনের জন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদের আশেপাশের মানুষ হলেও, তাদের অবাস্তব মনে হয়।

‘অলীক বাবু’ থেকে একটু উদাহরণ নেওয়া যাক। অলীকপ্রকাশ যখন বকেয়া বাড়িভাড়ার জন্য পেয়াদার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে, এবং তার সকল

মিথ্যাকথা ধরা প'ড়ে যাওয়ায় হবু শ্বশুর সত্যবাবু এখন ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া দূরে থাক, টাকা দিয়ে পেয়াদার হাত থেকে ওকে খালাস করতেও রাজি হচ্ছেন না, নাটকের শেষের দিকের সেই জায়গা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"পেয়াদা। চল্ বে চল্।

অলীক। একটু সবুর কর বাবা — পেয়াদা সাহেব বড় ভালো লোক, শ্বশুর মশায়, আমাকে এযাত্রা উদ্ধার করুন — আমি এমন কর্ম আর কর্‌ব না।

সত্য। ভাখ, আমাকে "শ্বশুর মশায়" "শ্বশুর মশায়" ক'রে ডাকিসনে — আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্চিনে — পাজি — ছুঁচো — লক্ষ্মীছাড়া!

অলীক। এ যাত্রায় রক্ষা করুন — আর কখন এমন কর্ম কর্‌ব না —

জগ। ভাড়ার টাকা কটা দিয়ে খালাস করে' দিন — হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে —

সত্য। না মশায়, আমি ও টাকা দিচ্চিনে — যেমন কর্ম, তেমনি ফল।

(হেমাঙ্গিনীর অন্তরালে আগমন)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কি! আমার প্রাণেশ্বর বন্দী হয়েছেন! —

সত্য। না — আমার মেয়ের সঙ্গে ওর কখনই বিয়ে দেব না — পাজি ছুঁচো — লক্ষ্মীছাড়া।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) — কি কথা শুনলেম! — ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না! আমি আর নীরব থাকতে পারিনে। — প্রণয়ের অপমান। — এ প্রাণ আর রাখব না —

পেয়াদা। চলো বাবু চলো।

অলীক। মারিসনে বাবা — তোকে পরে খুব খুসি কর্‌ব — শ্বশুর মশায় কিছু কোল্লে না — নিতান্তই কি তবে জেলে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে — ও প্রেয়সী — প্রেয়সী — বিরহ-যন্ত্রণায় তা হলে যে একেবারে মারা যাব — এই অসময়ে একবার ভাখা দাও।—

(একটা ভোঁতা বঁটিহস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলচি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর — আমার কণ্ঠরত্ন। ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ করব না — যদি এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, তাহ'লে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জন কর্‌ব।

সত্য। হাঁ হাঁ — কর কি! কর কি! — অমন কর্ম কোরো না মা — আমি এখনি টাকা দিয়ে খালাস করে' দিচ্চি — এ কি উৎপাত! লক্ষ্মীটি, ঘরে যাও — এত লোকের সামনে কি বেরোতে আছে — ছি ছি, কি লজ্জা!

হেমা। আমি জগতের সামনে এই শেষবার বল্‌চি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!

(দ্রুতবেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)"

নভেল-পড়া হেমাঙ্গিনী হুবহু বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার ভাষায় কথা বলছে। অলীকপ্রকাশের পক্ষে যেমন মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলা অসম্ভব, হেমাঙ্গিনীর পক্ষেও তেমনি নভেলী ঢং ও ভাষা ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে থাকা অসম্ভব। এ টাইপের প্রাদুর্ভাব সে-যুগে হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনকার সিনেমার যুগেই কি দুর্লভ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রহসন 'হিতে বিপরীতে'র কাহিনীটি পুরাতন। বাহাত্তুরে বুড়ো বিপত্নীক কৃপণ ভজহরি আবার বিয়ে করতে চায়। দৌহিত্র কুঞ্জ থিয়েটারের নেশায় মত্ত, কিন্তু থিয়েটারের দলকে 'খ্যাঁট' দিতে না পারলে আর মান থাকে না। থিয়েটার করতে খরচও বিস্তর। যথা —

"(থিয়েটারের দলবলের প্রবেশ)

কুঞ্জ। ···তোমাদের আজ যে এত দেরি হ'ল?

দলপতি। এই হাতীর পা মশায়কে খুঁজে আন্‌তে এত দেরি হ'ল। উনি আবার গজেন্দ্রগমনে চলেন কিনা!

সকলে। ঠিক বলেছ — গজেন্দ্রগমনই বটে — হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

দলপতি। কিন্তু বল্‌তে কি — বড় সরেশ হাতীর পা পাওয়া গেছে — হাতীর সামনের পা ও ঠিক সাজতে পারবে। আর ঐ ব্যক্তিটি হাতীর পিছনের পা দিব্যি সাজবে। আর ঐ লোকটি হাতীর শুঁড় সাজবে। (কানে কানে) হাতীর শুঁড়কে একটু বেশি টাকা কবুল করতে হ'ল ; শুঁড়ের মতন ক'রে হাত দুটো অনেকক্ষণ উঁচিয়ে রাখতে হবে কি না — তাই কাজেই একটু বেশি দিতে হ'ল। মোদ্দা কথা, কুঞ্জ বাবু, প্রহ্লাদ চরিত্রের নাটকে এমন হাতী কলকাতার সহরে, কোন থিয়েটারের ষ্টেজে আনতে পারবে না—"

খ্যাটের জন্য দাদা মশায়ের কাছে অনেক আব্দার ক'রেও দুটি টাকার বেশি সংগ্রহ করার যখন আর কোনোই আশা দেখা গেল না, তখন থিয়েটারের দলের এক ছোকরাকে কনে, এবং কাউকে কাউকে কনের বাবা খুড়ো শালীর দল আর ঘটক সাজিয়ে দাদামশায়ের বিয়ে দেওয়া এবং অবশেষে বাসর ঘর থেকে 'কনে'কে দিয়ে টাকার বাক্সটি সরিয়ে তা দিয়ে ভোজ লাগানো, এইটুকুই 'হিতে বিপরীতে'র কাহিনী। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র কাহিনীর সঙ্গে এ-কাহিনীর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু, 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র রাজীব যেখানে সংকীর্ণমনা, অত্যাচারী, কৃপণ জমিদার ও সমাজপতি, সেক্ষেত্রে 'হিতে বিপরীত'-এর ভজহরির কৃপণতা ভিন্ন অন্য দোষ নেই। তবে দু'জনেই বিয়ে পাগলা। ভজহরির কৃপণতা এক দোষ বটে, কিন্তু তা এত অতিরঞ্জিত যে এক দোষই একশোর সমান হয়েছে। 'কনে'টিকেও তালিম দিয়ে তার উপযুক্ত ক'রেই তৈরি করা হয়েছে। 'শালী'দের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদের পর 'বাসর ঘরে' 'বরকনে'র নিভৃত আলাপ একটু শুনুন।

"ভজ। হ্যাঁ, এইবার তবে শুই, অনেক আমোদ আহ্লাদ হ'ল। (স্বগত) এখনি শোব? গিন্নীর সঙ্গে দুই-একটা খোস্‌গল্প করব না? না, দুই-একটা ভাল কথাবার্তা কওয়া থাক্‌। (প্রকাশ্যে) বলি, ও গিন্নি, গাম্‌ছা আজকাল কত ক'রে বিকোচ্ছে গা?

আমার একখানি গাম্‌ছা চাই। এই গাম্‌ছাখানা একেবারে কুটি কুটি হয়ে গেছে।

কনে। ছেড়া গাম্‌ছাগুল ফেলে দাও না তো? পুরোনো গাম্‌ছাগুল আমার কাছে দিও, আমি ধুতি ক'রে দেব।

ভজ। (মহাখুসী হইয়া) সত্যি না কি? ধুতি ক'রে দেবে? সে কি রকম?

কনে। আমি শেলাই ক'রে জুড়ে ধুতি ক'রে দেব — বেশ হবে। তা জান না?—

গাম্‌চাক্কে গাম্‌চা
গাম্‌চা দুগুণে কাছা
দুই কাছায় পণে ধুতি
চার কাছায় ধুতি।

ভজ। কি বল্‌ব যাদু, তুমি একটি রত্নবিশেষ। এই বয়সে কত গিন্নীই দেখলুম, কিন্তু তোমার মত গিন্নী আমি তো চক্ষে দেখিনি। আশ্চর্য! — আমরা ছেলেবেলায় কড়াঙ্কে — ষোট্‌কে গুরু-মহাশয়ের কাছে শিখেছিলুম, কিন্তু গাম্‌চাক্কে তো কখনো শুনিনি। আজকাল মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চাটা খুব হচ্চে দেখচি। এই রকম লেখা পড়া মেয়েরা শিখ্‌লে খুব কাজ দেখে।"

ভজহরি চরিত্রের সঙ্গে রাজীব চরিত্রের প্রভেদ এই যে, রাজীব সেকালের সমাজের প্রতিনিধি, ভজহরি সর্বকালীন বিয়ে পাগলা কৃপণের অতিরঞ্জিত সংস্করণ। 'হিতে বিপরীত' নাটকটিও 'অলীক বাবু'র মতই অতি পরিচ্ছন্ন রুচিসম্পন্ন, এবং আমার মতে এখনও সাফল্যের সঙ্গে অভিনয়ের যোগ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হয়। হাস্য-রসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অতিরঞ্জনের যে মাত্রাধিক্য এনেছিলেন, এবং যার ফলে মিথ্যেবাদী চালবাজ চরিত্রের নাম পর্যন্ত সোজা-সুজি 'অলীকপ্রকাশ' দিয়ে তাকে ব্যক্তিগত বিদ্রূপের উর্ধ্বে স্থাপন করতে পেরেছিলেন, সেই অতি-অতিরঞ্জনের কৌশলটি তেমন সফলভাবে পরশু-

রামের পূর্ব পর্যন্ত অন্য কোনো হাস্যরসিক ব্যবহার করতে পারেন নি। এ-প্রসঙ্গে পরশুরামের গণ্ডেরীরাম বাটপেরিয়া, লালিমা পাল (পুং) প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অতিরিক্ত বাড়িয়ে বলার ফলে এই দুইজন হাস্যরসিকের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব, জীবন্ত এবং পরিচিত চরিত্র হয়েও তারা ব্যক্তিগত বিদ্রূপের ঊর্ধ্বে সর্বকালীন টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। পরশুরামের আলোচনা-প্রসঙ্গে বিষয়টি আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার সুযোগ পাবো।

জন্মের তারিখ হিসাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ (১৮৪৪-১৯১২)। কিন্তু তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক পরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। সত্য বটে, প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর কবি হবার বাসনা এবং চেষ্টা ছিল। কিন্তু সে সময়ে তাঁর স্বভাবে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করেছিল; সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন থাকা তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গিরিশচন্দ্রের ভগ্নীপতি দেবেন্দ্রনাথ বসু তাঁর এ-সময়ের কথা বর্ণনা করে লিখেছেন, "গিরিশচন্দ্র আবাল্য আমোদপ্রিয় ছিলেন। এই দুর্দমনীয় আমোদপ্রিয়তা দিন দিন তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে টানিয়া লইয়া চলিল। পাড়ায় একটী সমধর্ম্মী বওয়াটে বাউন্ডুলে দলের সৃষ্টি হইল।" এর পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল। "কিন্তু তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল, এবং অচিরে পানদোষ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। জামাতার দিন দিন অধোগতি দেখিয়া শ্বশুর তাঁহাকে নিজের আপিসে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গিরিশের বয়স তখন অনুমান বিংশতিবর্ষ।"

সুখের বিষয়, যে 'বাউনডুলে দল'টির কথা দেবেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন, তার মধ্য দিয়েই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজে পায়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ না করলেও, এবং চাকরিতে ঢুকে গেলেও, গিরিশচন্দ্র নিজে সখের যাত্রার দল গঠন করেছিলেন, এবং পরে বাগবাজার সখের দল প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে গিরিশবাবুর উদ্যম ও সহায়তাতেই বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

অভিনয়-প্রতিভা গিরিশচন্দ্রের জন্মগত ছিল। নট হিসাবে গিরিশচন্দ্র আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে অদ্বিতীয়রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। তাঁর এ-প্রতিভা

বাল্য ও কৈশোরের উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুমাত্র স্তিমিত করতে পারে নি। সহজ সাহিত্যপ্রীতি তাঁকে সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করেছিল। ফলে, "বাল্য ও কৈশোরকালে তিনি যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবি ও হাফ্-আখড়াই গান সর্বদাই শুনিতেন, এবং সেই বয়সেই সে সকলের রস গ্রহণ করিতে পারিতেন।"* তিনি নিজে যে প্রথমে আধুনিক থিয়েটারের দল গঠন না ক'রে যাত্রার দলই গঠন করেছিলেন, তাতে তাঁর প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিতা তিনি কবে থেকে লিখতে আরম্ভ করেন, সঠিক জানা নেই। তবে বাগবাজারের সখের দলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয়ে গান লিখেই গিরিশচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকাশিত হন। নাট্যরচয়িতারূপে ইনি প্রথম আবির্ভূত হন 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ দান করে। কিছু পরে ইনি 'আগমনী' (১৮৭৭), 'অকালবোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' (১৮৭৮), 'মায়াতরু' (১৮৮১), 'মোহিনীপ্রতিমা' (১৮৮১), প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন, এবং এ সময়ের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মেঘনাদ বধ' 'পলাশির যুদ্ধ' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রভৃতিরও নাট্যরূপ দান করেন। ১৮৮১ সালের পূর্বে গিরিশচন্দ্র কোন মৌলিক নাটক রচনায় হাত দেন নি।

গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল অভিনয়ে। বাল্যকাল থেকে যাত্রা-থিয়েটারের দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল, এবং প্রথম যৌবন থেকে সখের যাত্রা-থিয়েটারের দলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তিনি এ-প্রতিভাকে বাড়িয়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সহজাত প্রতিভা এবং চর্চার ফলে তিনি যে অভিনয়-দক্ষতা লাভ করেছিলেন, তা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সম্পূর্ণ তুলনাহীন। তিনি বাংলাদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই তিনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। গিরিশচন্দ্র বাংলাদেশের একজন প্রধান নাট্যকার সত্য ; কিন্তু তিনি প্রথমতঃ নট, দ্বিতীয়তঃ নাট্যকার, একথা স্মরণ রাখা উচিত। সাধারণ

* বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু।

রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তাদের যে-সকল বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার মধ্যে অভিনয়যোগ্য নাটকের অভাবই প্রধান। এ-বিষয়ে অমৃতলাল বসুর উক্তি আগেই উদ্ধৃত করেছি। এ অভাব পূরণের জন্য প্রথম দিকে মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুবিখ্যাত লেখকদের কাব্য-উপন্যাসের নাট্যরূপ দানের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও চাহিদার ফলে যখন এগুলি যথেষ্ট বিবেচিত হোল না, এবং যখন উৎকৃষ্ট গীতিনাট্য, সামাজিক নাটক প্রভৃতির প্রয়োজনও তীব্রভাবে অনুভূত হোল, তখন কৃতী অভিনেতাদের অনেকে নাট্যরচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। গিরিশচন্দ্র প্রথমে নাটকের জন্য গান লিখে, পরে কাব্য-উপন্যাসাদির নাট্যরূপ দিয়ে লেখকরূপে সুপরিচিত হন। তার পরে তিনি গীতিনাট্য রচনা করেন এবং সর্বশেষে মৌলিক নাট্যরচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম মৌলিক ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। এ নাটকখানির রচনা উৎকৃষ্ট নয়, এবং এর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব সুস্পষ্ট।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ মৌলিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে আর গিরিশচন্দ্রের প্রথম মৌলিক নাটক ১৮৮১ সালে। এর থেকেই বোঝা যায়, গিরিশচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তী — এবং ঐতিহাসিক-রোমান্টিক নাটক রচনায় স্পষ্টতঃই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা প্রভাবিত।

বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র "মহাকবি" এই জনপ্রিয় আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কবিত্বশক্তি প্রকৃতপক্ষে কত উচ্চস্তরের ছিল বা না ছিল সে আলোচনা এ-প্রসঙ্গে অবান্তর। তবে বিদ্যালয়গত উচ্চশিক্ষার অভাবে এবং বাল্যাবধি পাঁচালী-যাত্রা-হাফ্-আখড়াই প্রভৃতির প্রতি ঝোঁক, পুরাণকাহিনীর প্রতি আকর্ষণ ও মনোমোহন বসুর প্রভাবে একদিকে তাঁর রচনায় যাত্রার ঢংটি কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, অপরদিকে পৌরাণিক ও ধর্মমূলক কাহিনী তাঁর অধিকাংশ নাটকের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাবও তাঁর মধ্যে ধর্মপ্রাণতা এনে দিয়েছিল, এবং তাঁর রচনাকে ভক্তিরসের দিকে আকর্ষণ করেছিল। সামাজিক পৌরাণিক ও

ভক্তিরসাত্মক রচনা ভিন্ন প্রহসন-জাতীয় অর্থাৎ হাস্যরসাত্মক কয়েকটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু খাঁটি প্রহসন গিরিশচন্দ্র বিশেষ লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর বিখ্যাত 'ঘ্যায়সা-ক্যা-ত্যায়সা' প্রহসনখানি মলিয়েরের রচিত 'L'Amour Me´aecin' অবলম্বন ক'রে লেখা। 'আবু হোসেন' প্রকৃতপক্ষে কৌতুকময় গীতিনাট্য। তাঁর অন্যান্য হাস্যরসাত্মক নাটকের মধ্যে 'বেল্লিক বাজার', 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'পাঁচকনে', 'বড়দিনের বখশিস্' প্রভৃতিকে গ্রন্থকার 'পঞ্চরং' বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, পঞ্চরং বলে কোনো বিশেষ ধরণের রচনা বাংলায় নেই। আসলে বাংলায় এই শব্দটিরই অস্তিত্ব প্রায় নেই বলা যায়। একমাত্র সতরঞ্চ বা দাবা খেলায় এক বিশেষ ধরণের নাকাল সহ পরাজয়কে 'পঞ্চরং' বলে। গিরিশচন্দ্র তাঁর এ-জাতীয় হাস্যরসাশ্রিত নাট্য-নক্‌শাগুলিকে যে প্রহসন না বলে পঞ্চরং বলে অভিহিত করেছেন, তার কারণ, এগুলিতে ঠিক প্রহসনের গুণ নেই। এর মধ্যে কোনো কোনোটির বিভিন্ন দৃশ্য বা অংকের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই, কোনো কেন্দ্রীয় ঘটনা বা চরিত্র অথবা তাদের ক্রমবিকাশ নেই, কাহিনীর সুসম্বদ্ধতা অথবা সুষ্ঠু পরিণতি নেই। 'পূজার পঞ্চরং' বলে বর্ণিত গিরিশ চন্দ্রের 'সপ্তমীতে বিসর্জন' রচনাটি সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, "পূজার বাজারে কাপ্তেন বাবুদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক শ্লেষাত্মক পঞ্চরংখানি লিখিত। ইংরাজিতে যাহাকে Extra-vaganza বলে, ইহা সেই প্রকৃতির।… সামাজিক নাটক বাস্তব সংসারের ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত হয়। এইরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রহসনের গল্প এবং চরিত্র সম্ভব রাজ্যের প্রান্তসীমা হইতে আহৃত হইয়া থাকে — ইহার সকলই উচ্ছৃঙ্খল।" ('গিরিশচন্দ্র')। পূজোর সময় নানা শ্রেণীর বাঙালী বড়মানুষি আমোদ করবার জন্য চড়া সুদে মোটা টাকা ধার ক'রে ঋণে ডুবে যাচ্ছে, কতকগুলি অসংলগ্ন দৃশ্যে, এটাই এ-রচনায় দেখানো হয়েছে। একটু দৃষ্টান্ত দিলে এর ধাঁচটা পরিস্ফুট হবে।

"খানসামা। খোকাবাবু সাবালক হয়েছে, কে হ্যাণ্ডনোট ধার দেবে দাও, এই ঠিকুজী দেখে নাও।

দালাল। কত টাকা নেবেন? পাঁচশো টাকা কমিশন দিতে হবে। পঁচিশ পার্শেণ্টের দরে এক মাসের সুদ আগাম। দালালী বিশ পার্শেণ্ট; গদিয়ানী আর উকীল খরচা। টাকা চান ত' আসুন, — ধনী, উকীল প্রস্তুত, এই সঙ্গে আছে; হ্যাণ্ডনোট লেখা আছে, সই করুন — এই কলম নেন।

উকীল। এই হিসাবে দেখুন,— পাঁচশো টাকা কমিশনে গেল, এক মাসে সুদ আড়াই শো টাকা গেল, এই হ'লো সাড়ে সাতশো; আর দুশো দালালী — এই সাড়ে ন'শো; হাজারের পঞ্চাশ টাকা হাতে আছে, আর আপনার ঘড়ী ঘড়ীর চেন দিলেই উকীল খরচা মিট্‌বে।

... ...

(আদালতের বেলিফ ও জনৈক ওয়ারেণ্টের আসামীর প্রবেশ)

আসামী। বুঝেছ বেলিফ সাহেব। আমি পালাবার ছেলে নই। অমন কতবার ধার করেছি, কতবার জেলে গেছি। আমার সঙ্গে আসুন — পূজোর বাজারটা করে আমি তোমার সঙ্গে জেলে যাচ্ছি; বেশী সওদা কিছু নেই, এই ধর কোম্পানীর ওখান থেকে টাকা শ' চেরেকের কাপড় নেব — এই বডি-টডি জোড়া কতক জুতো, এই এক জায়গা থেকেই সব সওদা হবে। দরওয়ানের কাছ থেকে দু'টাকা ধার ক'রে তোমায় মদ খাইয়ে দেব এখন। হ্যাঁ, আর একবার তোমাকে এসেন্সওয়ালার দোকানে দাঁড়াতে হবে, সেখানে থেকেও বিল সই ক'রে টাকা শ' দুইয়ের এসেন্স নিতে হবে,...আমি বছর বছর জেলে অমন যাই, তুমি কিছু ভেব না।"

এইরূপ বহুবিধ চরিত্র ও তাদের বিবিধপ্রকার দুর্বলতাকে বইটিতে বিদ্রূপ করা হয়েছে। অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু উপরের উদ্ধৃতি থেকে গিরিশচন্দ্রের রসিকতার ধরণটি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। গিরিশ চন্দ্রের রচনাবলী পড়লে বোঝা যায় যে, আসলে হাস্যরস তাঁর স্বভাবজ ছিল না। ভক্তি তাঁর মধ্যে স্বতঃ-প্রবহমান ছিল বলে ভক্তিমূলক এবং

পৌরাণিক নাটকগুলিতে যে আন্তরিকতা ও রচনা-উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, হাস্যরসাত্মক রচনায় তিনি সেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। তবে আমাদের সামাজিক নানা ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সামাজিক নাটকের অনেকগুলিতে আমাদের নানা কুপ্রথাকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। পণপ্রথাকে আক্রমণ ক'রে গিরিশচন্দ্র একদিকে যেমন 'বলিদান' প্রভৃতি করুণরসাত্মক নাটক লিখেছেন, অপরদিকে তেমনি কয়েকটি 'পঞ্চরং' ও সামাজিক নক্শাও রচনা করেছেন। তাঁর সামাজিক নক্শা 'আয়না' এবং 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'র বিষয় পণপ্রথা এবং মেয়ে বিয়ের সমস্যা।

গিরিশচন্দ্র একজন কৃতী নাট্যকার হলেও, তিনি হাস্যরসিক লেখক ছিলেন না। বরং গম্ভীর, রোমান্টিক, ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করেই তাঁর প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ ঘটেছিল। তবুও রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নানা সময়ে তাঁকে হাস্যরসাত্মক 'পঞ্চরং' লিখতে হয়েছে। পূজোর এবং বড়দিনের 'পঞ্চরং' তিনি কয়েকখানিই লিখেছিলেন। এই সব প্রহসনজাতীয় রচনাগুলির হাস্যরস গতানুগতিক, হাস্যরসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতে, কিংবা অন্য কোনো দিক দিয়েই গিরিশচন্দ্র বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। কিন্তু তবু, গিরিশচন্দ্র সাধারণ রসিকতা এবং গতানুগতিক হাসির কথাও এরূপ নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করতেন যে, তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতো। সাধারণ কথার মধ্যেও তিনি অসাধারণ নাট্যরস সঞ্চার করতে পারতেন। এ তাঁর অভিনয়-প্রতিভারই সাক্ষাৎ ফল।

গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র নাটকই রচনা করেন নি। তিনি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি সবই যথেষ্ট রচনা করেছেন। এগুলি থেকেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, গম্ভীর সামাজিক বা পৌরাণিক বিষয়ের দিকেই গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, হাস্যরসের দিকে নয়। তাঁর প্রহসনগুলিতে আমরা যে ধরণের হাস্যরসের সন্ধান পাই, তা প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক। নিছক হাস্যরস গিরিশচন্দ্রের রচনায় অল্পই মেলে।

গিরিশচন্দ্রের সহকর্মী নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)

এক কালে প্রহসন-রচনায় খুব নাম করেছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর ইনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং পরে কাশীতে হোমিওপ্যাথি চর্চায় নিযুক্ত থাকেন। এঁর পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন, অমৃতলালও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের প্রতি এঁর বিশেষ মমত্ববোধ ছিল ব'লে জানা যায়। প্রথম যুগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় ইনি ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা। সে যুগে বিভিন্ন থিয়েটারী দলের মধ্যে নানারূপ রেষারেষি ও দলাদলি ছিল, এখানে সে আলোচনা অবান্তর। তবে নটজীবনের অধিকাংশ কাল অমৃতলাল গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সুবিখ্যাত অভিনেতাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অল্পবয়স থেকেই তিনি হাস্যরসবোধ এবং 'উইট্' এর অনেক পরিচয় দিয়েছিলেন। বিপিনবিহারী গুপ্তের কাছে অমৃতলাল তার দু'একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করেছেন। (পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়)। প্যারডি প্রভৃতি রসরচনায় তিনি প্রথম প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেন তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, "আমার একজন দূর সম্পর্কীয় কাকা ছিলেন; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু। ... তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাঙ্গালা বই পড়িয়া শুনাইতাম; 'ভাস্কর' কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাংলা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। ... তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাঁহার সাক্‌রেদ্ হইয়া উঠিলাম; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপূরণের জন্য আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম।"

এর আগেই অমৃতলালের কবিতা রচনায় হাতে খড়ি হয়েছিল শ্যামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। প্যারীবাবুর মৃত্যুর পর নিয়মিত সাহিত্যচর্চার অভ্যাস না থাকলেও ঘটনাচক্রে অমৃতলাল প্রহসন রচনায় হাত দেন। সে কাহিনী তিনি নিজেই বিবৃত করেছেন, "আমাদের পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল। এক দিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল — 'আপনি আমাদের একটা পালা লিখে দিন।' আমি বলিলাম, 'আমি কি

লিখে দেব?' তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; একখণ্ড দাশুরায়ের পাঁচালি আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম; নামটা বড় ছোটখাট হইল না — 'একেই কি বলে তোদের বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করা?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত।" রসসাহিত্য রচনায় প্রেরণার জন্য তিনি শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র কাছে যে ঋণ স্বীকার করেছেন, শিশিরকুমারের আলোচনা-প্রসঙ্গে সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি।

প্রথমে রঙ্গমঞ্চের জন্য নাট্য-নক্শা বা প্রহসন রচনায় অমৃতলালের যেটুকু সংকোচ ছিল, গিরিশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে তিনি তা কাটিয়ে ওঠেন। গিরিশচন্দ্রের মত অমৃতলালও প্রধানতঃ অভিনেতা ছিলেন। কিছুটা উইট্ও তাঁর ছিল । কিন্তু আজ তাঁর নাটক-প্রহসনাদি পড়লে, কি কারণে বাঙালী তাঁর রচনায় মুগ্ধ হয়েছিল এবং তাঁকে 'রসরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল তা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য মনে হয়। অমৃতলালের কল্পনা-শক্তি বিন্দুমাত্র ছিল না। তাঁর প্রথম "farce" যেমন মধুসূদনের অনুকরণ, তেমনি তাঁর অধিকাংশ নাটক-প্রহসনই হয় ইংরেজী, নতুবা অন্য কোনো দেশী-বিদেশী নাটক-প্রহসনের ছায়া অবলম্বন ক'রে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর মলিয়ের-এর প্রহসন অনুবাদ করা বোধহয় ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা-ক্যা-ত্যায়সা' মলিয়ের-এর ছায়ায় রচিত। অমৃতলালও মলিয়ের-এর ছায়ায় তাঁর 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মলিয়ের-এর মর্মগ্রহণ করার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। তবু গিরিশচন্দ্র প্রতিভাবলে তাঁর রচনাটি উচ্চশ্রেণীর না হোক, চলনসই প্রহসনে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু অমৃতলালের নট-প্রতিভা যতটাই থাকুক, সাহিত্যিক প্রতিভা কিছুমাত্র ছিল বলে আমি মনে করি না। আধুনিক কালের পাঠক ও দর্শকের পক্ষে শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, ভদ্রতা ও শালীনতাবোধ বজায় রেখে অমৃতলালের প্রহসন উপভোগ করা দুঃসাধ্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে অমৃতলাল সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করেছেন, তা বহুল পরিমাণে সত্য।

রসরাজ অমৃতলাল বসু কয়েকখানি সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচনাই প্রহসন, নক্‌শা বা 'পঞ্চরং'। খাপছাড়া অসংলগ্ন রসিকতা-ভরা একজাতীয় নাট্যরচনাকে গিরিশচন্দ্র যে 'পঞ্চরং' নামে অভিহিত করেছিলেন, থিয়েটারী সমাজে সেটা বেশ প্রচলিত হয়েছিল দেখা যায়। অমৃতলাল কয়েকখানি 'পঞ্চরং' লিখেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরবর্তী অনেক নাট্যকারও এ-জাতীয় নাট্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন। পূজা-বড়দিন প্রভৃতি উপলক্ষে এ ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করা বোধহয় থিয়েটারী জগতে একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

অমৃতলালের প্রথম প্রকাশিত প্রহসন 'হীরকচূর্ণ নাটক'টি (১৮৭৫) তৎকালীন এক দেশীয় রাজ্যের ঘটনা নিয়ে রচিত। দ্বিতীয় প্রহসন 'চোরের উপর বাটপারি' মলিয়ের অবলম্বনে লেখা। 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' দু'খানি ইংরেজী প্রহসন অবলম্বন ক'রে রচিত। অন্যান্য প্রহসন ও নাটকগুলিরও অধিকাংশই হয় কোনো সমসাময়িক ঘটনা, নতুবা অন্য কোনো রচনার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। কেবল প্লট নয়, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, ভাব বা শিল্পকৌশল কোনোদিকেই অমৃতলালের বিন্দুমাত্র মৌলিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর নাটক-প্রহসনগুলিতে ঘটনার গতি নেই, চরিত্রের বিকাশ নেই, ভাবের গভীরতা দূরে থাক — পরিচ্ছন্নতা পর্যন্ত নেই, আদর্শের ভান ও বিকৃতি থাকলেও প্রকৃত জীবনাদর্শের চিহ্নমাত্র নেই, পরিস্থিতির নাটকীয়তা নেই এবং হাস্যরস নামে যা আছে, তা রুচি ও শালীনতার দিক থেকে কবিওয়ালাদের খেউড়েরও অধম। কারণ, কবিওয়ালাদের খেউড়ে ব্যক্তিগত গালিগালাজ থাকলেও তা অস্লীলতাহীন ছিল, এবং তা এ-ধরণের হীন ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ থাকতো না। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ঠিকই বলেছেন, জাত-তুলে গাল দেওয়ার কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে অমৃতলাল বসুই দাবি করতে পারেন।

অমৃতলালের একখানি প্রহসন নিয়ে আলোচনা করলেই হয়তো আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। 'সামাজিক নাট্যলীলা' বলে বর্ণিত 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনটি বোধহয় অমৃতলালের নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছিল। নাটকটির কাহিনী এই। গোপীনাথ সরকার নামক এক গৃহস্থ চারিদিকে

দেনাগ্রস্ত, তার গৃহিণীর অলঙ্কার পর্যন্ত ঋণে আবদ্ধ। কেবল তাই নয়, সে পুরো দেড় বৎসর ঝি-এর মাইনে দেয় নি (আশ্চর্য ! ঝিটি ঠিক টিকে আছে !), মুদির দেনা শোধ করে নি (মুদি সব জিনিসের জোগান দিয়ে চলেছে !), ধোপাকে টাকা দেয় নি (ধোপা ঠিক কাপড় কেচে দিচ্ছে !), সবাইকে সে ভরসা দিয়ে রেখেছে, এল্-এ পড়া ছেলের বিয়ে দিয়ে সব দেনা শুধবে, ঝি-এর মাইনে থেকে শুরু করে বন্ধকী দেনা পর্যন্ত ! অমৃতলালের চোখে বোধহয় লেখাপড়া শেখা — বস্তুতঃ সকল প্রকার অগ্রসর মনোবৃত্তিই — অমার্জনীয় অপরাধ এবং তীব্র বিদ্রূপের যোগ্য ব'লে বিবেচিত হোত। তাই শিক্ষিত লোককে বিদ্রূপ করতে তিনি কখনো ছাড়েন নি। কন্যার পিতা মন্মথনাথ মিত্র পাত্রকে দেখতে এলে, হবু শ্বশুর এবং নিজের পিতার সমক্ষেই 'এল্-এ পড়া' ছেলেটির কথাবার্তা একটু শুনুন।

"মন্মথ (মেয়ের বাবা)। নামটি কি বাপু তোমার ?

নন্দ (পাত্র)। এন্. সরকার। ...

লোকনাথ (মেয়ের পিসে)। পূরো নামটি কি বাপু ?

নন্দ। নন্দলাল সরকার ; কিন্তু এখনকার ইউনিভার্সিটিতে হাণ্টারের মত চলিত, সেই মতে এন্. সরকার বল্লে sufficient হলো — লোকেরও বুঝে নেওয়া উচিত।

লোক। ঠাকুরের নাম ?

নন্দ। কি ঠাকুর ?

মন্মথ। পিতার নাম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন।

নন্দ। সামনেই ব'সে আছেন — জিজ্ঞেস কোত্তে পারেন, আমায় ফর্‌নাথিং ট্রবল্ দেওয়ার আবশ্যক ?

মন্মথ। (স্বগত) বাবা, এ কি ছেলে গো ! যেন জাহাজী গোরা।

ঘটক। ছুটো লেখা-পড়ার কথা জিজ্ঞেস করুন দে মশাই, এখনকার সব কলেজের ছেলে, বাপ-পিতামোর নামের ধার ধার না। ...

গোপী। একটু বল, যা জিজ্ঞেস কচ্চেন, শোনই না, এত শিখেছ — কিছু পরিচয় দাও।

নন্দ। পরিচয় আর দিব কি ! আমার "চাদর নিবারিণী সভার" সব

লেকচার পড়েন নি ? — Graduates Guardianএ সব বেরিয়েছিল, গেল Anniversary স্পিচে বলেছিলাম — Of man's first disobedience the evil treat befell on the intellectual biped breed. Nothing excels in enormity the course that alighted like a bombarded bombshell on the heads of Bengalees, (hear, hear, loud applause) I mean the use and abuse of sinful sheets vulgarly known as Chaders — এই চাদরের চত্বরে পড়িয়া বঙ্গবাসী যে কি রাশি রাশি দুঃখার্ণবে দহন হইতেছে, তাহা বলিতে গেলে ওয়েবেষ্টারের Emphasis খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; — (ঘন ঘন করতালি) আর কত বলবো — এই নিন, এই pamphletএ সব আছে, পড়ে নেবেন !"

কি রসিকতা ! এ-জাতীয় রসিকপ্রবরদের কথা স্মরণ করেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হাস্যকৌতুকে' রসিকরাজবাবুর চরিত্রটি এঁকেছিলেন। আর এই দীর্ঘ বক্তৃতায় নাটকীয়তাই বা কী অপরূপ ! অথচ এই নাটকই নাকি এককালে 'নাম' করেছিল !

যাই হোক, পাত্রের এই পরিচয় পাবার পরও কন্যার পিতা সর্বস্বান্ত হয়ে এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অগ্রসর হোল এবং এই বক্তৃতা শোনার অব্যবহিত পরেই পাত্রটিকে একটি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করতে দ্বিধা করলো না !

বিয়ে হয়ে গেল। 'এল্-এ পড়া' শিক্ষিত পাত্রটি বাপের সুপুত্র হয়ে বিয়ে করলো বটে (কারণ পণের টাকাগুলো তার দরকার), কিন্তু বাসি বিয়ের দিন আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কারণ ততক্ষণে সে বিলাসিনী কারফরমা ও মিঃ সিংএর সঙ্গে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে বোম্বাই মেল ধ'রে বিলেত যাবার বন্দোবস্ত করছে। এর আগে এক দৃশ্যে মিঃ সিংএর সঙ্গে সংলাপে নন্দ বলেছে — "আচ্ছা, আপনি তো এই দশ মাস (বিলাতে) ছিলেন, দশ মাসে সব সাহেবের মত হওয়া যায় ?" এবং "বাঙ্গালা কথাটা ভুলে যাওয়া যায় কি ক'রে বলুন দেখি ?" 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রকাশিত

হয় ১২৯১ (১৮৮৪) সনে। সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও কোনো এল্‌-এ পড়া 'শিক্ষিত' ছেলে যে এ জাতীয় কথা বলতে বা ভাবতে পারে, তা কল্পনা করাই শক্ত। বিলাসিনী কারফরমা আর একটি অবাস্তব চরিত্র। সে যেহেতু বি.এ. পাশ ক'রে এম্‌.এ. পড়ছে, সেহেতু তার চরিত্র সর্বদোষান্বিত। মিঃ সিং নামক বিলেতফের্তা (দশ মাস!) সাহেবের সঙ্গে তার সংলাপ একটু উদ্ধৃত করি।

"সিং। ··· আমার বেশ অনুমান হয়েছিল যে আপনি উমাচরণ গুপ্টাকেই সুখী করবেন।

বিলা। অনুমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি একপ্রকার বিবাহ কত্তে স্বীকারও করেছিলাম বটে, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী ব'লে কি ক'রে নিই?

সিং। নেংটো গা? নেংটো পা? লেডীর সামনে? horrible!

বিলা। শকিং।"

স্পষ্টই বোঝা যায়, শিক্ষা এবং শিক্ষিতের প্রতি অমৃতলালের সহানুভূতি তো ছিলই না বরং রীতিমত বিদ্বেষ ছিল। অথচ তিনি শিক্ষাব্রতীর ছেলে। খুব উচ্চশিক্ষা না হোক, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন; এবং তাঁর জীবনীকারদের মতে, শেষজীবনে শিক্ষার প্রতি তাঁর মমতাও জন্মেছিল। অথচ তাঁর সকল প্রহসনে শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রতি তিনি অতি নিম্নশ্রেণীর বিদ্রূপ প্রয়োগ করতে কখনো বিরত হন নি। এর থেকে মনে হয় যে, থিয়েটারী সমাজের সংস্পর্শেই হোক, বা যে-ভাবেই হোক, তাঁর রুচি ও মতামত অত্যন্ত অনগ্রসর ও সেকেলে হয়ে পড়েছিল। পুরোনো আদর্শ নিয়ে প্রাণহীন উচ্ছ্বাস ছাড়া, কোনো প্রকৃত উচ্চাদর্শ, উচ্চ ভাব বা উদার মনোবৃত্তি তাঁর কোনো নাটকেই চোখে পড়ে না।

অমৃতলালের রচনা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা বা উদ্ধৃতি বাহুল্য মনে করি। কারণ, আজকের দিনের পরিচ্ছন্ন-রুচি শিক্ষিত পাঠক তাঁর রচনার মধ্যে হাসির উপকরণ খুব অল্পই খুঁজে পাবেন, এবং তাঁর মতামত ও রুচি দ্বারা পদে পদেই আহত ও বিমুখ হবেন। রঙ্গমঞ্চ-সংশ্লিষ্ট অমৃতলাল প্রমুখ কোনো

কোনো নাট্যকারের রচনায় এরূপ অপরিচ্ছন্ন রুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা শিক্ষিত লোকের পক্ষে সহ্য করা রীতিমত কষ্টকর। সাহিত্যে আমরা যাকে অশ্লীলতা বলি, অনেক সময় তা'ও একটি শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন মনের পরিচয় বহন করে। সাহিত্যে তা সহনীয়। যেমন, ভারতচন্দ্রের অথবা মাইকেল-দীনবন্ধুর অশ্লীলতা। কিন্তু আর এক জাতের অপরিচ্ছন্নতা আছে, যাকে হয়তো সচরাচর অশ্লীল বলে বর্ণনা করা হয় না, কিন্তু তা এতই অসংস্কৃত মলিন মনোভাব প্রকাশ করে, যা শিক্ষা ও রুচিসম্পন্ন মনকে রীতিমত পীড়িত করে। অমৃতলাল-অমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ রঙ্গমঞ্চ-সংশ্লিষ্ট অনেক নাট্যকারের রসিকতাগুলি অধিকাংশই এই স্তরের।

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক-প্রহসন আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি কথা মনে হয়। নাট্যরচনার প্রথম যুগে মাইকেল-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে বাংলা নাটককে যে যুগোচিত বিষয়, রুচি, ভাব ও চিন্তার পথে অগ্রসর ক'রে নিয়ে চলেছিলেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যে রঙ্গমঞ্চ-সংশ্লিষ্ট নাট্যকারদের দ্বারা সে অগ্রগতি রক্ষিত হয়নি। বরং গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যরচয়িতারা বাংলা নাটককে গঠনে, চিন্তায় ও আদর্শে অনেকখানি পিছিয়ে দিলেন। সত্য বটে, দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও পদ্য ও গান ছিল, কিন্তু গঠন-কৌশলে ও ভাবাদর্শে আমাদের নাটক ক্রমশঃ পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শের পথেই পরিণতি লাভ করতে চলেছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত কোনো প্রতিভাশালী সাহিত্যিক এই সময়ে নাটককে হয়তো বৃহত্তর ও মহত্তর সম্ভাবনার পথে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এ-সময় নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যিনি একচ্ছত্র অধিকার লাভ করলেন, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাশালী অভিনেতা ছিলেন সন্দেহ নেই, এবং সাহিত্য-প্রতিভাও তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্য নাটকের গঠন-কৌশল অথবা ভাবাদর্শ হৃদয়ঙ্গম করা অথবা তদনুযায়ী নাটক রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি বাল্যকাল থেকে পাঁচালী, যাত্রা ও ঈশ্বরগুপ্তের রচনারই ভক্ত ছিলেন ; দাশু রায় এবং ঈশ্বর গুপ্তই তাঁর আদর্শ ছিলেন। তাঁর অভিনয়-প্রতিভা এবং নাট্যোৎসাহ প্রথমে যাত্রার দল গঠন ও যাত্রাভিনয়েই

প্রকাশিত হয়। নাট্যরচনায় তিনি যাত্রা-পাঁচালীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনোমোহন বসুর যাত্রার ঢঙে লেখা ভক্তিরসাত্মক পৌরাণিক নাটকও তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে তিনি সহজাত প্রতিভাবলে অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু বাংলা নাটক — যা যাত্রা-পাঁচালীর প্রভাব থেকে ক্রমশঃ মুক্ত হয়ে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে গঠিত হতে চলেছিল — তাকে তিনি পুনরায় যাত্রার প্রভাবে সেকেলে ঢঙের নাটকে পরিণত করলেন।

মঞ্চে সফল এবং সার্থক সামাজিক নাটক গিরিশচন্দ্র লিখেছেন বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়ের সমস্যা প্রভৃতি দু'চারটি ঘরোয়া সমস্যা ছাড়া কোনো গভীর ও দূরপ্রসারী সামাজিক সমস্যা তাঁর নাটকে আলোচিত হয় নি। আধুনিক যুগোচিত কোনো উচ্চাদর্শও সেখানে অনুপস্থিত। যাত্রার ধরণটি তাঁর ভক্তিরসাত্মক ও পৌরাণিক নাটকে অত্যন্ত প্রকট, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। দুঃখের বিষয়, মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট পরবর্তী নাট্যকারেরা গিরিশচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য নাট্যাদর্শ অনুধাবন করার মত প্রবৃত্তি ও শিক্ষা তাঁদের কারুরই ছিল না। কাজেই ভাবের দিক থেকে তা ক্রমশঃই হয়ে দাঁড়াচ্ছিল গতানুগতিক ও স্থূল, গঠনের দিক থেকে ক্রমশঃই তা পাশ্চাত্ত্য নাটকের থেকে সরে সেকেলে যাত্রার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। মঞ্চে এই সব নাটকের মধ্যে অনেকগুলিই সফলতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু আধুনিককালেও অনেক যাত্রা জনপ্রিয় হয়েছে, তা দ্বারা এসব নাটকের আধুনিকতা প্রমাণ হয় না।

এই নাটকগুলির সেকেলে ভাব ও সেকেলে গঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা ও শিক্ষিত — তথা সর্বপ্রকার অগ্রসর মনোবৃত্তির প্রতি বিরূপ মনোভাব। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যখন স্ত্রীভূমিকা অভিনয়ের জন্য বারাঙ্গনা সমাজ থেকে অভিনেত্রী গ্রহণ করা আরম্ভ হয়* (আগে পুরুষ অভিনেতাই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতেন), তখন থেকেই সামাজিক কারণে শিক্ষিত শ্রেণীর মনোভাব থিয়েটারী জগতের প্রতি বিরূপ

* "মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল।"

পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত।

হতে আরম্ভ করে। অভিনেতাদের পক্ষ থেকে শিক্ষিতের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব সম্ভবতঃ এরই প্রতিক্রিয়া। অমৃতলাল বসু ও অমরেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় এই মনোভাবের চরম প্রকাশ দেখতে পাই।

পৌরাণিক ও সমাজিক নাটকে যতটা না হোক, প্রথম যুগের বাংলা প্রহসনে পাশ্চাত্ত্য নাট্যশিল্পের আদর্শ সুষ্ঠু রূপ নিয়েছিল। মাইকেলের প্রহসনেই এ-শিল্পরূপের বিকাশ দেখতে পাই। দীনবন্ধু কিছু কিছু পদ্য ব্যবহার দ্বারা তাঁর প্রহসনের আধুনিকতা কতকটা ক্ষুণ্ণ করলেও, ঘটনা-বিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে ও অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর প্রহসনগুলিকে যে তিনি আদর্শ-স্থানীয় করে তুলেছিলেন, তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইংরেজী নাট্যাদর্শ-প্রণোদিত প্রহসনে ফরাসী শিল্পকৌশল সংযুক্ত ক'রে তাকে আধুনিকতার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পৌরাণিক-সামাজিক নাটক দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও প্রহসনের ক্ষেত্রে এই পূর্ববর্তী লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বরং যাত্রার ঢঙেই প্রহসন রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। ভাব ও চিন্তার দিক থেকে এ-প্রহসনগুলি সামাজিক কুসংস্কার ও অনগ্রসর মনোভাবকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার পরিবর্তে অগ্রগতিকেই বিদ্রূপ করেছে। চরিত্রসৃষ্টিতেও গিরিশ-পরবর্তী নাট্যকারেরা কোনোরূপ কৃতিত্ব দেখানো দূরের কথা, সামান্য বাস্তবতাবোধেরও পরিচয় দিতে পারেন নি। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দত্ত অথবা 'এমন কর্ম আর ক'রব না'র অলীক বাবু চরিত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য অনুধাবন করা এঁদের পক্ষে সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল। তাই এঁদের প্রহসনের হাসি নিতান্ত স্থূল সংলাপজাত হাসি — যদি অবশ্য সেই বস্তুকে হাসি বলে বর্ণনা করা যায়। কাতুকুতু বুড়োর বর্ণনায় সুকুমার রায় বলেছেন,

"বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন দেশী,
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশী।"

অমৃতলাল-অমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ নাট্যকারদের প্রহসনগুলি সম্বন্ধে এ বর্ণনা অতি যথাযথ। গিরিশচন্দ্র ঘোষকে এ-বিষয়ে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, তাঁর হাস্যরসের দিকে কোনো ঝোঁক ছিল না; যা লিখেছেন নিতান্ত

মঞ্চের প্রয়োজনে। তাছাড়া, হাস্যরস উৎপাদনে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব না থাকলেও তাঁর রচনায় ততটা অপরিচ্ছন্নতা নেই। পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকগুলিতে চরিত্রসৃষ্টিতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

অমৃতলাল-প্রমুখ নাট্যকারদের প্রহসনে গানের ছড়াছড়ি আর একটি গুরুতর ত্রুটি। আর গানগুলিও, কি ভাষায়, কি ভাবে, অতি নিম্নস্তরের। নাটক-প্রহসনে গানের বাহুল্য আসলে যাত্রার প্রভাবে মনোমোহন বসুর নাটকে* এবং মনোমোহন বসুর প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের নাটকে এসেছিল। মনোমোহন বসু দেশী যাত্রা আর পাশ্চাত্ত্য নাটকের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন, পরবর্তী নাট্যকারেরা অন্ধের মত মনোমোহন বসু ও গিরিশ ঘোষকে অনুসরণ করেছেন। এ সব নাট্যকারের সাহিত্যিক-প্রতিভা কিছুমাত্র ছিল বলে মনে হয় না। কবিত্বশক্তি তো নয়ই। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়কলার সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করার ফলে তাঁরা হয়তো রঙ্গমঞ্চে উৎরে যাবার মত নাটক-প্রহসন লিখেছেন। হয়তো তার কোনো কোনোটা জনপ্রিয়ও হয়েছে। কিন্তু এসব নাটক-প্রহসনের পাঠযোগ্যতা বিন্দুমাত্র নেই। আধুনিক সাহিত্যরসিক পাঠকের পক্ষে সেগুলি পড়ে উপভোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আসলে সেগুলি সাহিত্য-পদবাচ্য কিনা আধুনিক পাঠকের সে-বিষয়ে সন্দেহ জন্মাও অস্বাভাবিক নয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫—১৯৩২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দশম সন্তান, চতুর্থ কন্যা। ইনি গৃহশিক্ষকের কাছে উন্নত প্রণালীতে সুষ্ঠু শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া, একটি উন্নত রুচিসম্পন্ন সাহিত্যিক পরিবেশে শৈশব থেকে মানুষ হয়েছিলেন বলে সাহিত্যপ্রীতি ছোট বয়স থেকেই এঁর মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায়, স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য-প্রতিভা সহজেই বিস্তার লাভ করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "…মেয়েদের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং তাঁহাদের হৃদয়মনের ঔদার্যও অনেক বর্ধিত হইতেছিল। আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া, ইংরেজী

*"ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন।…বাঙ্গালা নাটকে সৎসঙ্গীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে, সন্দেহ নাই।" মনোমোহন বসু—'সতী নাটকে'র ভূমিকা।

হইতে ভাল ভাল তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম — তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখন তিনি অবিবাহিতা।"*

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রধানতঃ উপন্যাস ও গল্পলেখিকা রূপেই সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি গাথাকাব্য, গীতিকবিতা, গীতিনাট্য, নাটক ও প্রহসন সবই কিছু কিছু লিখেছিলেন, এবং সে সব রচনায় কৃতিত্বও দেখিয়েছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকারূপেও তাঁর কর্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবীর হাস্যরসাত্মক রচনা 'কনে বদল' ও 'পাকচক্র' নামে দু'টি প্রহসন ও 'কৌতুকনাট্য' নামে ছোট ছোট নাট্য-নক্‌শার একটি সংকলন-গ্রন্থে সীমাবদ্ধ। নাট্যশিল্পগত বিচারে প্রহসন দু'টিতে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় না থাকলেও কৌতুকের একটি বিশেষ দিক তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে দিকটি হচ্ছে নারী-চরিত্রের কতকগুলি হাস্যকর দুর্বলতা। 'কৌতুকনাট্য' থেকে একটি ছোট নক্‌শা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

"প্রথমা। তারপর?

দ্বিতীয়া। নেহাৎ শুনবি? সে কিন্তু অনেক ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে।

প্র। তা বারণ করলেই বা আমার কাছে বলবি বইত নয়, আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছিনে।

দ্বি। তা জানি বলেই তোকে বলছি — নইলে কি বলতুম, তা ভাই দেখিস যেন প্রকাশ না হয়।

প্র। মরণ — তুই কি ক্ষেপেচিস — আমার কাছে —

দ্বি। তবে শোন এই সে দিন — কিন্তু তাকে কড়ারটা দিলুম, দেখিস —

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্র। এমন ক্ষেপাও ত কোথাও দেখিনি, আমাকে কথা বলতে ডরাস? এই সেদিন দিনুর মা আমাকে যে বল্লে, তার স্বামী মদ খেয়ে ঘরে এসেছিল — সে কথা কি আমি তোদের কাউকে বলেছি? আমার মত লোহার সিন্ধুক কাউকে পাবিনে।

দ্বি। তা সত্যি — তবে শোন —" (লোহার সিন্ধুক)

'কৌতুকনাট্যে'র অন্তর্গত 'লজ্জাশীলা' চিত্রটিতেও নারীর পরনিন্দা, তোষামোদ এবং সাজসজ্জা-প্রিয়তা নিয়ে উপভোগ্য কৌতুক আছে।

'ক'নে বদল' এবং 'পাকচক্র' এই দু'খানি প্রহসনেই নারী-চরিত্র নিয়ে বহুবিধ কৌতুকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'পাকচক্র' থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"কর্তা। আমি ত আগে থাকতে শ্রীচরণে সবই দিয়ে রেখেছি — যেমনই মাইনেটি পাই, অমনি এনে দিই।

গিন্নি। শোন কথার ছিরি! কুড়ি টাকা ক'রে হাত খরচ কে দেয়?

ক। (স্বগত)— পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে বেড়েছে, সেটা যদি একবার প্রকাশ পায়, তা হলেই গেছি। (প্রকাশ্যে) তা গিন্নি আমার ত খরচও আছে — ২০ টাকা আর কত বল?

গি। তোমার খরচটা কি এত শুনি! সবই ত আমি যোগাচ্ছি। কেবল জামাখানা, কাপড়খানা, তেলটা, সাবানটা, নাপিতটা আসটা — ঐ বই ত নয়!"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাস্যরসাশ্রিত কবিতাগুলির আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি। কিন্তু কবি অপেক্ষা নাট্যকার হিসাবেই তাঁর খ্যাতি বেশি বিস্তৃত। তাঁর নাটকগুলি এখনও জনপ্রিয়। নাটকের প্রতি অনুরাগ থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনয়-প্রতিভা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংশ্রবও কিছু ছিল না। সেইজন্য তাঁর নাটকগুলি অভিনয়যোগ্যতার দিক থেকে নানা ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেগুলি প্রতিভাবান্ উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিকের রচিত নাটক, এবং সেহেতু পূর্ববর্তী মঞ্চসংশ্লিষ্ট নাট্যকারদের রচনার মলিনতা থেকে মুক্ত, এবং সাহিত্য-গুণান্বিত।

তবু, কেবলমাত্র সাহিত্যপ্রতিভা দ্বারাই উৎকৃষ্ট নাটক রচনা সম্ভব হয় না। যেমন, শুধুমাত্র রঙ্গমঞ্চের জ্ঞান ও অভিনয়প্রতিভাই সার্থক নাট্যরচনার প্রেরণা বা শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। বাংলা নাট্যসাহিত্য যে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত পুষ্টিলাভ করেনি, তার অন্যতম কারণ, বাংলা রঙ্গমঞ্চে সমাজ-বহির্ভূতা নারীকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীরূপে গ্রহণ করার পর থেকে সামাজিক দিক থেকে আমাদের থিয়েটারী জগৎ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। সাম্প্রতিক কালে এ-ব্যবধান কিছুটা কমলেও, এতকাল ধ'রে শিক্ষিত সংস্কৃতিমান্ বা সাহিত্যিক সমাজ প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে বা সেরূপ ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ফলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁরা রঙ্গমঞ্চের জ্ঞান, অভিনয়-কলার অভিজ্ঞতা, বা নাট্যশিল্পের বিবিধ প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না ; অপরপক্ষে মঞ্চসংশ্লিষ্ট নাট্যকারগণ অভিনয় ও মঞ্চের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও, সাহিত্য-প্রতিভার অভাবে উচ্চশ্রেণীর নাটক রচনা করতে সমর্থ হন নি। আমাদের নাট্য-সাহিত্য যে এত অনগ্রসর, সাহিত্যিক সমাজ ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সমাজের দুস্তর ব্যবধান তার দ্বিতীয় কারণ ; প্রথম কারণটি আগেই উল্লেখ করেছি। অভিনেতৃ-সমাজ থেকে যে একমাত্র সার্থক নাট্যকারের উদ্ভব হয়েছিল, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু গিরিশচন্দ্র উচ্চ শিক্ষা পাননি ; তাছাড়া, তাঁর যাত্রা-পাঁচালীর দিকে ঝোঁক এবং অনাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নাট্য-সাহিত্যকে ভাবে, ভাষায় ও শিল্পকৌশলে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় নি। পাশ্চাত্ত্যদেশে নাট্যকারদের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতৃ-সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা ক'রে চলতে হয়। আমাদের দেশে গিরিশচন্দ্রের আমল থেকেই সাহিত্যিক ও অভিনেতৃ-সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান ছিল, তা তিনি লাভ করেছিলেন সেক্সপীয়র প্রমুখ নাট্যকারদের বই পড়ে, এবং বিলেতে ও এ-দেশে নাটকের অভিনয় দেখে। কাজেই নাটকের গঠনকৌশল, অভিনয়োপযোগী ঘটনাবিন্যাস বা সংলাপ প্রভৃতি নাট্যশিল্পের বহুবিধ আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অসম্পূর্ণ ছিল। সেইজন্য তাঁর নাটকগুলি স্বগতোক্তি ও

বক্তৃতাভারে প্রপীড়িত। মঞ্চে অভিনয় করার সময়, এইজন্যই সেগুলির অনেক কাটছাঁট প্রয়োজন হয়। • দ্বিজেন্দ্রলাল কেমন ক'রে নাটক-রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, "বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃ দল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison ও Cato এবং Shakespeareএর Julius Caesar এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ সমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়ই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।"*

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে হাস্যরসবোধ প্রবল ছিল, এবং হাস্যরসে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাই হাসির নাটক লিখেই তিনি নাট্যরচনার সূত্রপাত করেন। দুঃখের বিষয়, প্রবল হাস্যরসবোধ সত্ত্বেও হাসির রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ততটা কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁর তীব্র বিদ্রূপ দ্বারা খোঁচা বা আঘাত দেবার প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব বা গোঁড়ামি। তাছাড়া, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ অত্যন্ত তীব্র ছিল, অথচ সাহিত্যের প্রয়োজনে তাদের প্রচ্ছন্ন করার মত সংযম তাঁর ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার'এ প্রাচীন সংস্কার ও গোঁড়ামির প্রতি বিদ্রূপ আছে বটে, কিন্তু নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরত সমাজের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ আরো তীব্র। তাঁর পরবর্তী প্রহসনগুলির মত এ-প্রহসনটিতেও কতকগুলি হাসির গান আছে, এবং হাসির গানগুলিই এর প্রধান আকর্ষণ। নাটক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি প্রহসনকেও উঁচুদরের বলে বর্ণনা করা যায় না। তবে কৌতুকজনক পদ্য

*'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ'—নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭

রচনায় — বিশেষতঃ ছন্দ-মিলে — দ্বিজেন্দ্রলালের যে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, 'কল্কি অবতার'এ তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নাটকটি আগাগোড়া পদ্যে 'মুক্তক ছন্দে' রচিত, কিন্তু গ্রন্থকার নির্দেশ দিয়েছেন, "পদ্যগুলি অবিকল গদ্যের মত পড়িতে হইবে।" প্রস্তাবনা থেকে নিম্নোদ্ধৃতিতে রচনার বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়।

"তৃতীয়তঃ, মানি এ নাটকখানি
সনাতন প্রথাত্যাগী — প্রায় পদ্যের মতন ;
বিশেষ মিত্রাক্ষরে — বটে, এটা খুব 'নতুন'।
আবার মিত্রাক্ষরও কিছু নতুনতরো ;—
অক্ষরের বিপর্যায় গরমিল হোল এ —
এ ছত্রটা তেরোয়, ওটা বিশে, সেটা ষোলয় ;
পূর্বতন প্রথা হয়েছে অন্যথা
এরূপে ;—হাঁ অস্বীকার করি না এ কথা।"

দ্বিতীয় প্রহসন 'বিরহ' নাটক হিসাবে উৎকৃষ্ট না হলেও, তীব্র বিদ্রূপ দ্বারা কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে আঘাত দেবার চেষ্টা নেই বলে এর মধ্যে খুব সূক্ষ্মস্তরের না হলেও যথেষ্ট হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তৃতীয় প্রহসন, 'ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার'এ অমৃতলালের প্রভাব পড়েছে। কি ঘটনা-বিন্যাসে, কি রুচিতে, এ-প্রহসনটি নাটক হিসাবেও উৎকৃষ্ট নয়, হাস্যরসেও সমৃদ্ধ হয় নি। 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের গোঁড়ামির সঙ্গে তৎকালীন জনপ্রিয় প্রহসনগুলির ভাব ও রুচি যুক্ত হয়েছিল, ফলে নাট্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবেও এটি যেমন ব্যর্থরচনা, অনগ্রসর মত ও চিন্তার প্রকাশে তেমনি যুগানুপযোগী। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা বোধহয় 'পুনর্জন্ম'। এটি মঞ্চেও সফল হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ প্রহসন 'আনন্দ বিদায়ে' কি ভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন সে কাহিনী আজ ভুলে যাওয়াই ভালো।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৌলিকতা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর রচনায় ইংরেজী সাহিত্যের ছায়া প্রায়ই দেখা যায়। দেশাত্মবোধমূলক

কতকগুলি কবিতায়, তাঁর নাটকে এবং তাঁর 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলিতে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবকে তিনি প্রচ্ছন্ন করতেও চেষ্টা করেন নি। নাট্যশিল্পের জ্ঞান বা নাট্যপ্রতিভাও যে তাঁর খুব বেশি ছিল, এমন মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান দক্ষতা ছিল হাস্যরস উৎপাদনে। যদি কোনো কোনো বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ তাঁর হাস্যরসবোধকে আচ্ছন্ন না করতো, তাহলে তিনি হাস্যরসিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর স্থান অধিকার করে থাকতে পারতেন।

তবু নাটক-প্রহসনের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রচেষ্টা ও তাঁর প্রভাব সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য। কারণ, যে-যুগে রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ গণ্ডির থেকে উদ্ভূত অসাহিত্যিক নাট্যকারদের নাটক-প্রহসন সাহিত্যের এই বিভাগকে অপাঠ্য রুচিহীন পঙ্কিলতার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, সে যুগে উচ্চশিক্ষিত রুচিসম্পন্ন সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাগুলি নাটক-প্রহসনকে পুনরায় সাহিত্যগুণান্বিত এবং পাঠযোগ্য করে তুললো। তা ছাড়া, দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের আর একটি মহৎ সংস্কার সাধন করেছিলেন। সেকালে গানের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তিনি তাঁর নাটক-প্রহসনে গানের বাহুল্য রেখেছিলেন সত্য (তাঁর হাসির গানগুলিই ছিল এগুলির মধ্যে সব চেয়ে উপভোগের বস্তু), কিন্তু সংলাপে তিনি পদ্য সম্পূর্ণ বর্জন এবং গদ্যভাষা গ্রহণ ক'রে যথেষ্ট সৎসাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "প্রথমে Shakepeareএর অনুকরণে Blank Verseএ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। "তারাবাই" প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কাপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর — মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই — এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল — যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হবে।...তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে

কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেইজন্য আমি আমার তারাবাইয়ের পরবর্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান মেবার পতন ও শাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি।"*

নাটকের সংলাপে পদ্য ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণরূপে গদ্যের ব্যবহারের ফলে বাংলা নাটক আধুনিকতার পথে এক ধাপ অগ্রসর হোল। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের মত উচ্চস্তরের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যিক যখন সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চের জন্য নাটক লিখতে অগ্রসর হলেন, তখন মঞ্চের জন্য নাটক রচনায় সাহিত্যিক সমাজের সংকোচ কিছুটা কমে গিয়েছিল বলে মনে হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাংলা নাটকের রুচি যে অনেকটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে, এবং মঞ্চাভিনয়ের নাটক যে ক্রমশঃই সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে চলেছে, এর মূলে যুগপ্রভাব তো আছেই, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবও কিছুটা থাকা সম্ভব বলে মনে করি।

যদিও বয়সে অনেক ছোট, তবু অমরেন্দ্রনাথ দত্তও (১৮৭৬-১৯১৬) এ যুগের প্রহসনরচয়িতা ও নাট্যকারদের মধ্যে গণনীয়। ইনি এক উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তবু, অল্প বয়সেই ইনি কুসংসর্গে পড়েছিলেন এবং লেখাপড়াও ভালো ক'রে শেখেন নি। এঁকে কুসংসর্গ এবং কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য এঁর মেজদা হীরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম এঁকে নানারূপে শাসন করতেন, কিন্তু পরে অমরেন্দ্রনাথের প্রতি পিতার প্রশ্রয়ের ফলে কনিষ্ঠকে সংশোধন করার সকল চেষ্টা থেকে তিনি বিরত হন। থিয়েটারী জগৎ অমরেন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল, এবং বলতে গেলে কৈশোরেই তিনি থিয়েটারী জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন।

রঙ্গমঞ্চের জগতে নট ও নাট্যকাররূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সহজ এবং প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ নিজেই রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষরূপে

* নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭

দেখা দিলেন, যেমন সাহিত্যযশঃপ্রার্থী সাহিত্যিকরূপে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য নিজেই পত্রিকা বার করে সম্পাদকরূপে দেখা দেন। ইনি প্রথম করিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' মঞ্চস্থ করেন এবং তাতে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা নিয়ে তাকে ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয় আরম্ভ করেন।

প্রথম দিকে অমরেন্দ্রনাথ শুধু প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলি অভিনয় করতেন। অভিনেতারূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্রমে তিনি নাটক-প্রহসন রচনায় হাত দেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে অধিকাংশই রঙ্গনাট্য-নকশা-পঞ্চরং প্রভৃতি, অর্থাৎ প্রহসন জাতীয়।

নাট্যরচনায় অমরেন্দ্রনাথের কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল বলে মনে হয় না। আর, তাঁর রঙ্গনাট্য বা নক্শা-পঞ্চরং-এ তিনি যা পরিবেশন করেছেন, তাকে হাস্যরস বলে কল্পনা করাই শক্ত। শিক্ষা ও শিক্ষিতের প্রতি বিদ্বেষ অমরেন্দ্রনাথের রচনায় অতিপ্রবলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখের বিষয় এই যে, উচ্চশিক্ষিত পরিবারের সন্তান হয়েও শিক্ষিতদের সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ও বিকৃত ধারণারই তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'মজা' নামক 'সামাজিক নকসা' থেকে একটু পরিচয় দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন, অমরেন্দ্রনাথের রচনায় কী জাতীয় রুচি ও মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই নকশার প্রস্তাবনায় নটীগণের এই গীতটি আছে।

"সাঁচ্চা বুলি, আমরা বলি, ভয় করিনা তাই।
ব'লবো ছুটো, নয়কো ঝুটো, রাগ করোনা ভাই॥
কুলের বধূ ঘরের কোণে বসে থাকে ঘোমটা টেনে,
ছাড়িয়ে শাড়ী চড়াও গাড়ী, লজ্জা সরম নাই;
পার্কে যাওয়া, খাওয়াও হাওয়া, বলবো কি আর ফাই ফাই॥"

কী ভাব! কী রচনা! কী কবিত্ব! কী রুচি! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোওয়া যেমন, অমরেন্দ্র দত্তের পদ্যরচনাও সেরূপ। এই প্রহসনের নায়িকা বড়লোকের একমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়ে 'ফুলকুমারী'র বয়স উনিশ বছর। সে কথায় কথায় ইংরেজী বুকনি ঝাড়ে এবং বাবা-মাকে পাপ্পা-মাম্মা ব'লে সম্বোধন করে। এদিকে আবার সে অনবরত পয়ার ছন্দে পদ্য আওড়ায়,

যে সব পদ্যের বক্তব্য ও রুচি অত্যন্ত সেকেলে ও গ্রাম্য। ফুলকুমারীর আওড়ানো এরূপ একটি পদ্য উদ্ধৃত করছি। এর থেকে শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে অমরেন্দ্র দত্তের কিরূপ ধারণা ও কি জাতীয় মনোভাব ছিল, তার একটু পরিচয় পাওয়া যাবে।

"চ'ড়ব গাড়ী, চ'ড়ব "হুইল", খেলব সখের টেনিস
দেখব যেমন, শিখব তেমন, তবে "কেরিয়ার ফিনিস।"
রেসে যাব, ডিনার খাব, পেলিটি হোটেলে
ঘরে বসে রাইস্ ডালে আর কি মন ভোলে॥
পাপ্পা মামা দু'জন মিলে উড়ালে নিশান।
পেয়েছি নূতন পথ ইমানসিপেসান॥
ফ্রিলাভ শিখতে যাব ইডেন গার্ডেনে।
জুলিয়েট সম প্রেম রোমিওর সনে॥"

ফুলকুমারীর আর একটি গান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই নট ও নাট্যকারের 'প্রহসন' নামধেয় কদর্য রচনাগুলির আলোচনা শেষ করতে পারি।

"সামলে চলা যায় কি পাপ্পা, পেয়েছি এজুকেসন।
প্রাণের ভিতর ভাবের লহর যেন প্যাসিফিক ওসান॥
ফ্রিলাভ্ এ চাই ট্রাজিডি,
অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমিডি,
ফ্যান্সি লেডী বলবে তবে, হবে কেমন নিউ ফ্যাসান॥"

এই প্রহসনে নিতাই নামে একটি চরিত্র এক রসিকতা শুনে বিদ্রূপ ক'রে বলেছে, "আহা! যেন গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা, কি মধুর।" সমস্ত প্রহসনখানির মধ্যে এই একটি মাত্র ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে একমত হয়ে আমরা এর তারিফ্ করতে পারি।

বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষ রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা দিয়েই আরম্ভ হয়। এর আগে, দোম এণ্টনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমান কাথলিক সংবাদ', পাদ্রি আসুম্প্‌সামের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, এবং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আইনের বই প্রভৃতিকে বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা চলে মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলা গদ্যে বাইবেলের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু গদ্যভাষার সে-আদর্শ বাঙালী গ্রহণ করে নি। শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার মত ব্যবহারিক বাংলা গদ্যের উদ্ভব হ'ল রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা। এঁরা অনেকেই টমাস, কেরি প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারক সাহেবদের মুন্সী ছিলেন, এবং প্রথমতঃ বাইবেল অনুবাদের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সদ্য-আগত ইংরেজ কর্মচারীদের দেশী ভাষা শিক্ষার জন্য গদ্যরচনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ ছাপা হয়ে বেরুলো রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ সালে ; ঐ বছরই পাদ্রি কেরির 'কথোপকথন'ও প্রকাশিত হয়। পরের বছর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন', রামরামের 'লিপিমালা' ও গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হোল। প্রথম যুগের গদ্যরচনার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান। প্রাথমিক উদ্দেশ্য শিক্ষণোপযোগী গদ্যভাষা গঠন হ'লেও, এই নবগঠিত ভাষায় লিখিত হোল বর্ণনা, ইতিহাস ও উপাখ্যান ; তাদের মূল ছিল কখনো সংস্কৃত সাহিত্যে, কখনো লোকপ্রচলিত কাহিনীতে। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' এই কাহিনী-ইতিহাসের দৃষ্টান্ত। বাংলা গদ্যে বিষয় ও রীতির বহুবৈচিত্র্যের সম্ভাবনা দেখা দিল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনায়। তিনি কিছু গদ্য রচনা করলেন সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করে, কিছু লিখলেন শিক্ষামূলক নীতিকথা, এবং কিছু লিখলেন লোক-প্রচলিত কাহিনী, উপখ্যান প্রভৃতি।

একেবারে প্রথম যুগের গদ্যরচয়িতা হয়েও ভাষাগঠনে, বিশেষতঃ বিষয় ও ভাবোপযোগী বিভিন্ন বিচিত্র ভাষার আদর্শ রচনায় মৃত্যুঞ্জয় (১৭৬২-১৮১৯) যে কৃতিত্ব দেখালেন, তা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি একদিকে উচ্চচিন্তা ও গভীর ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে সংস্কৃতশব্দবহুল দুরূহ গম্ভীর গদ্যরচনা করলেন, অপরদিকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের উপযোগী অনতিদুর্বোধ্য বর্ণনাত্মক ভাষার আদর্শ উপস্থিত করলেন; আবার লঘু বর্ণনা ও ভাবের উপযোগী সহজ সরল গদ্য রচনা ক'রে ভাব ও বিষয় অনুযায়ী বাংলা গদ্যের বিচিত্র বহুমুখী সম্ভাবনাকেও তিনিই উন্মুক্ত ক'রে দিলেন।

লঘু রচনার উপযোগী সহজ সরল ভাষার বহু উদাহরণের মধ্যে লোক-প্রচলিত কতকগুলি কৌতুকজনক কাহিনীও মৃত্যুঞ্জয় গদ্যভাষায় গ্রথিত করেছিলেন। এসব রচনায় মৃত্যুঞ্জয় সম্ভবতঃ নিজে কোনো কৌতুক বা পরিহাস করেন নি, অথবা হাস্যরস উৎপাদনের চেষ্টা করেন নি; তবু প্রথম যুগের গদ্যে কৌতুককর কাহিনীর নিদর্শন হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা থেকে একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে। তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া। পুত্রের নাম ঠক্। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাইধূলা আঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদসের ঘি দিয়া দেশে দেশে সহরে সহরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনিয়মিতবেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়া সুদ্ধা তৌলায়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে তবে তাহাকে দেয় না। বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত দেবতাদির হোমে উপযুক্ত। আমি ঐ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না। যদি তোমার দেব ব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয় তাহার এক আদসের ন্যূন করিয়া ঘড়া সমেত দিতে পারি কিন্তু ঘড়া হইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্বদা দিতে পারি না। কেননা যদি কিছু দেই তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবেন না কহিবেন এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস্ কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস্ অবশিষ্ট ভাগ দেবতাদিগকে দেয় হয় না। তবে লইয়া কি করিব?"

এই মজার গল্পটির শেষাংশ থেকে আর একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"তদন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ববৎ পাগল হইয়া ভু ভু কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল যাও যাও ভাই আমার সহিত কৌতুক করার কার্য নাই আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতেও ভু ভু এই মাত্র উত্তর করিল। এইরূপে কিছু দিন সেথা থাকিয়া নানাপ্রকার ভয় ভীতি প্রদর্শন দ্বারা যত যত তাগাদা করে তাহাতে কেবল ভু পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ভাল রে বেটা ভাল আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও ভাঁড়াইলি। তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস্ যে শিখাইল ভু তারেই দিলি ভু। এই কহিয়া চোরেরা লাজে কাঁদে না এতন্ন্যায়ে কেবল ভেকুয়া হইয়া ভবনে গেলেন।"

যদিও প্রথম যুগের গদ্য পদ্য নাটকে হাস্যরস প্রধানতঃ সামাজিক বিদ্রূপ দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছে, তবু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারে হাস্যরসাশ্রিত এ-রচনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক নয়। তার কারণ, সাহিত্যসৃষ্টি মৃত্যুঞ্জয়ের লক্ষ্য ছিল না, ভাষার বিভিন্ন বিচিত্র রীতির নিদর্শন উপস্থিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারের যুগ। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্রমুখ লেখকদের রচনায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। তৎপরবর্তী সাহিত্যপ্রচেষ্টা কিন্তু প্রথম থেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নিবদ্ধ ছিল। এর কারণ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। পদ্য ও নাট্যসাহিত্যে যেমন ব্যঙ্গাত্মক ও নক্শাজাতীয় রচনারই প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিল, গদ্যসাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

গদ্যে প্রথম লোকমনোরঞ্জক সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; (১৭৮৭-১৮৪৮) এবং গদ্যসাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টির কৃতিত্বও তাঁরই। এর আগেই অবশ্য উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) তাঁর 'কথোপকথন'-এ বিভিন্ন সমাজের কথোপকথনের দৃষ্টান্তের মধ্যে কৌতুকজনক মেয়েলি কোন্দলেরও উদাহরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেরি বা

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় সচেতন ভাবে সাহিত্যসৃষ্টি বা ব্যঙ্গ-কৌতুক উৎপাদনের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক যিনি সামাজিক দোষ-ত্রুটি অবলম্বন করে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন।

ভবানীচরণ গদ্যে পদ্যে যে সব বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'আশ্চর্য উপাখ্যান' "মুক্ত কালীশঙ্কর রায়ের বিবরণ, ক্ষমতাদি কীর্ত্তিকৃত্য ইহাতে বর্ণন॥" অর্থাৎ পদ্যে রচিত নড়াইলের রাজা কালীশঙ্কর রায়ের জীবনচরিত বা নড়াইল রাজপরিবারের প্রশস্তি। 'কলিকাতা কমলালয়'ও হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ নয়, সদ্য কলিকাতায় আগত কোনো পল্লীবাসীর সঙ্গে নগরবাসীর কথোপকথনচ্ছলে কলকাতার হালচাল বোঝানো হয়েছে। ভবানীচরণ 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁর সম্পাদনা-কালে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকায় 'বাবুর উপাখ্যান', 'শৌকীন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ', 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত', 'বৈষ্ণব', 'বৈদ্যসংবাদ' প্রভৃতি নামে কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক নক্শা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে কোনো কোনোটিকে যদিও ভবানীচরণ অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রেরিত বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন, তবু রচনারীতি লক্ষ্য করলে সেগুলি ভবানীচরণেরই রচনা বলে ধরে নেওয়া যায়। সে-সময়ে ভবানীচরণের মত ঐরূপ কৌতুকজনক ব্যঙ্গরচনা লিখতে সমর্থ দ্বিতীয় ব্যক্তি কে ছিলেন, তাও অনুমান করা যায় না।

ভবানীচরণের প্রধান কৃতিত্ব তাঁর 'প্রমথনাথ শর্মা' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত 'নববাবুবিলাস' নামক ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থে। 'নববাবুবিলাস' শুধু প্রথম ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাশ্রিত গদ্যরচনা নয়, বাংলা উপন্যাসের বীজও বোধহয় এই গ্রন্থেই উপ্ত হয়েছিল। তেইশ বৎসর পরে প্রকাশিত টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', যার মধ্যে সমালোচকেরা বাংলা উপন্যাসের অঙ্কুর দেখতে পান, 'নববাবুবিলাসে'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকাই সম্ভব। এ-প্রসঙ্গে ১৮৫৯ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন, "...যথার্থ ব্যঙ্গকাব্যের মধ্যে "নববাবুবিলাস" নামক গদ্য পুস্তকের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।...মাসিক পত্রিকা নামক এক ক্ষুদ্র সাময়িক পত্রে "আলালের ঘরের দুলাল" শিরোনাথে একটি প্রস্তাব প্রকট হয়।...ঐ প্রবন্ধের আদর্শ "নববাবুবিলাস"।" ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পাদ্রি লঙ

সাহেব এ বইখানিকে "one of the ablest satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago" বলে বর্ণনা করেছিলেন।

এই নববাবু কিরূপ পদার্থ তা ভবানীচরণের রচনাতেই প্রকট। "ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা বাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন ইহারা অখণ্ড দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত ক্রমাগত বিবিধবিত্তবিশিষ্ট বিদ্যাযুত শ্রীযুত বাবু জনগণ সন্নিধানে স্বস্ব নাম সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া প্রথমত পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালক বাবুদিগের শিক্ষা কারণ গুরুমহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।"

গুরুমশাইয়ের কাছে এই হবু বাবুদের যেরূপ শিক্ষা হয় তা বলাই বাহুল্য; কারণ, "শিক্ষাকার যদ্যপি বাবুদিগের শরীরে স্বল্প বেত্রাঘাতাদি করেন কিম্বা ভয়জনক বাক্য কহেন তবে কর্ত্তামহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবা না আর ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবা না যেরূপ ক্ষুদ্র লোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক সদা অনুনয় বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা…।" ফলে বাবুদের যেরূপ শিক্ষা হোল, তার দৃষ্টান্ত—"বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার বাবুদিগের নিজ সমিভ্যারে লইয়া কর্ত্তা মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন আর কহিলেন মহাশয় … বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় লউন কর্ত্তা কহিলেন আপন আপন নাম লেখ প্রথম বড়বাবু আপন নাম লিখিতেছেন উচ্চৈঃস্বরে শ্রী লেখ জ লেখ গ লেখ ত লেখ দ লেখ ল লেখ র লেখ ইহাই লিখিয়া পাঠ করিলেন শ্রীজগদ্দুল্লভ … পরে ছোটবাবুকে কহিলেন তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে চল

সেই স্থানে যাইয়া গৃহিণীকে কহিলেন বাবুদিগের কি প্রকার বিদ্যা হইয়াছে তাহা শুন তিনি ··· ছোটপুত্রকে কহিলেন লেখ দেখি আমি যে নাম কহিলাম ছোটবাবু কহিলেন গুরুমহাশয় আমাকে এ নাম লেখান নাই গৃহিণী কহিলেন তুমি কেন শিক্ষাইয়া দেও না সেই বাক্যানুরোধে শিক্ষাইতেছেন শ্রী লেখ ক লেখ এক দাঁড়ি ফেল খ লেখ গ তে সাবঘোড় ওকার দেও আর ম তে হ্রস্বউকার একটু নীচে টানিয়া দেও ইহা লেখাইয়া পাঠ করাইলেন শ্রীরত্নেশ্বরী ··· ইত্যাদি পরিচয়ানন্তর শ্লোক যথা অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা। বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং॥ এই শ্লোক গুরুমহাশয় কিরূপ শিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন তথাপি লিখি যথা অবু তবু গিরিস্থত মায় বলে পড় পুত পড়িলে শুনিলে হুদিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি শ্লোক শুনিবামাত্র কর্ত্তা আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন।”

হবু বাবুরা এইরূপ শিক্ষা এবং পরে উপযুক্ত সঙ্গী সাথী পেলেন ; যথা “নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহুবলে রমণীমেলক গাওক বাদক নর্ত্তক নর্ত্তকী ভণ্ডপ্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীন বাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন বাবুসকল দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য হইয়া বসিয়াছেন কেহ কেহ বাবু কিবা ধীর কি গভীর কেহ বলে বাবুর কিবা পাণ্ডিত্য কি বক্তৃতায় তাৎপর্য জ্ঞান হয় সাক্ষাতে সরস্বতী কেহ কেহ কিবা সুধারা কি রসিকতা এমত প্রায় সম্ভব হয় না”। তারপর বিলাসে ব্যসনে স্বভাবে চরিত্রে তাঁরা কিরূপ হলেন, কি জাতীয় কার্যকলাপে লিপ্ত হলেন এবং তাঁদের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হ'ল, এই-ই ‘নববাবুবিলাসে’র কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে কাহিনী অত্যন্তই ক্ষীণ, নেই বল্লেই হয়। কেবলমাত্র নববাবুদের চরিত্র ও কার্যকলাপের বর্ণনাই বইটির প্রায় সব। তবু বাংলা উপন্যাসের বীজ এই গ্রন্থেই উপ্ত হয়েছিল ; ‘আলালের ঘরের দুলাল’-এ টেকচাঁদ তাকে অঙ্কুরিত করেন।*

* সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স রচিত ‘ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’ নামক গ্রন্থখানি আবিষ্কার ও সম্পাদনা ক'রে বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসরূপে উপস্থিত করেছেন। চিত্তরঞ্জন বাবুর এ দাবি যুক্তিযুক্ত হলেও ‘ফুলমনি ও করুণা’র প্রচার সম্ভবতঃ পাদ্রি ও খৃষ্টান সমাজেই প্রচলিত ছিল। বাঙালী সাহিত্যিকরা যে এর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কাহিনী যাই হোক এই গ্রন্থে তৎকালীন হঠাৎ-বড়লোক কলকাতিয়া বাবু সমাজের যে ব্যঙ্গময় নকল বা caricature ভবনীচরণ পরিবেশন করেছেন, তা বর্ণনার গুণে অত্যন্ত সরস ও কৌতুকাবহ হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। ভবানীচরণের ভাষাও তৎকালীন গদ্যভাষার তুলনায় যথেষ্ট সহজ সরল ও সর্বজনবোধ্য। কেবল কাহিনী নয়, ভাষাতেও টেকচাঁদ ঠাকুর যে 'নববাবুবিলাস'কেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, এরূপ মনে করা নিতান্ত অসংগত হবে না। 'নববাবুবিলাসে'র তিনটি সংস্করণ হয়েছিল, এবং বইখানি যে শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রমাণ, 'আলালের ঘরের দুলালে' টেকচাঁদ, 'হুতোম প্যাচার নকশা'য় হুতোম, এমন কি 'একেই বলে সভ্যতা'য় মাইকেল মধুস্দন দত্ত, এই কলকাতিয়া নববাবুর চরিত্রটি 'ঘিরেই তাঁদের কাহিনী গঠন করেছিলেন। প্রচুর জনপ্রিয়তার ফলে এই 'নববাবুবিলাসে'র উপর ভিত্তি করে একটি নাটকও রচিত হয়েছিল।

'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রিকায় 'বাবুর উপাখ্যান' নামে অজ্ঞাতনামা লেখকের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। যদিও এই লেখাটি "প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছেন" বলে সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তি ছিল, তবু এটি ভবানীচরণেরই রচিত বলে সন্দেহ হয়। একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হোল।

"সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুসা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিস্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে ২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন। …

সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন।"

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য যে-সব বই লিখেছেন, তার মধ্যে

একমাত্র 'দূতীবিলাস' নামে গ্রন্থখানি ব্যঙ্গাত্মক। 'কলিকাতা কমলালয়', 'আশ্চর্য উপাখ্যান' প্রভৃতি গ্রন্থ নক্‌শা বা বিদ্রূপাত্মক নয়, একথা উল্লেখ করেছি। 'দূতীবিলাস' ভবানীচরণ স্বনামে প্রকাশ করেছিলেন, এবং বইটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থখানি অশ্লীল, বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য বলে মনে হয় না। এ সময়ে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নববিবি-বিলাস' নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর গ্রন্থকার বলেছেন যে, 'নববাবুবিলাসে'র জনপ্রিয়তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ঐ নববাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ তাঁদের অন্তঃপুরিকাদের কিরূপ অধঃপতন হয় তাই বর্ণনা ক'রে তিনি 'নববিবিবিলাস' রচনা করেন। তিনি আরও বলেছেন যে 'নববিবিবিলাস' 'নববাবুবিলাস' ও 'দূতীবিলাসে'র মধ্যবর্তী কাহিনী। 'নববিবিবিলাস'-রচয়িতার এ সব উক্তি থেকে এই ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে গ্রন্থখানি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই রচনা। আধুনিক কালে শ্রীসজনীকান্ত দাস বইটি ভবানীচরণের নামেই সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু বইটি বস্তুতঃই ভবানীচরণের লিখিত কিনা এ-বিষয়ে ঘোরতর সংশয় আছে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, অধ্যাপক সুকুমার সেনও তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' 'নববিবিবিলাস' অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত বলে বর্ণনা করেছেন। এরূপ সংশয়ের কারণ এই,—

প্রথমতঃ, ভবানীচরণ প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে 'নববাবুবিলাস' রচনা করলেও, এই ব্যঙ্গাত্মক রচনাটির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে স্বনামেই 'দূতী-বিলাস' প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের প্রচুর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পূর্বতন ছদ্মনাম এবং স্বনাম ত্যাগ ক'রে নূতন ছদ্মনাম গ্রহণ ক'রে তাঁর দু'খানি বইয়ের মধ্যবর্তী অংশ রচনা করবেন, এটা মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা সাহিত্যে যখনই যে লেখক এবং যে বই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে, তখনই তার অসংখ্য অনুকারী দেখা দিয়েছে। কি সেকালে কি একালে এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে একজনের সফলতা ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহু অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের রচনাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে চেয়েছে। 'হুতোম প্যাঁচার

নক্‌শা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় হুতোম এদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখেছেন যে, 'নববাবুবিলাসে'র জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, এবং 'নববাবু-বিলাস' ও 'দূতীবিলাস' 'নববিবিবিলাসে'র পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড, তার কারণ, আমার মনে হয়, তিনি ইচ্ছে ক'রেই লোকের মনে এই ধারণা জন্মাতে চেয়েছেন যে, তিনি এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিন্ন ব্যক্তি। এক কথায়, তিনি ভবানীচরণের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ভবানীচরণের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন; এবং স্বীকার করতে হবে যে, সে চেষ্টায় তিনি কৃতকার্যও হয়েছিলেন; কারণ, 'নববাবুবিলাসে'র মত 'নববিবিবিলাসের'ও তিনটি সংস্করণ হয়েছিল, এবং ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বস্তুতঃ ভবানীচরণেরই ছদ্মনাম এ-বিশ্বাস লোকের মনে এরূপ বদ্ধমূল হয়েছিল যে, আধুনিক কালের সমালোচকও সে ধারণা কাটাতে পারেন নি।

তৃতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ বিচারেও 'নববিবিবিলাস' ও 'নববাবুবিলাস'কে একই লেখকের রচনা বলে মেনে নেওয়া শক্ত। যাঁরা উভয় গ্রন্থ পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে ভবানীচরণের রচনার সে কৌতুকময় ভঙ্গিটি 'নববিবিবিলাসে' একেবারেই অনুপস্থিত। উভয় গ্রন্থের মিল মাত্র এই যে, দু'টিই একই সমাজ নিয়ে রচিত, এবং উভয় গ্রন্থেই গদ্যের মাঝে মাঝে পদ্যের মিশ্রণ আছে। এটা অবশ্য তাৎকালিক একটা বৈশিষ্ট্য। শুধু গদ্যই যে সাহিত্যের বাহন হতে পারে এ ধারণাটি বোধহয় তখনো সাহিত্যিকরা ঠিক হৃদয়ংগম করতে পারেন নি। তাই তৎকালীন নাটক ও গদ্যসাহিত্য সর্বত্রই প্রচুর পদ্যের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

'নববিবিবিলাস' পড়ে এর মধ্যে হাসির বস্তু আমি অন্ততঃ খুঁজে পাই নি। সেকালের বড়লোকরা অনেকেই রক্ষিতা প্রভৃতি নিয়ে বাইরে রাত্রিযাপন করতো। সে-ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিতা স্ত্রীদের কিরূপে পদস্খলন ঘটতো, এবং গৃহত্যাগের পর তাদের কলঙ্কময় জীবন কিরূপ শোচনীয় পরিণামে গিয়ে পৌঁছুত, সেইটুকুই এ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। এ বইখানি আগাগোড়া অশ্লীলতায় ভরা — কুরুচি ও অশ্লীলতাকে যদি হাস্যরসের উপকরণ বলে স্বীকার করা যায়, তবেই মাত্র এটির মধ্যে কিছু হাসির বস্তু পাওয়া যেতে

পারে। বইটি যে কী জাতের, এর আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করলেই পাঠক তার পরিচয় পাবেন। "নববিবিবিলাস। অর্থাৎ। কুলটাধর্মে কুলকামিনীর দুঃখপ্রকাশ যথা। অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টনী সর্বশেষে। সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী। এতদ্‌বৃত্তান্ত বিস্তৃত গ্রন্থ॥ অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড। চতুষ্টয়ে কুলটাগঞ্জন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জনে। ও মনোরঞ্জনে ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্তে। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত"। 'নববিবিবিলাসে'র অশ্লীলতম অংশগুলি পদ্যে লেখা।

ভবানীচরণের পর আধুনিক বাংলাভাষার জনকরূপে খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯১) হাস্যরসিক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য বলে গণনা করতে হবে। বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নিয়ে সে সময়ে পণ্ডিত-মহলে বহু তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং উদার সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরকে পণ্ডিতসমাজের তীব্র আক্রমণের লক্ষ্য হতে হয়েছিল। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের এই সব আক্রমণের প্রতিবাদরূপে ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে পাঁচখানি বেনামী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাগুলি কার লেখা গ্রন্থকার তা যথাসাধ্য গোপন রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু এই পাঁচখানি যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই রচনা এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই।

এই পাঁচখানি বইয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়খানির নাম 'অতি অল্প হইল' এবং 'আবার অতি অল্প হইল'। উভয়ই 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত'। বহুবিবাহের স্বপক্ষে এবং বিদ্যাসাগরের মতকে আক্রমণ ক'রে তারানাথ তর্কবাচস্পতি যা লিখেছিলেন, পুস্তিকা দুটি তারই প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র উষ্মা প্রকাশ না ক'রে এমনই সরস ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন যে এর ফলটা হয়েছে মারাত্মক। 'আবার অতি অল্প হইল' থেকে একটি নমুনা আনা যেতে পারে।

"এ স্থলে খুড় মহাশয়কে (তারানাথ তর্কবাচস্পতি) আর একটি উপদেশ অর্থাৎ গালি দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি অতঃপর যা কিছু লিখিবেন, কলেজের পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন, দ্বারী বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন, কেরাণী কালী গাঙ্গুলি, জমাদার জুরাণ সিংহ প্রভৃতি তাঁর যে-সকল বিশিষ্ট আত্মীয়

আছেন, তাঁহাদিগকে না দেখাইয়া তাহা প্রচার না করেন। কালী গাঙ্গুলি ও জুরাণ সিংহ, খুড়র মত, সংস্কৃত বিদ্যায় ফাজিল নহেন, যথার্থ বটে; কিন্তু খুড় অপেক্ষা, তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা ভাল, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহারা, সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে, সম্যক্ সাহায্য করিতে না পারুন, কিন্তু বুদ্ধি দিতে পারিবেন ··· অথবা, আমার এ উপদেশ অর্থাৎ গালি দেওয়া সর্বথা নিরর্থক হইতেছে; কারণ, খুড় পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও মানুষ জ্ঞান করেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সংস্কৃতবিদ্যা কেবল তাঁর পেটেই অন্তঃসলিলা বহিতেছে।" ('আবার অতি অল্প হইল')

১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত (১৮৮৪) 'ব্রজবিলাস' গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে দেখা যায়, এটি 'যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য। কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।' নবদ্বীপের স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভায় সংস্কৃত ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, এ পুস্তিকাটি তারই উত্তর। প্রধানতঃ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এ গ্রন্থের বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বলে বইটির নাম 'ব্রজবিলাস', কিন্তু ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভার আরো অনেককেই বিদ্যাসাগর আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে 'নদিয়ার চাঁদ' বলে উল্লেখ ক'রে একটি পাদটীকায় বলা হচ্ছে, "আমি এস্থলে, শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু, শ্রীমতী যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা দেবী, ইতিপূর্বে, শ্রীমান ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের। সুতরাং, উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যপাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু, এ পর্যন্ত, এক সময়ে, দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং, একজন বই দুজনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, উভয়ের মধ্যে, একজন এক বারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; এবং, ঐ উপলক্ষে, দুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতগুঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভাল দেখায় না। এ জন্য, আমার বিবেচনায়, সমাংশ করিয়া, দুজনকেই এক এক অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, বিদায় করা উচিত।"

বিদ্যাসাগরের অপর দু'খানি পুস্তিকার মধ্যে 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' প্রণীত 'বিনয়পত্রিকা' অপেক্ষাকৃত গম্ভীর চালের যুক্তিতর্কসমন্বিত রচনা; গ্রন্থকারের নামেই তার ইঙ্গিত আছে। 'রত্নপরীক্ষা — অর্থাৎ শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, এই তিন পণ্ডিতরত্নের পরিচয় প্রদান' আর একখানি বিদ্রূপাত্মক পুস্তিকা — এর প্রণেতা 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য'।

বিদ্যাসাগরের এ পুস্তিকাগুলি বিদ্রূপাত্মক সত্য, কিন্তু তৎকালে হাস্যরসাশ্রিত সকল রচনাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছিল। সে হিসাবে, সাময়িক বিচারে, বিদ্যাসাগরের এ পুস্তিকাগুলি উল্লেখযোগ্য হাস্যরসাত্মক রচনা। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মতে এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা "বাঙ্গালাভাষায় অতি অল্পই আছে"। অবশ্য বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপগুলি অনেকটা ব্যক্তিগত, 'নববাবুবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতির মত সামাজিক বিদ্রূপ নয়; অতএব প্রকৃতপক্ষে স্যাটায়াররূপে গণনীয় নয়। তবু, এই সব পুস্তিকায় পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হাস্যরসিক বিদ্যাসাগরের যে সমন্বয় হয়েছিল, তা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। বিদ্যাসাগরকে সকলেই গুরুগম্ভীর বিষয়ের লেখক বলেই জানতেন, সেই জন্যই এসব পুস্তিকার রচয়িতারূপে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছিলেন। তাহলেও ঠাট্টা বিদ্রূপের ফাঁকে ফাঁকে এ রচনাগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি এবং বিদ্যাসাগরের সুপরিচিত মতামতের প্রকাশ দেখে কেউ কেউ প্রথম থেকেই অনুমান করেছিলেন যে এগুলি বিদ্যাসাগরেরই রচনা। 'আবার অতি অল্প হইল' পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর এ-সন্দেহ নিরসন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "এ স্থলে, আর একটি মজার কথা না বলিয়া, ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। উপযুক্ত ভাইপোর পুস্তক পড়িয়া, অনেকে বেয়াড়া খুসি হইয়াছেন, এবং উপযুক্ত ভাইপো লোকটা কে, ইহা জানিবার জন্য, অনেকের অতিশয় ঔৎসুক্য ও কৌতূহল জন্মিয়াছে। কেহ কহিতেছেন, অমুক; কেহ কহিতেছেন অমুক। কেহ কেহ এত বড় সুবোধ যে, বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত ভাইপোর জায়গায় বসাইতেছেন। ... ভাগ্য ক্রমে, আমি এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ি নাই, এবং শীঘ্র ধরা পড়িব তাহাও সম্ভব বোধ হইতেছে না। লোকে জানে, আমার

চালাকি ও ফচ্‌কিয়ামি আইসে না; কিন্তু আমার পুস্তকে ঐ দুয়ের ভাগই অধিক; সুতরাং, আমি ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের রচয়িতা, লোকের সহসা এরূপ সংস্কার হওয়া সম্ভব নহে। বস্তুতঃ, অমি চালাক ও ফচ্‌কিয়া নই। কিন্তু মা সরস্বতীর আমার উপর এমনি দয়া যে, লিখিতে বসিলে, অস্মদীয় অতি দুর্দ্দান্ত, মহাবল, পরাক্রান্ত কলম বাহাদুরের প্রফুল্ল মুখপদ্ম হইতে, ফচ্‌কিয়ামি মধু ভিন্ন, অন্য কোনও রস, বড় একটা নির্গত হয় না।”

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩) বিদ্যাসাগর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল' নিয়ে প্যারীচাঁদ সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হবার অনেক আগেই গদ্যরচয়িতারূপে বিদ্যাসাগরের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বস্তুতঃ, বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রতিক্রিয়া রূপেই আলালী ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানি ১৬ই আগস্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে বরাবর মুদ্রিত হোত।

“এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।”

এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা থেকে 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। তখন প্যারীচাঁদ মিত্রের বয়স চল্লিশ বৎসর। 'মাসিক পত্রিকা'র যে-উদ্দেশ্য পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রচারিত হয়েছিল, তার থেকে মনে হয় যে, সর্বজনবোধ্য ভাষায় লোক-মনোরঞ্জক রচনার অভাব পূরণ করাই এ-পত্রিকার লক্ষ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে-ভাষার সর্বজনবোধ্যতা ছিল না। স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকারা, সংস্কৃতশব্দবহুল বিদ্যাসাগরী

ভাষা বুঝতে বা উপভোগ করতে পারতেন না। এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প-শিক্ষিতদের জন্যই 'মাসিক পত্রিকা'র প্রয়োজন হয়েছিল।

সংস্কৃতিমান্ সমাজে বিদ্যাসাগরী ভাষা সাহিত্যের ভাষারূপে গৃহীত ও প্রচলিত হওয়ার পরে বিদ্যাসাগরী ভাষার আদর্শে অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক রচনাবলী লিখিত হয়। এই ভাষা বুঝতে পারা সকল শিক্ষিত লোকের পক্ষেও সহজ ছিল না। তাই পাঠকসমাজে বাংলা ভাষার এই দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এ-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবার পূর্ব পর্যন্ত লোকপ্রচলিত সহজ ভাষায় গদ্যরচনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

আলালী ভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, "একদিকে পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর, অপরদিকে খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষা যখন নবজীবন লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃত-বহুল হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষানুরাগী লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট, ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে পাঁচজন ইংরেজী শিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র বসিলেই এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরের' ন্যায় পত্রেও সেই উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশিত হইত। অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া, "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি শব্দের সহিত "চিট্‌টীমিষা" শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালার ভার দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, "মাসিক পত্রিকা" নামে এক ক্ষুদ্রকায়া পত্রিকা দেখা দিল। প্যারীচাঁদ

মিত্র ও রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা লোক-প্রচলিত সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত। স্ত্রীলোকে বালকে যেন বুঝিতে পারে এই লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ লিখিতেন।”

এর থেকে মনে হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র যখন ‘মাসিক পত্রিকা’য় ‘আলালের ঘরের দুলাল’ লিখতে আরম্ভ করেন, তখন উচ্চস্তরের সাহিত্যরস পরিবেশনের অপেক্ষা অপণ্ডিত, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের নিকট সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য রচনা উপস্থিত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর সে উদ্দেশ্য যে কতদূর সফল হয়েছিল, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “মাসিক পত্রিকা পড়িতে সকলে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিত। কখন পত্রিকা আসে তজ্জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত।”

‘আলালী’ ভাষার সৃষ্টি প্যারীচাঁদ মিত্রের মহত্তম কীর্তি। ‘লুপ্তরত্নোদ্ধারে’র ভূমিকায় ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদের স্থান’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, " ‘‘আলালের ঘরের দুলাল’’ বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু “আলালের ঘরের দুলালে”র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ। আমি এমন বলিতেছিনা যে “আলালের ঘরের দুলালে”র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ-ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে।… “আলালের ঘরের দুলালে”র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।’’

প্যারীচাঁদ ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র, এবং উচ্চ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তিনি যে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' পত্রিকা দু'খানির নিয়মিত লেখক ছিলেন, এবং এ-দু'টি পত্রিকার পরিচালনা ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এতে মনে হয় যে, 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মধ্যে তাঁর খুব প্রতিপত্তি ছিল। রাধানাথ শিকদারও এই দলভুক্ত ছিলেন। এভারেস্ট আবিষ্কর্তারূপে এঁর নামও বাংলাদেশে সুপরিচিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর বিবরণ থেকে জানতে পারি, বিদ্যাসাগরী ভাষার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ইংরেজী শিক্ষিত সমাজেই বেশি হয়েছিল। সেই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজই ছিল সেকালে সকল প্রকার সংস্কারে — বিশেষতঃ নারীশিক্ষায় — অগ্রণী। সে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ কৃতবিদ্য ও বহুমুখী প্রতিভাশালী প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্য দিয়ে অতি-সংস্কৃতবহুল ভাষার বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথ পেয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা নয়, "উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ।" প্যারীচাঁদ মিত্র স্বয়ংও 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখবার সময় সম্ভবতঃ এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি সংস্কৃতিসম্পন্ন বা cultured সমাজের একজন হয়ে এই অসংস্কৃত ভাষা পরিবেশনে হয়তো প্রথমে কিছুটা সংকোচ বোধ করেছিলেন। নতুবা তিনি তাঁর রচনা 'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে প্রকাশ করবার প্রয়োজন অনুভব করতেন কিনা সন্দেহ। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষাকে যে প্যারীচাঁদ উচ্চ সাহিত্যের আদর্শ ভাষা বলে চালাতে চাননি, তার আরো প্রমাণ এই যে, 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়', এই দু'খানি বই ভিন্ন তাঁর অন্য এবং পরবর্তী বইগুলিতে তিনি সংস্কৃতবহুল ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

অতএব এই অনুমান অসংগত নয় যে 'মাসিক পত্রিকা'র প্রকাশ এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার দ্বারা প্যারীচাঁদ মিত্রের উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা যারা উচ্চ শিক্ষার অভাব হেতু সাহিত্যের রসে বঞ্চিত,

তাদের কাছে সহজবোধ্য বাংলায় চিত্তবিনোদনের উপকরণ উপস্থিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনে যে তিনি অসামান্য সফলতা অর্জন করেছিলেন, 'আলালের ঘরের দুলালে'র জনপ্রিয়তা ও খ্যাতিই তার প্রমাণ।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলালে'র একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ-বৈশিষ্ট্য প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সাহিত্যে লোকপ্রচলিত কথ্য ভাষার ব্যবহার। আমরা আজ যাকে চলতি ভাষা বলি, তার প্রধান লক্ষণ চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার। সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কেবলমাত্র কথ্য ভাষার ক্রিয়া ব্যবহার দ্বারাই অনতিসরল ভাষাও আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী চলতি ভাষারূপে পরিগণিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষাকে আমরা সে অর্থে চলতি ভাষা বলে গণনা করতে না পারলেও, এই বইখানির মধ্য দিয়েই প্যারীচাঁদ মিত্র সাহিত্যে লোকপ্রচলিত তথাকথিত অমার্জিত ও অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ক'রে ভাষা ব্যবহারের বৃহৎ সম্ভাবনার পথ খুলে দেন। কেবল তাই নয়, 'আলালের ঘরের দুলালে'র অন্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তিনি সেই সেই চরিত্রের উপযোগী ভাষা ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করলেন না। ফলে ঠক্ চাচা ও চাচীর মুখে আমরা উর্দু মিশ্রিত অমার্জিত ভাষা এবং অন্যান্য সকলের মুখে তত্তৎ চরিত্রোপযোগী ভাষাই শুনতে পাই। এই মুখের ভাষা বা কথিত ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার ফলে কেবল যে টেকচাঁদের রচনায় নাটকীয়তা সৃষ্টি হ'ল তা নয়, টেকচাঁদের রচনার মধ্য দিয়েই প্রথম চরিত্রানুযায়ী কথিত ভাষা, এমন কি উর্দু মিশ্রিত মুসলমানী ভাষা বা নীচ নাগরিক ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতিটিও প্রবর্তিত হ'ল। কাহিনীর ভাষার আদর্শ টেকচাঁদই 'আলালের ঘরের দুলালে' সর্বপ্রথম উপস্থিত করলেন, যদিও এ-ভাষাকে মার্জিত বাংলার সঙ্গে সমন্বিত করে উপন্যাসের উপযোগী ভাষা সৃষ্টির গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য।

'আলালের ঘরের দুলাল' রচনায় প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় কৃতিত্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, তাঁর কাহিনীর মৌলিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা

ইংরাজী গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না।...এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।"

এই প্রশংসাবাদ রচনা করবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের কথাই উল্লেখ করেছেন, এবং সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের কথাই তাঁর মনে ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' প্রভৃতি রচনার কথা সম্ভবতঃ তাঁর মনে পড়ে নি। আদিযুগের গদ্যরচয়িতাদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা কতটা স্পষ্ট ছিল জানা নেই। কিন্তু 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধারে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের গদ্য লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।"

এখন, ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাসে'র সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে 'আলালের ঘরের দুলালে' কাহিনীর মৌলিকতা কতখানি। মতিলাল চরিত্রটি আসলে 'নববাবুবিলাসে'র নববাবুদের আদর্শে রচিত, এ-বিষয়ে সন্দেহের খুব বেশি অবকাশ নেই। নববাবুদের শিক্ষাদীক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র যেরূপ ছিল, মতিলালের চরিত্র প্রায় অবিকল তদনুরূপ। মতিলালের পিতা বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু "তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব শুবাদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রের তাদৃক্ গৌরব হয় না।" 'নববাবুবিলাসে'র কর্তাও এই শ্রেণীর লোক। "দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরে"র সংশ্রবে নানারূপ কাজ ক'রে যারা পয়সা করেছিলেন 'নববাবুবিলাসে'র কর্তাও সেই অনতি-

শিক্ষিত 'স্ব নাম সম্ভ্রমাভিলাষী' দলের অন্তর্গত। উভয় গ্রন্থেরই বিষয় বড়লোকের আদুরে ছেলের বা spoilt child-এর অধঃপতন ও শোচনীয় পরিণামের কাহিনী। 'সধবার একাদশী'র অটলও এই শ্রেণীর। প্যারীচাঁদের গ্রন্থটি *The Spoilt Child* নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছিল, এবং বিলাতে প্রচার লাভ করেছিল। এই দুই কাহিনীর সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রও লক্ষ্য করেছিলেন, এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' যে 'নববাবুবিলাস'কে ভিত্তি করেই রচিত, 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' একথা উল্লেখ করেছিলেন।*

বস্তুতঃ, প্যারীচাঁদ মিত্রের সমগ্র রচনাবলী পড়ে ধারণা জন্মে যে, তিনি বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন প্রধানতঃ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে। সেজন্য কাহিনীর মৌলিকতা অপেক্ষা রচনার সহজবোধ্যতার দিকেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। সেকালে সাহিত্যের ভাষার দুর্বোধ্যতা-হেতু পাঠকসংখ্যার যে সংকীর্ণতা ছিল, একদিকে তিনি তার প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে অশিক্ষা ও অসৎসঙ্গ হেতু মানুষের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হয়, তারই চিত্র উপস্থিত ক'রে একটি নৈতিক আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' বইটিতেও তিনি স্বকল্পিত কোনো কাহিনীর অবতারণা করেন নি, প্রচলিত গাল-গল্প থেকে উপকরণ নিয়ে মদ্যপানের বিষময় ফল দেখাতেই চেষ্টা করেছেন। 'মদ খাওয়া বড় দায়'-এর আগড়ভমের দীর্ঘ কাহিনীটি স্পষ্টতঃই সেক্সপীয়রের ফলস্টাফ্ চরিত্রের ছায়া ও পক্ষীর দলের নৈতিক হীনতার উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। কাহিনী-গ্রন্থনে প্যারীচাঁদের কোন বইয়েতেই মৌলিকতা দেখাবার প্রয়াস নেই। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'রামারঞ্জিকা'র বিষয় নারীর আদর্শ প্রচার, এবং এই সব আদর্শ তিনি কোথাও পাশ্চাত্ত্যদেশীয় ইতিহাস ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী থেকে এবং কোথাও বা আমাদের পুরাণেতিহাসের কাহিনী এবং চরিত্র থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। টেকচাঁদের পরবর্তী গ্রন্থ 'যৎকিঞ্চিৎ' ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনা। এর পর 'অভেদী', নামে 'আধ্যাত্মিক উপন্যাস' হলেও, এর কাহিনী বলতে গেলে

* পৃঃ ১৭১ দ্রষ্টব্য।

কিছুই নয়। 'আধ্যাত্মিকা' সম্বন্ধেও সেকথা প্রযোজ্য। 'বামাতোষিণী' নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী — আসলে এর কাহিনী অতি ক্ষীণ, নীতিশিক্ষাই প্রধান। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু প্যারীচাঁদের সকল বইয়ে এই সংস্কারকের মনোভাব ও আদর্শস্থাপনের প্রয়াস প্রবল। কিন্তু কাহিনীর মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায় না।

ইংরেজ-সংস্পর্শ ও ইংরেজী শিক্ষার ফলে সে-যুগের সাহিত্যিক প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কার এবং সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ-প্রতিষ্ঠার দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের বহুবিধ আদর্শ-প্রণোদিত কার্যকলাপের মধ্যে বাংলা সাহিত্যকে সাহিত্যরসবঞ্চিত অনতিশিক্ষিত বা সংস্কৃতানভিজ্ঞ জনসাধারণের অধিগম্য ক'রে তোলা এবং সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ প্রচার করাও ছিল অন্যতম। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে কেবলমাত্র আনন্দ বিতরণ নয়, সাহিত্যের মধ্য দিয়েই যে সকল আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার প্রয়োজন, বাংলা সাহিত্যের সেই নবযুগে এই বোধ সকল সাহিত্যিকের মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভাষাকে সহজবোধ্যরূপে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে, বিশেষতঃ নারীসমাজে, পৌঁছে দিতে না পারলে আদর্শ-প্রচার অসম্ভব, এই বোধ থেকেই, আমার বিশ্বাস, 'মাসিক পত্রিকা'র জন্ম ও 'আলালের ঘরের দুলালের' সূত্রপাত হয়। সহজ ভাষার মধ্য দিয়েই নীতিমূলক সাহিত্যকে সাধারণ লোক, বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস প্যারীচাঁদের ছিল। সর্বজনের প্রয়োজনে কালক্রমে এ জাতীয় সর্বজনবোধ্য ভাষার ব্যবহার সাহিত্যে প্রচলিত হবে বলেই তিনি মনে করতেন। তার প্রমাণ, "মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন? — লোকে ঘরে আট-পৌরে যাহা হয় পরিয়া আত্মীয়জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা এইখানে। আপনি, দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভা-সমাজে সর্ব্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব!" ··· তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়া, উত্তেজিত

ভাবে প্যারীচাঁদ বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে ? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।" মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-সহকারে তদুত্তরে বলিলেন,"It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit," ('মধুস্মৃতি', নগেন্দ্রনাথ সোম)

প্যারীচাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী যে কতদূর সত্য হয়েছে, "language of Fishermen" ই যে পণ্ডিতী ভাষাকে ক্রমে সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জলতার পথে অগ্রসর ক'রে দিয়েছে, এ-কথা বলা আজ বাহুল্য মাত্র। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলে গেছেন, তা এমনই যথার্থ যে সে সব কথার পুনরবতারণা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটা কথা, আমার মনে হয়, এ-প্রসঙ্গে সংযোগ করা যেতে পারে। তা এই।—

'আলালের ঘরের দুলাল' বর্ণনাত্মক কাহিনী হলেও এর মধ্যে টেকচাঁদ ঠাকুর বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তত্তৎ চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠক্‌চাচা ও ঠক্‌চাচীর মুখে যে ভাষা শুনতে পাই, সে ভাষা নগরবাসী নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমান সমাজের মুখের ভাষা। সংলাপে চরিত্রানুযায়ী ভাষা, বিশেষতঃ অমার্জিত ভাষার ব্যবহার এই প্রথম। আমার মনে হয়, মাইকেল-দীনবন্ধু প্রহসন রচনাকালে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর আগে উইলিয়াম কেরি তাঁর কথোপকথনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথ্যভাষার উদাহরণ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু কোনো বর্ণনাত্মক রচনা, কাহিনী বা নাটকে চরিত্রানুযায়ী এইরূপ অমার্জিত ভাষার ব্যবহার আমরা দেখতে পাই না। মাইকেল মধুসূদনের প্রহসনে হানিফ-দম্পতির ভাষা এবং দীনবন্ধুর রচনায় তোরাপ-আদুরীর ভাষার যে বাস্তবতা এই চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ জীবন্ত ও নিখুঁত করে তুলেছে, তার আদর্শ কি প্যারীচাঁদের ঠক্‌চাচা চরিত্রেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়নি ? টেকচাঁদের কাহিনী-গুলির একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা সংলাপের প্রাধান্য। শুধু 'আলাল' বা 'মদ খাওয়া বড় দায়' নয়, তাঁর 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মি-কাতে'ও এই গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনাত্মক রচনায় সংলাপের প্রাধান্য ও সংলাপে চরিত্রোচিত ভাষার ব্যবহার তাঁর রচনায় একটা

নাটকীয়তা এনে দিয়েছে যা পরবর্তী নাট্যকারদের প্রভাবিত করা সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বাস্তবদৃষ্টি ও বাস্তবতাবোধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের প্রহসন দু'টিতেও চরিত্রসৃষ্টির বাস্তবতাই সেগুলিকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে ঠক্‌চাচা চরিত্রসৃষ্টিতে যে বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাই, তা পরবর্তীকালের নাট্য ও গদ্যসাহিত্যের পথ প্রদর্শক বলে গণ্য হতে পারে। প্যারীচাঁদ তাঁর কাহিনীগ্রন্থনে ও চরিত্রসৃষ্টিতে কল্পনার আশ্রয় নেন নি। প্রথমটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন পূর্ববর্তী বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং লোকপ্রচলিত আখ্যান উপাখ্যান থেকে; দ্বিতীয়টি তিনি তুলে নিয়েছিলেন তাঁর চোখে-দেখা সমাজ ও ব্যক্তিচরিত্র থেকে। তাই দীনবন্ধুর বাস্তবতাবোধ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে তা বহুলাংশে প্রযোজ্য। 'আলালের ঘরের দুলাল' ব্যঙ্গাত্মক রচনা; তাই ব্যঙ্গের অযোগ্য সাধু ও উন্নত চরিত্র প্যারীচাঁদের হাতে ঠিক বিকাশ লাভ করেনি। যেমন বরদা বাবু এবং রামলাল চরিত্র। এ-বিষয়ে প্যারীচাঁদের সঙ্গে দীনবন্ধুর সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। দীনবন্ধুর সাধু ও উন্নত চরিত্রগুলি সম্বন্ধে নিষ্প্রাণতা ও অবাস্তবতার যে অভিযোগ করা হয়, টেকচাঁদের বরদাবাবু বা রামলাল চরিত্রের প্রতিও সে অভিযোগ প্রযোজ্য। তার কারণ, প্যারীচাঁদ ও দীনবন্ধু উভয়েই একই ধরণের সংবেদনশীল সংস্কারাভিলাষী সামাজিক ব্যঙ্গ-রচয়িতা। উভয়েই আদর্শবাদী হয়েও ঘোরতর বস্তুনিষ্ঠ লেখক; এবং উভয়েই নীচ, হীন বা ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রের মুখে যে বাস্তব ভাষা ব্যবহার করেছেন, উচ্চ চরিত্রের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে সাহস পাননি। আর একটি কথা। যিনি মনে প্রাণে বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যিক, তাঁর পক্ষে কাল্পনিক আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি সহজ নয়। মতিলাল বা ঠক্‌চাচার চরিত্র প্যারীচাঁদ চোখে দেখে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু বরদা বাবু ও রামলালের মত আদর্শচরিত্র সংসারে দুর্লভ বলে তাদের তিনি চোখে দেখেন নি, তাঁকে এসব চরিত্র কল্পনা করে নিতে হয়েছিল। 'অভেদী' নামক আধ্যাত্মিক উপন্যাসে লালবুঝ্‌করের চরিত্রটির অদর্শও তিনি বাস্তব জগতেই দেখেছিলেন বলে ধারণা জন্মে। কিন্তু অন্য চরিত্রের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

ঠক্‌চাচা বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় চরিত্র। এ-জাতীয় ভণ্ড সুবিধাবাদী চরিত্র সর্বযুগেই দেখা যায়। মুকুন্দরাম তাঁর জীবনে এ-জাতীয় লোক কিছু কিছু দেখে থাকবেন, নতুবা তাঁর মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, প্রভৃতি চরিত্র এত জীবন্ত মনে হোত না। ভারতচন্দ্রও হীরা মালিনীর মধ্যে এক কপট স্বার্থান্বেষীর চরিত্র স্পষ্টরেখায় ফুটিয়েছেন। হীরা মালিনীর চরিত্র সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছেন। তবু, আমার মনে হয়, মুকুন্দরামের মুরারি শীল ও দুর্বলা দাসীর ছায়াই হীরা মালিনীতে জমাট বেঁধেছে। কিন্তু প্যারীচাঁদের ঠক্‌চাচা তাঁর একান্তই নিজস্ব এক অতুলনীয় সৃষ্টি। প্যারীচাঁদের বাস্তবদৃষ্টি এবং রচনাকৌশলের শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই ঠকচাচা হাস্যরসাত্মক চরিত্র হলেও এ-চরিত্রে এমন একটি করুণ রসের ধারা মিশ্রিত হয়েছে যে, ঠক্‌চাচা-চরিত্র প্রকৃতই বাংলা সাহিত্যের উচ্চস্তরের সৃষ্টিরূপে সার্থকতা লাভ করেছে। দ্বীপান্তর বাসে যাত্রা করবার আগে ঠকচাচা বলছে, "মোকানবি গেল — বিবির সাতে বি মোলাকাত হল না — মোর বড় ডর তেনে বি পেল্টে সাদি করে।" কাহিনী-রচনায় প্যারীচাঁদ মৌলিকতার পরিচয় দেন নি বটে, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে যে মৌলিকতা তাঁর ঠক্‌চাচা প্রভৃতি চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তা সম্পূর্ণ অদ্বিতীয়।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আলালের ঘরের দুলাল'কে "প্রথম সম্পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস" বলে বর্ণনা করেছেন। আমার বিশ্বাস খুব কম সমালোচকই এ-বিষয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হবেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একটু পরে মন্তব্য করেছেন, "আলালের ঘরের দুলাল বাংলা উপন্যাসের পথ প্রদর্শক মাত্র।" অধ্যাপক সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এ-প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রশংসায় কার্পণ্য করেন নি সত্য, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'ই যে উপন্যাসের সম্পূর্ণ রূপটি প্রকাশ পেয়েছিল, এমন কথা একবারও বলেন নি। তবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাসে' উপন্যাসের যে বীজ বপন

করেছিলেন, 'আলালের ঘরের দুলালে'ই তা প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল, এপর্যন্ত বোধহয় নিঃসংশয়েই বলা যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' বই দু'খানি ব্যঙ্গরচনা। দু'খানি রচনারই উদ্দেশ্য, অসৎসঙ্গ, মদ্যপান বা চারিত্রিক অধঃপতনের কুফল দেখানো। প্যারীচাঁদ ব্যঙ্গ-রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তাঁকে প্রধানতঃ হাস্যরসিক লেখক বলে গণনা করা যায় কিনা সন্দেহ। তাঁর বর্ণনাগুলি কৌতুকপ্রদ, কিন্তু তার মধ্যে হাস্যরসসৃষ্টির জন্য প্যারীচাঁদের বিশেষ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'আলালের ঘরের দুলালে' যেটুকু কৌতুক পেয়েছে, তা নিখুঁতভাবে মানবচরিত্রের শঠতা ও দুর্বলতা বর্ণনায়। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

"হু-হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল···অল্পক্ষণের মধ্যে দুই তিন খানা নৌকা মারা গেল।···বাবুরাম বাবু ত্রাসে কাঁদিতে লাগিলেন ও বলিলেন — ঠক্‌চাচা কি হইবে!···ঠক্‌চাচারও ভয় হইয়াছে কিন্তু তিনি পুরাণ পাপী মুখে বড় দড় — বলিলেন ডর কেন বাবু? লা ডুবি হইলে মুই তোমাকে কাঁদে করে সেতরে নিয়ে যাব।··· ঠক্‌চাচা মনে মনে কহেন "চাচা আপন বাঁচা"।"

এই ঝড় থেকে বেঁচে বাবুরাম বাবু বাড়ি ফিরে আসবার পর আর এক দফা ভণ্ডামির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

"বাহির বাটীতে স্বস্তয়নি ব্রাহ্মণেরা আশীর্ব্বাদ করণান্তর বলিলেন "নচ দৈবাৎ পরং বলং" দৈব বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই — মহাশয় একে পুণ্যবান্ তাতে যে দৈব করা গিয়াছে আপনার কি বিপদ হইতে পারে? যদ্যপি তা হইত তবে আমরা অব্রাহ্মণ। এ কথায় ঠক্‌চাচা চিড়চিড়িয়া উঠিয়া বলিলেন — যদি এনাদের কেরদানিতে সব আফদ দফা হল তবে কি মোর মেহনৎ ফেলতো, মুই তো তস্‌বি পড়েছি?···বাঞ্ছারাম বাবু মণিহারা ফণী হইয়া ছিলেন — বাবুরাম বাবুকে দেখাইবার জন্য পান্সে চক্ষে একটু একটু মায়া কান্না কাঁদিতে লাগিলেন তখন তাহার দশ হাত ছাতি হইয়াছে — এবং দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে।

তিনি ব্রাহ্মণদিগের কথা শুনিয়া তেড়ে আসিয়া ডান হাত নেড়ে বলতে লাগিলেন — এ কি ছেলের হাতের পিঠে ? যদি কর্ত্তার আপদ হবে তবে আমি কলিকাতায় কি ঘাস কাটি ?”

এ-বর্ণনায় যথেষ্ট কৌতুক আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তব জগতের কপটতা ও ভণ্ডামির চিত্রাঙ্কনেই এ কৌতুকটুকু ফুটেছে, হাস্যরসসৃষ্টির জন্য বাস্তব চরিত্রের যতটা বিকৃতি প্রয়োজন প্যারীচাঁদের বর্ণনায় তা দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্যারীচাঁদ হাস্যরসসৃষ্টির বিশেষ কোনো চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয় না। তৎসত্ত্বেও তাঁর ব্যঙ্গময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি কৌতুকের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যথা—

“মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল — কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি — কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচতে সাধ নাই — বৌছুঁড়ি আমাকে দুপা দিয়া থেত্‌লায় — বেটা কিছুই বলে না ; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল — কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিএটা দিয়ে নি।”

একে হয়তো আমরা যথার্থ হাস্যরসরূপে অভিহিত করতে পারি না — কিন্তু মানবের চারিত্রিক দুর্বলতার উত্তম নকল বা caricature রূপে এ-বর্ণনা যে বেশ কিছুটা কৌতুক উৎপন্ন করেছে তাতে আর সন্দেহ কি ?

মুকুন্দরামের মুরারি শীলের মত ঠক্‌চাচার উপস্থিতি এবং কথাবার্তা সর্বত্রই কৌতুকাবহ। ঠক্‌চাচীটিও কিছু কম যান না।

“ঠক্‌চাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন — তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা ? তুমি হর ঘড়ী বল যে হাতে বহুত কাম, এতনা বাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায় ? মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভাল ভাল রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখি না, তুমি দেয়ানার মত কের — চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ

বিরক্ত হইয়া বলিলেন — আমি যে কোশেশ করি তা কি বলিব। মোর কেতনা ফিকির — কেতনা ফন্দি — কেতনা প্যাচ — কেতনা শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়।"

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' বইখানির উদ্দেশ্য প্রধানতঃ মদ্যপানের কুফল দেখানো। এতে ছোট ছোট আখ্যানের মধ্য দিয়ে মদ্যাদি নেশার কুফল এবং প্রসঙ্গতঃ লাম্পট্যের পরিণাম দেখানো হয়েছে। আখ্যানগুলি সবই ছোট ছোট, এবং এগুলি প্রচলিত গাল-গল্প থেকে নেওয়া। এ-প্রসঙ্গে নেশাখোরদের সম্বন্ধে প্রচলিত মজার মজার গল্পই প্যারীচাঁদ বেছে নিয়েছিলেন ব'লে স্পষ্টই বোঝা যায়। যদিও 'আলালের ঘরের দুলাল'ই প্যারীচাঁদের সার্থকতম রচনা, তবু হাস্যরসের দিক থেকে দেখতে গেলে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' বইটি অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। যথা,

"পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে — ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন — এক একবার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক্ খুলে চারিদিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন — "শালারা সারারাত কেবল মালিনীর গান শুনিয়ে হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছিস — কৃষ্ণ বাহির কর্ — যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তো বেটাদের থামে বেঁধে মার্‌ব।" কৃষ্ণ বাহির করিবার গোল হইতে হইতে সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। নিকটস্থ দুই এক ব্যক্তি বলিল, "কৃষ্ণ এ সময় গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন — এখন কৃষ্ণ কোথায় পাওয়া যাবে?" মনেতে এক এক সময় এক এক ভাবই থাকে, বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শাক্ত ভাব উদিত হইল, প্রতিমার নিকটে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাতে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌তে লাগিলেন — "মা! আমাকে বুঝি ছেড়ে যাবি? ছেলে এক বৎসর মাকে না দেখে কেমন করে থাকবে? আমি প্রাণ গেলেও ছেড়ে দিব না — বেটী, তুই যা দেখি কেমন করে যাবি?" এই বলিয়া দেবীর পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন — টানাটানিতে প্রতিমার অর্দ্ধেক পা

ভাঙ্গিয়া গেল। বাটীর সকল লোক হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া ক্ষান্ত করাইতে লাগিল।" (মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে)।

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়ে'র ছোট ছোট আখ্যান-গুলির মধ্যে আগড়ভমের কাহিনীটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এতে এক নেশাখোর লম্পটের নাকাল দেখানো হয়েছে, এবং সে-প্রসঙ্গে আগড়ভম চরিত্রে, ক্ষীণরূপে হলেও *Merry Wives of Windsor* এর ফলস্টাফ চরিত্রের ছায়া পড়েছে। তবে এই সূত্রে প্যারীচাঁদ কুখ্যাত পক্ষীর দলকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি।

"আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড — পেটটি একটি ঢাকাই জালা — নাকটি চেপ্‌টা — চোক দুটি মৃদঙ্গের তালা — হাঁটি বোড়া সাপের মত — দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক্ চিক্ করিতেছে — গোঁপ জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালাফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন — কোন নেসাই বাকী নাই — প্রাতঃকালাবধি তিনি চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান আহার করেন, পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদয় রজনী সজনী সজনী বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখী সংবাদ, বিরহ, লাহড়, খেউর, টপ্পা, নক্সা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর — সে ব্যক্তির গুণের মধ্যে নাকটি বড় টেকাল, হাসিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাসাতে গগনমণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্পবয়সে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণা কি শ্যামবর্ণা কিছুই জানিত না।…পক্ষীর দলের আর আর পক্ষীরা সর্বদাই ডানা ধরিত। চরস, গাঁজা গুলী, ছর্‌রা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্র ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মধুর চেষ্টা করিত।…পক্ষীদিগের গান সকল অতি বিচিত্র। সকলে মিলে সর্ব্বদা এই গান গাইত — "বড় বিলের পাখী মোরা ছোট বিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে — কু কু রামশালিকে কু কু কু গঙ্গা ফড়িং।"

'জাতি মারিবার মন্ত্রণা' শীর্ষক আর একটি অংশ থেকে একটি ছোট

উদ্ধৃতিতে প্যারীচাঁদের হাস্যরসের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা প্যারীচাঁদের প্রসঙ্গ শেষ করবো।

"কথাবার্তা কহিতে কহিতে চারি জনায় ক্রমে ক্রমে এত মদ্যপান করিলেন যে সকলেই বেহুঁস ও ভোঁ হইলেন। বাচস্পতি কলিকা হইতে দুই তিনখানা টীকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ্ মচ্ করিয়া খাইতে খাইতে বলিলেন, 'হায়! কলিতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে বাতাসার মিষ্টতাও গেল'।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) নাম বাংলা সাহিত্যে নানা কারণে স্মরণীয়। ব্যঙ্গ-রচনায় এঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' অসাধারণ শক্তির পরিচয় বহন করে। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ধনী পরিবারের সন্তান এই বিদ্যোৎসাহী প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁর অতি স্বল্পপরিসর জীবনে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করা সত্ত্বেও এঁর ভাগ্যে নিন্দাই বেশি জুটেছে। তৎকালে যে সাহিত্য ও সাহিত্যিক-সমাজের জন্য অর্থ ও সামর্থ্য তিনি অকাতরে নিয়োগ করেছিলেন, সেই সাহিত্যিক সমাজের অগ্রণী কেউ কেউ তাঁর প্রতিভা ও কৃতিত্বের উপযুক্ত মুল্য দেওয়া দূরের কথা, তাঁকে নানারূপ নিন্দা ও আক্রমণে বিদ্ধ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক কালের সমালোচকও সেই নিন্দার সূত্র ধরে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিভা ও কৃতিত্বের যথার্থ আলোচনায় বিরত হয়েছেন।

বড়লোকের ছেলে হলেও শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ কালী-প্রসন্নের স্বভাবজ ছিল। কালীপ্রসন্ন যে সাহিত্য-প্রতিভা ও সাহিত্যানুরাগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা পরিপূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হবার সময় পেলে আমরা এক অদ্বিতীয় সাহিত্যসাধককে পেতাম বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র প্রথম খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তুলনার দ্বারা কালীপ্রসন্নের প্রতিভা পরিস্ফুটতর হইবে। কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পরলোক গমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপাল-কুণ্ডলা', ও 'মৃণালিনী'র রচনা শেষ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে

এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে।''

ইস্কুল-কলেজে কালীপ্রসন্ন খুব বেশি লেখা পড়া করেন নি বটে, কিন্তু বাড়িতে ঠাকুরমা এবং উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক নামে এক ইংরেজের কাছ থেকে কেবল উচ্চশিক্ষাই লাভ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর বিদ্যানুরাগ, ভারতীয় পুরাণেতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি প্রবল প্রীতি এবং তীব্র সাহিত্য-প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ফলে, যে বয়সে ছেলেরা খেলা-ধুলায় মত্ত থাকে, সে বয়সে বাংলা সাহিত্যচর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে তিনি তার মধ্য দিয়ে নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা ও যশোলিপ্সাকে মুক্তি দেবার উপায় করে নিয়েছিলেন। ১২৬০ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে, ১৪ই জুন, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, "বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য'' কালীপ্রসন্ন এক সভা স্থাপন করেন। তখন তাঁর বয়স ১৩ বৎসর মাত্র। ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যানুশীলনের এই সভাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'।

এই সভার সম্পাদক প্রথম কয়েক বৎসর ছিলেন কালীপ্রসন্ন স্বয়ং। সেই বালক বয়সেই কালীপ্রসন্ন এই সভার সম্পাদকের কাজ চালাতে পেরেছিলেন, একথা ভাবতেই বিস্ময় বোধ হয়। কিন্তু আরো আশ্চর্য বোধ হয় যখন দেখা যায় যে, তৎকালীন বহু বিখ্যাত ব্যক্তিকে কালীপ্রসন্ন এই সভার সভ্য ক'রে নিতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তিরাও ছিলেন। এই সভায় বালক কালীপ্রসন্ন নিজেও মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষিত লোকের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা কিরূপ জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করেছিল, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬-১৭ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত 'সমাচার সুধাবর্ষণে'র নিম্নোদ্ধৃত বিবরণে তা পরিস্ফুট হবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐ বছরের ২০শে এপ্রিল, অর্থাৎ বৈশাখ মাস থেকে 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে কালীপ্রসন্ন একখানি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স ১৫ বৎসর।

"আমরা গত শনিবাসরীয় যামিনীযোগে 'বিদ্যাৎসাহিনী সভায়' গমন

করিয়াছিলাম ···। ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রসন্ন বদনে সম্মান পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, ···। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ··· মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি ২ উপকার সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন ··· অনন্তর কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবু ঈষদ্‌হাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভ্য ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য্য এবং উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যাৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।”

এ-ভাবে একটি পত্রিকা ও একটি সাহিত্যসভার কার্য পরিচালনা করা যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষেই কৃতিত্বের বিষয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সেই অপরিণত যুগে, যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কোনো গতানুগতিক পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি, তখন পঞ্চদশবর্ষীয় একটি কিশোরের পক্ষে দক্ষতার সঙ্গে একটি সাহিত্যসভা ও একটি সাহিত্য-পত্রিকা পরিচালনা করা বিস্ময়কর কৃতিত্ব বল্লেও যথেষ্ট বলা হয় না।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় তৎকালীন কৃতবিদ্য ও প্রসিদ্ধ লোকদের বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হোত এবং মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি রচনার জন্য পুরস্কার-পারিতোষিক বিতরণ করা হোত। এই সভার মধ্য দিয়েই কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৯১ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ক'রে তাঁর ঔদার্য, সাহিত্যানুরক্তি ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যরচনার জন্য মাইকেল মধুসূদন প্রশংসা যেমন পেয়েছিলেন, নিন্দা-বিদ্রূপও কিছু কম পান নি। কিন্তু এর জন্য প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন লাভ মধুসূদনের সেই প্রথম। অথচ, অধ্যাপক সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যে মধুসূদনের সুপরিচিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা 'চাঁড়ালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে', 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে লক্ষ্য করেই লেখা হয়েছিল। সুকুমার বাবুর এ অনুমান সহসা

মেনে নিতে সংকোচ হয়। মাইকেল মধুসূদন অনেক সময় ঝোঁকের মাথায় কাজ করতেন সত্য, কিন্তু তিনি উদার চরিত্রের লোক ছিলেন, কৃতজ্ঞতা-স্বীকার তাঁর স্বভাবজ ছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় মধুসূদনের বন্ধু-স্থানীয় কাউকে কাউকে বিদ্রূপ ক'রে থাকতে পারেন, তবু এই উদারহৃদয় প্রতিভাশালী ভক্তের কাছ থেকে মাইকেল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভেই যে সম্মান ও অভিনন্দন পেয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তিনি প্রকাশ্যে তাঁকেই এরূপ তীব্র আক্রমণ করেছিলেন, সত্য হলে, এ কথা প্রীতিকর নয়। কেননা, সাহিত্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ মাইকেল মধুসূদন দত্তকে একটি মূল্যবান্ রজতপাত্রসহ মানপত্র দান করলে মধুসূদন তার উত্তরে বলেছিলেন, "বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর প্রকাশ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। … আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি।"

মাইকেল মধুসূদনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেই গুণগ্রাহী সাহিত্যরসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ ক্ষান্ত হন নি। এই সহৃদয় সাহিত্যিক আষাঢ়, ১৮৭৩ শকাব্দে (জুন-জুলাই ১৮৬১), 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' একটি আলোচনায় 'মেঘনাদ বধে'র গুণাবলী বিশ্লেষণ ও প্রচার করেছিলেন। একুশ বৎসরের যুবকের এই সমালোচনাতেই প্রথম 'মেঘনাদবধে'র প্রকৃত মূল্যের স্বীকৃতি ও প্রচার হোল। কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, "হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। … মাইকেল মধুসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলবিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে

তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই ; কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।"

'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'র প্রথমেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কালীপ্রসন্ন একটি সংক্ষিপ্ত অবতারণা দিয়েছেন। এই পংক্তি ক'টিকে কেউ কেউ মাইকেলের রচনার প্যারডি বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। বরং অনুকরণ দ্বারা এ স্থলে শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছিল বলেই ধারণা জন্মে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের গুণগ্রাহিতা, বদান্যতা এবং সাহিত্য ও স্বদেশ প্রীতির দৃষ্টান্ত অজস্র। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ প্রচারের অভিযোগে নীলকরেরা পাদ্রি লঙ্‌ সাহেবকে আদালতে অভিযুক্ত করলে বিচারে লঙের একমাস কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা জরিমানা হয়। এই বিচারের সময়ে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মোকদ্দমার রায় শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি অযাচিত ভাবে জরিমানার এক হাজার টাকা দিয়ে দেন। লঙের অর্থদণ্ড হলে সে টাকা দিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই কালীপ্রসন্ন আদালতে এসেছিলেন, কিন্তু একথা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকেও তিনি জানতে দেন নি। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "তিনি যেমন তাঁহার purse এর সদ্ব্যবহার জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না। যেদিন Revd. Mr. Long এর মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশ হইবার কথা ছিল, সে দিন কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন ; হাজার টাকার জরিমানা হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।"*

কালীপ্রসন্নের এই বদান্যতার মূলে যে আত্মপ্রচারের কোনো অভিসন্ধি ছিল না, উপরের উদ্ধৃতিতেই তা পরিস্ফুট হবে। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই পাদ্রি লঙ্‌ সাহেব দেশে চলে যান। তাঁর যাত্রার আগে

* পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়—বিপিন বিহারী গুপ্ত

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জনৈক নীলকরের নামে একটি কুৎসিৎ অভিযোগ প্রকাশ ক'রে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত হন। পরে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তিনি মুক্তি পান বটে কিন্তু তাঁর প্রতি মামলার খরচ দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অল্পদিন পরে হরিশ্চন্দ্র মারা যান। এই মামলার দেনায় হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি ঘর বাঁধা পড়ে, 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ এককালীন পাঁচ শ' টাকা নিয়ে এগিয়ে আসেন। কেবল তাই নয়, "হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার বিপন্ন পরিবারের সাহায্যার্থ ও স্মৃতিরক্ষার জন্যও অগ্রণী হইয়াছিলেন; কিছুদিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালিত করিয়া তিনি তাহার জন্য ন্যাস গঠনান্তে বিদায় গ্রহণ করেন।" *

কালীপ্রসন্নের স্বল্পপরিসর জীবনে এইরূপ স্বদেশ ও সাহিত্যপ্রীতি, গুণ-গ্রাহিতা, সহৃদয়তা, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের অজস্র পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বহুবিধ সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূলেও সাহিত্য, স্বদেশ ও উচ্চাদর্শ-প্রীতি প্রেরণা দান করেছিল, একথা আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা কর্তব্য।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ক'রে বিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করেন। স্মরণ রাখতে হবে, তখনো বাংলা দেশে নাট্যরঙ্গশালার নিদারুণ অভাব ছিল। লেবেডেফের দ্বারা তাঁর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে 'ছদ্মবেশী' অভিনীত হবার পর নবীনচন্দ্র বসু তাঁর বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন, কিন্তু এর পর নাট্যশালার অভাব বাংলা নাটকের উন্নতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকল সৎকার্যে অগ্রণী কালীপ্রসন্ন এই সময়ে বিদ্যোৎ-সাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন ক'রে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির আর একটি পথ ক'রে দিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত ভট্টনারায়ণ রচিত 'বেণীসংহার' নাটক, ১৮৫৭

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ভূমিকা।

সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে। এ-নাটকে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর অভিনয় প্রশংসা অর্জন করেছিল।

১৮৫৪ সালে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন 'বাবু নাটক' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। এটি এরূপ জনপ্রিয় হয়েছিল যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সেটি আবার ছাপবার প্রয়োজন হয়। ১৮৫৭ সালে কালীপ্রসন্ন নিজ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য 'বিক্রমোর্বশী' নাটকটি অনুবাদ করেন, এবং সেই বছরই ২৪শে নবেম্বর তারিখে তাঁর নাট্যমঞ্চে সেটি মঞ্চস্থ করেন। এ নাটকে কালীপ্রসন্ন নায়ক পুরূরবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। এর পর, ১৮৫৮ সালে কালীপ্রসন্ন তাঁর মৌলিক নাটক 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' প্রকাশ করেন। পরের বছর তিনি ভবভূতির 'মালতী মাধব নাটক' অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। ১৮৬১ সালে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

কালীপ্রসন্ন পুরাণ-সংগ্রহ পর্যায়ে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণ-গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করবার এক বৃহৎ পরিকল্পনা করেছিলেন। এর মধ্যে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অনুবাদ তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। এই বৃহৎ অনুবাদ সুসম্পন্ন করতে তাঁর আট বৎসর সময় লেগেছিল। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে মহাভারত অনুবাদ করায় ব্যয় ছাড়াও, প্রতি খণ্ড মহাভারত তিন হাজার করে কালীপ্রসন্ন নিজব্যয়ে মুদ্রিত করেন, এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। রামায়ণ অনুবাদের পরিকল্পনাও কালীপ্রসন্নের ছিল, কিন্তু সে কল্পনা তিনি কার্যে পরিণত ক'রে যেতে পারেন নি। মহাভারত-অনুবাদে বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিত কালীপ্রসন্নকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নাম কালীপ্রসন্ন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'কৃপার' কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং বলেছেন, "... সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদের বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।"

দেখা যাচ্ছে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত অনুবাদের উপসংহাররূপে উপরের উদ্ধৃতিটি লেখেন, তখনো মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে; তাকে উপলক্ষ ক'রে মাইকেল মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতায় প্রচণ্ড আক্রমণটি লিখলে, এ-বন্ধুত্ব এমন অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হোত বলে মনে হয় না।

এ-ভিন্ন কালীপ্রসন্ন 'বঙ্গেশবিজয়' নামে একখানি ঐতিহাসিক কাহিনী বা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং তার দু'ফর্মা ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু এটিকে তিনি শেষ ক'রে যেতে পারেন নি। কালীপ্রসন্ন 'শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা'রও একটি অনুবাদ করেছিলেন, সেটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রিকা-সম্পাদনায় কালীপ্রসন্নের প্রতিভা ও কুশলতাও কেবলমাত্র 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'কে আশ্রয় করেই নিঃশেষ হয় নি। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটির উদ্দেশ্য ছিল "প্রাণি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি" বিষয়ের আলোচনা। এর পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ছয় পর্ব সম্পাদন করার পর ৭ম পর্বের আটটি সংখ্যা — ১৭৮৩ শকের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ — কালীপ্রসন্ন সিংহই সম্পাদনা করেন। এর পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' কালীপ্রসন্ন সাহিত্য-সমালোচনাও লিখতেন। এ ভিন্ন 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক সংবাদপত্রও কালীপ্রসন্ন কয়েক মাস সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছিলেন।

যে প্রতিভাশালী পুরুষ ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবার আগে ইহলোক ত্যাগ করেও সাহিত্যসভা পরিচালক, বিবিধ পত্রপত্রিকা সম্পাদক, নাট্যকার, অভিনেতা, সমালোচক, নূতন গদ্যরীতির প্রবর্তক, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অনুবাদক, গুণগ্রাহী, বদান্য, পরদুঃখকাতর, স্মরণীয় কীর্তিমান্ পুরুষরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তাঁকে "পর-দ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত।" বলে বর্ণনা করা সঙ্গত বলে মনে করা যায় না।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছিলেন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' উপন্যাসের সমালোচনায়। 'কল্পতরু' উপন্যাসটি আমাদের বিচারে কাহিনী বা ব্যঙ্গ সর্ব-বিষয়েই উচ্চ প্রশংসার অযোগ্য বলে মনে হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র যদি বইটিকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে থাকেন, তাতে অবশ্য কারুর কিছু বক্তব্য থাকতে পারে না। কিন্তু সেই সমালোচনা প্রসঙ্গে অকারণে হুতোমের নাম ক'রে তাঁর প্রতি কতকগুলি কঠিন গালি বর্ষণ অবশ্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টির দৃষ্টান্ত নয়। সাহিত্য-সমালোচনায় একের প্রশংসার জন্য অপরের নিন্দার প্রয়োজন কোথায়? আরো দুঃখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি লিখেছিলেন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পরে, ১২৮১ সনে; যখন আর এ কথাগুলির উত্তর দেবার উপায় কালীপ্রসন্নের ছিল না। তবু, মৃত্যুর পূর্বেই, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র দ্বিতীয় সংস্করণের গৌরচন্দ্রিকাতেই, কালীপ্রসন্ন এ-জাতীয় সমালোচনার উত্তর লিপিবদ্ধ করেছিলেন, "পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্শা অতি কদর্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চা খেঁউর ও পচালে পোরা ও স্বদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; একবার ক্যান, শতেক-বার মুক্তকণ্ঠে বলবো — ভ্রম। হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদূর নীচ নন যে দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন।" নিরপেক্ষ বিচারে হুতোমের এ-উক্তির যাথার্থ্য সকলকেই মানতে হবে।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। কালীপ্রসন্নের মহাভারত হাতের কাছে না পেলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে 'কৃষ্ণচরিত্র' লেখা সহজ হোত না। আরো কয়েক বৎসর পরে, ১৮৮৬ সালে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথমভাগের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।"

উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে তীব্র মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, হুতোমের

প্রতি ঐ নিন্দাবাদটুকুই বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট বিবেচনা করেন নি। তিনি 'বঙ্গদর্শনে' অন্যত্র লিখেছিলেন, "লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত-সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।" যে ইন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের প্রতি নিন্দা বর্ষণ করেছিলেন, সে ইন্দ্রনাথ উচ্চপ্রশংসার কতটা যোগ্য, যথাস্থানে আমরা তার বিচার করবো। এখন, হুতোম "সুনীতির শত্রু, এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত" ছিলেন কিনা দেখা যাক।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, "কি অভিপ্রায়ে এই নক্শা প্রচারিত হল, নক্শাখানির ভ্রু-পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই — সত্য বটে অনেকে নক্শাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্শার মধ্যে থাকতে ভুলি নাই।" প্রকৃতই, বাল্যাবধি কালীপ্রসন্ন যে অসাধারণ প্রতিভা ও বহুমুখী কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন — এবং যার জন্য অধিকাংশ লোকই সম্ভবতঃ গর্ব এবং আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো — 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় তাকেও তিনি বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। বাল্য-স্মৃতির হাসিকান্নায় মেশানো এই আত্মবিদ্রূপের অংশটি উদ্ধৃতিযোগ্য।

"আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মত উথলে উঠলো, (বোধ হয় পাঠকেরা এই হুতোম প্যাঁচার নক্শাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌড় বুঝতে পেরে থাকবেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠলেম — কেউ কেউ আদর করে 'চালাকদাস' বলে ডাকতে লাগলেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাংলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল,

শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্বে নানাপ্রকার রূপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেইরূপ মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়িতে ও মার কাছে আওড়াতেম — মা শুনে বড় খুশি হতেন ও কখনো কখনো আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; ··· সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হল; টিকি ফোঁটা ও রাঙা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য দেখলেই তর্ক কত্তে যাই, ছোঁড়া গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি — পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহংকার করি — সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো — কখনো বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হব···

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হল, তারই সার্থকতার জন্যেই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম — গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম — সম্পাদক হতে ইচ্ছা হল — সভা কল্লেম — ব্রাহ্ম হলেম — তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই — বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকদের উপাসনা করি — আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের একজন ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!”

নিজের কৃতিত্ব নিয়ে এ-জাতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা উন্নত ও উদারমনা কালীপ্রসন্নের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

‘দ্বিতীয় স্তরের গৌরচন্দ্রিকা’য় হুতোম বলেছিলেন, “জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান

ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক ; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে অজগর ক্ষুধিত হলে আরসুলা খায় না ও গায়ে পিঁপড়ে কামড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।”

কালীপ্রসন্ন যে সকল প্রকার কুপ্রথা ও কুরীতির সংস্কারাভিলাষী এবং হীনতার প্রবল শত্রু ছিলেন, তা তাঁর সর্ববিধ সংস্কারান্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবেই স্বপ্রকাশ। ‘হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা’তেও কালীপ্রসন্ন তাৎকালিক সমাজের কতকগুলি কু-আচার, দুর্নীতি, অভব্যতা ও হীনতাকেই আঘাত করতে চেয়েছিলেন। কেবল কালীপ্রসন্ন নয়, প্রথম যুগের গদ্যলেখক ও নাট্যকার, সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কারকের আদর্শ প্রচার। গদ্যে ভবানীচরণ ও প্যারীচাঁদ, পদ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, নাটকে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, কেউ এর ব্যতিক্রম নন। এঁদের কারুর রচনাই অশ্লীলতা মুক্ত নয়। তবে হুতোম নিন্দিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে এঁদের কারুর বিদ্রূপই হুতোমের বিদ্রূপের মত তীব্র ও তীক্ষ্ণ নয়। তাছাড়া এঁরা যেখানে ব্যাপকভাবে এবং কাহিনীর আবরণে কোনো সামাজিক দুর্নীতি বা কুপ্রথাকেই মাত্র বিদ্রূপ করেছিলেন, হুতোম সেখানে সোজাসুজি এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামাজিক, নাগরিক ও ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেকটি হীন আচরণের প্রতিই তাঁর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেছেন। কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের উপায় ছিল না যে তার হাস্যকর দুর্ব্বলতাগুলিকে হুতোমের সর্বগামী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির থেকে লুকিয়ে রাখে। কাজেই হুতোম যে বহু লোককেই চটিয়েছিলেন, এটা বিস্ময়কর নয়।

হুতোম কি তাঁর লেখায় কোথাও সুনীতির সঙ্গে শত্রুতা করে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন? তিনি কি কোথাও সুরুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত হয়ে কুরুচিকে সমর্থন করেছিলেন? তাঁর ‘হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা’য় এ-প্রশ্নের কি উত্তর মেলে খুঁজে দেখা যেতে পারে।

“আজকাল শহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম

দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বস্ট্'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'।" (কলিকাতায় চড়ক পার্বণ)

"আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন — আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য বড় ধুম করে কালীপূজা করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ক্রটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদিত করে মড়াকান্না কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুজতে পারবেন না — আড্ডা থেকে না ডাকলে শুন্‌তে পারবেন না; ক্রমে ক্রিশ্চানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।"

(কলিকাতায় চড়ক পার্বণ)

"হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনো একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি।" (কলিকাতায় বারোইয়ারী পূজা)

"শহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, স্বদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙালী বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়।" (কলিকাতায় বারোইয়ারি পূজা)

"যে দেশের লোকের যে প্রকার হেম্মৎ থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কার কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদার-ককের কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজকাল আমরা বারোইয়ারিতলায় নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনের' তাপে

পরিতুষ্ট হচ্চি, ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল নাচ, পাঁচালি ও পচা খেঁউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের 'ছকুবাবু' ও 'সুন্দরের' সং নাবাতে হুকুম দিচ্ছি। মল্লযুদ্ধের তামাসা দেখ 'বুলবুল্ ফাইট' ও 'ম্যাড়ার লড়ায়ে' পর্যবসিত হয়েচে। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের 'খেঁউড়ে' জিত ধরাই আছে।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি পড়ে কি মনে হয় যে হুতোম 'সুনীতির শত্রু ও সুরুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত' ছিলেন? অথবা এর ঠিক বিপরীত কথাটিই জাজ্বল্যমান্ হয়ে ওঠে? আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয় যে, হুতোম এমন একটি সংস্কারমুক্ত অগ্রসর মনের অধিকারী ছিলেন, যা সর্ব যুগেই দুর্লভ। তাই পক্ষপাতিত্বহীন হুতোম নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে পেরেছেন; স্বয়ং আনুষ্ঠানিক হিন্দু ও পুরাণ-অনুবাদক হয়েও তৎকালীন হিন্দু সমাজের বহুবিধ গ্লানি ও অনাচার নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন; ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরাগী হয়েও সে-সমাজের বিবিধ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করেছেন; স্বয়ং কলকাতার বড়লোক ও জমিদার হয়েও কলকাতার বড়মানুষি কার্য-কলাপকে তীব্র আক্রমণ করতে পশ্চাৎপদ হন নি; এবং সমাজের যেখানেই হীনতা, কুশ্রীতা বা দুর্নীতি-কুরুচির গ্লানি দেখেছেন, সেখানেই স্বজন-পরজন নির্বিশেষে আঘাত করতে অগ্রসর হয়েছেন।

সেকালের প্রধান প্রধান লেখকদের প্রায় সকলেই অনাচারগ্রস্ত, সংস্কারা-চ্ছন্ন বা নৈতিক চরিত্রে অধঃপতিত বাঙালী সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ কোনো কোনো চরিত্রকে তীব্র বিদ্রূপ ও নিন্দা করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা তৎকালীন সমাজের চারিত্রিক হীনতাকে প্রবল নিন্দা করেও বঙ্কিম-কর্তৃক 'পরনিন্দক' বলে অভিহিত হন নি, বরং তাঁর কাছ থেকে অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছেন। তবে কি কোনো কোনো লোকের আচরণ ও চরিত্রের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র হুতোম সম্বন্ধে এ-কথাগুলি

বলেছিলেন? কিন্তু তাই বা কি ক'রে সম্ভব? দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রায় সকল বইতে বাস্তব-চরিত্র থেকে তাঁর ব্যঙ্গের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "নবীন-তপস্বিনীর বড়রাণী ছোটরাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।" 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীব মুখোপাধ্যায়ও কোনো জীবন্ত ব্যক্তির উপর ভিত্তি ক'রে লেখা হয়েছিল এবং "জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত" একথাও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন। হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ব্যক্তিগত আক্রমণের অভাব নেই। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — যাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের কথা টেনে এনেছেন — ব্যক্তিগত আক্রমণেই সবচেয়ে আনন্দ পেতেন; এবং সে-আক্রমণ সব সময় পরিচ্ছন্ন রুচিরও অনুমোদিত হোত না। তাঁর গ্রন্থাবলীর ভূমিকা 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে এ ব্যক্তিগত আক্রমণ সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ইহার স্থলে স্থলে ব্যক্তিগত ইঙ্গিত থাকিলেও এই ব্যঙ্গকাব্যখানি একেবারেই ব্যক্তিগত নয়। ... যেখানে বিষয় ব্যক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেখানে বিষয়ের কথায় ব্যক্তির ইঙ্গিত না থাকিয়াই পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে ব্যক্তিগত বলিলে চলিবে না।" তবু বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা হুতোম "পরদ্বেষী, পরনিন্দক" বলে ভর্ৎসিত হলেন, কিন্তু অন্যান্য লেখকেরা "সুনীতির প্রতিপোষক" বলে কীর্তিত হলেন, এ খুবই আশ্চর্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য সম্বন্ধে কিছুকাল আগে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যে কথাগুলি বলেছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। হেমেন্দ্র বাবু লিখেছিলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোম'কে বিদ্বেষপরিপূর্ণ বলিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, ইহাতে হুতোমের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। পরের ভাল দেখিলে হুতোম দুঃখিত হয় নাই। যে ধনিগণ কোন প্রকার সৎকার্য্যে যোগ না দিয়া কেবল বিলাসে ব্যসনে অর্থব্যয় করিতেন — নবভাবের স্রোত যাঁহাদের গৃহের ও হৃদয়ের প্রাচীরে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আসিত; যাঁহাদের ব্যবহারে আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও কৃত্রিমতার পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট ছিল; যাঁহারা কপটতার আবরণে হীনতা আবৃত করিয়া লোককে প্রতারিত করিতে চাহিতেন — 'হুতোম' তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত।

তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে হুতোমের রব শুনিয়া মানব যেমন ভয় পায়, 'হুতোমের' কথায় এই ভণ্ড সম্প্রদায়ে তেমনই ভীতির সঞ্চার হইত। কালীপ্রসন্ন যে ধনিসম্প্রদায়ের কপটতার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সমাজেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সমাজস্থ তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহার তাঁহার নিকট সুপরিচিত ছিল; তাঁহাদের প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। এ অবস্থায় আক্রমণ একটু অতি মাত্রায় তীব্র হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে তীক্ষ্ণ বাণগুলি তূণীরে রাখিয়া যুদ্ধ করা সকল সময় সম্ভব হয় না। সুতরাং আক্রমণের তীব্রতার জন্য কালীপ্রসন্নকে নিন্দা করা যায় না।"*

সাম্প্রতিক কালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দার সূত্র ধরে আধুনিক সমালোচকেরা হুতোমের রচনাকে যথোচিত মর্যাদা দেন নি। কিন্তু হুতোমের লেখনী যে মহাশক্তিশালী একথা পূর্ববর্তী মনীষী ও সমালোচকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য ··· হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক ··· প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক" মনে করতেন, একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। †

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, "হুতোম প্যাঁচার নক্সা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা পাঠে তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।" রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুম পেঁচার নক্সায় বিলক্ষণ হাস্যরসউদ্দীপনী শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নক্সাগুলি জলজ্যান্ত বোধ হয়।" রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁর কলকাতার ইতিহাসে লিখেছেন, "His comical and satirical social sketch, the *Hutum Pancha* graphically delienates in a humours vein several points, good and bad, of the state of society which prevailed at the time. It is a masterpiece of its kind and has never been eclipsed by the latter day productions in the

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ভূমিকা।

† পৃঃ ৪৬ দ্রষ্টব্য।

line. Time may come when one may not read *Hutum Pancha*, but the time will never come when it will fail to give pleasure and profit to its readers." বিনয়কৃষ্ণ দেবের এ উক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র আধুনিক পাঠক তা' উপলব্ধি করবেন। আর হুতোমের প্রবর্তিত গদ্যভাষার যে প্রবল শক্তি ও আধুনিকতা আমাদের মুগ্ধ করে, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে কি কারণে "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই ; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই ;" বলে বর্ণনা করলেন, তাও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে আলালী ভাষার চেয়ে হুতোমি ভাষা অনেক বেশি জোরালো, এবং আজ একশো বছর পরেও এ-ভাষা আধুনিক মনে হয়। হুতোমি ভাষার এই শক্তি সেকালেও অনেক মনীষী লক্ষ্য করেছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' এ লিখেছিলেন, "His *Hutum pacha* marks an era in the histoy of fiction-writing in Bengallee. He has introduced a familiar and graphic style in drawing sketches from real life hitherto unknown among Bengallee writers." এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিভাজন লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন, "বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম করিতে হইবে। বঙ্কিমবাবু মিত্রজার গ্রন্থ দেখাইয়া 'রত্নোদ্ধার' করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম। তখন হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় বাজী খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল ফাটান যায়, ফুয়ারা ছুটান যায়। আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী।"

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "আলালের ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম 'আলালী ভাষা' হইল। তখন

আমরা কোনও লোকের ভাষাকে গাম্ভীর্য্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম। এই আলালী ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা "হুতমের নক্সা"। যাঁহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী।"

দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে' কালীপ্রসন্নের প্রশংসা করেছিলেন।

"দানশীল কালীসিংহ বিজ্ঞ মহাশয়,
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে আপনি পণ্ডিত,
'ভারতে'র অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব যেন অবনী ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা
হুতোমপেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

(সুরধুনী কাব্য, দশম সর্গ)

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল; নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'হুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশের রথের সময় বাচখেলা. মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশ গোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন।...as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten."*

বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোমি' ভাষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি উল্লেখ ক'রে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, "যে কালীপ্রসন্নের মহাভারত ভাষার বিশুদ্ধি ও তেজের আদর্শ বলিলেও

* পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়—বিপিনবিহারী গুপ্ত।

অত্যুক্তি হয় না, সেই কালীপ্রসন্ন হুতোমি ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন কেন? আমরা বলি বিষয় বিবেচনায়। হংসকারণ্ডবাদিসমাকীর্ণ, প্রস্ফুটিত পঙ্কজপ্রফুল্ল, স্বচ্ছসলিল সরোবরের শ্যামশষ্পাস্তৃত কূলে অবস্থিত ভারতীমন্দিরের উপাসিকার পুংস্কোকিলকলবিড়ম্বিনী বাণী কপটতার কমঠকঠোর আবরণ ভেদ করিবার উপযুক্ত কশাঘাত-কটূক্তিতে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 'হুতোম' সাময়িক সাহিত্য। তবে ড্রাইডেনের সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত কবিতার মত 'হুতোমেও' স্থায়িত্বের উপকরণের অভাব নাই। 'হুতোমের' বিদ্রূপ শাণিত, আঘাত দ্রুত ও মর্ম্মভেদী। কিন্তু 'হুতোম' হুতোম — প্রভাত বৈতালিক দধিয়াল বা বসন্তবিলাসী কোকিল নহে।"*

আধুনিক কালে নিরপেক্ষ পাঠক 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় সকল প্রকার গোঁড়ামিহীন, সর্বপ্রকার হীনতা ও কদাচারের প্রবল শত্রু, কালীপ্রসন্নের উদার আধুনিক মনেরই পরিচয় পাবেন। তিনি স্বসমাজ, স্বশ্রেণী, এমন কি নিজের দুর্বলতাগুলি নিয়েও বিদ্রূপ করিতে ছাড়েননি। ইতিহাস-বোধও তাঁর অতি তীক্ষ্ণ ছিল, এই 'নক্‌শা'র মধ্যে নানা স্থানে তা পরিস্ফুট হয়েছে। আর 'হুতোমি' ভাষা যে কি আশ্চর্যরূপে আধুনিক ও শক্তিশালী ভাষা, তা যে কোনো পাঠকই অনুভব করবেন। প্রকৃতপক্ষে হুতোমই বাংলায় প্রথম চল্‌তি ভাষা-রীতির প্রবর্তক। একমাত্র তৎকালীন সাহিত্যে প্রচলিত কিছু কিছু অশ্লীলতা এবং কয়েকটি অতি উগ্র কলকাতিয়া শব্দের প্রয়োগ ছাড়া, এ ভাষাকে বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্তের রচনা, এমনকি 'দুর্গেশনন্দিনী' 'কপালকুণ্ডলা'র সমসাময়িক ভাষা বলে চেনাই শক্ত।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহের এমন একটি পক্ষপাতিত্ব-হীন সংস্কার-বিমুক্ত আধুনিক মন এবং একটি আধুনিক ভাষা-রীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যা তাঁর কালের তুলনায় অতি-অগ্রসর ছিল। 'হুতোমি' ভাষা সৃষ্টির প্রায় ষাট বৎসর পরেও চল্‌তি ভাষা চালাতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে কত বাধা, কত আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মধ্যভাগে হুতোমি ভাষা যে রক্ষণশীল সমাজে নিন্দিত হয়েছিল, এতে আর আশ্চর্য কি। কি মতামতে,

* মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—মন্মথনাথ ঘোষ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত ভূমিকা।

কি দৃষ্টিভঙ্গিতে, কি ভাষার ব্যবহারে, কালীপ্রসন্ন অতি-অগ্রসর ছিলেন। তাই, সে-যুগের সংস্কারকামী অথচ স্বভাবতঃ রক্ষণশীল মনোভারাপন্ন অনেকেই এ-জাতীয় উগ্র আধুনিকতাকে অনুমোদন করেন নি। কিন্তু তার জন্য হুতোমের রচনার যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে আমাদের সংশয় পোষণ করা অনুচিত।

কথিত হয়, কালীপ্রসন্ন নিজে মদ্যপানাদি ও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না, এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে থেকে এ দোষগুলি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সত্য হলেও এ-অভিযোগে কালীপ্রসন্নের সৃষ্টির মাহাত্ম্যকে ক্ষুণ্ণ করা সঙ্গত নয়। বিশ্বসাহিত্যে প্রতিভাধর এরূপ কবি-সাহিত্যিকের অভাব নেই, যাঁরা ব্যক্তিগত চরিত্রে উন্নত না হয়েও জগতের সাহিত্য মহৎ দানে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের চারিত্রিক দুর্বলতা তাঁদের সৃষ্টিকে যথার্থ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নি। কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক কীর্তিকেই বা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের মানদণ্ডে বিচার করবার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে, তা ভেবে পাওয়া যায় না।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে আধুনিক কালের পাঠক হুতোমের অসাধারণ বর্ণনাশক্তি, অপূর্ব হাস্যরসবোধ এবং তাঁর ভাষার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

"নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গেল। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হল। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনশী, ছিরে বেনে, ও পুঁটে তেলি রাজা হল। সেপাই পাহারা, আসা সোঁটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ্ আখ্ড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। শহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে

বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এই সময়ে হাফ আখ্‌ড়াই ও ফুল আখড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি শহরের বড় মানুষরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগলেন। শ্যামবাজার, রামবাজার চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ আখ্‌ড়াই দলের মুরুব্বী হলেন।"

আশ্চর্য হতে হয়, কত সংক্ষেপে অথচ কি নিপুণভাবে কালীপ্রসন্ন সেকালের বাঙালী সমাজের অর্থনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ধনী সমাজে নিম্নশ্রেণীর আমোদ-প্রমোদ ও সাহিত্যের জনপ্রিয়তার চিত্রটি এঁকেছেন। আর বর্ণনারই বা কি সৌন্দর্য। পাঠক বিচার করবেন যে যথার্থই "'হুতোমি' ভাষা দরিদ্র,...'হুতোমি' ভাষা নিস্তেজ", অথবা আধুনিক কালের মানদণ্ডেও এ ভাষা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

নিচের উদ্ধৃতিটিতে হুতোমের রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক তাঁর ব্যঙ্গের ধরণ এবং হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা, উভয়েরই পরিচয় পাবেন।

"এদিকে বারোইয়ারিতলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিল, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুতঃ যা বলচেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক।... কথা শোনবার ও সং ছাখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে — কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষরা থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাঙচেন! ... সংগুলি বর্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন — অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোশাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমার্টিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা — বিক্রমাদিত্য আফিমের দালালের মত পোশাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর ও বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন — রত্নদের সকলেরই একরকম ধুতি, চাদর ও টিকি; হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ি ঢোক্‌বার জন্যে দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে — দেশ দেশান্তরের রাজারা চারদিকে ঘিরে বসেচেন — মধ্যে ট্যানাপরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন, একদল দরওয়ান স্যাকরার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন — বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা শহরে মুচ্ছুদ্দী বাবুদের মত পোশাক পরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন — শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন — রামের বাঁ দিকে সীতা দেবী; সীতার ট্যাড়চা শাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে।" (কলিকাতায় বারোইয়ারি পূজা)

আজকাল ধন ধন 'সার্বজনীন পূজা' এবং 'আধুনিক' ঠাকুর-প্রতিমার যুগে এ-বর্ণনা অপূর্ব বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী বোধ হয়। এই অধ্যায় থেকে আরো কিছু উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

"রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিস্টার্স, থিক্, রোগ এণ্ড পিকপকেট উকিল সাহেবদের আপিসের খাতাঞ্চী। আপিসের ফের্‌তা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দু-ধারি দোকানও ফাঁক যাচ্ছে না — পাগড়িটে এলিয়ে পড়েচে, ধুতি খুলে হতুলি পুতুলি পাকিয়ে গ্যাচে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে জোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! ঠাকুর বাবুদের বাড়ির একজন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রামবাবু তাকে দেখে 'আরে ব্যাটা মাতাল' বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বল্লি!' রামবাবু বললে, 'আমি রাম!' চাকর বললে, 'আমি তবে রাবণ!' রামবাবু — 'তবে যুদ্ধং দেহি' বলে যেমন তারে মাত্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোঁকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর

মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলো। থানার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন। চাকর মাতাল কিছু ঠিক ছিল, পুলিসের সার্জ্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে। রামবাবুও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'ছি বাবা, এখন রামের হনুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছিঃ।' (কলিকাতায় বারোইয়ারি পূজা)

স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স্ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থাকা কালে তিনি মাঝে মাঝেই মন্তব্য করতেন যে বাঙালীরা মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। ১৮৬১ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে দেশীয় নেতারা এক বিরাট সভায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ-সভায় রাধাকান্ত দেব, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই প্রতিবাদের ফলে তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেইট স্যার চার্লস্ উড কর্তৃক ওয়েল্‌স্ ভৎর্সিত হন। এই ঘটনাটি হুতোম তাঁর নক্‌শায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সে বিবরণে একদিকে হুতোমের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি এবং অপরদিকে তাঁর ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শাণিত ভঙ্গিটি প্রকাশিত হয়েছে। হুতোম লিখছেন,

"শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জষ্টিস্ ওয়েল্‌স্ নতুন ইণ্ডেণ্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা করবার সময় যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বলতেন 'বাঙালীরা মিথ্যেবাদী ও বর্ব্বরের জাত্।' এতে বাঙালীরা অবশ্যই বলতে পারেন, 'শতকরা দশজন মিথ্যেবাদী বা বর্ব্বর হলে যে আশি-নব্বুই-জনও মিথ্যেবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই — চার দিকে অসন্তোষের গুজ্‌গাজ্ পড়ে গেল, বড় দলের মোড়লরা হাতে কাগজ পেলেন, 'তেঁই ঘোটের' মত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোট পড়ে গেল, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কাঙ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হল।...

শহরের অনেক বড়মানুষ — তাঁরা যে বাঙালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুনোগলির আন্‌ড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বললে তাঁরা বড় খুশি হন, সুতরাং যাতে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল

কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌সের বিপক্ষে বাঙালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন — খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লেন !···

নিরূপিত দিনে সভা হল, শহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙে পড়লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনে জোড়হস্ত করা পাথরের গরুড়েরও আহ্লাদের সীমা রইল না। বাঙালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। ··· দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত রুাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।" (জস্টিস্ ওয়েল্‌স্)

হুতোমের ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ আর দু' একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা কালীপ্রসন্নের প্রসঙ্গ শেষ করবো।

"আজকাল ইংরেজী কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্তা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক করেন না। কেউ ছেলেপুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়েবাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান — কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভান করে কাটিয়ে ছ্যান, অথচ বাড়িতে এক জোড়া কুম্ভকর্ণের আহার তল পেয়ে যায় — হাতীশালের হাতী ও ঘোড়াশালের ঘোড়া খেয়েও পেট ভরে না !" (রমাপ্রসাদ রায়)

"এক একখানি থার্ড ক্লাস কাঁকড়ার গর্তের আকার ধারণ কল্লে, তথাপিও মধ্যে মধ্যে দুই-একজন এস্টেশন মাস্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকি মাচ্চেন — যদি নিশ্বাস ফ্যালবার স্থান থাকে, তবে আরও কতকগুলো যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। ··· প্রেমানন্দ গাড়িতে প্রবেশ করেচেন বটে, কিন্তু এখনো পদার্পণ কত্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ির পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটি এমনি ঠেস মেরে গেছে যে গাড়িতে প্রবেশ করে পর্য্যন্ত শূন্যেই রয়েচেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড় চড় কল্লে এক একবার কারু কাঁধ ও কারু মাথার উপর হাত দিয়ে অবলম্বন কত্তে চেষ্টা কচ্চেন, কিন্তু ওতে সাব্যস্ত হয়ে উঠচে না —।" (রেলওয়ে)

সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯) ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) উভয়েই কালীপ্রসন্ন সিংহ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন যখন 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' লিখে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টারূপে তাঁর মহৎ কৃতিত্বের কোনোই প্রতিশ্রুতি দেখাতে পারেন নি। এর আগে ছাত্রজীবনে দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে' গদ্য ও পদ্য 'মক্স' ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যযশোলিপ্সার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এ সময়ের রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব অতি স্পষ্ট ছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন, "দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "এই শিষ্যত্বের ফল 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ঋতুবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তর মূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 'বিচিত্র' ও একটি 'বিষম বিচিত্র' নাটক এবং দুই-একটি টুকরা গদ্যরচনা। 'ললিতা ও মানস' কাব্যও এই প্রভাবের ফল। এই কালের রচনা হইতে ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা দুরূহ ; ··· যে প্রতিভা একদিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না।" (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড)। 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। আর, 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৫। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যচর্চার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা আরম্ভ করেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, এর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ইংরেজী ভাষায় *Rajmohan's Wife* রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। অপরদিকে, কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। এর আগে 'বাবুনাটক' থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক গ্রন্থই কালীপ্রসন্ন প্রণয়ন করেছিলেন, এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' লিখে হাস্যরসেও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সে হিসাবে হাস্যরসিকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা কালীপ্রসন্ন সিংহের পরে হওয়াই বিধেয়।

সঞ্জীবচন্দ্র যদিও হাস্যরসাত্মক রচনায় হাত দেন নি, তবু তাঁর রচনা-রীতিতে একটি সরস ভঙ্গি ছিল, যা বিশেষ ক'রে 'পালামৌ' ও অন্য দু'

একটি রচনায় লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে এ-প্রসঙ্গে তাঁর নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশের পর থেকে বঙ্কিমের প্রতিভা অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিম সংস্কৃতানুসারী ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন সত্য, কিন্তু এর পর তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষার সঙ্গে এ ভাষাকে সমন্বিত ক'রে গদ্যভাষার যে-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, বহুকাল পর্যন্ত বাঙালী সাহিত্যিক তা-ই অনুসরণ ক'রে চলেছে। 'লুপ্তরত্নোদ্ধারে'র ভূমিকায় প্যারীচাঁদ মিত্রের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঋণ প্রায় স্পষ্টই স্বীকার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের বিবিধমুখী অসম্পূর্ণ প্রয়াসকে একটি পরিণত, সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিলেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতবহুল ভাষা এবং প্যারীচাঁদের আলালী ভাষা "এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা" তিনিই বহুকালস্থায়ী আদর্শ গদ্যের সৃষ্টি করলেন। আবার, গদ্যে কাহিনী রচনার যে প্রয়াস অতিপ্রকট ব্যঙ্গ ও নীতিকথার ভারে উপন্যাসে পরিণতি লাভ করতে পারছিল না, তাকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম একটি পরিপূর্ণ নিটোল উপন্যাসের রূপে গঠিত করলেন। তৎকালীন যুগচেতনালব্ধ সংস্কারকের মনোভাব ও আদর্শস্থাপনের প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্র ত্যাগ করলেন না, বরং তাকে আরো গভীরভাবে আত্মস্থ করে নিলেন ; কিন্তু তা তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে এমনই নিপুণতায় ওতপ্রোত ক'রে দিলেন যে, তাকে আর আদর্শপ্রচার বলে মনে হল না। তিনি একাধারে লোকমনো-রঞ্জন ও লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন, এবং উভয়কে এরূপ আশ্চর্য কৌশলে মিশিয়ে দিলেন যে, লোকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আকৃষ্ট হোল, তাঁর শাসন ও অনুশাসন মেনে নিতে দ্বিধা করলো না। তিনি আদর্শ ভাষা ও আদর্শ উপন্যাস লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, প্রবন্ধরচনা ও সমালোচনার আদর্শও তিনিই স্থাপন করলেন। আর তাঁর উপন্যাসেরই বা কত বৈচিত্র্য! ঐতিহাসিক, রোমান্টিক ও সামাজিক, সকলপ্রকার উপন্যাসেরই তিনি নির্মাতা। আবার বিবিধ প্রকার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে

সামাজিক, লৌকিক এবং সাহিত্যিক আদর্শও তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ··· যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।" একথা যে কত সত্য, আধুনিকতার সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে আমরা সব সময় তা উপলব্ধি করতে পারি না।

বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর কঠোর ও একাগ্র সাধনার শক্তি, অদম্য মনোবল এবং অনমনীয় দৃঢ়চিত্ততা। দায়িত্বপূর্ণ সরকারি চাকরির গুরু কর্মভার কৃতিত্বের সঙ্গে বহন ক'রেও ক্রমবর্ধমান সাহিত্যিক দায়িত্ব ও সাহিত্যসাধনা তিনি অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন, এ এক পরম বিস্ময়ের কথা। তীক্ষ্ণ মনীষা ও অসাধারণ মনোবলের দ্বারা তিনি একদিকে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব, অপর দিকে সমকালীন সাহিত্যিকদের নিম্ন রুচি ও অসংযমকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। তিনি পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে তিনি জাতীয় ধর্ম ও পুরাণেতিহাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন নি। বরং, দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি সেই যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহায়তায় বাঙালীর স্বধর্মকে দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও অনমনীয় মনোবল সম্মিলিত হয়েছিল, যার ফলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে দেশ ও সমাজের কল্যাণের পথটি তিনি সুস্পষ্ট রেখায় এঁকে দিতে পেরেছিলেন। যা তিনি সঙ্গত, ন্যায্য ও মঙ্গলজনক মনে করতেন, সহস্র বাধা অগ্রাহ্য করেও তিনি তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য অগ্রসর হতে কখনো দ্বিধা করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে স্রষ্টা, অপরদিকে আচার্য। সেকালের ব্যঙ্গাত্মক, নেতিধর্মী, রুচিহীন, অপরিণত গদ্যসাহিত্যকে তিনি ভাবাদর্শ ও রূপাদর্শে মণ্ডিত ক'রে বাঙালী সাহিত্যিকের চোখের সম্মুখে এক নূতন জগতের ছবি এনে দিলেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের

স্বর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে বলতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। বাংলাসাহিত্যপাঠক ও সাহিত্যজিজ্ঞাসু মাত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবিধ কৃতিত্বের সঙ্গে সুপরিচিত। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রধান সিংহদ্বার বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী। তাকে অতিক্রম না ক'রে কোনো অনুসন্ধিৎসুর পক্ষেই এ-সাহিত্যের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর প্রায় শতাব্দকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। সাহিত্যের সেই উচ্ছৃঙ্খল যুগে বঙ্কিম একদিকে সাহিত্যে ও সমাজে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস করেছিলেন, অপরদিকে অসংযত ও অশোভন সকল রচনা তিনি কঠোর হস্তে সাহিত্য থেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন। যে সকল মতামত, রুচি ও ভঙ্গি তিনি ভর্ৎসনা ও নিন্দায় বিদ্ধ করেছিলেন, আজ বহু ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ সাহিত্যের আধুনিক যুগে বসে তাদের আমরা যুগোচিত পরিবর্তিত দৃষ্টিতে দেখে বিচার করি ব'লে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কঠোরতার তাৎকালিক উপযোগিতা আমরা সব সময় উপলব্ধি করতে পারি না। সাহিত্যিক ও সামাজিক রুচি ও নীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র যে-প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সে যুগে তার প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের শাসন ব্যতীত বাংলাসাহিত্য কিছুতেই এত শীঘ্র এরূপ পরিচ্ছন্ন ও উন্নত রূপ লাভ করতে পারতো না। সামাজিক উচ্চাদর্শ এবং সুনীতি ও সুরুচিকে প্রাধান্য দিয়েও তিনি মহৎ সৃষ্টির দুরারোহ শিখরে অনায়াসেই পৌছুতে পেরেছিলেন,— এ আশ্চর্য কৃতিত্ব কেবল বঙ্কিম-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু আধুনিক বাংলা গদ্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনি বাংলার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও ধর্মব্যাখ্যাতা। উন্নত ভাব, মৌলিক কল্পনা, উচ্চনীতি ও পরিচ্ছন্ন রুচির সমন্বয় দ্বারা তিনিই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের পথ প্রদর্শক। আধুনিক কালে রম্য-রচনা নামে আখ্যাত লঘু নিবন্ধেরও তিনিই স্রষ্টা। আবার নির্মল, শুভ্র, পরিচ্ছন্ন হাস্যরসও বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তা বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের এ কথাগুলির তাৎপর্য অতি গভীর, এবং সংক্ষিপ্ত হলেও, এই উক্তির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্বের মূল কথাটি নিহিত আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে বহুবিস্তৃত। সমালোচকেরা তাঁর সুমহৎ ব্যক্তিত্ব এবং ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিকরূপে তাঁর বহুবিধ দানেরই বেশি আলোচনা করেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীল, তীক্ষ্মমনীষাসম্পন্ন, উচ্চাদর্শময় গম্ভীর ব্যক্তিত্বই বেশি প্রকট, সেহেতু এ ব্যক্তিত্ব-সঞ্জাত প্রতিভা সাহিত্যসৃষ্টিতে, সাহিত্যচিন্তায় এবং সামাজিক নীতিপ্রতিষ্ঠায় যে আদর্শ স্থাপন করেছে, তার দিকেই পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-কোনো দিকেই বঙ্কিমের মহত্ব পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর গভীর ও উচ্চভাবচিন্তাময় রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনাগুলিরও আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের রচনায় যে হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছিল, আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। পদ্যে ঈশ্বর গুপ্তের পর দীনবন্ধু মিত্র ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি; গদ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ কৃতী লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে যে হাস্যরস পরিবেশন করেছিলেন, তার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করেও

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, উচ্চস্তরের নির্মল হাস্যরস, বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এনেছিলেন। কারণ, পূর্বোল্লিখিত সাহিত্যিকদের সকলের সৃষ্ট হাস্যরসই ব্যঙ্গাত্মক, বিদ্রূপজাত। ইংরেজ ও ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে বাঙালীর মনে দু'টি বোধ খুব প্রবলরূপে জাগ্রত হয়েছিল। এক, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি; দুই, আমাদের সামাজিক জীবনের বহুবিধ ত্রুটি ও গ্লানি সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রথম যুগের সাহিত্যিকেরা আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বিবিধ ত্রুটিকে বিদ্রূপের আঘাত ক'রে জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং আমাদের হাস্যকর দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। প্রথম যুগের সকল লেখক তাই সংস্কারকের মনোভাব এবং বিদ্রূপের ভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। অবশ্য, শিক্ষা, নীতি বা ধর্মপ্রচারমূলক রচনা সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু এখানে আমরা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বা কবিতা-কাহিনী-নাটকেরই আলোচনা করছি। ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রাক্‌বঙ্কিম সকল সাহিত্যিকের কৃতিত্ব সমান নয়। দীনবন্ধু মিত্র আমাদের সমাজ-জীবনের বিবিধ ত্রুটি ও ব্যক্তি-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে প্রচুর ব্যঙ্গ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে-ব্যঙ্গ এমনই সহানুভূতিপূর্ণ এবং করুণামিশ্রিত ছিল যে তা উচ্চস্তরের হাস্যরসেই পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনাবলী অত্যন্ত অসমান, এ জাতীয় সাফল্য তিনি সকল রচনায় লাভ করতে পারেন নি। দীনবন্ধু মিত্র ভিন্ন সে-যুগের অন্যান্য লেখকেরা বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস সৃষ্টিতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও নিছক হাস্যরস সৃষ্টিতে সে রকম সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। বঙ্কিম-চন্দ্রই প্রথম উচ্চস্তরের পরিচ্ছন্ন হাস্যরস বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট উপস্থিত করলেন। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও কিছু কম করেন নি। কিন্তু যিনি সমাজ ও সাহিত্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পক্ষে একদিকে আঘাত অপরদিকে আনন্দদান করাই স্বাভাবিক।

আরো একটি কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম উন্নতস্তরের হাস্যরসিকরূপে গণনা করতে হয়। ইতিপূর্বে সকল ব্যঙ্গ ও হাস্যরসিক লেখকই আগাগোড়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক বা হাস্যরসাত্মক রচনা লিখেছেন, উচ্চভাব

ও চিন্তামূলক অথবা গম্ভীররসাত্মক রচনার মধ্যে হাসির উপকরণ সন্নিবিষ্ট ক'রে তাকে এমন রসবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।" বঙ্কিম-পূর্ব গদ্যকাহিনী সবই পুরো-পুরি ব্যঙ্গাত্মত। সেগুলি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিপূর্ণ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র 'মুচিরাম গুড়' ভিন্ন এরূপ পরিপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক কাহিনী আর একটিও লেখেন নি। 'লোকরহস্য'কে কাহিনী বলা চলে না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে বর্ণনা-বিবরণে, চরিত্র-চিত্রণে ও ঘটনা-বিন্যাসে সর্বত্রই গম্ভীর ও করুণরসের সঙ্গে কৌতুকহাস্য মিশ্রিত ক'রে বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসকে একটি অভূতপূর্ব মর্যাদা দিতে সমর্থ হলেন। এতকাল স্ব-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হাস্যরসকে তিনিই অন্যান্য রসের সঙ্গে অবাধ মিশ্রণের অধিকার দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনীতে'ই গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের দ্বারা হাস্যরসের অবতারণা ক'রে হাস্যরসকে গম্ভীর রসাত্মক সাহিত্যে স্থান দিলেন। এ-ভিন্ন এ উপন্যাসে কাহিনীর গতি যখনই তীব্র ও শঙ্কাজনক ঘটনার দিকে অগ্রসর হয়েছে, তখনই হাস্যরসের অবতারণা দ্বারা তিনি পাঠক মনকে সাময়িক বিশ্রাম দিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে, গম্ভীর ও গভীররসাত্মক রচনাকেও হাস্যরসের সংস্পর্শ দ্বারা উজ্জ্বল ক'রে না নিলে, সে-রচনা সকল সময় চিত্তগ্রাহী হয় না।

সত্য বটে, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গজপতির চরিত্র-চিত্রণে বা সংলাপে যে-ধরণের হাস্যরস উপস্থিত করা হয়েছে তাকে উচ্চশ্রেণীর বলে অভিহিত করা যায় না। এ-হাসি কেবলমাত্র পরিহাস-রসিকতায় সীমাবদ্ধ। গজপতির হাস্যকর দুর্বলতাগুলি গতানুগতিক। এ-হাসি কতকটা স্থূল পর্যায়ের। তবু বঙ্কিম তাঁর প্রথম উপন্যাসেই গণ্ডিবদ্ধ হাস্যরসকে সাধারণ ও গম্ভীর সাহিত্যে প্রবেশাধিকার দিলেন — এ-ও বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ কৃতিত্ব। পরবর্তী উপন্যাস-গুলিতেও বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের এই সর্বত্র বিচরণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'য় বিশেষভাবে হাস্যরসাশ্রিত কোনো চরিত্র বা আখ্যানের

অবতারণা না করলেও, স্থানে স্থানে কৌতুকজনক কথোপকথনের দ্বারা তিনি এ-উপন্যাসের ধারাবাহিক গাম্ভীর্যকে খণ্ডিত করেছেন। যেমন, 'প্রথম পরিচ্ছেদ: সাগর সঙ্গমে' অংশে যাত্রীদের কথোপকথনে দেখতে পাই। এর পর প্রত্যেকটি উপন্যাসেই, হয় বর্ণনায়, না হয় রচনাভঙ্গিতে, নতুবা বিশেষভাবে হাস্যরসাত্মক চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় গাম্ভীর্যের নিরবচ্ছিন্নতা ভেঙে দিয়েছেন। অবশ্য বঙ্কিমসৃষ্ট উপন্যাসে হাস্যরসাত্মক চরিত্র বা ঘটনাগুলি অতি স্বল্পাঙ্কিত, ক্ষীণ ও অস্পষ্ট মনে হয়, কিন্তু তার কারণ বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষমতা নয়, গভীররসাশ্রিত সাহিত্যে হাস্যরসকে অতি-প্রাধান্য দিতে অনিচ্ছা। মাঝে মাঝে কিছু কিছু লঘু হাস্য পরিবেশন ছাড়া গভীররসের প্রগাঢ়তা যথার্থরূপে পাঠকমনে উপলব্ধ হয় না, একথা বঙ্কিমচন্দ্রের অজানা ছিল না। তাই তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি মাঝে মাঝে কৌতুকহাস্য উপস্থিত করেছেন সত্য, কিন্তু তার দিকে তিনি কোনো বিশেষ প্রয়াস পরিচালিত করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাশ্রিত হাস্যরস সম্বন্ধে কোনো সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "Bankim Chandra did not create many good caricatures. The best examples are Gajapati, Taracharan, Hiralal, Debendra, the village Postmaster in Krishnakanter Uil, henpecked Ramsaday, Ramram's elderly wife, but some of them are very incomplete skecches. They are not such enduring characters like Mrs. Gamp, Micawber, Pickwick and Mr. Collins. Bankim chandra lacked to some extent what is known as "fantastic humour" and which Dickens had in plenty."* কিন্তু হাস্যরসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতে ডিকেন্স-এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করা অসমীচীন। ডিকেন্স একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেও হাস্যরসেই তাঁর সমধিক কৃতিত্ব ছিল, এবং হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গ-রসিকতাই তাঁর রচনায় প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। অপরপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত রাশভারি ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন,

---

*A Critical Study of the Life and Novels of Bankimchandra—Jayanta Kumar Das gupta.

এবং তিনি প্রধানতঃ গম্ভীর ও গভীররসাত্মক রচনার দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে হাস্যরসবোধও প্রবল ছিল, এবং তিনি গভীর-রসাত্মক রচনাতেও হাস্যরসের মিশ্রণ প্রয়োজন মনে করতেন সত্য, কিন্তু হাস্যরসের দিকেই তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল না। এ-প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় যা লিখেছেন, তা একান্ত যথার্থ। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনের সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্যসম্পাদনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে।" প্রকৃতই উপন্যাসগুলির অন্তর্গত কিছু কিছু কৌতুক-রঙ্গ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সকল হাস্যরসাত্মক রচনাই গভীর তাৎপর্যময়। তিনি লোক-শিক্ষার, আদর্শস্থাপনের এবং ভাব ও চিন্তায় যুক্তিনিষ্ঠা ও গভীরতা-প্রতিষ্ঠার যে ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনাগুলিতে তিনি মুহূর্তের জন্যও তা ভুলে যান নি। কাজেই বঙ্কিমের হাসির রচনা শুধুমাত্র হাসি জোগায় না, তা পাঠকের মনের গভীরতর স্তরে প্রবেশ ক'রে তার চিন্তাকেও আলোড়িত করে।

কেবলমাত্র রসিকতার জন্যই রসিকতা, অথবা ছ্যাবলামি জাতীয় রচনাকে যে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, সে কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। তৎকালীন স্থূল রসিকতার বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম ভাগে 'রসিকতা' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "অধুনাতন বাঙ্গালী মহলে রসিকতার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। 'তামাসা' 'ঠাট্টা' 'ইয়ারকি' 'রং' 'মজা' ইত্যাদি বিবিধ নামে, রসিকতা বঙ্গদেশে একাধিপত্য করিতেছে। বরং কথোপকথনে কিছু নিস্তার আছে। সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ লোকের কাছে, বা শোকদুঃখাদির সময়ে, বা বিষয়কর্মের সময়ে, অনেকে

বাঁচাইয়া চলেন। কিন্তু লেখকদিগের নিকট কিছুতেই নিস্তার নাই। সুসময়ে, অসময়ে; সৎকথায়, কুকথায়; যেখানে, সেখানে; যখন তখন, রসিকতা করা আজি কালি কতকগুলিন লেখকের ব্যবসায়। এমন কথা বলি না যে, সকল লেখকই রসিকতা ব্যবসায়ী। কতকগুলিন লেখক বড় বিজ্ঞ। তাঁহারা রসিকতার প্রতি বড় অপ্রসন্ন। তাঁহাদের ধারণা আছে যে, পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখাই পাণ্ডিত্য। রসিকতার সংস্পর্শমাত্র দুরপনেয় কলঙ্কের কারণ। তাঁহাদের কাছে রসিকতার নাম গ্রাম্যতা।" এই প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালে প্রচলিত রসিকতাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। যথা, (১) প্রাচীন রসিকতা বা নানারূপ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ দোষারোপ দ্বারা হাসানো, (২) গালি দিয়ে হাসানো। (৩) অশ্লীলতার দ্বারা হাসানো (৪) ইতরভাষা বা নানারূপ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা হাসানো।*

উপরের উদ্ধৃতিতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সাহিত্যে হাস্যরসের অবতারণা বঙ্কিম অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করতেন, নিরবচ্ছিন্ন গাম্ভীর্যপূর্ণ রচনাকে তিনি "পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখা"র সঙ্গে তুলনা করেছেন। আবার, ছ্যাবলামি বা নিম্নস্তরের হাস্যরসকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কেবল তাই নয়, অন্য সকল রসের মত হাস্যরসেরও যে স্থান কাল পাত্র আছে, যেখানে সেখানে ভাঁড়ামি-রসিকতা-ছ্যাবলামি যে অতি অশোভন, একথাও তিনি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন। হাসির কথা যেখানে সহজে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃউৎসারিত হয়, তখনই তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে; জোর ক'রে, কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা যে কোনোদিনই সার্থক হয় না, একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম লেখক সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন।' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, "অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌছিবে।"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ জাতীয় প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে

* 'বঙ্কিমচন্দ্র'—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক ও সাহিত্যিক আদর্শ প্রচার করতে অগ্রসর হলেন, এবং সাহিত্য-সমালোচনার কঠোর অথচ নিরপেক্ষ মূল্যায়নের একটি আদর্শ পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত।" এই 'বঙ্গদর্শনে'ই "রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, আবার তাঁর সুবিখ্যাত 'বিজ্ঞান-রহস্য,' 'সাম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিও 'বঙ্গদর্শনে'ই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক লঘু বিষয় বা কৌতুকহাস্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এই 'বঙ্গদর্শনে'ই তিনি প্রথম 'লোকরহস্য' এবং পরে 'কমলা-কান্তের দপ্তর' লিখতে আরম্ভ করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বছর থেকেই 'লোকরহস্যে'র অন্তর্গত রচনাগুলি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এ-পর্যন্ত বঙ্কিম হাস্যরসকে অন্যান্য রসের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশন করেছিলেন, পৃথক ভাবে হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গ-রচনায় হাত দেন দিন। এখন 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি পুরোপুরি ব্যঙ্গরচনায় অগ্রসর হলেন।

সমালোচকেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর আদর্শ-প্রতিষ্ঠাতা, লোকশিক্ষক ও সাহিত্য-সম্রাট্ বলেই গ্রহণ ক'রে অনেক সময় তাঁর প্রতি অবিচার করেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি যে হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক 'লোকরহস্য' প্রমুখ রচনাগুলি লিখেছিলেন, তা তাঁর সময় ও শক্তির অপপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। "পুত্রশোকাতুরের ন্যায় অনবরত মুখ দীর্ঘীকৃত করিয়া রাখা"কেই বোধহয় কোনো কোনো সমালোচক সম্রাটের উপযুক্ত গাম্ভীর্য ও মহিমার যোগ্য বলে মনে করেন। যেমন, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছিলেন, "বঙ্গদর্শনের ব্রতোদ্‌যাপনার্থ প্রথম হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইত। ... সাহিত্য সেবার জন্য তিনি যে সময়টুকু পাইতেন, 'বিজ্ঞানরহস্য' 'লোক-

রহস্য' 'গদ্যপদ্য' প্রভৃতিতে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশের ন্যায় বঙ্গ দর্শনের বিষয় বৈচিত্র্য সম্পাদনই যাহাদের একমাত্র না হইলে অন্ততঃ প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়, তাদৃশ প্রবন্ধমালা রচনায় সে সময়টুকুও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা বঙ্কিমের পক্ষে মহত্তর কার্যসাধনপটীয়সী-শক্তির অপপ্রয়োগ নয় কি ?" 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা ভরাট করবার জন্য অধিকাংশ রচনাই নিজে লিখতে হোত বলে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখপ্রকাশ করেছেন সত্য, কিন্তু ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' যে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় দায়ে পড়ে লিখেছেন, এমন মনে হয় না। যদি 'বঙ্গদর্শনে'র সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য হাস্যরসাত্মক রচনার সন্নিবেশ তিনি নিতান্ত প্রয়োজন মনে ক'রে থাকেন, তবে অন্য কারুর উপর সে-রচনাগুলি লেখবার ভার দিয়ে তিনি বিবিধ প্রকার গম্ভীর রচনার দিকেই মনোনিবেশ করতে পারতেন। 'বঙ্গদর্শনে'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারও ছিলেন। দীনবন্ধু বঙ্কিমপূর্বযুগের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখক। হাস্যরসে অক্ষয়চন্দ্র সরকারেরও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। 'বঙ্গদর্শনে' এঁদের দ্বারা হাস্যরসাত্মক বা লঘু রচনা লেখানো অসম্ভব ছিল না। হাস্যরসবোধ বা ব্যঙ্গ ও হাস্যরসে কিছুমাত্র প্রবণতা না থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই এ-জাতীয় রচনায় হাত দিতেন না, এবং সেক্ষেত্রে তাঁর রচনা 'লোকরহস্যে'র মত উৎকর্ষও লাভ করতো না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র যে হাস্যোৎপাদনে অপটু ছিলেন না, তাঁর উপন্যাসগুলিতে এর আগেই তিনি তা প্রমাণ করেছিলেন।

১২৭৯-৮০ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা সংগ্রহ ক'রে ১৮৭৪ সালের নভেম্বর মাসে (১২৮১ সন) 'লোকরহস্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে বঙ্কিম বইটিকে 'কৌতুক ও রহস্য' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র আরো কয়েকটি রচনা সংযোগ করেছিলেন। 'দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছিলেন, "লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন ; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত

হইয়াছে। সকলগুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।" আমরা এই পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়েই আলোচনা করবো।

'লোকরহস্যে'র রচনাগুলিকে মুখ্যতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ও পরিপূর্ণ হাস্যরসাত্মক। বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলি আবার দুই শ্রেণীর ; তৎকালীন সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিবিধ অনাচার ও বৈষম্যই এই দ্বিবিধ রচনাগুলির লক্ষ্য। 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল,' 'বাবু', 'গর্দ্দভ', 'সুবর্ণ-গোলক', 'হনুমদ্বাবু সংবাদ', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' এবং 'New Year's Day', এ-কটিকে সামাজিক বিদ্রূপ বলে অভিহিত করা যায়। 'ইংরেজস্তোত্র', রামায়ণের সমালোচন', 'কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র' ও 'Bransonism' দেশীয় লোকদের প্রতি তৎকালীন শাসকদের নানা অপমানজনক ব্যবহারকে বিদ্রূপ ক'রে লেখা। 'দাম্পত্য দণ্ড বিধির আইন', 'বসন্ত এবং বিরহ' এবং 'গ্রাম্য কথা' পর্যায়ের রচনা দু'টি পরিপূর্ণরূপে হাস্যরসাত্মক। 'লোকরহস্যে'র রচনাগুলি সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা তিনি অনায়াসেই বলিতে পারিয়াছেন।" ব্রজেন্দ্র-বাবুর এ কথাগুলি 'লোকরহস্যে'র রাষ্ট্রীয় বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলির সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কিন্তু তাঁর সামাজিক ব্যঙ্গ অথবা নিছক হাস্যরসাত্মক রচনাগুলি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাঙালীর স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হয়েছিল। দেশীয় লোকদের প্রতি ইংরেজদের আচরণ সম্বন্ধে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদও দেখা দিতে আরম্ভ হয়েছিল। সরকারি চাকরির সূত্রে উপরওয়ালা ইংরেজদের সংস্পর্শে বঙ্কিমচন্দ্র এ-বৈষম্যমূলক আচরণের বহু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও লাভ করে থাকবেন। ফলে তাঁর মনে যে ক্ষোভ ও তিক্ততা জমা হয়েছিল, এই রাষ্ট্রীয় বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলির মধ্যে বঙ্কিম তাকে মুক্তি দিলেন।

ইংরেজ জাতির বিদ্যা ও তাদের চরিত্রগত নানাগুণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, আবার সেই ইংরেজই যখন এদেশে শাসক-রূপে দেখা দিত তখন দেশীয় লোকদের প্রতি ব্যবহারে তাদের চরিত্রের নিকৃষ্ট দিকটাই প্রকাশ পেত। 'ইংরেজস্তোত্র' রচনাটিতে ইংরেজের প্রতি বঙ্কিমের শ্রদ্ধা ও এদেশীয় ইংরেজদের প্রতি ব্যঙ্গ, উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, "তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ— অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম করি।··· তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; তুমি অগ্নি, কেন না, সব খাও; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের।"

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই 'ইংরেজস্তোত্র'টিতে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-চরিত্র নিয়ে ততটা বিদ্রূপ করেন নি, যতটা করেছেন আমাদের সমাজের তৎকালীন ইংরেজ-স্তাবকতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানবর্জিত হীনমন্যতাকে নিয়ে। যথা, "হে ভক্ত বসৎল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি— তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে বহুমানাস্পদ হইতে বাসনা করি,— তোমার হস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি— অতএব হে ইংরেজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।··· হে মিষ্টভাষিন্। আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃকধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টার লেখাইব। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ চরিত্র নিয়ে কোথাও তেমন বিদ্রূপ করেন নি, যা কিছু ব্যঙ্গ করেছেন সবই এদেশ এবং এদেশীয়-দের সম্বন্ধে ইংরেজের অজ্ঞতা নিয়ে। 'রামায়ণের সমলোচন', 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র', রচনাগুলি এই বিদ্রূপের নিদর্শন। বঙ্কিমের ব্যঙ্গ প্রধানতঃ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা, বিবিধ সামাজিক ত্রুটি, ও তৎকালীন বাঙালীর পরানুকরণস্পৃহার প্রতিই প্রযুক্ত হয়েছে। এমন কি ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজের বৈষম্যমূলক

আচরণের তীব্রতম ব্যঙ্গ ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় বাদানুবাদকালে লিখিত 'Bransonism'-এও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ চরিত্র অপেক্ষা তৎকালীন ইংরেজী আইনের প্রতিই তাঁর বিদ্রূপ বেশি পরিচালিত করেছেন।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্রকে যা সবচেয়ে পীড়িত করতো তা আমাদের সমাজের নানা বৈষম্য, হীনতা, অনাচার এবং সর্বোপরি পরানুকরণপ্রিয়তা। বাঙালী ইংরেজ-সংস্পর্শে আসবার পর থেকে সকল লেখকই আমাদের সমাজের নানা ত্রুটি ও দুর্বলতাকে লক্ষ্য ক'রে ব্যঙ্গাত্মক নকশা, প্রহসন, ব্যঙ্গ কবিতা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। আমাদের সমাজের সংস্কার-সাধন ও তৎকালীন বাঙালীর নৈতিক অধঃপতন রোধ করাই তাঁদের রচনার উদ্দেশ্য ছিল। অতি-উগ্র সাহেবিয়ানা বা অত্যধিক ইংরেজ-অনুকরণকেও কেউ কেউ বিদ্রূপ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তুলনায় তা অত্যল্প। 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানে' অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাহেবিয়ানাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'ই অতি উগ্র ইংরেজ-অনুকারীদের প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। এ সব ক্ষেত্রে ইংরেজ সমাজের অতি প্রকট নির্লজ্জ অনুকরণের প্রতিই বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে, ইংরেজী আচার-ব্যবহারের অনতি-উগ্র প্রভাব নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করেন নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে জাত্যভিমানবোধ এরূপ প্রবল ছিল যে, যেখানেই তিনি বিন্দুমাত্র পাশ্চাত্ত্যানুকরণ লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি তীব্র বিদ্রূপ দ্বারা তাকে বিদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মতামতে অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতিকেও যে তিনি কোনোদিন সুনজরে দেখেন নি, তার কারণ, আমার মনে হয়, এ সব আন্দোলনের পশ্চাতেও তিনি ইংরেজ সমাজের অনুকরণ প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন অভ্যন্তর থেকে, তার নানা ত্রুটির সংশোধন দ্বারা, এবং সামাজিক নীতি ও আচার-ব্যবহারের উন্নতি দ্বারা। কিন্তু প্রচলিত ও প্রথাগত রীতির কোনোরূপ আমূল পরিবর্তন তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি,— সেরূপ পরিবর্তন তাঁর চোখে ইংরেজী সমাজের অনুকরণ বলেই মনে হয়েছে।

'ইংরেজ স্তোত্র' রচনাটিতে ব্রাহ্মধর্মের এবং বিধবাবিবাহের যে উল্লেখ আছে, তাতেও এই ধারণারই সমর্থন পাওয়া যায়।

ইংরেজ-অনুকারীদের প্রতি বঙ্কিমের বিদ্রূপ 'লোকরহস্যের' অন্তর্গত অধিকাংশ রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। 'ইংরেজস্তোত্র' ভিন্ন 'হনুমদ্বাবু-সংবাদ', 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' ও 'New Year's Day'তে এই ইংরেজ-অনুকারী ও স্তাবকদের তিনি তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইংরেজদের অজ্ঞতাকেও তিনি একাধিক রচনাতে আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। 'রামায়ণের সমালোচন' এবং 'কোন স্পেশিয়ালের পত্রে' এ-অজ্ঞতাক আক্রমণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলে'র মধ্যেও তিনি 'মোক্ষমূলর' এবং জেম্‌স্ মিলকে এদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য বিদ্রূপ করেছেন। 'লোকরহস্যের' অন্তর্গত রচনাগুলির মধ্যে একমাত্র 'Bransonism'কে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রিক বিদ্রূপ বলে গণ্য করা যায়। তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ বা পাশ্চাত্যদেশীয়দের অজ্ঞতা নিয়ে রচিত ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি রাষ্ট্রশাসকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে, সেগুলিকেও এই শ্রেণীতেই গণনা করা চলে। প্রকৃতপক্ষে তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ লেখেন নি। তার কারণ, ইংরেজ চরিত্রের প্রতি সাধারণতঃ তিনি শ্রদ্ধাই পোষণ করতেন; এমন কি ইংরেজ-শাসনও তিনি এদেশের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইংরেজদের অজ্ঞতা, এবং ভারতীয়দের প্রতি কোনো কোনো ইংরেজের আচরণবৈষম্যই তাঁর কাছে নিন্দনীয় মনে হোত। সেজন্য বঙ্কিমের রাষ্ট্রিক বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ক্ষোভের তিক্ততা বা বিদ্রূপের জ্বালা ততটা লক্ষ্য করা যায় না, যতটা তৎকালীন ইংরেজদের অজ্ঞতার প্রতি উপহাস দেখতে পাওয়া যায়।

অন্য যে রচনাগুলিকে আমরা সামাজিক ব্যঙ্গ বলে অভিহিত করেছি, তার মধ্যেও হিন্দু-সমাজব্যবস্থার প্রতি কোনো তীব্র আক্রমণ নেই। বহু-বিবাহ, বাল-বিধবার প্রতি সামাজিক নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি, আমাদের সমাজের যে গুরুতর ত্রুটিগুলি রামনারায়ণ তর্করত্ন থেকে অধিকাংশ লেখকেরই বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সে সকল বিষয়

স্থান পায় নি। তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু সমাজের কোনো প্রচলিত ব্যবস্থা, প্রথা বা রীতির আমূল পরিবর্তন কল্যাণকর বলে মনে করতেন না। বরং তিনি মনে করতেন যে, এ-দেশীয় লোকেরা বেশে-ভূষায়, আহারে-বিহারে, এমন কি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে এবং ভাষায় ও আচরণে যে পর-দেশীয়দের অনুকরণ করে, সেটাই আমাদের জাতির পক্ষে বেশি ক্ষতিকর। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুসমাজে প্রচলিত প্রথা বা রীতিগুলির গুরুতর পরিবর্তন না ক'রে লোকের নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে পারলেই আমাদের জাতির উন্নতি হবে। এইজন্য তাঁর প্রায় সকল সামাজিক ব্যঙ্গ-রচনার লক্ষ্য তৎকালীন বাঙালী সমাজের পরানুকরণ-স্পৃহা এবং নৈতিক হীনতা। এই জন্যই 'লোকরহস্যের' অন্তর্গত সামাজিক ব্যঙ্গ-রচনাগুলির প্রায় সবই শিক্ষিত বাঙালীর পরানুকরণ প্রবৃত্তি ও নৈতিক চরিত্রের নানা দুর্বলতাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা। অপরদিকে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও রুশোপ্রমুখ পাশ্চাত্য সংস্কারকদের মতবাদ দ্বারাও বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার ফলে ধনী-দরিদ্র ও স্ত্রী-পুরুষভেদে সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের যে তারতম্য হয়, তিনি তা অসঙ্গত মনে করতেন। 'সাম্য' প্রভৃতি গম্ভীর প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এর যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন, এবং ব্যঙ্গ রচনাতেও এ-জাতীয় বৈষম্যকে তিনি আঘাত করতে ছাড়েন নি। 'সুবর্ণগোলক' রচনাটি এ-ব্যঙ্গের একটি উদাহরণ। 'কমলাকান্তে'র 'বিড়াল' প্রভৃতি রচনাতেও তিনি এ-বৈষম্যকেই বিদ্রূপ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের যে মিশ্রণ ঘটেছিল, তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। পুরোপুরি পাশ্চাত্য ভাবধারায় গঠিত হয়েও সেই শিক্ষা এবং ভাবধারাকে তিনি হিন্দু সমাজে মাত্রাধিক পাশ্চাত্য প্রভাব প্রতিরোধের কাজে লাগিয়াছিলেন। যে অস্ত্র তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, সেই অস্ত্রদ্বারা তিনি ইংরেজী সমাজ ও পরিবারের অবাঞ্ছনীয় প্রভাবগুলিকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। যে-যুক্তিবাদ ও সাম্যবাদ তাঁর মধ্যে গভীরভাবে অন্তর্লীন হয়েছিল, তার দ্বারাই তিনি হিন্দু সমাজকে সুগঠিত করতে এবং প্রাচীন বিশ্বাস ও পুরাতন

প্রথাগুলিকে সংশোধিত আকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্র’ এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ‘লোকরহস্যে’ও তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও যুক্তিসমন্বিত ভাবধারার প্রয়োগ দ্বারাই এ দেশীয় লোকের ইংরেজী শিক্ষা প্রসূত বিকৃত রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করেন নি।

‘লোকরহস্যে’র অন্তর্গত অন্য রচনাগুলিকে প্রকৃত হাস্যরসাত্মক বলে বর্ণনা করা যায়। এগুলির বিষয় সামাজিক, পরিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের নানা কৌতুককর বিষয়। যথা, শিক্ষকশ্রেণীর মূর্খতা ও তজ্জনিত শিক্ষার বিপর্যয়, স্ত্রীগণের স্বামী-শাসন প্রভৃতি। এর মধ্যে ইংরেজী-বাংলা মিশ্রিত ‘দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন’কে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসাত্মক রচনা বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ‘গ্রাম্য কথা’ শীর্ষক রচনা দু’টিতে বঙ্কিম যে কৌতুক-হাস্য পরিবেশন করেছেন তা প্রকৃতই উচ্চস্তরের এবং সে যুগে সম্পূর্ণ অভিনব। একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

“পণ্ডিত। শূওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক’রে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?”

(গ্রাম্য কথা। প্রথম সংখ্যা,—পাঠশালায় পণ্ডিত মহাশয়)

“কাদম্বিনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধীতশাস্ত্র সেই বালক তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ছেলে। বলি মা!

কাদম্বিনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কাণ জুড়ায়।

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটা পয়সা দে না মা!

কাদম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথায় পাব, বাবা?

ছেলে। দিবি নে বেটি? মুখপুড়ি! হতভাগী! আঁটকুড়ি!

কাদম্বিনী। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে।

ছেলে। দিবি নে বেটি! (ইতি প্রহার ও কলসী ধ্বংস)

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)

বাপ। এ কি রে বাঁদর ?

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি—"মাতৃবৎ পরদারেষু।" কই মাগি বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে ?" (গ্রাম্য কথা)

এই উদ্ধৃতিতে যে-ধরণের হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যে তা পূর্বে দেখা যায় নি। বঙ্কিমপূর্ব সাহিত্যে হাস্যরস প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আশ্রয় ক'রেই বিকাশ লাভ করেছিল। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুই শ্রেণীর। সে-সব ব্যঙ্গের তীব্রতা অনেক সময়ই জ্বালাময় ও তিক্ত ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এ-সব রচনাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ না বলে কৌতুকহাস্য পর্যায়ে গণনা করাই বিধেয়। যদিও বা এগুলিকে আমাদের তৎকালে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ও উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের প্রতি ব্যঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যায়, তবু এর তিক্ততাহীন, অসূয়াহীন, হাস্যময় প্রকাশ ঐতিহাসিক বিচারে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস বলে স্বীকার করতে হবে। তা ছাড়া, ব্যঙ্গ-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য কেবলমাত্র আমাদের সমাজেরই নানা ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসাম্য নয়, মানবতার উচ্চাদর্শে উদ্বুদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব-সমাজের অনাচার, অসাম্য এবং দুর্বলতা-গুলিকেও লক্ষ্য করতে ছাড়েন নি। তাই 'লোকরহস্যে'র অন্তর্গত ব্যঙ্গ-রচনাগুলি আমাদের পরিবার, সমাজ বা দেশের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে সমগ্র মানবসমাজে বিস্তার লাভ করেছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গরচনায় কোনো অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সামাজিক সমস্যা — যেমন বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, মদ্যপান ইত্যাদি অপেক্ষা, বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা — যেমন অসাধু আচরণ, নৈতিক হীনতা, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতিই বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। আর, আমাদের সমাজের নানা দুর্বলতা নিয়ে উপহাস করতে করতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই সে বিদ্রূপকে বৃহত্তর মানব সমাজের অনুরূপ দুর্বলতার প্রতি চালিত করেছেন বলে, তাঁর কোনো ব্যঙ্গেই আঘাতের জ্বালা নেই, কিন্তু কৌতুকের আমেজ আছে। যথা,

""...একদা আমি সেই দেশে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রা নামে একজন উদ্ধত স্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষয়কর্ম্মটা কি ?"

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, "বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্য-লোকে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম 'বিষয়-কর্ম্ম', অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি ; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা, লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না ; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়।" "

(ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল)

"মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ ;—এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।" (ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল)

"প্রথম বানর। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা হউক।

দ্বিতীয় বানর। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।...

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহা দোষ বৈ আর কি ?"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি এবং অশ্লীল গালি-গালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।" "

(ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল। দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

এই শেষ উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বাঙালী সমাজের ভীরুতা, কাপুরুষতা, পরনিন্দাপ্রিয়তা, মূর্খতা ও অশ্লীলতাপ্রবণতাকে বিদ্রূপ করেছেন

সত্য, কিন্তু প্রথম দু'টি উদ্ধৃতিতে তিনি সমগ্র মানবসমাজকেই তাঁর ব্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। 'লোকরহস্যে'র অন্যান্য রচনাতেও বঙ্কিমের ব্যঙ্গের এই অসাধারণ গুণ লক্ষ্য করা যায়; যার ফলে, তাঁর নিজস্ব সমাজের প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপও সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়েছে। যেমন,

"আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।··· তুমি উচ্চাসনে বসিয়া স্তাবকগণ পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে। তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ।···হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুলসঙ্গোপন পূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সরস্বতীমণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ।···হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠিমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া, তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি।···তুমি নানা রূপে নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।" (গর্দ্দভ)

"মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে? কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না।" (সুবর্ণগোলক)

'বাবু' রচনাটির বিষয় মৌলিক নয়। ইতিপূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ লেখকেরা বাঙালী সমাজের এই বাবু-নামধেয় ব্যক্তিটির বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিভিন্ন প্রকার

ব্যঙ্গ-বাণ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী লেখকেরা যেখানে বিত্তশালী বাবু সমাজের নৈতিক চরিত্রগত হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নিয়েই বিদ্রূপ করেছেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সকল শ্রেণীর বাবুর সামাজিক আচরণগত, শিক্ষাগত ও ব্যবহারগত সকল দুর্বলতাকে লক্ষ্য করেছেন ব'লে, তাঁর ব্যঙ্গ কেবলমাত্র সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ও ধনবান সমাজের প্রতিই প্রযুক্ত হয়নি, তৎকালীন ভদ্রশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত বা অনতিশিক্ষিত, ধনী কিংবা দরিদ্র, উচ্চপদস্থ অথবা নিম্নচাকুরিজীবী সকলের প্রতিই সমানভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। সেজন্য এ-ব্যঙ্গ সমাজের কোনো বিশেষ অংশকে আঘাত করেনা। পাঠক এবং লেখক সকলেই এ-ব্যঙ্গের লক্ষ্য বলে গণ্য হতে পারেন। যেমন,

"যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু! যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু; —চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহার সহিষ্ণু; যাঁহাদের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।…হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধকোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু।" (বাবু)

তৎকালীন বাবুসমাজের কোন্ দোষ এই ব্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হয়েছে? আর তৎকালীন ভদ্রসমাজের কোন ব্যক্তিই বা নিজেকে এই ব্যঙ্গের অতীত বলে গণ্য করতে পারতেন? এই সর্বজনীনতাই বঙ্কিমচন্দ্রের

ব্যঙ্গাত্মক রচনাকে বিদ্রূপের জ্বালামুক্ত ক'রে প্রকৃত হাস্যরসের স্তরে উন্নীত করেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের গ্রন্থাদির সমালোচনা প্রসঙ্গে হাস্য ও ব্যঙ্গাত্মক রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এই গ্রন্থের প্রথম দিকে আমরা তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উক্তি থেকে বোঝা যায়, প্রকৃত হাস্যরস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কিরূপ উচ্চাদর্শ ছিল। তিনি অসূয়াহীন, অশ্লীলতামুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও সহানুভূতিময় ব্যঙ্গকেই মাত্র প্রকৃতপক্ষে হাস্যরসাত্মক বলে মনে করতেন। 'লোকরহস্যে'র প্রত্যেকটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এ-উচ্চাদর্শ রক্ষা করেছেন বলেই 'লোকরহস্য' ব্যঙ্গাত্মক রচনা-সমষ্টি হলেও তার মধ্যে উচ্চস্তরের হাস্যরস পরিস্ফুট হয়েছে। আর, পূর্বগামীদের তুলনায় বঙ্কিমের হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গ-রচনার পরিচ্ছন্নতাও আশ্চর্য। যে-অশ্লীলতা বঙ্কিম-পূর্বযুগের হাসির রচনায় প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ বলে গণ্য হোত, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-রচনার আদর্শ স্থাপন করলেন। যে-বঙ্কিমচন্দ্র সকল প্রকার নৈতিক অধঃপতন ও চারিত্রিক হীনতার প্রবলতম শত্রু ছিলেন, তিনি তাঁর ব্যঙ্গ-রচনার কোথাও চরিত্রহীনতা অথবা নৈতিক গ্লানির নগ্নচিত্র আঁকলেন না, এ অল্প সংযমের পরিচয় নয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ উচ্চস্তরের সমাজ-সংস্কারক লেখকদের রচনাতে আমরা যে ধরণের লাম্পট্য এবং চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্র দেখতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও তার অবতারণা করেন নি। তবু, তাঁর উচ্চাদর্শময় ও পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গরচনাগুলিতে এমন একটি উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে, যা তৎকালে বাঙালীর নীতি ও রুচির উন্নয়নে অনেক বেশি পরিমাণে কার্যকরী হয়েছিল।

'লোকরহস্যে'র রচনাগুলির মধ্যে 'বর্ষ সমালোচন' অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনা। এটি নিতান্ত সম্পাদকীয় প্রয়োজনে সাধারণ পাঠকের জন্যই লিখিত হয়েছিল বলে ধারণা জন্মে। 'দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন' আর একটি রচনা যাকে উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ বলে গণ্য করা চলে না। এটি দাম্পত্য জীবন নিয়ে

কৌতুক হলেও, এর হাস্যরস আইনজ্ঞ ভিন্ন অন্যের পক্ষে সহজে অধিগম্য নয়। এটির মধ্যে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করিতে পারেন নি। তবু, সব দিকে বিবেচনা করলে, 'লোকরহস্য' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম ব্যঙ্গ রচনা হলেও, পরিচ্ছন্ন অসূয়াহীন সর্বজন-উপভোগ্য হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গ রচনার আদর্শ স্থাপন করেছিল বলা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক রচনা 'কমলাকান্ত'। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁর সকল রচনার মধ্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন, এ কথা তিনি তাঁর জামাতার কাছে স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন। আধুনিক সমালোচকেরা এ বিষয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে একমত হোন বা নাই হোন, 'কমলাকান্তের দপ্তর' যে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এ-বিষয়ে মতদ্বৈধের কোনো অবকাশ আছে বলে মনে করি না।

১২৮০-৮২ সনে (১৮৭৩-৭৫) 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'বঙ্গদর্শনে' এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "এই গ্রন্থ কেবল "কমলাকান্তের দপ্তরে"র পুনঃসংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।..."চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত ; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।..."বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলা-কান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র" মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।" 'বুড়া বয়সের কথা' 'কেবলরাম শর্ম্মা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কমলাকান্তে'র তৃতীয় সংস্করণে 'ঢেঁকি' নামে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আরো একটি রচনা সংযোজিত হয়।

কমলাকান্ত-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রের মধ্যে ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতা, আদর্শবাদ ও বাস্তবতাবোধ, কবিত্ব ও সাংসারিকতা, মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতি, দার্শনিকতা ও সমাজচেতনা যে

ভাবে সমন্বিত করেছেন, তা একমাত্র বঙ্কিমের লোকোত্তর প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব ছিল। 'কমলাকান্ত' সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত আইডিয়ালিষ্ট — আদর্শবাদী এবং বাস্তবের উর্ধ্ব-লোকে তাঁহার কল্পনাবিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-সাহিত্যের যাহা প্রথম — স্বদেশপ্রেমিক।" ব্রজেন্দ্র বাবুর এ-উক্তি তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচায়ক হলেও, তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যায় না। কমলাকান্ত-চরিত্রে গভীর আদর্শবাদের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধও সমন্বিত হয়েছে, এবং স্বদেশপ্রেম — যা পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের সংস্পর্শে বাঙালীর মনে সর্বপ্রথমেই জাগ্রত হয়েছিল — তার প্রকাশও ইতিপূর্বেই কোনো কোনো চরিত্রে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। কমলাকান্ত চরিত্রের মহত্তর বৈশিষ্ট্য এই যে, দার্শনিক, কবি, ভাবুক, মানবপ্রেমিক, সমাজহিতৈষী, আদর্শবাদী কমলাকান্ত একান্ত সংবেদনশীল বিষাদময় চরিত্র হয়েও, সে হাসিই উৎপাদন করে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে কমলাকান্তকে একটি 'কমিক চরিত্র' বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কী করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন জানা নেই, কিন্তু কোনো সমালোচকের কাছ থেকে তিনি এ মতের সমর্থন পাবেন বলে বিশ্বাস হয় না। বস্তুতঃ কমলাকান্ত বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক চরিত্র এবং এই জাতীয় উচ্চস্তরের ট্র্যাজিক চরিত্রই চার্লি চ্যাপলিনের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় —"Playful pain — as you say — that is what humour is. The minute a thing is overtragic it is comic."। কমলাকান্তে আমরা সেই 'playful pain', সেই 'tragic' হাস্যরসের সাক্ষাৎ পাই। কমলাকান্ত জগৎ ও জীবনকে যতই দেখে, ততই সহানুভূতিময় বেদনায় সে অভিভূত হয়। কিন্তু যেহেতু তার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের বিচারে অস্বাভাবিক, সেহেতু — সেই অ-স্বাভাবিকতার অসংগতির দরুণ — সে আমাদের হাসি উৎপন্ন করে।

এ-প্রসঙ্গে এ-গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হোরেস ওয়ালপোলের

উক্তি ও সে-সম্পর্কে পামারের মন্তব্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মানুষের জীবনে এবং তার পরিবেশ ও কার্যকলাপে এমন জিনিস কমই আছে, যার করুণ এবং হাস্যজনক দুটো দিক নেই — দু' দিক থেকেই যাকে দেখা যায় না। হোরেস ওয়ালপোল বলেছিলেন যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে যাকে হাস্যজনক মনে হয়, সংবেদনশীল হৃদয়ে তা দুঃখ উৎপন্ন করে। এ-প্রসঙ্গে জন পামার বলেছেন যে, কোনো একটি বিশেষ বিষয় বা ঘটনার দুঃখ ও কৌতুকজনক দিক একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই; কারণ, মানুষের হৃদয় ও মন, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি একই সঙ্গে কাজ করে চলে। বঙ্কিমের কমলাকান্ত-চরিত্রে যুগপৎ হাস্য ও বেদনাসৃষ্টির এক অপূর্ব উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। কমলাকান্ত তার কথাবার্তা ও মতামতে একই সঙ্গে আমাদের মনন ও হৃদয়াবেগকে আলোড়িত করে। ফলে, তার অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিনব বক্তব্যের অ-সাধারণত্বে আমাদের হাসি পায় সত্য, কিন্তু হৃদয়বান পাঠকমাত্রই কমলাকান্ত-উদ্ঘাটিত মানবজীবনের প্রচ্ছন্ন ট্রাজেডিতে দুঃখ অনুভব না ক'রে পারে না।

চেস্টারটন তাঁর কোনো গল্পের এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলেছেন যে, অনেক সময় পা উঁচুতে তুলে মাথার উপরে দাঁড়িয়ে দেখলেই পৃথিবীকে যথার্থভাবে দেখা যায়। অর্থাৎ যে গতানুগতিক দৃষ্টিতে বিশ্বসুদ্ধ মানুষ জগৎ, সংসার ও সমাজকে দেখে, সে-দৃষ্টি ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে, অন্যভাবেও পৃথিবীকে দেখা ও বিচার করা সম্ভব; এবং অনেক সময় এই অন্যভাবে দেখতে জানার ফলেই জগৎকে তার সত্যরূপে দেখা যেতে পারে। কমলাকান্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎ-সংসারকে দেখবার ও চিনবার জন্য সে এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছে। তাই মনুষ্য বা পতঙ্গ, বসন্তের কোকিল বা বড়বাজারের ভিড়, বিড়াল বা ঢেঁকি, যা সে দেখে তারই মধ্যে সে নূতন অর্থ, নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করে। কমলাকান্তের দেখা প্রত্যেকটি বস্তু তার দরদী মনে এক অভাবনীয় রূপে প্রতিভাত হয়। তাই সে মানুষকে দেখে বৃক্ষ-বিলম্বিত বিবিধপ্রকার ফলের মত — যার "সকলগুলি পাকিতে পায় না — কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে।…কতকগুলি তিক্ত,

কটু বা কষায়, — কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময় — যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকালজাতীয় — কেবল দেখিতে সুন্দর।" আলোর ফানুসের চারপাশে ভ্রাম্যমান পতঙ্গের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় যে, "মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে — সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে — কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।" কমলাকান্ত দেখে, "এই বিশ্ব-সংসার একটি বৃহৎ বাজার — সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ — খরিদ্দার চলে আয়" — সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।" বিড়ালের 'মেও' ডাকে কমলাকান্ত শুনতে পায় দরিদ্র, বুভুক্ষু, বঞ্চিত সমাজের আর্তনাদ — "আমাদিগের দশা দেখ — আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে — জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে — অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না! —" আমাদের কালো দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে।...দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?"

এই 'কমলাকান্তি' দৃষ্টির লক্ষ্য প্রধানতঃ বাঙালী সমাজ, কিন্তু বৃহত্তর মানবসমাজও সে সূক্ষ্ম ও অভিনব দৃষ্টিতে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়। যে-জীবন, যে-সংসার, যে-সমাজ আমাদের সংস্কারাভ্যস্ত দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও বৈশিষ্ট্যহীন মনে হয়, কমলাকান্তের চোখে তার অন্তর্নিহিত অসংগতি ও বেদনা জাজ্জ্বল্যমান্ হয়ে ওঠে। এই অসংগতি অনেক সময় আমাদের হাসি উৎপাদন করে ব'লে এর পিছনে যে গভীর মানব-সহানুভূতিসঞ্জাত দুঃখ ও

বিষাদ রয়েছে, তা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। তাই কমলাকান্ত পুরোপুরি ট্র্যাজিক চরিত্র হয়েও আমাদের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির অসংগতি ও অসামঞ্জস্যহেতু, আমাদের কাছে হাস্যরসাত্মক বলে প্রতিভাত হয়।

কমলাকান্তের এই দৃষ্টিভঙ্গি — যাকে সে দিব্যদৃষ্টি বলে অভিহিত করেছে — এলো কোথা থেকে? কমলাকান্ত নিজে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে, "অহিফেন প্রসাদাৎ"। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের কবি-সাহিত্যিক সমাজে যে আফিং-এর দৌরাত্ম্য দেখা গিয়েছিল, এবং যে আফিং-এর নেশার কল্পনা-প্রবণতার সুযোগ নিয়ে ডি কুইন্সি তৎকালীন ইংরেজী সমাজের উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর উপাদেয় *Confessions of an English Opium Eater* রচনা করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙালী সমাজ ও মনুষ্যসমাজের হাস্যকর দুর্বলতাগুলি দেখাবার জন্য সেই আফিংখোরের মানসদৃষ্টিরই সাহায্য নিলেন। শিল্পকৌশল বা টেক্‌নিকের দিক থেকে 'কমলাকান্তে'র উপর ডি কুইন্সির প্রভাব অতি স্পষ্ট। আধুনিক কালে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন পর্যন্ত বহু সমালোচকই এই প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। সন্ধানী পাঠকের পক্ষে স্থানে স্থানে ডি কুইন্সি বা ডিকেন্সের ছায়াও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। তবু আভ্যন্তরীণ সম্পদে — উদ্দেশ্য, বক্তব্য ও গভীর দরদপূর্ণ সমালোচনায়— 'কমলাকান্ত'কে বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন, "কি ভাষার মাধুর্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ, ও স্বদেশ-প্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজ-শিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সাহিত্যের, তরলতার সহিত মর্ম্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে? কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা

কতখানি? হায়রে অদৃষ্ট! "মৌলিকতা মৌলিকতা" করিয়া অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে "কমলাকান্ত" প্রথম পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন, "ওটা De Quincy-র Confessions of an English Opium Eater এর অনুকরণ।" বড় হইয়া বুঝিয়াছি উহা পাণ্ডিত্যের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papersএর Samএর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।" (বঙ্কিমচন্দ্র)

কমলাকান্ত চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আপন ব্যক্তিত্বকেই প্রসারিত করেছিলেন। এ-সম্বন্ধে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা যথার্থ। "সোজাসুজি সজ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না।" বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসবোধ তীব্র ছিল বটে, কিন্তু তিনি গম্ভীর, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, মনীষাসম্পন্ন গভীর চিন্তাশীল মনের অধিকারী ছিলেন। চটুলতা অপেক্ষা গাম্ভীর্যের প্রতিই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাই 'লোকরহস্যে'র লঘুচাপল্যে সন্তুষ্ট থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কমলাকান্ত-চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আপাত-লঘুতার সঙ্গে তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত নানা মন্তব্য ও মত ব্যক্ত করবার সুযোগ ক'রে নিলেন। কমলাকান্তরূপী একটি অস্বাভাবিক ও অসংগতিময় চরিত্র উপস্থিত ক'রে, তিনি চরিত্রটিকেই হাস্যাস্পদ ক'রে তুললেন। ফলে, এ-চরিত্রের গম্ভীর মন্তব্যগুলিও আপাতদৃষ্টিতে হাস্যময় বলেই মনে হোল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার আরো একটি দিক, যা তিনি প্রবন্ধ-উপন্যাসের মধ্যে যথোচিতরূপে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি, তাকে তিনি কমলাকান্ত-

চরিত্রের মধ্য দিয়ে অসংকোচে মুক্তি দিতে সমর্থ হলেন। বঙ্কিমপ্রতিভার এই দিকটি তাঁর কবিত্ব। 'সংবাদ-প্রভাকরে' কবিতা রচনা দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা ও মানস' কাব্য। এর পর গদ্যরচনাকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভার বৃহত্তর এবং যোগ্যতর ক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তরে যে কবিত্ব ছিল, প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকলেও তা বিনষ্ট হয় নি। 'কমলাকান্ত' চরিত্র সৃষ্টি ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে তাঁর দার্শনিকতা, চিন্তাশীলতা ও মনস্বিতা ও অপরদিকে তাঁর ভাবুকতা ও কবিত্বকে অসংকোচে মুক্তি দিতে সমর্থ হলেন। অথচ, যেহেতু কমলাকান্ত আফিংখোর অদ্ভুতকল্পনাবিলাসী হাস্যাস্পদ চরিত্র এবং যেহেতু তার উক্তি ও মন্তব্যকে সাধারণ মানুষ গভীরভাবে অনুধাবন করে না, সেহেতু তার চিন্তাশীলতা, দার্শনিকতা, ভাবুকতা ও কবিত্বকে 'বঙ্গদর্শনে'র লঘুচিত্ত পাঠক লঘুভাবে গ্রহণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিত্বকে প্রকাশ করবার সংকোচ কমলাকান্ত-চরিত্রের আবরণে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হলেন।

'কমলাকান্তে'র 'একা—"কে গায় ওই?"', 'ফুলের বিবাহ', 'একটি গীত' প্রভৃতি নিছক কবিত্বময় রচনা। কিন্তু কমলাকান্তের লেখনী-নিঃসৃত হয়ে এরা কৌতুকজনক বলে প্রতিভাত হয়। সেরূপ, 'পতঙ্গ', 'আমার মন', 'আমার দুর্গোৎসব', ও 'বুড়া বয়সের কথা', দার্শনিকতা ও ভাবুকতাময় রচনা; 'বড়বাজার', 'বিড়াল' ও 'ঢেঁকি' প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাপ্রসূত রচনা; কিন্তু কমলাকান্তী ঢং-এর মিশ্রণে সবই আপাতকৌতুককর রচনায় পরিণত হয়েছে। এর অনেকগুলিতে কৌতুক-জনক উক্তি ও ভঙ্গির প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্তু কোনো কোনোটি, যেমন 'কে গায় ওই?', 'আমার দুর্গোৎসব', প্রভৃতিতে বিশেষ কোনো কৌতুক বা ব্যঙ্গ না থাকলেও, কমলাকান্তের নামের ও ঢঙের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে সেগুলি লঘুরচনা ব'লে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ, কমলাকান্তী ঢং বলতে আমরা লঘু কৌতুকজনক ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিই বুঝি, তাই ইদানীন্তন কালেও বহু লেখক ব্যঙ্গাত্মক সরস রচনা লিখে কমলা-কান্তের নামে প্রকাশ করেন। এর কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যতই

গভীর দার্শনিকতা, ভাবুকতা ও কবিত্বপূর্ণ উক্তি করুক না কেন, এই নেশাখোর, কল্পনাবিলাসী চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র এমনই সুকৌশলে অঙ্কিত করেছেন যে, আমাদের সাধারণ, গতানুগতিক, সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই চরিত্রের কথা-বার্তা, কার্যকলাপ, সবই হাস্যজনক মনে হয়। অপরপক্ষে সাধারণ মানুষ যেভাবে জগৎ ও জীবনকে দেখে এবং গ্রহণ করে, কমলান্তের অহিফেন-উন্মুক্ত দৃষ্টিতেও তা অতি অর্থহীন ও কৌতুকজনক ব'লেই বোধ হয়। তাই কমলাকান্তকে স্পষ্টই স্বীকার করতে হয়, "বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না।" এই সংসারের সঙ্গে এবং সাংসারিক যাবতীয় প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে না বনার জন্যই, কমলাকান্ত ইংরেজী ও সংস্কৃত জানা সত্ত্বেও সে-বিদ্যাকে অর্থকরী ক'রে তুলতে পারে নি এবং আপিসের চিঠিপত্রের উপরে "সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া" লিখে রাখতে ইতস্তত করেনি। "একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল।"" কমলাকান্তের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিপরীত মূল্যবোধের এরূপ জাজ্বল্যমান উদাহরণ আর কী হতে পারে?

কমলাকান্তের যেমন সংসারের সঙ্গে বনলো না, সংসার ও সাংসারিক মানুষের পক্ষেও তেমনি কমলাকান্তের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বনিবনা হওয়া শক্ত। এবং এইখানেই, এই অসংগতির জন্যই, কমলাকান্ত-চরিত্রের মধ্যে সাংসারিক মানুষ হাসির খোরাক পায়, যেমন কমলাকান্তও এই জীবন ও জগতের দিকে তাকিয়ে গভীর বেদনাপূর্ণ হাসি হাসে।

বঙ্কিমচন্দ্রই যে কমলাকান্ত এতে আর সন্দেহ কী? ব্রজেন্দ্রবাবু যথার্থই বলেছেন, "স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি।" বঙ্কিমচন্দ্রের মননশীলতা, আদর্শবাদ, ভাবুকতা, সকলই কমলাকান্ত চরিত্রে উপস্থিত। কিন্তু সকলপ্রকার চারিত্রিক ও সাহিত্যিক গুণান্বিত এই

চরিত্রে অহিফেন-প্রভাবোচিত অদ্ভুত কল্পনাসমৃদ্ধ জনদুর্লভ 'দিব্যদৃষ্টি' সংযুক্ত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে একটি হাস্যজনক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন ব'লে, কমলাকান্তের অন্তরালে সহজেই তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছিলেন।

'কমলাকান্ত' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসসৃষ্টির চরম সার্থকতা কোনো বিশেষ রচনা বা কোনো বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ নয়। বঙ্কিমসৃষ্ট হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'কমলাকান্ত' চরিত্রে। 'মনুষ্য ফল', 'বিড়াল', 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী', প্রভৃতি রচনায় প্রচুর কৌতুকহাস্য থাকলেও, এই সব রচনার জন্যই হাস্যরসে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়নি। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব কমলাকান্ত-চরিত্রসৃষ্টিতেই প্রমাণিত। সে-হিসাবে 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামক 'ভীষ্মদেব খোসনবীস' রচিত গ্রন্থ ভূমিকাই এ-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ রচনা। কেননা, এই রচনাটিতেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিত্বকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাস্যজনক চরিত্রসৃষ্টির দ্বারা প্রচ্ছন্নরূপে এবং অন্যভাবে প্রকাশ করার সুযোগ ক'রে নিলেন। কেবল তাই নয়, সাধারণ মানুষের সাংসারিক ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই কমলাকান্তী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও তিনি এ-রচনাতেই দেখিয়ে দিলেন। কমলাকান্ত বাংলা-ইংরেজী-সংস্কৃতে বিদ্বান হয়েও সাংসারিক বিচারে সে মূর্খ; কারণ, "যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই।... কমলাকান্তের মত বিদ্বান, যাহারা কেবল কতকগুলো বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।" তাছাড়া, কমলাকান্ত "চাকরি রাখিতে পারিল না। ... ছেঁড়া কাগজ ... দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না।" এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে সাধারণ সাংসারিকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধি ভীষ্মদেব খোসনবীস এবং বিষয়-বুদ্ধির অতীত 'দিব্যদৃষ্টি'সম্পন্ন কমলাকান্তের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কমলাকান্ত চরিত্রের মহত্তম বৈশিষ্ট্য তার ব্যাপক মানব-সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা। এই সহানুভূতি-সঞ্জাত বেদনাই কমলাকান্তের হাস্যজনক উক্তিতেও গভীর দুঃখে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। দীনবন্ধু মিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই।" বস্তুতঃ ব্যাপক ও

গভীর মানবসহানুভূতিই বঙ্কিমচন্দ্রের সকল সাহিত্য-প্রেরণার মূলস্বরূপ ছিল। তাঁর ব্যঙ্গরচনাতেও এই সহানুভূতিই সেগুলিকে উচ্চস্তরের মর্যাদা দিয়েছে। সামাজিক মানুষ তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃতিত্বে আত্মপ্রসাদ ও তৃপ্তি লাভ করে বটে, কিন্তু তার সকল গণ্ডিবদ্ধ ও গতানুগতিক কার্যকলাপের অন্তরালে অধিকাংশ মানুষের জীবনে যে চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও হতাশা বিরাজ করে, কমলাকান্তের সংবেদনশীল মনে তা গভীর দুঃখ এনে দেয় বলেই সে মনুষ্যফলের শোচনীয় পরিণাম নিয়ে রসিকতা করতে পারে। নিজের কাম্যলাভের জন্য মানুষের আত্মোৎসর্গ যে কী নিদারুণ, প্রেম ও মিলনের আনন্দ যে কত ক্ষণস্থায়ী, ধনবণ্টনবৈষম্যজনিত দারিদ্র্য মানুষকে কত অধঃপতন ও দুঃখের পথে নিয়ে যায়, 'পতঙ্গ', 'ফুলের বিবাহ', 'বিড়াল' প্রভৃতি রচনায় কমলাকান্ত তারই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কমলাকান্তের মন্তব্যগুলি তার পরদুঃখকাতরতা ও সমবেদনা থেকে উৎসারিত, এবং সেগুলির তাৎপর্য বেদনাময়। কিন্তু যেহেতু কমলাকান্ত আফিংখোর, সেহেতু সে তার নেশাগ্রস্ত কল্পনায় এই বিষয়গুলি এমনভাবে দেখে ও এমনভাবে উপস্থিত করে, যে গতানুগতিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলি হাস্যজনক ব'লে মনে হয়।

এই জন্যই একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, 'কমলাকান্ত' বইটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব কমলাকান্ত-চরিত্রসৃষ্টিতে, কমলাকান্তী দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণায়। একথা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ভাল করেই জানতেন, তাই আফিং-খোর 'দিব্যদৃষ্টি'সম্পন্ন কমলাকান্তকে সৃষ্টি ক'রে এই পর্যায়ের কোনো কোনো রচনার ভার তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। কমলাকান্তী ঢংএর ছাঁচে ফেলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সাহিত্যিকও যে-কোনো বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য-সমন্বিত রচনা তৈরি করতে পারবেন, এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল। কমলাকান্ত চরিত্রসৃষ্টির মহত্তম ও দুরূহতম কাজটি তিনি নিজেই সমাধা করেছিলেন। অবশ্য, বঙ্কিমসৃষ্ট এ-পর্যায়ের রচনার আদর্শ সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও 'স্ত্রীলোকের রূপ'-লেখক তাঁর রচনায় কমলাকান্তোচিত নিরপেক্ষ-নির্বিকার দৃষ্টি রক্ষা করতে পারেন নি, এবং 'চন্দ্রালোকে' লেখক তার পাণ্ডিত্যের গুরুভারে কমলাকান্তী সহজ লঘুতাকে খর্ব করেছেন; তবু,

এ-দুটি রচনা যে 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার অনুপযুক্ত হয় নি, এতেই প্রমাণ হয় যে, কমলাকান্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আদর্শরূপে সম্মুখে রেখে, অন্য সাহিত্যিকের পক্ষেও এ পর্যায়ের রচনা লেখা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কমলাকান্ত চরিত্র ও তার দিব্যদৃষ্টিতে দেখা জগৎ বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন অপর কারুর পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল।

'কমলাকান্তের পত্র' পর্যায়ের তিনটি রচনা ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র পত্রগুলিকে "তিনখানি ভাঙ্গিয়া চারিখানি"তে পরিণত করেন। "কমলাকান্তের জোবানবন্দী"তে বঙ্কিমচন্দ্র আইন-আদালত উকিল-সাক্ষী নিয়ে প্রচুর ব্যঙ্গকৌতুক করেছেন সত্য, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, এখানেও তাঁর মূল বক্তব্য মানবসহানুভূতিসঞ্জাত করুণায় পরিপূর্ণ। যে দরিদ্র গরু চুরি ক'রে তার অভাবমোচন করতে চায়, একদিকে তার প্রতি সহানুভূতি, অপরদিকে যারা বাহুবল দ্বারা পরের অধিকারে ও সুখশান্তিতে হস্তক্ষেপ করে তাদের প্রতি বিদ্রূপ, এই দুই-ই এ-রচনার আসল কথা। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষের এতই অনভ্যস্ত যে 'খোশনবীশ জুনিয়র' যখন বলে "মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে" তখন সে সাধারণ মানুষের বিচারই প্রকাশ করে।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' থেকে পুনর্মুদ্রিত ১৮৮৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ ব্যঙ্গাত্মক রচনা। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশকালে এটি "শ্রীদর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড প্রণীত" বলে উল্লিখিত ছিল। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনায় আর হাত দেন নি, দার্শনিকতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যার গুরুতর রচনাতেই তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীরূপে 'মুচিরাম'ই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র ব্যঙ্গ-রচনা। সেকালে যে সব মূর্খ, সংকীর্ণচেতা, অসাধু ও অযোগ্য ব্যক্তি কিছুটা ঘটনাচক্রে এবং কতকটা উপরওয়ালা ইংরেজদের অজ্ঞতার দরুণ উচ্চপদ এবং রাজসম্মান লাভ করতো, এ বইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। মুচিরাম গুড় নামক ব্যক্তিটি মূর্খ, অসৎ এবং সর্ববিষয়ে অযোগ্য

হয়েও কীভাবে দৈবচক্রে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে ইংরেজের উচ্চ খেতাবে ভূষিত হোল — সংক্ষেপতঃ এইটুকু 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র কাহিনী। দীনবন্ধু মিত্রের কেনারাম ঘোষ বা ঘটিরাম ডেপুটিও এই শ্রেণীর। যে-কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় ডেপুটি, তথা অযোগ্য রাজকর্মচারীদের, বিদ্রূপ করতে প্রণোদিত হয়ে থাকুন, তাঁর মুচিরাম চরিত্রে ঘটিরাম ডেপুটির কিছুটা ছায়া পড়েছে বলেই মনে হয়। তবে এই বিদ্রূপ রচনার প্রাথমিক প্রেরণা বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করে থাকবেন। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত লিখেছেন, "তিনি নিজ সার্ব্বিসে এবং হয়ত নিজ ষ্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।" (বঙ্কিমচন্দ্র)। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' যে "বিদ্রূপের বিষজ্বালা" আছে, তা যে-কোনো পাঠকই লক্ষ্য করবেন, এবং লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হবেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সকল ব্যঙ্গ-রচনার মধ্যে একটি সহানুভূতিশীল দরদী মনের সন্ধান পাওয়া যায়। তিক্ত জ্বালাময় বিদ্রূপ, অসূয়া বা ক্রোধ, শুধু তাঁর নিজের রচনাতেই অনুপস্থিত নয়, কারুর কোনো ব্যঙ্গরচনায় বিন্দুমাত্র অসূয়া বা ক্রোধকে তিনি সমর্থন করেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় যেখানে যেখানে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে, সেসব রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা পায় নি। যাঁদের রচনায় তিনি অসূয়া বা বিদ্বেষের স্পর্শমাত্র লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের তীব্র নিন্দা বা ভৎর্সনায় বিদ্ধ করতে তিনি কখনো ইতস্ততঃ করেন নি। অথচ তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে', অসূয়া বা বিদ্বেষ না হলেও, কিছুটা রোষ বা বিরক্তি অতি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। এই কারণেই কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন যে, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদলাভ ক'রেও বিনা কারণে সেখান থেকে অপসারণের জ্বালাই এ-গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ অনুমান যে যথার্থ নয়, অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "বঙ্কিমের এক জীবনীকার তাঁহার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি পদলাভ ও পদচ্যুতির সহিত এই

রচনাকে সম্পর্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ... 'মুচিরাম' রচিত হয় তাঁহার সেক্রেটারি হইবার অন্ততঃ এক বৎসর পূর্বে।" (বঙ্কিমচন্দ্র)।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জীবনের কোনোরূপ অসাফল্যের তিক্ততা অথবা বিক্ষোভ তাঁর 'কমলাকান্ত' বা 'মুচিরাম'এ প্রকাশ পেয়েছে, এ অনুমানের কোনোই ভিত্তি নেই। 'কমলাকান্তে'র ক্ষেত্রে তো এ অনুমান রীতিমত অসঙ্গত, কেন না, সে-গ্রন্থে বিন্দুমাত্র জ্বালা বা তিক্ততা নেই, বরং তা মানব-সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতায় ভরপুর। দুঃখের বিষয়, 'মুচিরাম' সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় না। এর মধ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও তীব্র বিদ্রূপ অতি প্রকট। বইটি পড়ে ধারণা জন্মে যে, কর্মজীবনে বঙ্কিম মুচিরামের মত কোনো সম্পূর্ণ অযোগ্য সহকর্মীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাঁকে তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করবার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেন নি। এ-বিষয়ে অক্ষয় দত্তগুপ্তের অনুমানের মূলে সত্য থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। 'মুচিরাম' যে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রের উপর ভিত্তি ক'রেই রচিত, বইটির বিজ্ঞাপনেও যেন এইরূপ ইঙ্গিতই লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে; কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনিই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরববৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না।"* বঙ্কিমচন্দ্র অসূয়া বা ক্রোধ প্রণোদিত ব্যঙ্গ অপছন্দ করতেন সত্য, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ বোধ হয় তিনি দোষাবহ মনে করতেন না। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র-পাত্রীদের বাস্তবজীবন থেকে সংগ্রহ করতেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যক্তিগত বিদ্রূপাত্মক রচনা অনেক লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে-সব রচনার নিন্দা করেন নি। এর থেকে মনে হয় যে, তাঁর কর্মজীবনে তিনি এমন

* অধোরেখা গ্রন্থকারের।

কোনো মূর্খ অকর্মণ্য অথচ রাজপ্রসাদে পুরস্কৃত উচ্চ কর্মচারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাকে তিনি ব্যঙ্গের যোগ্য পাত্র বলে বিবেচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাবের সঙ্গে হয়তো 'সধবার একাদশী'র ঘটিরামের প্রভাব যুক্ত হয়েছিল।

দুঃখের বিষয় 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' বিদ্রূপের তীব্রতা যতটা আছে প্রকৃত কৌতুক ততটা নেই। বিশেষতঃ, বইটি প'ড়ে মনে হয়, বিদ্রূপ দ্বারা বিদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নেমেছেন। যে পরদুঃখ-কাতরতা ও মানব-সহানুভূতি উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসের প্রাণস্বরূপ, 'মুচিরাম' বইটিতে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা হলেও, 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'কে তাঁর সকল হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে নিকৃষ্ট বলে গণ্য করতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে তাঁর সহযোগী, বন্ধুস্থানীয় লেখক ও কনিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রভাব এমনই বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে, যাঁরা তাঁর রচনার প্রভাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি, তাঁরাও তাঁর মতামত, নির্দেশ ও উপদেশ দ্বারা চালিত হতেন। এ জন্য, তৎকালীন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক এবং হাস্যরসাত্মক গদ্য রচনায় ভাষা, ভঙ্গি ও বিষয় নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। 'স্বর্ণলতা' ভিন্ন 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট' ও 'বিধিলিপি' নামে আরো তিনখানি উপন্যাস এবং 'ললিতা সৌদামিনী', প্রভৃতি তিনটি ছোট গল্প ইনি লিখেছিলেন। যদিও ইনি বিশেষভাবে হাস্যরসাত্মক রচনায় হাত দেন নি, তবু এঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে গদাধরচন্দ্র ও নীলকমল চরিত্র বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। গদাধর চরিত্রটি পুরোপুরি কুচরিত্র বা villain-রূপে দেখানো হয়েছে বলে চরিত্র হিসাবে এটিকে ঠিক হাস্যরসাত্মক বলে গণনা করা চলে না। তবু তার ত-বর্গ-বর্জিত ভাষা এবং তার 'ডুড' এবং 'টামাক' খাওয়ার

কাহিনীতে বেশ কিছু কৌতুক আছে। কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র 'নীলকমল' প্রকৃতই হাস্যজনক চরিত্র এবং উচ্চস্তরের চরিত্রসৃষ্টির নিদর্শন। তার বেসুরো গান-বাজনা, কালীঘাটে তার নাকাল হওয়ার কাহিনী, তার যাত্রাদলে অবতীর্ণ হওয়া, সবই খুব মজার। অথচ এই হাস্যজনক চরিত্রটির প্রতি কোনো পাঠকই গভীর সহানুভূতি, এমনকি স্নেহ না অনুভব ক'রে পারে না, এবং তার মৃত্যুতে সকল পাঠকই দুঃখ অনুভব করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সমসাময়িক তাঁর প্রীতিভাজন অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) সে-যুগের একজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশকালে লেখক-তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, ইনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। 'বঙ্গদর্শন' প্রথম সংখ্যায় এঁর 'উদ্দীপনা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' পর্যায়ে 'চন্দ্রালোকে' ও 'মশক' নামে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত' দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্গাচরণ সরকারও সাহিত্যিক ছিলেন। যখন গঙ্গাচরণ বহরমপুরে মুন্সেফ এবং অক্ষয়চন্দ্র সেখানে ওকালতি করতেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বদলি হয়ে বহরমপুরে আসেন। দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ আরো অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক তখন বহরমপুরে ছিলেন, এবং এখানেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সূত্রপাত হয়।

বহরমপুরে পাঁচ বৎসর ওকালতি করার পর অক্ষয়চন্দ্র তাঁদের নিজ বাড়ি চুঁচুড়া-কদমতলায় ফিরে আসেন। চুঁচুড়া থেকে ১৮৭৩ সালে (কার্তিক ১২৮০) তিনি 'সাধারণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যদিও 'সাধারণী'র উদ্দেশ্য ছিল সরল ভাষায় রাজনীতি-আলোচনা, তবু সাহিত্য-চর্চা এ-পত্রিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এ-প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষার লেখকে' 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "সাহিত্য-সেবাপরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে।" 'সাধারণী' পত্রিকাটি যে পাঠকসমাজে প্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ বারো বৎসর অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি একটানা চলেছিল, এবং ১২৯৩ বৈশাখ থেকে 'নববিভাকর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে

'নববিভাকর সাধারণী' নামে অক্ষয়চন্দ্রেরই সম্পাদনায় আরো প্রায় চার বৎসর চলেছিল। ১২৯১ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' নামে আরো একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ-পত্রিকাটিও ১২৯৬ সাল পর্যন্ত চলেছিল। 'সাধারণী'র উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি আলোচনা, 'নবজীবনে'র উদ্দেশ্য ছিল ধর্মালোচনা। কিন্তু উভয় পত্রিকাতেই সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে থাকতো। অক্ষয়চন্দ্রের নিজস্ব রচনা ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনাও 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হোত এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকেরা 'নবজীবনে'র লেখক-তালিকাভুক্ত ছিলেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী 'নবজীবনে'ই প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু অক্ষয়চন্দ্রের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন।

কৌতুকজনক ভঙ্গিতে প্রবন্ধরচনায় অক্ষয়চন্দ্রের বেশ নিপুণতা ছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তাঁর 'চন্দ্রালোকে' ও 'মশক' রচনা দু'টিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ-ভিন্ন ছোট ছোট ব্যঙ্গাত্মক বা কৌতুকজনক রচনা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা দুটিতে মাঝে মাঝে 'চনকচূর্ণ' নামে প্রকাশিত হোত। এগুলি ছিল হাস্যকৌতুকপূর্ণ চুটকি ধরণের ছোট ছোট লেখা। এ জাতীয় রচনার একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি।

"পল্লীগ্রামে কোন গৃহস্বামীর বাটীতে চাকর, কৃষাণ সকলেই পীড়িত ছিল। কে তামাক সাজিবে সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক হওয়ায় (গৃহস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান বিলক্ষণ ছিল এবং তাঁহার ইষ্টদেব সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন,) তিনি গুরুদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভক্তিভাবে বলিলেন,—'ঠাকুর-মহাশয় থাকিতে আমার বাড়ী আর কেহ তামাক সাজিতে পারিবে না — সকল ক্রিয়াকাণ্ডে উনিই আমার কাণ্ডারী'।" (গুরুভক্তি)

'চনকচূর্ণ' পর্যায়ে অক্ষয়চন্দ্রের যে-সকল রচনা 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে তৎকালীন সাময়িক পত্র ও সাংবাদিকদের নিয়ে লেখা তাঁর দীর্ঘ কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম এতে উল্লিখিত হয়েছিল, এবং 'কিষণদাস (কৃষ্ণ দাস পাল) কি চেনা' নামে এটি কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল। ব্যঙ্গাত্মক ও

কৌতুকাশ্রিত প্রবন্ধরচনায় অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। এ-জাতীয় এবং অন্যান্য কতকগুলি রচনার দু'টি সংকলনগ্রন্থ অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। একটির নাম 'মোতিকুমারী', অপরটি 'রূপক ও রহস্য'। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্তভাবে 'হাতে হাতে ফল' নামে ইনি একটি প্রহসনও রচনা করেছিলেন। নিচের উদ্ধৃতিগুলিতে অক্ষয়চন্দ্রের কৌতুকাশ্রিত রচনার ধরণটি বোঝা যাবে।

"পাঠ্য ও অপাঠ্য ভেদে গ্রন্থ দ্বিবিধ। যাহা পাঠ করিতে হয়, তাহা পাঠ্য—যেমন বোধোদয়, নীতিবোধ প্রভৃতি। কেননা বোধোদয়, নীতিবোধ না পড়িলে উচ্চ শ্রেণীতে যাওয়া যায় না, পাস করা যায় না; পাস না করিলে ডিগ্রি হয় না; ডিগ্রি না হইলে মুনসেফি, মাষ্টারি, মোক্তারি, মজুরি,—মনুষ্যত্বের কিছুই হয় না। অতএব বোধোদয় ও নীতিবোধ পাঠ্য। কিন্তু কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষিতীশবংশাবলি — এ সকল না পড়িলে পূর্বোক্ত মনুষ্যত্বের হানি হয় না, অতএব ঐ সকল অপাঠ্য।" (গ্রন্থরহস্য)।

"জন্তু নানাবিধ; মনুষ্যজন্তুও নানাবিধ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য-জন্তু আছে।···আমরা দুই একটি উদাহরণ দিব মাত্র।··· প্রথমে পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ, সর্ব্বপরিচিত শুক পক্ষীকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করা যাউক। 'শৌকেয়' শ্রেণীস্থ মনুষ্য — দেখিলেই চেনা যায়। এ শৌকেয় শ্রেণীস্থ লোককেই লোকে শৌখীন বলে। কিন্তু শৌকীন বলিলেই ঠিক ব্যাকরণ-দুরস্ত হয়।··· গাটি বেশ চোমরাণ; মাথাটি বেশ আঁচড়ান,— সর্বদাই গাত্র পরিষ্কার রাখিতে ব্যস্ত। প্রায়ই শিকলে বাঁধা আছেন, তখন চাল-ছোলা লইয়াই মত্ত; না হয়, মন্দিরের কোটরে,— তখন দেব দেবতার মাথায় নৃত্য করিতেছেন। চিরজীবন শিকলে বাঁধা আছেন, কিন্তু আপনার ভ্রূকুটি ছাড়েন না, ছোলার খোসা না ফেলিয়া খাইতে পারেন না; দুধের সর একটু বাসি হইলে অমনই সেই বাঁকা নাক আরও বাঁকাইয়া বসেন। ইহার নাম শৌকীন বা শৌখীন রুচি।" (জন্তু-ধর্ম্মী মানব)।

এ-সব রচনার ভঙ্গিতে 'কমলাকান্তে'র প্রভাব অতি স্পষ্ট। এই ভঙ্গিতে ইনি সমসাময়িক সমাজ ও ব্যক্তিদের নিয়ে কৌতুক করতে

ভালবাসতেন। এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে অসূয়া-প্রণোদিত বা আক্রমণাত্মক নয়, তা বোঝাবার জন্য তিনি লিখেছিলেন,

"রহস্য লিখিনু মাত্র, রহস্য বুঝিবে।
বিদ্রূপে বিরূপ করি কোপ না করিবে॥"

তা'হলেও এ-জাতীয় ব্যঙ্গ-রচনা লিখে তিনি অনেক সময় লোকের অসন্তোষ ও বিরক্তি উৎপাদন করতেন। 'তুলনায় সমালোচন' নামে প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র তৎকালীন বহু বিখ্যাত লোককে নিয়ে রসিকতা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার; আর "বঙ্গদর্শন" সেই আচারের হাঁড়ি। খানিক মিষ্ট লাগিবে, খানিক অম্লরসময়; অম্ল — শুধু খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হলে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পড়িবে, তাহার হাড়ে হাড়ে ঋ-ঋ করিবে।" এ লেখার ফলে তিনি হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন। 'নবজীবনে' প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের 'ভাই হাততালি' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, কিন্তু এটির প্রকাশও অনেককে অসন্তুষ্ট করেছিল। প্রবন্ধটিতে ইনি লিখেছিলেন,

"যে দিন শুনিলাম, তুমি কুহকী কতকগুলি লোককে কুহকে মজাইয়া মানুষকে অতিমানুষ বলিয়া পূজা করিতে লওয়াইয়াছ, আর তাহারা ভক্তি-তামসে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া, স্বর্গের কেশবচন্দ্রকে মর্ত্যের দেবতা বানাইতেছে, তখনই বুঝিলাম দুরাত্মন্ হাততালি, তোমার নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে। তোমার চাটুপটু রসনা-ধ্বনিতে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন বিচলিত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান যে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কেশব-চন্দ্র ভ্রষ্টলক্ষ্য কক্ষনষ্ট হইয়া বিপথে বিচলিত হইলেন।…আর এক দিকে, আর এক পথে আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল রবীন্দ্রনাথ,…তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে — আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ সন্তানের কি আর স্থৈর্য্য থাকিবে?" এই রচনার ফলে কেশবচন্দ্র প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অনুরাগী অনেকে এবং রবীন্দ্রনাথ

স্বয়ং বিরক্ত হয়েছিলেন। 'রূপক ও রহস্য' বইটির 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' অক্ষয়চন্দ্রের পুত্র অজরচন্দ্র সরকার লিখেছেন, "নবজীবনের প্রথম পর্বের প্রথম সংখ্যায় পূজনীয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লিখিত "ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী" শীর্ষক রহস্যাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; পঞ্চম সংখ্যায় তাঁহার লিখিত চির-নূতন, চির-উজ্জ্বল, স্ফটিকোপম রচনা "রাজপথের কথা" বাহির হয়; সপ্তম সংখ্যায় পিতৃদেবের 'ভাই হাততালি' মুদ্রিত হইল,— আর রবীন্দ্রনাথ নবজীবনে লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর। সেই সময় হইতে নবজীবনের জন্য তিনি আর কলম ধরেন নাই।"

অক্ষয়চন্দ্রের গদ্যরচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "অক্ষয় বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য-লেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের মত ইনিও হাস্যরসবোধ-বর্জিত লেখকদের নিন্দা করেছেন। 'নবজীবনে' প্রকাশিত 'বদ্‌রসিক' প্রবন্ধে ইনি লিখেছিলেন, "···যার রস বোধ নাই, তাহার সাহস নাই, স্থৈর্য নাই, প্রফুল্লতা নাই, কিছুই নাই। ইহাদের সহিত বাস করা অপেক্ষা বিরাগী হইয়া বনে যাওয়া ভাল। গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং,— আবার রসিকতা ব্যবসায়ী বদ্ রসিক আছেন; ইঁহারা কখন কথক, কখন লেখক, আর কখন বা সমালোচক।"

বঙ্কিমকনিষ্ঠ সে-যুগের হাস্যরসিক লেখকদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯১৯) নিঃসন্দেহে প্রধান। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাশ্রিত রচনায় তিনি অনেক দিক থেকে অতুলনীয়। কিন্তু ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের আগে তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এর আগে ইনি এঁর অসামান্য প্রতিভা ও কর্মকুশলতা একাগ্রভাবে তাঁর কাজের মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছিলেন। সেহেতু বয়ঃকনিষ্ঠ হয়েও যাঁরা হাস্যরসিকরূপে ত্রৈলোক্যনাথের আগেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এখন তাঁদের আলোচনাই প্রয়োজন।

ব্যঙ্গাত্মক পদ্যরচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পদ্যের তুলনায় ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক গদ্যরচনার পরিমাণ অনেক বেশি, এবং গদ্যরচনাগুলির দ্বারাই তিনি অধিকতর প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন।

'উৎকৃষ্ট কাব্যম্' নামক ক্ষুদ্রকায় পদ্যগ্রন্থের দ্বারা ইনি সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত করেন। এর পর দিনাজপুরে ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয় এবং সে পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তখন তারকনাথের 'স্বর্ণলতা' প্রকাশিত হচ্ছিল। সে সময়ে 'জ্ঞানাঙ্কুর'-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ দাস ইন্দ্রনাথকে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' লিখতে অনুরোধ করেন। সে-প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সেই অনুরোধের ফলে···আমি 'কল্পতরু' লিখি।···'কল্পতরু' লিখিতে ১৮।১৯ দিন লাগিয়াছিল। 'কল্পতরু' রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন···; প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, 'কল্পতরু' উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণবাবুকে অভয় দিলাম, 'কল্পতরু' ফিরিয়া পাইলাম। তাহার পর আপন ব্যয়ে কলিকাতায় ছাবাইয়া গ্রন্থকার হইলাম।" এ ১৮৭৩-৭৪ সালের ঘটনা।

এই 'কল্পতরু' উপন্যাসটিকে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন, এবং এরই সমালোচনা প্রসঙ্গে হুতোমকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এ-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রনাথকে টেকচাঁদ ও দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তুলনা ক'রে উচ্চ আসন দিয়েছিলেন। আধুনিক কালের পাঠকের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের এ-উচ্চপ্রশংসার সঙ্গে একমত হওয়া সহজ নয়। 'কল্পতরু'ই বাংলা-সাহিত্যের প্রথম পুরোপুরি ব্যঙ্গ-উপন্যাস বটে, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে, কোনো মতে এটিকে উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। ইন্দ্রনাথের বিদ্রূপাত্মক রচনায় হাত ছিল এবং হাস্যরসে অধিকার ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর সকল ব্যঙ্গই যেন আঘাতের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। যে মানব-সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা সকল সার্থক সৃষ্টির প্রাণ, এবং যার অভাবে হাস্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, ইন্দ্রনাথের রচনায় তার অভাব দেখা যায়। সাহিত্যে যে উন্নতরুচি বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য ছিল, ইন্দ্রনাথ সে আদর্শও সর্বত্র রক্ষা করেন নি। তবু বঙ্কিমচন্দ্র 'কল্পতরু' প'ড়ে "ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার

গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে।" ব'লে মন্তব্য করলেন, এ খুবই বিস্ময়ের বিষয়। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"—দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থটির যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন, সেটি একান্ত যথাযথ, এবং তার থেকেই পাঠক এ বইটি সম্বন্ধে ধারণা পাবেন। সুকুমার বাবু লিখেছেন, "কল্পতরুর বাস্তব-চিত্র উপভোগ্য, কিন্তু রুচি সর্বত্র শুচি নয়। সেকালে প্রধানত ব্রাহ্মধর্ম্মালম্বী অথবা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজে অগ্রগতির সূচনা, সেইকারণে কল্পতরুতে এবং পরবর্তী অধিকাংশ রচনায় ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী নব্যেরাই বিশেষভাবে ব্যঙ্গচরিত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছিল।" ব্রাহ্মবিদ্বেষ ইন্দ্রনাথের সকল রচনায় অতিপ্রকট, কেননা ব্রাহ্মরাই ছিলেন সকল প্রকার সমাজসংস্কারে অগ্রণী, এবং ইন্দ্রনাথ প্রায় সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। কাজেই সর্বপ্রকার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদেরও তিনি সুযোগ পেলেই বিদ্রূপ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'একাদশ অবতার'-রচয়িতা যে বলেছিলেন যে, ব্রাহ্মনিধনের জন্যই পঞ্চানন্দ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন, একথা তিনি অযথা বলেন নি। ব্যক্তিগত আক্রমণে ইন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র সংকোচ ছিল না, এবং তাঁর ভক্তরাও যে এতে দোষ দেখতেন না, কালীপ্রসন্ন সিংহের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সে কথা উল্লেখ করেছি।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্রের সাধারণী-যন্ত্রে ছেপে চুঁচুড়া থেকে ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' নামে একখানি ব্যঙ্গ-পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 'পঞ্চানন্দ'ই পরে বিস্তীর্ণ খ্যাতি লাভ করেছিল এবং ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাম রূপে পরিচিত হয়েছিল। চুঁচুড়া থেকে 'পঞ্চানন্দে'র মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর পর ১৮৭৯ সালে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করলে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁকে পুনরায় 'পঞ্চানন্দ' প্রকাশ করতে উৎসাহ দেন; ফলে ভবানীপুর থেকে পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৮১ সালে ইন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করে ওকালতি করবার জন্য বর্ধমানে যান এবং সেখান থেকেই 'পঞ্চানন্দ'—খুব নিয়মিতভাবে না হলেও — প্রকাশ হতে থাকে। ১৮৮২ সালের জুন মাস পর্যন্ত 'পঞ্চানন্দ' বর্ধমান থেকে

প্রকাশিত হয়। এর পর পৃথক্ পত্রিকারূপে এর অস্তিত্ব লোপ পায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে 'পঞ্চানন্দ' 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে, এবং বহুদিন ধরে চলতে থাকে। শেষের দিকে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রমুখ অনেকেই 'পঞ্চানন্দ' পর্যায়ে লিখেছেন বটে, তবু 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচু ঠাকুর' ইন্দ্রনাথের নামের সঙ্গেই অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

ব্যঙ্গরচনায় ইন্দ্রনাথের দক্ষতা ছিল, এবং বাংলা গদ্য পদ্য রচনার শক্তিও তাঁর কিছুটা ছিল, কিন্তু তাঁর রচনাবলী পড়ে মনে হয় যে তিনি সর্বপ্রকার অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন। তাঁর রসিকতার স্থূলতা রুচি-সম্পন্ন পাঠকমাত্রকেই বিমুখ করে। বর্ধমান থেকে 'পঞ্চানন্দে'র প্রকাশকালে বর্ধমান শহরে জলের কল স্থাপনেরও ইনি বিরোধিতা করে-ছিলেন, এবং এ-প্রসঙ্গে 'রাজমার্গে নলপ্রদান' শিরোনামায় প্রতিবাদ-প্রবন্ধ লিখে নিজের রুচি ও মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথের মধ্যে হাস্যরসবোধ ছিল বটে, কিন্তু তাঁর রচনার সংবেদনশীল মন বা হৃদয়বত্তার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। সেইজন্য তাঁর রচনাকে কোনোমতে উচ্চশ্রেণীর হাস্যরসাত্মক রচনার মধ্যে গণনা করা চলে না।

'পঞ্চানন্দে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'পাঁচুঠাকুর' নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিবর্তিত নামে গ্রন্থপ্রকাশের কারণ বর্ণনা করে ইন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "পঞ্চানন্দ যে পাঁচুঠাকুর নামে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ — অর্থলোভ ; অথবা, বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে হইলে, লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য প্রমাণ। — "মুখপাত" 'পাঁচুঠাকুরের' প্রথম দুই খণ্ড 'পঞ্চানন্দ' পত্র হইতে, এবং তৃতীয় খণ্ড 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত কিছু কালের "পঞ্চানন্দ" হইতে সঙ্কলিত।"

গ্রন্থভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারিনা। কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই, …। বাঙ্গলায় এখন হাসিবার কিংবা হাসাইবার দিন আসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে, সে আমার কপালগুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে ; সে পক্ষে ক্ষমতার

দাবী দাওয়া কিছু রাখি না।” ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে “বাংলাদেশে হাসিবার কিংবা হাসাইবার দিন আসে নাই।” তাই তিনি হাস্যরসকে অধিকাংশ স্থলে রুচিহীন বিদ্রূপে বিকৃত করে উপস্থিত করেছিলেন।

‘পঞ্চানন্দ’ বা ‘পাঁচুঠাকুরে’র অন্তর্গত রচনাগুলির মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মসমাজ অথবা সে-সমাজের কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে বিদ্রূপ ক'রে লিখিত। অবশ্য সর্বত্রই বিদ্রূপ এরূপভাবে প্রযুক্ত হয়নি। যেখানে ইন্দ্রনাথ তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে সাধারণভাবে তৎকালীন সমাজ ও সামাজিক দুর্বলতাগুলির প্রতি পরিচালিত করতে পেরেছেন, সেখানে সে ব্যঙ্গের হাস্য উপভোগ্য হয়েছে। তবে প্রধানতঃ ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ সর্বপ্রকার সমাজ-সংস্কারমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছে বলে, তাঁর রচনায় এ-জাতীয় ব্যাপক ও সাধারণ ব্যঙ্গের পরিমাণ অত্যল্প। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে “ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে এদেশে যে ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় — কর্ম্মবিপর্য্যয়, — সমাজবিপর্য্যয়, মানবজীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ-বিপর্য্যয় ইত্যাদি বিবিধ বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে”, (গ্রন্থ-পরিচয়) সেই সকল বিপর্যয়কে রোধ করার ভার পঞ্চানন্দকেই নিতে হয়েছিল। ‘পঞ্চানন্দ’ থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ‘পঞ্চানন্দে’র বিদ্রূপের ধরণটি পরিস্ফুট হবে।

" “নশিনাল পেপার” নামক দৈনিক পত্রে বিধুভূষণ মিত্র লিখিয়াছেন যে, ১৬ই জানুয়ারী কেশববাবুর দলের ব্রাহ্মগণ এক উৎসব করেন; তদুপলক্ষে প্রীতি-ভোজন হয়, তারপর, “The demon of drunkenness was burnt”, (অর্থাৎ) মাতলামির কুশপুত্তল করিয়া তার অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল।

পঞ্চানন্দ ইহাতে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন —

(১) মাতলামি কি দ্বাদশ বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হইয়াছিল?

(২) মাতলামি নিরাকার। ব্রাহ্ম হইয়া মাতলামির কুশপুত্তল অর্থাৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা কি পৌত্তলিকতার চিহ্ন নহে?

(৩) দাহ করিবার আগে মুখাগ্নি করা হইয়াছিল কি না? হইয়া থাকিলে কে করিয়াছিল?

(৪) ব্রাহ্ম মতেই হউক আর হিন্দুমতেই হউক, যখন সংকার হইয়াছে। তখন শ্রাদ্ধ চাই। মদের শ্রাদ্ধ কবে হইবে? এবং কোথায় হইবে? পঞ্চানন্দ পরোপকারী "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্" অবধি কাঙ্গালী বিদায় পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতে প্রস্তুত আছেন।" (সুসমাচার)।

"কতকগুলি ব্রাহ্ম "ভ্রাতা" প্রস্তাব করিতেছেন যে, মৃতদেহ পোড়াইলে আত্মার অতিশয় যন্ত্রণা হয়, অতএব না পোড়াইয়া গোর দিবার নিয়ম প্রচলিত হউক।

প্রস্তাব অতি সৎ এবং সুবুদ্ধির পরিচায়ক। পঞ্চানন্দ ইহাতে সম্মত আছেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে "ভ্রাতা" সকলকে পুঁতিতে পারিলে আরও ভালো হয়। কেননা, তাহা হইলে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির পক্ষে আর সংশয় থাকিবে না।" (আর একটু)।

এইরূপ রসিকতার আরো কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। তার থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক রচনা কী জাতীয়।

"বিজ্ঞাপন

মহৌষধ! অব্যর্থ মহৌষধ!!

পঞ্চানন্দের এন্টী-বোকামি মিকশ্চার।

অর্থাৎ

বোকামি-নাশক আরক

এই ঔষধ সেবন করিলে, নিরেট বোকামি, পুরুষানুক্রমিক বোকামি, আকস্মিক বোকামি, দৈবাৎ বোকামি, দায়ে পড়িয়া বোকামি প্রভৃতি যত প্রকার বোকামি আছে বা হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় সারিয়া যায়।...

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধাদি কিনিয়া থাকেন, গেজেটের অনুরোধে দান ধ্যান করিয়া থাকেন, নামকা-ওয়াস্তে ময়লা-ফেলা কমিশনার হইয়া থাকেন, পিতৃশ্রাদ্ধের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই মহৌষধ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।"

ইন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন রসিকতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। এই জাতীয় দু'চারটি রচনাই 'পঞ্চানন্দে'র শ্রেষ্ঠাংশ। কিন্তু সমগ্র রচনাটি

পড়লে পাঠক দেখতে পাবেন যে এখানেও আঘাত-প্রচেষ্টার কোনো বিরাম নেই।

"লেজ! লেজ!! লেজ!!! — অতি উৎকৃষ্ট, সুগোল, সুদীর্ঘ, সুগঠন বিস্তর লেজ আমাদের দোকানে বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে। লেজগুলি আসল বিলাতী কারিকরের তৈয়ারি এবং জাহাজে করিয়া খাস চালানে আমদানি করা হইয়াছে। এই লেজগুলি এত উত্তম এবং উপাদেয় যে সঙ্গতি থাকিলে আমরা নিজেই ব্যবহার করিতাম। যাহাদের পয়সা নাই, যাহারা আমাদের মত নিরন্ন, তাহাদের কিনিবার চেষ্টা করা বৃথা। লেজগুলি সুলভ, কিন্তু কেবল রোজগেরের পক্ষে।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশস্তিতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের আসন বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে অতি উচ্চ হইত।" ইন্দ্রনাথের রচনাবলী পড়ে এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়ে পারা যায় না। প্রকৃতই, আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ না ক'রে গোপাল ভাঁড়ের যুগে জন্মালেই তিনি বেশি তারিফ পেতেন। আধুনিক কালের পরিচ্ছন্ন-রুচি, উচ্চস্তরের হাস্যরসবোধসম্পন্ন পাঠক ইন্দ্রনাথকে সঙ্গতভাবেই ভুলে যেতে বসেছে, এবং যতদিন যাবে ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর রচনাবলী ততই বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবে যাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করি না। কিন্তু যখন একজন প্রখ্যাত সমালোচক এ বিস্মৃতির জন্য বিলাপ ক'রে বলেন, "বাঙ্গালী আর হাসিতে জানে না।…হাসিতে পারিলে যে জীবনের অনেক ভার লঘু করিতে পারা যায় বাঙ্গালী এ সত্য বিস্মৃত হইয়াছে।" তখন তা পঞ্চানন্দের রচনার চেয়েও হাস্যজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, বলতে গেলে 'পঞ্চানন্দে'র পর থেকেই বাঙালী ভালো করে হাসতে শিখেছে। পরিচ্ছন্নরুচি, নির্মল, উচ্চস্তরের হাস্যরস দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিক কালের রাজশেখর বসু পর্যন্ত পরবর্তী লেখকদের হাতে যেরূপ ক্রমোন্নত পথে বয়ে চলেছে, তাতেই এ-সত্য প্রমাণিত হয়। আজ বাঙালী তার শত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও প্রাণ খুলে হাসতে পারে, এবং সাহিত্যে সে হাসির উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পায়, এও বাঙালী এবং বাংলা সাহিত্যের পরম গৌরবের কথা।

ইন্দ্রনাথ 'ক্ষুদিরাম' নামে আর একটি বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস লিখেছিলেন। এ-উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ এবং উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ। ব্রাহ্মদের এবং সকল প্রকার সংস্কারান্দোলনকে গালি দেওয়াই এ উপন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল। 'গ্রন্থপরিচয়ে' প্রদত্ত বর্ণনাতেই পাঠক এ-বইটি সম্বন্ধে ধারণা পাবেন।

"ক্ষুদিরাম কলিকাতায় ভুসীভোজন বাবুর সহিত এক বাসায় থাকিয়া বিধবা বিবাহ, স্বাধীনমত, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি বড় বড় সমস্যার সমাধান এবং ভুসীভোজন বাবুর কাছে "ঈশ্বরের অভিপ্রায়", "বিবেক", "নীতি" ও "যুক্তি" বিষয়ে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভ করিতে থাকিলেন। এই সব জ্ঞানের ফলে ক্ষুদিরাম সহস্র বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া বিধবা শ্রীমতী নিরঞ্জনীর সহিত পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জগতে সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।" এ বর্ণনার পর 'ক্ষুদিরাম' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫) ব্রাহ্মবিরোধী ও সংস্কারবিরোধী দলের আর একজন জনপ্রিয় লেখক ছিলেন, এবং সে-হিসাবে তাঁকে ইন্দ্রনাথের যোগ্যশিষ্যরূপে গণনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছ থেকেই সাংবাদিকতা ও সাহিত্যরচনার প্রথম পাঠ নেন। ইনি এফ্‌-এ পর্যন্ত পড়েন, কিন্তু পাশ করেন নি। আইনও ইনি পড়েছিলেন কিন্তু ওকালতি করেন নি। সাংবাদিকতার দিকেই এঁর ঝোঁক ছিল। প্রথমে তিনি চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী'তে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। এর পর কলকাতায় এসে উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়ের সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে উপেন্দ্রবাবু 'বঙ্গবাসী'র সংস্রব ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রই 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। 'জন্মভূমি' নামে ইনি একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশ করেছিলেন।

মতামতে যোগেন্দ্রচন্দ্র রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, অতএব তিনি ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনার প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর নিজের রচনাতেও তিনি ইন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনাগুলির মধ্যে তাঁর হাস্যরসবোধের যতটা পরিচয়

ছিল, যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় ততটা লক্ষ্য করা যায় না। ইনি ইন্দ্রনাথের রচনার ভক্ত ছিলেন, মতামতেও উভয়ের সমতা ছিল। 'পঞ্চানন্দ' বন্ধ হয়ে যাবার পর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, ইনি ইন্দ্রনাথকে 'বঙ্গবাসী'র পৃষ্ঠায় নিয়মিত 'পঞ্চানন্দ' লেখবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং এর পর থেকে 'পঞ্চানন্দ' 'বঙ্গবাসী'তেই নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ক্রমে গোঁড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। অহিন্দু কার্যকলাপকে বিদ্রূপ করাই ছিল এ-পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যোগেন্দ্রচন্দ্র নানারূপ বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখতেন, এবং কখনো কখনো 'পঞ্চানন্দ' পর্যায়েও তাঁর এ-জাতীয় লেখা প্রকাশিত হোত। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে তিনি 'চিনিবাস চরিতামৃত', পাঁচ পর্বে সমাপ্ত 'কালা-চাঁদ', 'বাঙ্গালী চরিত' তিন ভাগ এবং 'মডেল ভগিনী' চার ভাগ রচনা করেন। ১৯০০ থেকে ১৯০২ এর মধ্যে তাঁর 'কৌতুক-কণা', 'নেতা হরিদাস' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়।

পাঁচ পর্ব 'কালাচাঁদ' অথবা চার ভাগে সমাপ্ত 'মডেল ভগিনী' ধারাবাহিক কাহিনী নয়, খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গ রচনা। 'মডেল ভগিনী' এক কালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এর চার ভাগে চারটি বিদ্রূপাত্মক কাহিনী— কিংবা তাদের কাহিনী বলাও বোধহয় ঠিক নয়— বিচ্ছিন্ন আখ্যান মাত্র আছে। 'মডেল ভগিনী'র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার কুফল দেখানো। কয়েকটি শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে 'মডেল ভগিনী'তে যোগেন্দ্রচন্দ্র তাই দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বইটির মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলেছিলেন, "বঙ্গের পূর্ব-ইতিহাস অনেকেই লিখিয়াছেন, কিন্তু নব্য-বঙ্গের ইতিহাস কেহই বড় একটা লেখেন নাই। নব্য-বাঙ্গালীর জীবন-চরিতও এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। মডেল ভগিনী গ্রন্থে নব্যবঙ্গের ইতিহাস, এবং নব্য বাঙ্গালীর জীবনচরিত — একাধারে দুই পদার্থ দেখিতে পাইবেন। মডেল ভগিনীতে অষ্টবজ্র আছে। চন্দ্রের সুবিমল সুধা, অগ্নির জ্বলন্ত উত্তাপ, সূর্যের প্রখর কিরণ, বসন্তের মলয় সমীরণ, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ, মাধবীলতার প্রিয়তম ভৃঙ্গ, ইন্দ্রের শ্রীমতী শচী, নরেন্দ্রের মিসেস পাঁচী — এ সমস্তই আছে। স্ত্রীপুরুষ, যুবক যুবতী, বালক-বালিকা,— মডেল ভগিনী

পাঠে পরম জ্ঞান লাভ করুন, দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হউন, সংসারে সাবধান হউন — ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থনা।" এই 'দিব্যচক্ষু' কী, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতামত একটু উদ্ধৃত করলেই পাঠক সে-সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন। 'বাঙ্গালী-চরিতে' যোগেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, "ম্লেচ্ছ-অধিকারে "স্ত্রী-শিক্ষা" নাম্নী এক অভিনব সামগ্রী এ দেশে আমদানি হইয়াছে! এই "স্ত্রীশিক্ষাই" সর্ব্বনেশে জিনিষ; তেঁতুলে কেউটের বিষ। কিন্তু ইহাই বাবুদের সখের, সোহাগের, সু-ভোগের পদার্থ। এই হলাহল-প্রসবিনী, কালনাগিনী, শিক্ষাই আজ রমণীকুলের সর্ব্বোত্তম ভূষণ;— ইহাই যেন হাতের নোয়া, সীঁথির সিন্দুর; ইহাই পতিভক্তি, পুত্রস্নেহ, গৃহকর্ম্ম; ইহাই সংসারের সার সর্ব্বস্ব।"

কেবল স্ত্রী-শিক্ষা নয়, যোগেন্দ্রচন্দ্র সকল প্রকার শিক্ষারই বিরোধী ছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে এঁর কীরূপ ধারণা ছিল তার একটু উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন, "কেবল অক্ষর চিনিয়া বই পড়িলেই "শিক্ষিত" হয় না। বর্ণজ্ঞানশূন্য হইলেও, পুরুষ এবং মহিলা সুশিক্ষিত হইতে পারেন;··· শিক্ষার অর্থ — কার্য্যশিক্ষা, — শিক্ষা, পুঁথিগত শিক্ষা নহে,—টেয়াপাখীর রাধাকৃষ্ণ বুলি নহে। হিন্দু এই কার্য্যশিক্ষা বুঝে;— ইহা ব্যতীত হিন্দুর অন্য শিক্ষা নাই — কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্ম — ইহাই হিন্দুর একমাত্র কথা।"

বাংলা সাহিত্যে রক্ষণশীল লেখক অনেকে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত এরূপ উগ্ররূপে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব আর একটি লেখকের মধ্যেও দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় হাস্যরস দূরে থাক, প্রকৃত সরসতাই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গালি দিয়ে লোক হাসাবার যে প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে যথোচিত নিন্দা করেছেন। তবু সেকালে কবিওয়ালার খেউড়ে কিছুটা হাসি ছিল। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনা পাণ্ডিত্যের ভান অত্যুগ্র হিন্দুয়ানি এবং অসূয়াপূর্ণ মনোভাবে মিশ্রিত হয়ে 'দাঁত খিঁচুনিতে' পর্যবসিত হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের এ-জাতীয় রসিকতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরা 'পঞ্চানন্দ' পর্যায়ে প্রকাশিত 'কৌতুককণা' থেকে তাঁর হাস্যরসের একটু দৃষ্টান্ত দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ

করবো। তিনি লিখছেন, "চৌদ্দ আনা নগদ লইয়া ছেলেবেলা বর্ধমান ষ্টেশনে প্রাতে টিকিট কিনিতে গেলাম। টিকিট-বিক্রেতা হাত বাড়াইবামাত্র চৌদ্দ আনার পয়সা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি অমনি রাগিয়া উঠিয়া ভিড়ের মধ্যে আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া সেই চৌদ্দ আনার পয়সা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; বলিলেন, "পয়সা, কেন এনেছ, এক আঁচল কড়ি আনিতে পারো নাই? নাও তোমার পয়সা, এখন গোণে কে?" আমার হাত অবশ্যই পাতা ছিল না; পয়সাগুলি ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া গেল; কুড়াইয়া বারো আনা পাইলাম। বাটী ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, সে ট্রেন অবশ্যই ফেল হইল। বাটী গিয়া একটী টাকা আনিলাম। বৈকালে টাকাটী দিয়া যেমন টিকিট চাহিব, অমনি টিকিটবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি পোদ্দারী করিতে বসিয়াছি? একটী মোহর গাঁথিয়া আনিলে না কেন?" এই বলিয়া টাকাটী সজোরে আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিকে ফেলিয়া দিলেন। আঙ্গুলে লাগিল। আমি উ-হু উ-হু করিয়া চলিয়া আসিলাম।"

(কৌতুককণা)।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) সমস্ত জীবন উপন্যাস বা কল্পিত কাহিনীর মত বৈচিত্র্যময়! এরূপ রোমাঞ্চকর ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা বাংলা দেশের অপর কোনো লেখকের ভাগ্যে ঘটেছে কি না সন্দেহ। আবার কি শিক্ষায়, কি উদ্ভাবনী-শক্তিতে, কি কর্মে, কি সাহিত্যসৃষ্টিতে, প্রতিভার এরূপ অসাধারণ বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যও খুব কম লোকের মধ্যেই প্রকাশ পেতে দেখা গেছে। ইনি বিদ্যালয়গত শিক্ষায় ইস্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেন নি, অথচ এঁর সম্বন্ধে 'বঙ্গভাষার লেখকে' বলা হয়েছে, "মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উড়িয়া, হিন্দী, পারশী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ভাষায়ও অধিকার কম নহে। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে অধিকারের নিমিত্ত, ইউরোপীয়গণ তাঁহার বিশেষ সন্ধান করিয়া থাকেন।" বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার এই দুই ভাষায় রচিত তাঁর বহু গ্রন্থেই প্রকাশ। *Wealth of India* নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদনায় ইনি সাহায্য করতেন, এ-ছাড়া বহুবিধ ইংরেজী পত্রিকার

সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। "ইংলিশম্যান" পত্রিকায় তাঁকে নেবার জন্য 'সণ্ডার্স ও বার্কেলে সাহেব' উৎসুক ছিলেন, কিন্তু তিনি সে কর্মে যোগ দেন নি। ইনি ওড়িয়া ভাষা এরূপ আয়ত্ত করেছিলেন যে কিছুদিন 'উৎকল শুভঙ্করী' নামে একখানি ওড়িয়া মাসিকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। ইনি সমগ্র ভারতবর্ষে একভাষা প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, সেজন্য তিনি বলেছেন, "এই সময় আমি উৎকল ভাষা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করি। কারণ ভারতবর্ষের লোক যত এক হয় ততই ভাল, আমার এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা উঠাইয়া দিয়া, এ প্রদেশে হিন্দী প্রচলন করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে বঙ্গভাষা সম্প্রতি অনেক উন্নতি করিয়াছে, হিন্দি করে নাই।" 'বিশ্বকোষ' নামে সুবিখ্যাত অভিধানখানির প্রথম দুই খণ্ড ইনি এবং এঁর অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন। পরে নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষ' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনে ইনি প্রথমে কনট্রাক্টরের কাছে চাকরি, পরে ক্রমান্বয়ে ইস্কুল মাস্টারি, পুলিশের দারোগাগিরি প্রভৃতি বিবিধ চাকরি এবং শেষে কলকাতা মিউজিয়ামে Assistant Curator এর কাজ করেছিলেন। এর চেয়ে বড় চাকরিও তিনি করতে পারতেন। "সদাশয় হণ্টার সাহেবও আমাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় উত্তর পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য আফিস হইতেছিল। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া দিয়া, এখানে হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করি।" এই পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার একটু ইতিহাস আছে। ইনি যখন রাণীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়ায় আঠারো টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করেন, "এই সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। রাত্রিদিন লোকের কাতর ক্রন্দনে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানেই মরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মড়ার দুর্গন্ধে পথ-চলা ভার হইল। বাড়ীতে শিশু ভাইগণ,—তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনের প্রারম্ভ — অতিশয় ক্ষুধা। এক এক দিন সন্ধ্যেবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। মাথা

ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এইরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়িতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এরূপ কার্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব।" দুর্ভিক্ষের কষ্ট, উপবাসের যন্ত্রণা যে কী দারুণ, বাল্যকাল থেকে ত্রৈলোক্য-নাথের সে-অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথ দরিদ্র পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬২ সালে ইনি যখন ইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন ম্যালেরিয়ার মড়কে প্রথমে এঁর পিতামহী, পরে এঁর মা ও বাবার মৃত্যু হয়। ত্রৈলোক্যবাবুরা ছয় ভাই। রঙ্গলাল জ্যেষ্ঠ, ত্রৈলোক্যনাথ দ্বিতীয়। পৈতৃক জমি, বাগান প্রভৃতি যা ছিল ১৮৬৪ সালের ঝড়ে তাও নষ্ট হয়ে যায়। সেই দারুণ দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ত্রৈলোক্যনাথ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়েন। পুরুলিয়ায় তাঁর এক আত্মীয় ছিলেন। তাঁর কাছে পৌঁছনো ছিল ত্রৈলোক্যনাথের লক্ষ্য। কিন্তু রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলগাড়িতে যাবার পর পয়সা ফুরিয়ে গেল। সেইখান থেকে পদব্রজে পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে তিনদিনের হাঁটা-পথে তিনি রওনা হলেন। পথে আসামে কুলি চালানের এক আড়কাঠির হাতে পড়ে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচলেন। মানভূম পৌঁছে তাঁর আত্মীয়টির দয়ায় ইনি পুনরায় ইস্কুলে ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুর্দান্ত স্বভাব ও অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা তাঁকে সেখানে টিকতে দিল না। "কাঁসাই নদীর মূল নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরি-গুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিলাম। ইহাতে বালক-গণের অভিভাবকগণ বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। যথাদিনে রাঁচি পঁহুছিলাম। কিন্তু অল্পদিন পরেই রাঁচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ অনুসরণ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দু'জন ঢাকাই মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্য প্রদেশে তাহারা হাতী ধরিতে

যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছুদিন পরে জঙ্গলের মধ্যে তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল।”

বাড়ির কষ্ট ভোলা গেল না। বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর এবার ত্রৈলোক্যনাথ চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিনি পারশী শিখেছিলেন। প্রথমে এক কন্ট্রাক্টরের কাছে কাজ নিয়ে, তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে আসতে হল। তারপর ইস্কুলমাস্টারির চেষ্টায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। “এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমনকালে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন; কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম। সে সময়, ১৮৬৬ সালে — উড়িষ্যায় উৎকট দুর্ভিক্ষের সূচনা হইতেছে। চারিদিকে ঘোর অন্নকষ্ট। সুতরাং কোনদিন আহার মিলিত, কোন দিন মিলিত না। সন্ধ্যাবেলায় কাহারও বাটীতে গেলে যদি সে তাড়াইয়া দিত, সারারাত অনাহারে গাছ-তলায় থাকিতাম।”

অনাহারে থাকার অভিজ্ঞতা ত্রৈলোক্যনাথের আরো বহুবার হয়েছে। বর্ধমানে এসে ইনি শুনলেন যে পিতামহী (বাবার জ্যেঠাই) অত্যন্ত পীড়িতা এবং ত্রৈলোক্যনাথকে দেখতে চাইছেন। তখন তাঁর হাতে একটিও পয়সা ছিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি পদব্রজে বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। “সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি ষ্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, দু'দিন আহার হয় নাই; অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, ত কাল প্রাতে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথচলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুল গাছ হইতে তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময় মগরায় আসিলাম।”

আর একবার দু'দিন অনাহারে থাকবার পর ত্রৈলোক্যনাথ শিউড়ী স্কুলের হেডমাষ্টার নবীনচন্দ্র দাসের শরণাপন্ন হলেন। নবীন বাবু জাতিতে তন্তুবায়। তিনি তাঁর ব্রাহ্মণ ভৃত্য কুঞ্জর কাছে ত্রৈলোক্যনাথের খাওয়ার

ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু রান্নার সময় ঘরে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল; তৃতীয় দিনও প্রায় অভুক্ত অবস্থায় কাটলো। আর একবার পদ্মায় ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে তিনি মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। কোনোক্রমে পাড়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। চাঁড়ালরা মৃতপ্রায় একটি মানুষ দেখে ঘরে নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললো। এইরূপ বিচিত্র ত্রৈলোক্যনাথের জীবন। তিনি মানুষের নিষ্ঠুরতা অনেক দেখেছিলেন। "একদিন নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে দেখি, একটি সামান্য মাটির ঢিপি জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায়; ইহার কেবলমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল, — সেই স্থানে তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, — কিছুই নাই। ··· ভাবে বুঝিলাম, কোন নৃশংস লোকেরা সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে।" এই বৃদ্ধাদের ত্রৈলোক্যনাথ নৌকায় তুলে নিয়ে আসার ফলে সকলের বিরক্তিভাজন হন। "একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, সেই বুড়ীরা নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইলাম না। এই বিষয় লইয়া সে স্থানের কোন ক্ষমতাবান্ লোকের সহিত আমার কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল।"

এই সব বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার থেকে ত্রৈলোক্যনাথ এই কথাটি শিখেছিলেন যে, মনুষ্যত্ব অনেক সময় তাঁতি, চাঁড়াল বা সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যেও প্রকাশিত হয়, অপরপক্ষে সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত ধর্মাচরণপরায়ণ লোকের মধ্যেও অনেক সময় সে-মনুষ্যত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি আরো শিখেছিলেন যে, মানুষ যেমন স্নেহ-প্রেম-করুণায় দেবকল্প হতে পারে, তেমনি মানুষের কপটতার, ধূর্ততার, নিষ্ঠুরতারও পরিসীমা নেই। আর সবচেয়ে বেশি তিনি দেখেছিলেন মানুষের ভণ্ডামি। যে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি অপরকে ধর্মোপদেশ দিয়ে গুরুগিরি ব্যবসা দ্বারা জীবিকার্জন করে, দু'আনা পয়সার জন্য জীবন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে নিতে তার বিন্দুমাত্র সংকোচ বা দ্বিধা নেই; যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানে বসে আছে, এক জোড়া গরদের ধুতি বা এ জাতীয় সামান্য প্রাপ্তির লোভে ঠেঙাড়েদের নরহত্যা-ব্রহ্মহত্যায় সাহায্য করতে সে এগিয়ে আসে;

যে মুখে মানব-হিতৈষণা ও সহৃদয়তার বাণী প্রচার করে, অপরের অনিষ্ট-সাধনের কুটিল চক্রান্তে অনেক সময় তার মন ভরপুর থাকে। তাই ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট সাহিত্যে আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই এই ভণ্ডামির উন্মোচন, মানুষের হৃদয়হীনতার চিত্র। তথাকথিত ও আচরণগত ধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের মহিমা যে কত বড়, ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় সেই কথাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক, সকল প্রকার দুঃখী, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের এমন অকৃত্রিম দরদী বন্ধু বাংলা সাহিত্যে আর অল্পই দেখা গেছে।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসে ত্রৈলোক্যনাথের স্থান অতি উচ্চে। বস্তুতঃ ত্রৈলোক্যনাথের অপেক্ষা কৃতী হাস্যরসিক লেখক সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছেন। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, ত্রৈলোক্যনাথের জীবৎকালে তাঁর অসামান্য ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনাগুলির যথোচিত সমাদর ও মর্যাদালাভ হয় নি। অবশ্য, ভেবে দেখলে, এর কারণ বোঝা যায়। যে-যুগে হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুয়ানির গুণকীর্তনে জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা মুখর ছিলেন, যে-যুগে সকল প্রকার সংস্কারান্দোলনকে এবং ব্রাহ্মদের বিদ্রূপ করা হাস্যরসের পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য হোত, সে-যুগে ত্রৈলোক্যনাথের মত লেখক, যিনি মানবহৃদয়ের দুঃখ শোক বেদনাকে ধর্মের আচার অনুষ্ঠান এবং ধর্মধ্বজিতার উপরে স্থান দিতেন, তাঁর রচনার তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা, অথবা সে-তাৎপর্যদ্বারা মুগ্ধ বা অভিভূত হওয়া হয়তো সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় পর্যন্ত বঙ্কিম-পরবর্তী গদ্য-সাহিত্যে রক্ষণশীল মনোভাব অতি প্রকট। তা ছাড়া, ব্যঙ্গাত্মক ও হাস্যরসাত্মক রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যত উচ্চাদর্শই রক্ষা ক'রে থাকুন, বঙ্কিম-যুগের ব্যঙ্গ অধিকাংশই অসূয়া-প্রণোদিত, সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন এবং অপরিচ্ছন্ন। তাই সেই সাহিত্যিক পরিবেশে ত্রৈলোক্যনাথের মত মানবসহানুভূতিতে পূর্ণ, পরদুঃখকাতর, উদার ও সংস্কারবর্জিত একটি মন, এবং সেই সঙ্গে প্রভূত এবং অতুলনীয় হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতার অপূর্ব সমন্বয় প্রকৃতই বিস্ময়কর মনে হয়।

সুখের বিষয়, যত দিন যাচ্ছে, ত্রৈলোক্যনাথের রচনার সমাদর ততই বেড়ে চলেছে। উৎকৃষ্ট এবং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের এ-ও একটি লক্ষণ।

সমসাময়িককালের জনমানসকে প্রতিফলিত করার অপেক্ষা সর্বকালের মানবমনের শ্রেষ্ঠাংশের কাছেই তার আবেদন। তাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য অনেক সময়ই সমসাময়িক কালের সাধারণ পাঠক কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে রসজ্ঞ সমালোচক অথবা উন্নতস্তরের পাঠক দ্বারাই এ সব লেখাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। তাঁর কালের পাঠক, তাঁর রচনার তাৎপর্য বুঝতে না পারার জন্যই হোক, অথবা তাঁর রচনায় তাঁদের তৎকালীন মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পায়নি বলেই হোক, ত্রৈলোক্যনাথের রচনার যোগ্য সমাদর করেনি। কিন্তু কালক্রমে সাহিত্যে উন্নততর রুচি, উদারতর মনোভাব, সংস্কারমুক্তি এবং উচ্চশিক্ষা ও উন্নত মননশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের রচনার গভীরতর তাৎপর্য ও সৌন্দর্য ক্রমেই বেশি লোকের উপলব্ধ হচ্ছে এবং ত্রৈলোক্যনাথের খ্যাতিও সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছে। কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকও ত্রৈলোক্যনাথের রচনার গভীরতর তাৎপর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আজকের সাহিত্যরসিকের কাছে উদ্ঘাটিত করে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি মহৎ কর্তব্য সাধিত করেছেন। সেজন্য তাঁরা সাহিত্যরসিকমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীর মধ্যে 'কঙ্কাবতী' এককালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার কারণ, আমার মনে হয়, মিলনান্ত প্রেমের উপন্যাস হিসাবেই এটি সাধারণ পাঠক গ্রহণ করেছিল, এবং বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম অদ্ভুতরসের স্বাদও বোধহয় তাদের কিছুটা আকর্ষণ করেছিল। 'কঙ্কাবতী' বইটির প্রকৃত মাহাত্ম্য তৎকালীন পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না, এবং এই প্রথম বইটিতেই ত্রৈলোক্যনাথ যে হিন্দুয়ানির আচার-নীতির তুলনায় মানুষের জীবন ও মানুষের হৃদয়-বেদনাকে বড় স্থান দিয়েছিলেন, তার তাৎপর্যও সে-যুগের পাঠক পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের রক্ষণশীল — এমন কি প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবকেও ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। খেতুর মৃত্যুর পর কঙ্কাবতী সহমরণে যেতে চাইলে ইতর প্রাণীরা -- মশা, ব্যাং,

হাতি প্রভৃতি এবং খর্বুর মহারাজ — সকলেই এ নিদারুণ সংকল্পে বাধা দিতে অগ্রসর হোল। শুধু নাকেশ্বরী ভূতিনী কঙ্কাবতীকে সহমরণে পুড়িয়ে মারবার জন্য ব্যগ্র হয়ে চিরাচরিত ভারতীয় প্রথার নজির দেখাতে লাগলো।

"খর্ব্বুর উত্তর করিলেন,—পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, সত্য। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

নাকেশ্বরী বলিল, উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান? পূর্ব্ব প্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্ষিপ্তপ্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জ্বলন্ত অনলে পোড়াইবার নিমিত্ত আজ-কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্মের আমরা সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়া থাকি।" বাস্তবিকই ভূত অথবা ভৌতিক মনোভাবসম্পন্ন না হলে আর কে এমন হৃদয়হীন, মনুষ্যত্বের পরিপন্থী শাস্ত্রীয় প্রথা সমর্থন করতে পারে? এই ভূত-জাতি ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় একটি বৃহৎ স্থান অধিকার ক'রে আছে। যথাস্থানে এদের তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম বই 'কঙ্কাবতী' ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন ত্রৈলোক্যনাথের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর। এর আগে চাকুরিজীবনে নিশ্ছিদ্র কর্মে তিনি আবদ্ধ ছিলেন, সাহিত্যচর্চার অবকাশ তাঁর জীবনে তখন ছিল না। দেশের দুর্দশা এবং জনগণের দুঃখমোচনের চিন্তা যে তাঁর মনে সর্বদাই প্রবলরূপে জাগ্রত ছিল, তাঁর প্রমাণ, এই অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিই প্রথম বিভিন্ন স্থানীয় কুটিরশিল্পকে বড় বড় হোটেল, রেলওয়ে প্রভৃতি স্থানে বিক্রির ব্যবস্থা করে দিয়ে, এই সব শিল্পকে জনসাধারণের — বিশেষতঃ বিদেশীদের গোচরে আনেন এবং মরণোন্মুখ শিল্পীদের বাঁচার পথ করে দেন। দেশীয় শিল্প এবং সেগুলির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও গবেষণা এত ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, ১৮৮২ সালে হল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত শিল্প-মেলায় প্রেরণযোগ্য শিল্পদ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করার ভার তাঁর উপর পড়ে। সরকারী তরফ থেকে সে উপলক্ষে তাঁকে হল্যাণ্ড যেতেও অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের বিরোধিতায় সমুদ্রযাত্রা সেবার তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরে অবশ্য তাঁকে বিলেত যেতে হয়, এবং সে অভিজ্ঞতা তিনি

A Visit to Europe গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রথমে Officer in Charge of the Indian Exhibits for the Amsterdam International Exhibition এবং পরে Officer in Charge of the Exhibition Branch of the Govt of India নিযুক্ত হন। সরকারী অনুরোধে তিনি *A Rough List of Indian Art Manufactures* রচনা করেন, এবং পরে কলকাতা যাদুঘরে কাজ করার সময় *Art Manufactures of India* নামে একটি বৃহৎ পুস্তক এবং *Brass and Copper Manufactures* ও *Pottery and Glassware of Bengal* নামে দুখানি পুস্তিকা রচনা করেন। এর আগে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় ইনি নানা তথ্যপ্রমাণাদি সংগ্রহ ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অবিলম্বে গাজরের চাষ করলে গাজর খেয়ে বহু লোকের প্রাণ বাঁচতে পারে। তিনি সরকারী মহলে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, এবং সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ ক'রে চাষীদের গাজর চাষে উৎসাহ দিয়ে অনেকাংশে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে সমর্থ হন।

এই রকম কর্মবহুল ছিল ত্রৈলোক্যনাথের জীবন। দেশের লোকের উন্নতি বিধান এবং লোকের দুঃখ দূর করার চিন্তা ও চেষ্টায় তাঁর অধিকাংশ জীবন কেটেছে। কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্ন ও অক্লান্ত কর্মে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, এবং ১৮৯৬ সালে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তিনি অবসর নিতে বাধ্য হন। অবসর নেবার কয়েক বৎসর মাত্র আগে তিনি সাহিত্যরচনায় হাত দেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইংরেজী বাংলায় ত্রৈলোক্যনাথ অনেকগুলি বই লিখেছিলেন ; তার মধ্যে 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোক্‌লা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ময়না কোথায়', 'মজার গল্প', 'পাপের পরিণাম' ও 'ডমরু-চরিত' সাহিত্য শ্রেণী-ভুক্ত, এবং আমাদের আলোচনার বিষয়। 'ভূত ও মানুষ' বইটিতে 'বাঙ্গাল নিধিরাম' নামে হিউগোর *Toilers of the Sea* অবলম্বনে লিখিত একটি উপন্যাস, 'বীরবালা নামে' একটি গল্প, 'লুল্লু' নামক একটি ভৌতিক উপন্যাস এবং 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' নামে একটি গল্প আছে। 'মুক্তামালা' এবং 'ডমরু-চরিত' উপন্যাস বলে বর্ণিত হলেও এগুলি আসলে গল্পসমষ্টি। 'মুক্তমালা'য়

জাপানী কৌটোর মত গল্পের মধ্যে গল্পের স্রোত বয়ে চলেছে, এবং 'ডমরু চরিতে' বক্তা ডমরুধর তার বহুবিধ কৃতিত্বের কাহিনী একটির পর একটি গল্পে ব'লে যাচ্ছে। 'মজার গল্পে' মানুষের গল্প, ভূতের গল্প, বিদেশী গল্প সবই আছে; এর মধ্যে 'বিদ্যাধরীর অরুচি' গল্পটি, আমার মতে, বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলির অধিকাংশই হাস্যরসাত্মক, কিন্তু সেগুলি আবার করুণও বটে। পৃথিবীতে মানুষের ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতা অনেক সময়ই তার চরিত্রের সকল সংগতি ও যৌক্তিকতা নষ্ট ক'রে তাকে একটি কিম্ভূত চরিত্রে পরিণত করে, ফলে তা নিতান্ত হাস্যজনক বলে মনে হয়। কিন্তু এই কপটতা ও স্বার্থপরতা অপরের জীবনে যে নিদারুণ দুঃখদুর্দশা ডেকে আনে তা একান্ত বেদনাদায়ক। স্বভাবতঃ পরদুঃখকাতর ত্রৈলোক্যনাথ এই অসংগতি ও গভীর দুঃখ একই সঙ্গে দেখেছিলেন ব'লে তাঁর রচনায় হাসি ও অশ্রু একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, দীনবন্ধুর মত পরদুঃখকাতর মানুষ আর তিনি দেখেন নি। দীনবন্ধুর মধ্যে পরদুঃখকাতরতা অতি প্রবল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের পরদুঃখকাতরতা ছিল অতুলনীয়। ব্যক্তিগত জীবনে যিনি দিনের পর দিন নিজে অভুক্ত থেকে নিরন্নের অন্ন জোগাতে চেষ্টা করেছেন, দরিদ্রের দুঃখদুর্দশা কিছুটা লাঘব করতে পারবেন এই আশায় যিনি বড় চাকরি ছেড়ে কেরানিগিরি বেছে নিয়েছেন, যিনি পয়সা করার চেয়ে দেশের ও মানুষের সেবাই বড় কাজ বলে মনে করতেন, তাঁর মানব-করুণায় পরিপূর্ণ হৃদয়ের আর পরিচয় দেওয়া বৃথা। তিনি নিজেই লিখেছেন, "পৃথিবী অতি দুঃখময়। এ দুঃখ যিনি নিজ দুঃখ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাঁহাকে দরিদ্র থাকিতে হয়।" (কঙ্কাবতী)। পৃথিবীকে ত্রৈলোক্যনাথ দুঃখময় রূপেই দেখেছিলেন। 'কঙ্কাবতীর' দুঃখ, খেতুর নির্যাতন, বাঙ্গাল নিধিরামের জীবনের করুণ ব্যর্থতা, কুসুমের (ফোকলা দিগম্বর) মনোবেদনা প্রভৃতি অতি উজ্জ্বলরূপে ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় ফুটে উঠেছে। এইরূপ গভীর করুণাপরবশ ও মানবসহানুভূতিপূর্ণ লেখকের রচনা যে আমাদের হাস্যোদ্রেকও করে তার কারণ, মানব-

চরিত্রের যে গুরুতর অসংগতিগুলির ফলে পৃথিবীর মানবসমাজে এত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সে অসংগতিগুলির সম্পূর্ণ নগ্নরূপ তিনি আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটন করে দেন। যে-মানুষগুলিকে সমাজে ও আশে-পাশে আমরা নিত্য দেখি, ত্রৈলোক্যনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাদের প্রকৃত স্বরূপে দুই বিপরীত ধর্ম উদ্ঘাটিত হয় বলে, তারা এক কিম্ভূত হাস্যকর রূপ ধারণ করে। মদখোর মাতালের মধ্যে হাস্যকর কিছু না থাকতে পারে, আর ফোঁটা-টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণও হাস্যকর নয়। কিন্তু মাতাল যখন টিকি ও ফোঁটার জোরে তার মদ্যপানের অপরাধ স্খালন করতে চায়, তখন একই ব্যক্তির মধ্যে দুই বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ দেখে আমরা হেসে উঠি। নাত্‌নির বিয়ের সম্বন্ধের জন্য যখন পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এসেছে, তখন বৃদ্ধ রামেশ্বর টল্‌তে টল্‌তে শুঁড়ির বাড়ি থেকে বগলে বোতল নিয়ে ফিরছে দেখে "কিনু বলিলেন,—'বাবা! তোমার কি মান অপমানের ভয় একেবারেই গিয়াছে? তোমাতে আর কি কোনও পদার্থই নাই? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি জ্ঞানগোচর একেবারেই গিয়াছে? বগলে ও কি!' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'বগলে ও কি? বটে! আর কপালে এ কি? এটি দেখিলে আর ওটি (ফোঁটাটি) বুঝি দেখিলে না'।" ষাঁড়েশ্বর মদ খায়, আর মুসলমান সহিসের হাতে নানারূপ অখাদ্য মাংসও খায়, আবার এ দিকে প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন করে। ষাঁড়েশ্বরের বাড়ির নিচের দালানে হরি-সঙ্কীর্তন হয়, উপরের বৈঠকখানায় মুসলমান বাবুর্চির হাতের হ্যাম, মুরগি আর "ভি-র কাটলেট"ও চলে। এই পরম হিন্দু ষাঁড়েশ্বর আবার খেতু বরফ খায় শুনে আঁতকে ওঠে, "সর্ব্বনাশ! বরফ খায়? গোরক্ত দিয়া সাহেবেরা যাহা প্রস্তত করেন? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্মটি একেবারে লোপ হইল।" (কঙ্কাবতী)। শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলক চক্রবর্তী গড়গড়ি মহাশয়ের বংশের গুরুদেব। কলকাতায় তাঁর পাঁঠার দোকান ছিল। গড়গড়ি মশায় কলকাতায় এসে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করবার পর, "কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। ··· দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছটফট করিতেছে। খোঁয়াড়ে

স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাহার ভিতরে দশটি ছাগল ধরে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠেশা-ঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশটির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।" গুরুমহাশয়ের এক এক খেপ ছাগল সাত-আটদিনেই বিক্রি হয়ে যেত, এ-ক'দিন তাদের খাদ্য ও পানীয় দেওয়া তিনি অর্থ ও পরিশ্রমের অপব্যয় বলে মনে করতেন। চামড়ার দাম দু'আনা বেশি পাবার আশায় তিনি পাঁঠার মুখ পা দিয়ে চেপে ধ'রে জীবন্ত অবস্থায় তার ছাল ছাড়াতেন। পাঁঠার নাম ক'রে তিনি পাঁঠীর মাংস বিক্রি করতেন। "আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পাঁঠী! স্ত্রী পশু না খাইতে নাই?" গুরুদেব উত্তর করিলেন, — "আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজমান আছে। মাছ-মাংস একেবারেই আমি খাই না। সকলেই জানে যে, গোলোক চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান্ সদব্রাহ্মণ। লেখাপড়া জানি না, নিজের নামটিও সই করিতে পারিনা, ঢেরা দিয়া সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে সকলেই আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।"" (মুক্তামালা)।

এই সব চরিত্রে প্রত্যাশিত গুণের পরিবর্তে অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ গুণের উপলব্ধিই আমাদের হাস্যোদ্রেক করে। রামেশ্বর মাতাল, শুধুমাত্র কপালের মাটির ফোঁটাটির জন্য শুচিতার অহঙ্কার আমরা তার কাছ থেকে আশা করি না। ষাঁড়েশ্বর অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, বরফ খাওয়ার কথা শুনে তার আঁতকে ওঠা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। গোলোক চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং সকলেই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে; তাঁর মধ্যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আমাদের চেতনাকে আলোড়িত ও পীড়িত ক'রে হাসিতে প্রকাশিত হয়। পীড়ন ও নিষ্ঠুরতা অনেক সময়ই হাসি উৎপন্ন করে, একথা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানেও আমরা অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে পীড়ন ও নিষ্ঠুরতার অসংগতি এবং তজ্জনিত হাস্যরসের সন্ধান পাই।

বস্তুতঃ, মানুষের ভণ্ডামিটাই যুগপৎ হাস্যকর ও পীড়াদায়ক। আপাত-দৃষ্টিতে যে-মানুষকে এক-ধরণের লোক বলে মনে হয়, এবং যে-সব গুণ সে-ধরণের চরিত্রে আমরা প্রত্যাশা করি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন মানুষ তার সে

স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত গুণগুলিকে প্রচ্ছন্ন ক'রে কপটতা ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কতকগুলি চারিত্রিক লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন সেই ভণ্ডামি দ্বারা সে অপরের জীবনে নিদারুণ দুঃখ ডেকে আনে, এবং নিজে ব্যঙ্গ ও উপহাসের পাত্র হয়। এই শঠতা ও কপটতায় যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা আছে, আবার প্রচুর হাসিও আছে। ত্রৈলোক্যনাথ প্রধানতঃ এই ভণ্ডামির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে তজ্জনিত দুঃখকষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলেই তাঁর রচনায় যুগপৎ হাসি ও অশ্রুর সমাবেশ দেখতে পাই। ত্রৈলোক্যনাথ একজন উচ্চস্তরের ব্যঙ্গ রচয়িতা আবার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকও বটেন! তাঁর মধ্যে স্যাটায়ারিস্ট্ ও হিউমারিস্ট্-এর গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছে। একজন প্রখ্যাত সমালোচক ত্রৈলোক্যনাথকে ভল্টেয়ার, সুইফট্ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে এঁদের সমদলীয় বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করলে ত্রৈলোক্যনাথকে ঠিক সে-জাতীয় স্যাটায়ারিস্ট বলা যায় না। ভল্টেয়ার, সুইফট্ প্রমুখ স্যাটায়ারিস্টদের ব্যঙ্গ তীব্র, নিষ্ঠুর ও নিদারুণ। আঘাতে জর্জরিত ক'রেও সাধারণতঃ এঁরা ক্ষান্ত হন না, সমাজ, সভ্যতা বা রাষ্ট্রের অনুচিত বা নিন্দনীয় বিষয়গুলির বিনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েই যেন এঁরা কলম চালান। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় সে-জাতীয় নিষ্ঠুরতা নেই। নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে তাঁর রচনায় করুণার প্রস্রবন বয়ে চলেছে। তিনি যাকে ব্যঙ্গ করেছেন তা, প্রধানতঃ, মানুষের ভণ্ডামি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবচরিত্রে যে কপটতা ও হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, তাকেই তিনি বিদ্রূপ করেছেন। এই বিদ্রূপ দ্বারা আঘাত করার চেয়ে, মানুষের এ-জাতীয় আচরণে অপরের জীবনে কত দুঃখ আনে, সেদিকেই তিনি আমাদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছেন। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, যে-সব মানুষকে তিনি ভণ্ডামি বা হৃদয়হীনতার জন্য ব্যঙ্গ করেছেন, তাদেরও তিনি অতি শোচনীয় নিষ্ঠুর পরিণামে নিয়ে যান নি। এর দৃষ্টান্ত 'কঙ্কাবতী'র তনু রায় জনার্দন চৌধুরী ও গদাধর ঘোষ; 'মুক্তামালা'র অক্রূর ও গুরুদেব এবং 'ফোক্‌লা দিগম্বরে'র দিগম্বর বাবু। সংশয় ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে ত্রৈলোক্য নাথের মনে যে এ-দেশের শুভ পরিণতিতে একটা বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল,

'পাপের পরিণামে'র শেষাংশ থেকে নিচের উদ্ধৃতিতে তা পরিস্ফুট হবে। "ঈশ্বর বাঙ্গালী জাতিকে যেরূপ প্রখর বুদ্ধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, সেরূপ প্রখর বুদ্ধি অন্য কোন জাতিকে প্রদান করেন নাই। এই প্রখর বুদ্ধি যখন সত্য, সাধুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা আরও প্রভাবিশিষ্ট হইবে, তখন বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।...'অসত্য কথা, অসত্য আচরণ বাঙ্গালী একেবারেই জানেনা', — যখন আমাদের এই যশ জগতে ঘোষিত হইবে, তখন বাঙ্গালীর ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রভাবে জগতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে, সকল জাতি তখন বাঙ্গালীকে পূজা করিবে, বাঙ্গালীর গৌরবে তখন সকল পৃথিবী আলোকিত হইবে।" এ-কথাগুলি আসলে বিজয়বাবুর নয়, ত্রৈলোক্যনাথের। আর, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ত্রৈলোক্যনাথের মানব-সহানুভূতি ও মানবদুঃখ-কাতরতা। পুরোপুরি স্যাটায়ারিস্ট হওয়ার জন্য যে নিষ্করুণ আঘাতপ্রবৃত্তির প্রয়োজন, ত্রৈলোক্যনাথের তা ছিল না ; বরং মানুষের দুঃখ দেখলে তিনি সহানুভূতি ও করুণায় অভিভূত হতেন। সেইজন্য তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও শেষ পর্যন্ত উচ্চস্তরের হাস্যরসেই পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর স্বাভাবিক হাস্য-প্রবণতা বিদ্রূপ-ব্যঙ্গকে ছাপিয়ে উঠেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের পূর্ববর্তী প্রায় সকল ব্যঙ্গ-রচয়িতাই সমাজের কোনও প্রথা, রীতিনীতি বা হালচালের সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ সে-জাতীয় সংস্কারকের মনোভাব নিয়ে ব্যঙ্গ করেন নি। আসলে তিনি সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতির বিশেষ কোনো মূল্য দিতেন বলেই মনে হয় না। মানুষ যেখানে সামাজিক প্রথার দোহাই দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে, তাঁর ব্যঙ্গ সেখানেই পরিচালিত হয়েছে।

'কঙ্কাবতী'তে সেকালের বাঙালী হিন্দুসমাজের কতকগুলি চরিত্র এবং কোনো কোনো বিষয়ে তৎকালীন সমাজের গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তার মধ্যে লোভী ও পরস্বাপহারী জমিদার, স্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ বিবেকহীন সমাজপতি, অর্থগৃধ্নু কন্যাবিক্রেতা পিতা প্রভৃতি অনেকে আছেন। এ-সব চরিত্র অত্যন্ত বাস্তব। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সবই টাইপ চরিত্রে পর্যবসিত হয় নি, অনেক চরিত্রই নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ও জীবন্ত।

যে-জিনিসটাকে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর সকল বইয়ে ক্রমাগত আক্রমণ করেছেন, তা সেকালের হিন্দুসমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি। তখনকার সমাজে অনেক সময় মানুষের সুখদুঃখের চেয়ে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রথা ও রীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হোত। যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র, হৃদয়হীন ও নৃশংস, সেও একমাত্র তার জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে অপরের ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য হোত। এ-দৃষ্টিভঙ্গি যে কতদূর হাস্যকর ত্রৈলোক্যনাথ সেদিকে বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তি ফোঁটা কাটে ও টিকি রাখে, তার মূর্খতা ও মাত্‌লামি সমাজ উপেক্ষা করে, অথচ মনুষ্যত্বে বড় হয়েও যারা বিলেত যায়, সাহেবদের প্রস্তুত বরফ খায়, অথবা অন্য কোনো অসামাজিক কাজ করে, সমাজ তাঁদের শাস্তি দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তৎকালীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির এই অসামঞ্জস্যের দিকেই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের লক্ষ্য। এ-ব্যঙ্গ প্রধানতঃই পরিচালিত হয়েছে ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রতি। ফোঁটা কাটা, টিকি রাখা, ধর্মের নামে লোক-ঠকানো ব্যবসা এবং দুর্বলের উপর উৎপীড়ন, এইগুলিই ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য ছিল। 'কঙ্কাবতী' 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' ও 'মুক্তামালা' এর দৃষ্টান্ত। কেবল অসহায় ও উৎপীড়িত মানুষ নয়, পশুপাখি ইতরপ্রাণীর প্রতিও অহেতুক নিষ্ঠুরতায় ত্রৈলোক্যনাথ কাতর হতেন। এ-নিষ্ঠুরতা কত নিদারুণ হতে পারে 'মুক্তামালা'য় গড়গড়ি মহাশয়ের গুরুদেবের কাহিনীতে তা তিনি দেখিয়েছেন। 'কঙ্কাবতী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে-সব ইতর প্রাণীর তিনি অবতারণা করেছেন, তাদের নানা প্রকার জাতিগত দুর্বলতা নিয়ে তিনি রসিকতা করেছেন সত্য, কিন্তু কোথাও তাদের হৃদয়হীন রূপে চিত্রিত করেন নি। বস্তুতঃ, 'কঙ্কাবতী'র তনু রায়, জনার্দন চৌধুরী ও গোবর্ধন শিরোমণির চেয়ে মশা, ব্যাঙ ও হাতি হৃদয়বত্তায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। মানুষ যে হৃদয়হীনতায় অনেকসময় পশুপাখি কীটপতঙ্গের চেয়েও নিচে নেমে যায়, 'কঙ্কাবতী'তে এ ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর প্রায় সকল রচনায় গল্প বলার একটি বৈঠকি ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। লেখার ভঙ্গি অপেক্ষা বলার ভঙ্গি ত্রৈলোক্যনাথের

রচনার উপযোগী ছিল। প্রধানতঃ যে উপকরণের সাহায্যে তিনি তাঁর ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তা আমাদের দেশের কথাকোবিদ্‌রা চিরদিন ব্যবহার করে আসছেন। ভূতপ্রেত দৈত্যদানা রাক্ষসখোক্কস, এমন কি পশুপাখি কীটপতঙ্গ পর্যন্ত তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় উপস্থিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের ভূতপ্রেত আধুনিককালের অশরীরী মিডিয়াম-আশ্রয়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণাপ্রসূত নিরীহ ভূত নয়, রীতিমত সুস্থ সবল রূপকথা-উপকথার দুষ্টবুদ্ধিপরায়ণ ভূত। ঔপন্যাসিকের অথবা গল্পলেখকের প্রতিভাও যে ত্রৈলোক্যনাথের ছিল না, এমন নয়। 'ফোক্‌লা দিগম্বর', 'পাপের পরিণাম', 'বিদ্যাধরীর অরুচি' প্রভৃতিতে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ভণ্ডামি ও হৃদয়হীনতাকে এবং ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করা। এ-ব্যঙ্গের জন্য তিনি পুরাতন উপকরণের মধ্য দিয়ে উচ্চস্তরের রূপকধর্মী কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন। তাঁর গল্পবলার ভঙ্গিটি থেকে আরম্ভ করে, তাঁর চরিত্রগুলি পর্যন্ত সবই ছিল আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত সেকেলে ও গতানুগতিক, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় তারা সম্পূর্ণ আধুনিক এক গভীর তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। এদিক থেকে দেখতে গেলে ত্রৈলোক্যনাথের রচনা উৎকৃষ্ট স্যাটায়ারের গুণান্বিত। কিন্তু সর্বব্যাপী মানবসহানুভূতি ও করুণা তাঁকে ও তাঁর স্যাটায়ারকে যথেষ্ট নিষ্ঠুর হতে দেয় নি। সেইজন্যই ত্রৈলোক্যনাথ উৎকৃষ্ট স্যাটায়ারিস্ট হলেও ভল্টেয়ার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত স্যাটায়ারিস্টদের ন্যায় নির্মম আঘাতপ্রবৃত্তির অভাবহেতু তত্তুল্য স্যাটায়ারিস্ট হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গকে সহানুভূতি-মিশ্রিত ক'রে উচ্চস্তরের করুণ ও হাস্যরস উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অধিকাংশ গল্প-কাহিনীতে আরব্যোপন্যাস এবং রূপকথা-উপকথার শিল্পকৌশল অবলম্বন করেছেন। সেগুলি গল্পসমষ্টি বা গল্পের মালা। এক গল্পের কাণ্ডে শাখাপ্রশাখার মত নানা গল্পের অবতারণা দ্বারা তিনি তাকে একটি মহীরুহে পরিণত করেছেন। গল্প বলার এই পুরাতন টেকনিক তিনি সচেতন ভাবেই গ্রহণ ক'রে থাকবেন। তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রী অধিকাংশই অতিপুরাতন উপকথার

রাজ্যের। এ-জাতীয় পাত্রপাত্রী তিনি রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন — কেননা রূপকই উচ্চস্তরের ব্যঙ্গ বা স্ট্যাটায়ারের যথার্থ বাহন। সেজন্য 'কঙ্কাবতী', 'বীরবালা', 'মুক্তামালা' প্রভৃতি গল্পে বা গল্পশ্রেণীতে আজগুবি স্বপ্ন এবং উদ্ভট কাহিনীর প্রাচুর্য থাকলেও, এগুলিকে ঠিক 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' জাতীয় উদ্ভট রসের রচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না। সে-সব রচনার মুক্তোড্ডীন কল্পনার সঙ্গেও ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনার তুলনা হয় না। ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টি প্রধানতঃ বস্তুনিষ্ঠ ছিল। তিনি এই বাস্তব জগৎকে যতটুকু কাল্পনিক রূপ দিতে পেরেছিলেন, ততটুকুই ছিল তাঁর কল্পনার বিস্তার। তাঁর কল্পনা বাস্তব জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে অতি-বাস্তব বা অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান দিতে পারে নি। কিন্তু তবু বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর রচনায় ব্যাপকভাবে ভূতপ্রেত আমদানি করেছিলেন। 'লুল্লু' প্রভৃতি নিছক ভূতের গল্প ছেড়ে দিলেও, তাঁর 'কঙ্কাবতী' 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', প্রভৃতি সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক রচনাতেও প্রচুর ভূত আছে। সমাজে যে একদল মানুষ-ভূত তাদের হৃদয়হীন আচরণ ও কার্যকলাপ দ্বারা মানবজীবনে অপরিসীম দুঃখ ডেকে আনে, ত্রৈলোক্যনাথের এই ভূতগুলি আসলে তাদেরই প্রতিনিধি। এরা না করতে পারে হেন কর্ম নাই। নীল আকাশকে তারা রাতারাতি চুণকাম করে শাদা করে দেয়, সুযোগ পেলে অপরের স্ত্রীকে হরণ করে, মানুষের প্রাণবধ ক'রে তাকে ভক্ষণ করে, সদ্য স্বামীশোকাতুরাকে সহমরণে যেতে উৎসাহিত করে, এবং সকল প্রকার মানবতা-বিরোধী কার্যকলাপে তারা অগ্রণী হয়। বস্তুতঃ, ভূতের উপযুক্ত সাহায্য ছাড়া এ পৃথিবীতে কোনো কাজ হাঁসিল করা শক্ত। এই ভূতেরা আসলে কী, ত্রৈলোক্যনাথ তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।—"যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবরা করিতে পারেন না? অন্ধকারের অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তার পর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার

আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পূরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর পরিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। শস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।" (লুল্লু)।

এই ভূতদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধেও ত্রৈলোক্যনাথ কিছু কিছু আভাস দিয়েছেন। যথা, লুল্লু বলছে, "আমরা ভারতীয় ভূত। ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকা-ভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম্ম ফুস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্ম্মের গন্ধটি পর্য্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন।" (লুল্লু)। এই ভূতদের ঘানিতে পুরে তেল বার করতে পারলে, তা দিয়ে অনেক কাজ হয়। সাংবাদিক-সম্পাদকরূপেও কখনো কখনো ভূতগণ বিরাজ করেন। তাকে বলা যায় সংবাদপত্রের ভূত। ত্রৈলোক্যনাথ এই ভূতদের কার্যকলাপেরও বর্ণনা দিয়েছেন, "একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না।... গোঁগা যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র আফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগা তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকেরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব!" (লুল্লু)।

ভূত জাতিকে খাতির করা ভালো। ইংরেজি শিক্ষার ফলে লোকে ভূতদের না মানলে তাদের রাগ হতে পারে। "দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, এ কথা পূর্ব্বে জানিতাম; কিন্তু ভূত না মানিলে, ভূতের

রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, একথা কখনও শুনি নাই।" (কঙ্কাবতী)। কন্ধকাটা ভূতের প্রতিরূপ যে সংসারে যথেষ্ট আছে, এ বিষয়ে সকলকেই সচেতন থাকতে হয়। তাই 'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং'র স্কল যখন খেতুকে বলে, "কেমন! ভূতের উপর এখন তোমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তো?" তখন খেতু বলে, "পূর্ব হইতেই আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, ভূতের ষড়যন্ত্রেই আমি এতদিন ধরিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছি; কিন্তু সে অন্য প্রকার ভূত।" (কঙ্কাবতী)।

ভূতদের স্বভাবের আরো নানা দিক এই স্কল-ভূতের কাছ থেকে জানতে পারা যায়। যথা "বিবাহে ভাঙ্‌চি দিলে যেমন আমোদটি হয়, এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না। তুমি একটি পাত্র কি পাত্রী স্থির করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মত জিজ্ঞাসা কর; তাঁরা বলিবেন,—'দিবে দাও! কিন্তু—।' ঐ যে 'কিন্তু' কথাটি, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে।" ভূত ম'রে যে নিরীহ মারবেল হয়, একথাও স্কল মহাশয়ের মুখ থেকেই জানা যায়।

এই যে মানবসংসারের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ভূতজাতি, এদের তুলনায় ইতর-প্রাণীরা কিন্তু মন্দ নয়। কঙ্কাবতীর দুঃখ দেখে মাছি, মশা, হাতি, ব্যাং সকলেই সমবেদনায় অভিভূত হয়ে তার দুঃখ দূর করবার জন্য প্রাণপণ সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিল। সহমরণেচ্ছু কঙ্কাবতীকে ঘরে নিলে সমাজে পতিত হবে জেনেও খর্বুর মহারাজ বলেছে, "আত্মীয় স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, তাতেও আমি ভয় করিব না! তা বলিয়া অনাথা বালিকাটি যে অসহনীয় শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।" মশা বলছে, "আমারও ঐ মত, ভীরু কাপুরুষের মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি কঙ্কাবতীকে ঘরে লইয়া যাইব।" এবং ব্যাঙ বলছে, "আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মানুষেরা হউক, আমি হইব না।"

মানুষের হৃদয়হীনতা ও কাপুরুষতার প্রতি এমন তীব্র ব্যঙ্গ বাংলা সাহিত্যে অল্পই দেখা গেছে।

৬

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্যসাধনা আমাদের কালকে ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছে। আমাদের চিন্তা ও ভাবজগতের প্রায় সব ক্ষেত্রই রবীন্দ্রপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ—কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও নাটক প্রভৃতির আধুনিক আদর্শও রবীন্দ্রনাথই প্রতিষ্ঠা করেছেন বলা চলে। এ ভিন্ন বাংলা গদ্যকে বিভিন্ন বিচিত্র রূপ ও রীতির মধ্য দিয়ে এনে তিনিই সাম্প্রতিক কালের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এর বিচিত্র বহুমুখী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটি বৈচিত্র্যময় বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার একপ্রান্ত বঙ্কিমযুগে; কিন্তু আর একপ্রান্ত অতি-আধুনিক যুগের বিষয়, রীতি ও ভঙ্গিতে পরিণতি লাভ করেছে।

বঙ্কিমের যুগ ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যুগ, সমাজ-সংস্কার ও নীতিপ্রতিষ্ঠার যুগ। রবীন্দ্রনাথ যাকে কৌতুকহাস্য বলেছেন, সেই নিছক হিউমার তখনো বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। তবু রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কোনো কোনো লেখক গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের দুর্বলতাগুলিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন, এবং প্রবল হাস্যরসবোধ ও করুণার সংমিশ্রণে তাঁদের ব্যঙ্গ-রচনাগুলিকে উৎকৃষ্ট হিউমারের শ্রেণীতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই স্তরের ব্যঙ্গ-রচয়িতাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথের নাম উল্লেখ-যোগ্য। যদিও এঁদের ব্যঙ্গের মূল ছিল সমসাময়িক বাঙালী সমাজে, তবু বৃহত্তর মানবতার মুক্তাকাশে তা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে পেরেছিল। তা ছাড়া, আমাদের সমাজের বড় বড় ত্রুটিগুলিই শুধু নয়, আমাদের ব্যক্তিচরিত্র ও আচরণের ছোটখাট অসংগতিও যে কত হাস্যকর হতে পারে, সেদিকেও এঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই শেষোক্ত অসংগতিগুলিই আসলে কৌতুকহাস্যের প্রকৃত উপাদান। সেই জন্য

উল্লিখিত লেখকদের রচনায় ব্যঙ্গের তিক্ততা ততটা প্রকট নয়, একটি স্নিগ্ধ-মধুর হাস্যের আবরণে সে-তিক্ততা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এইরূপ উঁচুদরের হাস্যরসিকের মধ্যে আরো একজনের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইনি রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী না হলেও, এঁর কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। ইনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। হাসির গানগুলিতে যে-হাস্যরস ইনি পরিবেশন করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। কিন্তু যেখানে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, সেখানে ব্যঙ্গের খোঁচাটাকে তিনি সর্বত্র প্রচ্ছন্ন করতে পারেন নি।

যুগধর্মে রবীন্দ্রনাথও তাঁর তীব্র হাস্যরসবোধকে ব্যঙ্গরচনার মধ্য দিয়েই প্রথম উপস্থিত করলেন। প্রবল হাস্যরসবোধ জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী প্রভৃতির হাস্য-কৌতুকবোধের পরিচয় তাঁদের রচনাতেই উপস্থিত। ব্যক্তিগত জীবনে ঠাকুর পরিবারের অনেকেই কিরূপ পরিহাসরসিক ছিলেন, সেকথা আজ সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসবোধের পরিচয় তাঁর কবিতায়, চিঠিতে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, সমালোচনায়, সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে, এবং বাক্যালাপেও সর্বদাই প্রকাশিত হোত। কিন্তু তবু, যেহেতু ব্যঙ্গরচনারই সেটা যুগ ছিল, সেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর হাস্যরসবোধকে প্রকাশের পথ ক'রে নিয়েছিলেন।

অপরিণত বয়সে বোধহয় পরিহাস অপেক্ষা উপহাসের দিকেই ঝোঁকটা থাকে বেশি। তাই 'কড়ি ও কোমলে' পদ্য-পত্রগুলির মধ্যেই পরিহাস-কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গও মিশ্রিত হয়েছিল।

> "সস্তা লেখক কোকিয়ে মরে, ঢাক নিয়ে সে খালি পিটোয়,
> ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে কলম নিয়ে কালি ছিটোয়। ...
> খুদে খুদে 'আর্য' গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
> ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।" (পত্র)।

এই পংক্তিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ঢাউস কাগজগুলির অপরিচ্ছন্ন রুচি ও নিম্নস্তরের ব্যঙ্গপ্রবণতাকে এবং তৎকালীন আর্যত্বগর্বী অকর্মণ্য বাক্সর্বস্ব উগ্র রক্ষণশীল দলকে লক্ষ্য করেছিলেন। এ ব্যঙ্গের কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ

যে সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন, তা ছিল সর্বপ্রকার সংস্কার এবং প্রগতির পক্ষপাতী। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্রে সকলপ্রকার সংস্কারান্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইতিপূর্বে শশধর তর্কচূড়ামণি নকল-যুক্তির গলাবাজিতে হিন্দুত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস করেছিলেন, তার প্রভাবে তখন বাংলাদেশের উচ্চকণ্ঠ সাহিত্যিকদের অনেকের দ্বারা সংস্কারবিরোধী প্রচার-সাহিত্যের অতি-প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীলতা অতটা উগ্র, অযৌক্তিক ও সংস্কারবিরোধী না হলেও, তাঁর মত সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করার মতো মনীষা ও ধীশক্তি তখন জনপ্রিয় সাহিত্যে বিরল ছিল, এবং এই অত্যুগ্র হিন্দুয়ানির চাঁই-রা নিজেদেরকে বঙ্কিম-অনুসারী বলেই মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনের ঔদার্য বা সাহিত্যবোধ এঁদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন প্রতিভার তাৎপর্য কিংবা মর্যাদা উপলব্ধি করাও এঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে এঁদের হাতে রবীন্দ্রনাথকে কম নিন্দা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয় নি।

ব্যক্তিগত বিদ্রূপ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথকে যা বিশেষভাবে পীড়া দিত, তা তৎকালীন অত্যুগ্র হিন্দুয়ানির সংস্কার-বিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উগ্র সংস্কারপন্থী ছিলেন না, কিন্তু কালোচিত ও যুগোচিত পরিবর্তন তিনি কাম্য ও অপরিহার্য মনে করতেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন চিন্তা তাঁর ‘বালকে’ প্রকাশিত ‘চিঠিপত্র’ প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-রচনায় অবতীর্ণ হওয়ার কাহিনী কবি নিজেই ‘জীবনস্মৃতি’তে লিপিবদ্ধ করেছেন।

“এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম, আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গকাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার 'সঞ্জীবনী' কাগজে পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

কেবল 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত এবং 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতিতে পত্রাকারে লিখিত কবিতাগুলিতেই নয়, 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত কৌতুকনাট্যগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গাশ্রয়ী হাস্যরসের প্রভূত পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের সকল হাস্যরসাত্মক রচনাই ব্যঙ্গাত্মক অথবা নীতিমূলক। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে তাঁকে "মল্লভূমিতে আসিয়া তাল ঠুকিতে" হয়েছিল। সেই প্রতিকূল পরিবেশে নিন্দা, বিদ্রূপ ও সংস্কার-বিরোধী মনোভাবকে স্বভাবতঃ কৌতুকপ্রবণ রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের দ্বারাই প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

'বালকে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যগুলি পরে 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যদিও 'বালক' পত্রের পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনই এই কৌতুক নাট্যগুলির আপাত-উদ্দেশ্য ছিল, এবং ইয়ুরোপীয় 'শারাড' নামক নাট্যখেলার অনুসরণেই হেঁয়ালিনাট্যরূপে এগুলিকে উপস্থিত করা হয়েছিল, তবু, এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণিপন্থী লেখকদের এবং সংস্কার-বিরোধী ও হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী 'বঙ্গবাসী' প্রমুখ বড় বড় পত্রিকাগুলিকে ব্যঙ্গ করবার উপায় ক'রে নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বিশেষ ক'রে 'আর্য ও অনার্য' রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কৌতুক-রচনাটিতে সম্পূর্ণভাবেই তৎকালীন আর্যত্বগর্বী অনতি-উচ্চশিক্ষিত, নকল

বিজ্ঞানবিদ্ পাশ্চাত্ত্যবিমুখ লেখক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু 'হাস্যকৌতুকে'র অন্যান্য রচনাতেও এই উগ্র সনাতনপন্থীদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। 'আর্য ও অনার্য'তে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিদ্রূপ ক'রে সনাতনপন্থী বলছেন,—

"আপনি এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হতেই পারে না। হায়! এ-সকল ইংরাজি শিক্ষার শোচনীয় ফল।"

স্বদেশ, স্বধর্ম ও স্বজাতিপ্রীতি খুব উৎকৃষ্ট জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই প্রীতির প্রাবল্যে মানুষ যখন অপরের গুণাবলী অস্বীকার করে, অথবা নিজেদের স্মরণাতীত ইতিহাসে সেই গুণাবলীর উৎস আবিষ্কারের চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম হয়ে শেষে নকল যুক্তি ও কুযুক্তির আশ্রয় নেয়, তখন তা কতটা হাস্যকর হয়, সে-যুগে তর্কচূড়ামণি ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা তা বুঝতে না পারলেও, রবীন্দ্রনাথের কৌতুকবোধ যে তাতে উদ্দীপ্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ 'আর্য ও অনার্য' প্রমুখ 'হাস্যকৌতুকে'র কতকগুলি রচনা।

"হরিহর। য়ুরোপীয়েরা আর্যজাতি এবং তাঁদের বিজ্ঞান —

চিন্তামণি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ — আমি প্রমাণ করে দেব।"...

"হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগনেটিজম্ সম্বন্ধে ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন?

চিন্তামণি। কিছু না। দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরাজী পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক বারণশক্তির উত্তেজনা হয়— এই তো ম্যাগনেটিজম্। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বৎসর আগে আমাদের আর্যদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্রমার্জনপ্রথা প্রচলিত ছিল ভেবে দেখুন দেখি।

লেখকগণ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য! ধন্য! আর্যদের কী বিজ্ঞানপারদর্শিতা! আর্য কুণ্ডুমশায়ের কী গবেষণা!" (আর্য ও অনার্য)।

এখন অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই রকমই ছিল তর্কচূড়ামণিপন্থীদের পাণ্ডিত্য ও যুক্তি, এবং এইরূপই ছিল তদনুসারী লেখকদের মনোভাব। এই আর্যত্বগর্বীদের রবীন্দ্রনাথ কবিতাতেও বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। এবং, পরে রচিত হলেও, সে বিদ্রূপের ভাষা ও ভঙ্গি এরই অনুরূপ।

"উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
দু হাতে দাও তালি!
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি!" (দেশের উন্নতি, মানসী)।

"ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম;
আকার প্রকার রকম সকম
এতেই যা কিছু ভেদ।"

"মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।" (বঙ্গবীর, মানসী)।

"পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিতশির,
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।...
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড,

হেল্‌মহৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড।
উত্তর
কিছু-না, কিছু না, নাই জানাশোনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি—
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি ॥" (উন্নতিলক্ষণ, কল্পনা)।

তৎকালীন সাহিত্যিক ও সামাজিক পরিবেশে যে-জিনিসগুলি রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিত, তা উগ্র সংস্কারবিরোধী হিন্দুয়ানি, পরগুণ-অসহিষ্ণুতা, অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, যুক্তিহীন গলাবাজি, এবং কালধর্ম ও যুগধর্মকে অস্বীকার করে অতীতের স্মৃতি-কণ্ডূয়নে মগ্ন হয়ে নিষ্কর্ম বাক্‌সর্বস্বতা। তখনকার কতকগুলি বড় বড় পত্রিকায়, যথা 'বঙ্গবাণী', 'নবজীবন' প্রভৃতিতে, এ জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ সর্বদাই দেখা যেত। এরূপ মনোবৃত্তির ধারক ও প্রচারকদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতির পরিচয় আমরা আগে কিছু কিছু দিয়েছি। এ-দলের লেখকদের মধ্যে আরো একজন ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। ইনিও চূড়ামণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং কেবলমাত্র এ-জাতীয় মতামত প্রচারেই সন্তুষ্ট না থেকে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে তার 'অহিন্দু' মনোভাবের জন্য আক্রমণ করেছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স অল্প ; রক্ত গরম। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনীকে জ্যামুক্ত করলেন। ফলে যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও কৌতুক-নাট্যের সৃষ্টি হোল, তা তৎকালীন তরুণ মহলে প্রচুর আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করলো বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার কিছু কিছু অংশ গ্রন্থ-প্রকাশকালে বর্জন করলেন। 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীমান দামু বসু এবং চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছিল ব'লে 'রবীন্দ্রজীবনী'কার অনুমান করেছেন। এ-অনুমান সত্য হওয়াই সম্ভব। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েচেন ভয় নেইক আর।
ওরে দামু, ওরে চামু! ...
লিখচে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলচে মিথ্যা কথা চামু দিচ্চে গাল।
হায় দামু, হায় চামু! ...
দামু চামু কেঁদে আকুল কোথায় হিঁদুয়ানি।
ট্যাঁকে আছে, গোঁজ যেথায় সিকি দুয়ানি।
খোলের মধ্যে হিঁদুয়ানি।
দামু চামু ফুলে উঠল হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন বেড়ায় নেচে নেচে!"

স্পষ্টই বোঝা যায়, তখনকার হিন্দুধর্মের চাঁইদের সংস্কার-বিরোধী মনোভাব ও অহেতুক আক্রমণে রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। সাধারণতঃ, এ-জাতীয় উগ্র এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, এবং এ-ধরণের ব্যক্তিগত বিদ্রূপ তিনি অল্পই করেছেন। অবশ্য, তখনকার বিদ্রূপের এ অবাঞ্ছনীয় আঘাত-প্রবণতার সম্বন্ধে কবি অল্পকালেই সচেতন হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে বৃহত্তর মানবধর্মে অনুপ্রেরিত রবীন্দ্রনাথ পরমত-অসহিষ্ণুতা একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না; 'কড়ি-কোমল' ও 'মানসী'র বহু কবিতায় তার প্রমাণ আছে। পাদ্রি-প্রহারের একটি ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে লেখা তাঁর 'ধর্মপ্রচার' কবিতাটি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্ধ গোঁড়ামি ও উগ্র হিন্দুয়ানিকে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরে ব্যঙ্গ করেছেন। 'হিং টিং ছট্', প্রভৃতি কবিতাতে তার পরিচয় আছে, এমনকি কবির শেষ বয়সের রচনাতেও এ-ব্যঙ্গের অভাব নেই।

'হাস্যকৌতুক' বা 'বালক' ও 'ভারতী'তে প্রকাশিত হেঁয়ালিনাট্যের সংকলনটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ বলে গণনা করা চলে। কথোপকথনচ্ছলে লিখিত নক্শা-জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকনাট্য রচনা বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে'ই প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এর পর স্বর্ণকুমারী দেবীর এ-জাতীয় রচনারও আমরা পরিচয় দিয়েছি। 'হাস্যকৌতুকে'র

হেঁয়ালিনাট্যগুলিতে হেঁয়ালিটা মুখ্য ছিল না, ব্যঙ্গটাই ছিল আসল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন; "হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না।" এ-রচনাগুলির কোনো কোনোটি ব্যঙ্গাত্মক, কোনো কোনোটি ব্যঙ্গ-মিশ্রিত হাস্যাত্মক, কোনো কোনোটি উচ্চশ্রেণীর পরিচ্ছন্ন হাস্যরসের আদর্শস্বরূপ। 'আর্য ও অনার্য' নামক যে রচনাটি থেকে আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি, তার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিশেষ এক শ্রেণীর মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। 'আর্য ও অনার্য' ভিন্ন 'হাস্যকৌতুকে'র 'গুরুবাক্য' রচনাটিও এই উগ্র হিন্দুয়ানি এবং পাশ্চাত্ত্য গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অবহেলাকে ব্যঙ্গ ক'রে লিখিত। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'রসিক'-এ তৎকালীন অপরিচ্ছন্ন ভাঁড়ামি-জাতীয় রসিকতার প্রাবল্য ও তার জনপ্রিয়তাকে তীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু এরূপ কয়েকটি রচনা বাদ দিলে, 'হাস্যকৌতুকে'র রচনাগুলিতে আঘাত অপেক্ষা আমোদই বেশি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তীব্র হাস্যরসবোধ এবং উইট্-এর সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সংলাপজাত হাসি উৎপাদনেই যেন রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে আনন্দ পেতেন। উক্তি এবং প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে যে উইট-মিশ্রিত হাস্যরস তিনি 'হাস্যকৌতুক'-এ পরিবেশন করেছেন, তাই পদ্যে কথোপকথনচ্ছলে রচিত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় এবং প্রহসনগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে। "হাস্যকৌতুকে'র রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের উইট্-জাত হাস্যরসের পরিচয় সর্বত্র ছড়ানো।

"অভিভাবক।... তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ, আচ্ছা কাননে কী ফোটে বলো দেখি।

মধুসূদন। কাঁটা।

কালাচাঁদের বেত্র আস্ফালন

কী মশায়, মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলেছি?

অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কী বলে?

মধুসূদন। পোকায়।

বেত্রাঘাত

আজ্ঞে, মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি — শুধু সিরাজদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে ! এই দেখুন।” (ছাত্রের পরীক্ষা)।

“তিনকড়ি। … কাল তোমাকে যা শিখিয়েছিলুম মনে আছে কি ?

বনমালী। আছে।

তিনকড়ি। কী বলো দেখি।

বনমালী। পেটে খেলে পিঠে সয়।

তিনকড়ি। আজ আর-একটা শেখাব। কথাটা মনে রেখো — পিঠে খেলে পেটে সয় না।” (পেটে ও পিঠে)।

“কুঞ্জবিহারী ! … এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মতো কতকগুলো আহার না করেও বেঁচে থাকে। যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায় !

বশম্বদ। (সভয়ে মৃদুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি ; কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না — আরও কিছু খাবার আবশ্যক করে।” (ভাব ও অভাব)।

“খগেন্দ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সহজ বুদ্ধিতে পূর্বে সেটা একরকম ঠাউরেছিলুম, কিন্তু গুরুদেবের কথা শুনে বুঝলুম যে, পূর্বে কিছুই বুঝিনি এবং তিনি যা বললেন তাও কিছু বুঝলুম না।” (গুরুবাক্য)।

অর্থহীন বাক্যজাল দ্বারা বড় বড় কথার ভান করা এবং তা দিয়ে লোক-ভোলানোর তৎকালীন মনোবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ ‘হিং টিং ছট্’-এও এইরূপ ব্যঙ্গ করেছিলেন।

স্বভাবতঃ কলহপরায়ণ না হলেও রবীন্দ্রনাথকে প্রথম যৌবনেই ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, আচরণে ও সাহিত্যে যে-পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে তীব্র হাস্যরসবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গকেই প্রতিরোধক অস্ত্র হিসাবে বেছে নেবেন এটা আশ্চর্য নয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এ-সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথকে বেশিদিন চালাতে হয় নি। কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ অথবা উগ্র সংস্কার-বিরোধী রচনায় সাময়িকভাবে উত্তেজিত হয়েই তিনি এ রচনাগুলি লিখেছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ আঘাতপরায়ণ

ছিলেন না সত্য, কিন্তু সহজেই উত্তেজিত হতেন। রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, "কবির মন অল্প আঘাতেই ম্লান, অল্প কারণেই উত্তেজিত হয়; আবার অল্পকালের মধ্যেই শান্ত স্বাভাবিক হয়।" এই ব্যঙ্গ রচনাগুলি সেই সাময়িক উত্তেজনারই ফল।

'হাস্যকৌতুকে'র রচনাগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'অভ্যর্থনা', 'রোগের চিকিৎসা' প্রভৃতি রচনায় হাস্যরসের সঙ্গে একটি নীতি সংযুক্ত হয়ে, প্রকৃতই কিশোর-উপভোগ্য পরিচ্ছন্ন হাস্যরসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও নাট্যাকারে বা কথোপকথনরূপে এরূপ ছোট ছোট হাস্য ও ব্যঙ্গ-রসাত্মক নকশা বঙ্কিমচন্দ্রই উপস্থিত করেছিলেন, তবু বালক-বালিকাদের উপযুক্ত কৌতুকপ্রদ কিন্তু পরিচ্ছন্ন নীতিমূলক রচনা এর আগে দেখা যায় নি। 'হাস্যকৌতুকে'র দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলি 'ভারতী'তেই অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছিল, এবং এগুলি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক। এ-শ্রেণীর মধ্যে 'আশ্রমপীড়া', 'রসিক', 'গুরুবাক্য' প্রভৃতি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য। এ-রচনাগুলির নাটকীয়তাও প্রচুর, যার ফলে এর কোনো কোনোটি অভিনীত হলে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এ-জাতীয় নাটকীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত কৌতুক নক্শাগুলিতে অথবা রবীন্দ্রপূর্ববর্তী সংলাপরূপে রচিত অন্যান্য রচনায় লক্ষ্য করা যায় না।

প্রধানতঃ কবি হলেও, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই এ-যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী। নানাক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ও আদর্শকে একদিকে যেমন তিনি গভীররসাত্মক কবিতা প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বহুবিধ অযৌক্তিক দুর্বলতাকে তিনি ব্যঙ্গের দ্বারা হাস্যাস্পদ ক'রে তুলছেন। গদ্যে পদ্যে ব্যঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের সকল বয়সের রচনাতেই কোনো না কোনো প্রসঙ্গে কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। তবে, 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র যুগে যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে যেরূপ তীব্র আক্রমণাত্মক ব্যঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে বেরিয়েছিল, সেরূপ আক্রমণ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে অল্পই করেছেন। সুরেশ সমাজপতির

নবপ্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লেখার নমুনা' 'প্রত্নতত্ত্ব' ও 'সারবান সাহিত্য' নামে আরো কয়েকটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের পরিচয় আছে। 'বালক'-'ভারতী'-'সঞ্জীবনী' এবং 'কড়ি ও কোমল'-'মানসী'-'সোনার তরী'র ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এরূপ তীব্র ব্যঙ্গের অনৌচিত্য উপলব্ধি করেছিলেন। 'হিং টিং ছট্'এ তিনি চন্দ্রনাথ বসুকে আক্রমণ করেছিলেন বলে যে-ধারণা প্রচলিত হয়েছিল, তার ফলেও হয়তো তিনি এ-জাতীয় আক্রমণাত্মক রচনা থেকে বিরত হয়ে থাকবেন। কিন্তু ব্যঙ্গ না হলেও, কৌতুক করার দিকে একটা ঝোঁক এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাঁর গভীররসাত্মক রচনাতেও কৌতুকপ্রবণতা আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিল। 'পুরস্কার' কবিতাটি তার দৃষ্টান্ত। অবশ্য, 'মানসী'তেও কৌতুক-কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যথা, 'নবদম্পতির প্রেমালাপ'। কিন্তু এ-কবিতাটিতে নবযুবকের সঙ্গে অতি-অপরিণতবয়স্কা বালিকার বিবাহকে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নরূপে ব্যঙ্গ করেননি. এমন কথা বলা যায় না।

'গোড়ায় গলদ' রচনাদ্বারা রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ প্রহসন রচনায় হাত দিলেন। এ-সময়ে যে তীব্র কৌতুক-প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সম্ভবতঃ তারই ফলে তিনি অল্পকাল পরে রচিত 'পঞ্চভূত'এ 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' নিয়ে অতি সরল অথচ গভীর চিন্তাপ্রসূত আলোচনা করেন।

১২৯৯ থেকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হাস্যরসের প্রতি ঝোঁক প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করে, এবং 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'কণিকা', 'ক্ষণিকা'র যুগ (১৩০৬—৭) অতিক্রম ক'রে 'শিশু' ও 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র কাল (১৩১১) পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ে তিনি 'গোড়ায় গলদ' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এই দুখানি প্রহসন রচনা করেন। 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে'র অনেকগুলি রচনা এই সময়ের মধ্যেই লেখা হয়। 'পয়সার লাঞ্ছনা', 'বিনি পয়সার ভোজ' প্রভৃতি এ সময়েরই রচনা। এর কিছুকাল পরে গল্পাকারে কবি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' লেখেন। এটি পরে 'চিরকুমার সভা' নামে নাট্যাকারে পুনর্লিখিত হয়। এগুলিতে, বিশেষতঃ প্রহসন দু'টিতে,

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকহাস্যের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ উপস্থিত হয়েছে। অভিনয়-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সহজাত ছিল এবং প্রথম যৌবন থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রমুখ জ্যেষ্ঠদের ও নিজের রচিত বিবিধ নাটকে অবতীর্ণ হয়ে তিনি প্রচুর অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যে নাট্যমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেকথা উল্লেখ করেছি। নাট্যশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সহজ অভিনয়নৈপুণ্যের ফলে নাট্যরচনার দিকেও কৈশোর থেকেই রবীন্দ্রনাথের যে একটি বিশেষ ঝোঁক ছিল, সে-সময়ের নাট্যকাব্য ও গীতিনাট্য প্রভৃতিতে তা আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অবশ্য সর্বতোমুখী, কিন্তু নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দক্ষতা ও প্রবণতা ছিল। প্রবল কৌতুকরসের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ নাটকের অন্যান্য শাখার মত প্রহসন-রচনার দিকেও আকৃষ্ট হবেন, এটা স্বাভাবিক। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে হাস্যরসাত্মক রচনার দিকে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবল ঝোঁক এসেছিল, তার ফলে এ সময় থেকে তাঁর গভীররসাত্মক কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা প্রভৃতি সকল রচনাতেই একটি কৌতুকময় ভঙ্গি আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। গম্ভীর বা গুরুবিষয়ক রচনাও যে পরিচ্ছন্ন নির্মল হাস্যরসের সংস্পর্শে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে এবং মর্যাদা লাভ করে, একথা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তা বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে।" নিজের রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র এই হাস্যজ্যোতির স্পর্শ এনে দিতে ভোলেন নি। এ সময় থেকে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, গভীর ও গুরুবিষয়ক রচনাতেও একটি কৌতুকময় ভঙ্গি ও মৃদু হাস্যরসের অবতারণা দ্বারা সে সব রচনাকে চিত্তাকর্ষী ক'রে তুলবার প্রয়াস তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন 'গোড়ায় গলদ' প্রকাশিত হয়, ১২৯৯ সালে। প্রহসনখানি পরে পুনর্লিখিত হয়ে 'শেষরক্ষা' নামে আত্মপ্রকাশ করে

'গোড়ায় গলদ'এর কাহিনী অতি ক্ষীণ ; প্রণয়, এবং পরিশেষে বিবাহে এর সুখ-সমাপ্তি। মাঝখানে প্রেমাস্পদার নামধাম সম্বন্ধে নায়কের মনে ভুল ধারণা জমিয়ে কিঞ্চিৎ জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বহু প্রকারের বহু নাটক রচনা করেছেন। গীতিনাট্য, নাট্যকাব্য, রূপকনাট্য, ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি তাঁর সকল রচনাই যে মঞ্চাভিনয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, তার কারণ, নাট্যশিল্প ও অভিনয়কলা সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তিনি অল্প বয়স থেকে জোড়াসাঁকোর শখের রঙ্গমঞ্চেই যথেষ্ট লাভ করেছিলেন। এই শখের থিয়েটারী দলের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আর রবীন্দ্রনাথের অভিনয়-প্রতিভা তো সর্বজনবিদিত। ফলে নাট্যাকারে তিনি যাই লিখেছেন তাই বিশেষরূপে অভিনয়যোগ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এর দৃষ্টান্ত 'হাস্যকৌতুকে'র কৌতুকনাট্যগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের যে-ধারা রঙ্গমঞ্চ আশ্রয় ক'রে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথের নাটক-প্রহসনগুলি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সে-হিসাবে বলা যায় যে, আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত নাট্যসাহিত্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ নাটকের আর একটি ধারা প্রবর্তন করলেন। এজন্যই, গঠন, বক্তব্য বা রচনাশিল্পে রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের সঙ্গে পেশাদারি মঞ্চাশ্রয়ী নাট্যসাহিত্যের বিশেষ কোনোই মিল দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান নি। নাট্যশিল্প ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁকে বাড়ির মঞ্চেই লাভ করতে হয়েছিল। তার কারণ, "কলিকাতার রঙ্গালয় বহুকাল পর্যন্ত তেমন আকর্ষণের স্থান হয় নাই। রঙ্গমঞ্চ, গৃহসজ্জা, সিন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে বিলাতী থিয়েটারের নিকৃষ্ট অনুকরণ ছাড়া বৈশিষ্ট্য ছিল সামান্যই। অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চারিত্রিক আদর্শ তখনকার শিক্ষিত সমাজের নিকট আদৌ বরণীয় ছিল না।"* পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ ক্রমশঃ অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষেও তার সঙ্গে যেটুকু সংযোগ রাখা সম্ভব ছিল, রবীন্দ্রনাথের

* রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পক্ষে তা ছিল না। বিষয়টি আমরা আগেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। "পেশাদারী থিয়েটার বা প্রাইবেট থিয়েটার মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের অর্টিস্ট চিত্তের চাহিদা পূরণ করিতে পারিতেছিল না।" ফলে প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'সঙ্গীত-সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'সঙ্গীত-সমাজে' অভিনয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'গোড়ায় গলদ' রচনা করেন।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী প্রহসনগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সেগুলি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ছিল। কেবল প্রহসন নয়, সেকালের হাস্যরস প্রায় সর্বত্রই ব্যঙ্গবিদ্রূপ আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে দেখতে পাই। প্রহসন রচনায় রামনারায়ণ থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সকলেই ব্যঙ্গ অবলম্বন করেছিলেন। এর মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ব্যঙ্গকে গভীর মানব-সহানুভূতিতে মণ্ডিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন; এবং জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ব্যঙ্গের প্রকৃতিই ছিল ভিন্ন,—তিনি ব্যঙ্গের মধ্যে একটি ব্যাপকতা আনতে পেরেছিলেন। তবু, 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ও 'অলীক বাবু'কে ব্যঙ্গাত্মক রচনা বলেই গণ্য করতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' নিতান্তই হাসির নাটক। এর মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ নেই, সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নেই, নীতিকথার অবতারণা নেই, এমন কিছুই নেই যাকে বিশুদ্ধ হাস্যরসের গণ্ডিবহির্ভূত বলে মনে করা চলে। অতি সামান্য ব্যঙ্গ যদি থাকে, তবে ললিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ইংরেজী-মিশ্রিত বাংলা বুকনির প্রতি। সে হিসাবে 'গোড়ায় গলদ'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক রচনা। এর আগে বাংলার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপবর্জিত খাঁটি হাস্যরসের দেখা একেবারেই পাওয়া যায়নি, একথা হয়তো বলা যায় না। কিন্তু সে-হাস্যরস ছোট ছোট আকারে এখানে ওখানে ছড়ানো ছিল, একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসন কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হাস্যরসকে আশ্রয় ক'রে এর আগে আর রচিত হতে দেখা যায় নি।

'গোড়ায় গলদ' রচনাটি নাটক হিসাবে হয়তো নিখুঁত নয়। ইন্দুমতী যেভাবে নিমাইকে চাকর বলে সম্বোধন ক'রে তাকে পাল্কি আনতে পাঠাচ্ছে তা, সেকালের সমাজে তো বটেই, বোধহয় আধুনিক সমাজেও বাঙালী মেয়েদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক কিনা সন্দেহ। তবু সব

দিক আলোচনা ক'রে 'গোড়ায় গলদ'কেই বাংলার প্রথম পরিপূর্ণ হাস্যরসাত্মক প্রহসন বলে গণনা করতে হবে। কেবল প্রহসনের মধ্যে নয়, বাংলা সাহিত্যে এরূপ রচনাই ইতিপূর্বে দুর্লভ ছিল, নিছক নির্জলা আমোদই যার একমাত্র উদ্দেশ্য। এর আগে অনেকের রচনা মূলতঃ ব্যঙ্গাত্মক হলেও লেখকের প্রতিভাবলে তার ব্যঙ্গটুকু প্রচ্ছন্ন হয়ে হাস্যরসই প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনাবিল পরিচ্ছন্ন উচ্চস্তরের আনন্দ পরিবেশন ছাড়া যার কোনোই উদ্দেশ্য নেই, এরূপ রচনা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে অল্পই দেখা গেছে।

'গোড়ায় গলদে' রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস উৎপাদনের কৌশল হিসাবে প্রধানতঃ ব্যবহার করেছেন সিচুয়েশন বা ঘটনাসংস্থান এবং সংলাপ। এ প্রহসনের চরিত্রগুলি অতি জীবন্ত ও নিখুঁত বটে, কিন্তু তার কোনোটিকেই উচ্চস্তরের হাস্যরসাত্মক চরিত্র বলে গণ্য করা যায় না। 'উইট'-আশ্রিত হাস্যরসাত্মক সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দক্ষতা ছিল। তাঁর কৌতুকনাট্য ও প্রহসনগুলিতে তিনি এ-দক্ষতার চূড়ান্ত প্রয়োগ করেছিলেন। আবার ঘটনাসংস্থানের কৌশলও তিনি ভালো করেই জানতেন। এই ঘটনা-সংস্থান বা সিচুয়েশন-সৃষ্টির দ্বারা তীব্র অনুভূতি উৎপানের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস-নাটক প্রভৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। উপন্যাস ও গল্পে চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, হাস্যরসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক সে-জাতীয় কৃতিত্বের পরিচয় অল্পই দিয়েছেন। এটা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হতে পারে; কিন্তু আমার মনে হয়, চরিত্রগত যতখানি গভীর অসংগতি মানুষকে তীব্র উপহাসের পাত্র ক'রে তোলে স্বভাবতঃ কোমল-প্রাণ রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ঠিক ততখানি অসংগতিময় চরিত্র সৃষ্টি করবার মতো নিষ্ঠুর হতে পারেন নি। সে কারণেই, নিমচাঁদ বা কমলাকান্তের মতো গভীর বেদনাময় হাস্যরসাত্মক চরিত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের এই কোমলপ্রাণতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'একটি আষাঢ়ে গল্প' বা 'তাসের দেশ', যেখানে উচ্চস্তরের স্যাটায়ার-রচনার সকল উপাদান সন্নিবেশ ক'রেও স্যাটায়ারোপযোগী নিষ্ঠুরতা ও আঘাতপ্রবৃত্তির

অভাবহেতু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাকে একটি কোমলস্নিগ্ধ রোমান্স-এ পরিণত করেছেন। হাস্যরসাত্মক চরিত্রের দুটি দিক আছে। একদিক থেকে তার চারিত্রিক দুর্বলতাগুলির দরুণ সে অপরের উপহাসাস্পদ হয়, অপরদিক থেকে সেই দুর্বলতাগুলিই তার নিজের জীবনে নানা লাঞ্ছনা ডেকে আনে। উৎকৃষ্ট হাস্যরসাত্মক সকল চরিত্র সম্বন্ধেই — ফলস্টাফ্, ডন কুইক্সোট, নিমচাঁদ, কমলাকান্ত — একথা প্রযোজ্য। এ-কারণে উঁচুদরের হাসির চরিত্রে কিছুটা ট্র্যাজিক ভাব বা দুঃখের সংস্পর্শ থাকা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের একথা খুব ভালো করেই জানা ছিল; পীড়ন ও দুঃখ যে হাস্যরসের মূলে বিরাজ করে, একথা 'পঞ্চভূতে' তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত উত্তেজিত না হলে, দুঃখ দেওয়ার মতো মনোভাব রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অবশ্য, গল্প-উপন্যাসগুলিতে দুঃখময় চরিত্র রবীন্দ্রনাথ অনেক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হাস্যজনক চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ঠিক ততটা তীব্র উপহাসের দ্বারা বিদ্ধ করতে চান নি, যতটা উপহাস তাকে হাস্যরসের চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির হাসি ব্যঙ্গাত্মক নয়। এমন কি, হাস্যরসসৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ এমন কোনো চরিত্রের অবতারণা করেন নি, সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিচারে যা কোনো বিশেষ চারিত্রিক দুর্বলতার অধীন। সাধারণতঃ উচ্চস্তরের হাস্যরসাত্মক চরিত্র স্বভাবের কোনো বিশেষ দুর্বলতা বা হীনতার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়ে থাকে। ফলস্টাফের নারীলিপ্সা, ডন কুইক্সোট-এর বীরকীর্তির আকাঙ্ক্ষা, নিমচাঁদের মাতলামি, কমলাকান্তের নেশাগ্রস্ততা তাদের প্রতি লেখক ও পাঠকের উপহাসকে সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষরক্ষা' এবং 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বা 'চিরকুমার সভা'য় সেরূপ কোনো স্বভাবগত বা চারিত্রিক দুর্বলতা দেখানো হয় নি। যে-দুর্বলতা গুলি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে, তা মানবচরিত্রে নিতান্তই স্বাভাবিক। আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে নিতান্ত বোকার মতো আচরণ ক'রে থাকি। বিশেষতঃ প্রেমে পড়লে নাকি খুব শিক্ষিত, বুদ্ধিমান তরুণ-তরুণীকেও নানাপ্রকার বোকামি ও পাগলামির পরিচয় দিতে দেখা যায়। প্রেমেপড়া-জনিত এই সাময়িক দুর্বলতা নিয়েই প্রধানতঃ এ দু'টি প্রহসনে

অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই, যদিও এ দু'খানি প্রহসন হীরকোজ্জ্বল সংলাপে ও কৌতুককর ঘটনা-সংস্থাপনের কৌশলে প্রচুর হাসি জোগায়, তবু এর মধ্যে উঁচুদরের হাস্যরসাত্মক চরিত্রের বিশেষ দেখা পাওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনটি অনেক পরিমাণে এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। এর প্রধান চরিত্র বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠের দুটি দুর্বলতা আছে। এক, সে বই লেখে এবং তার লেখার সমজদার শ্রোতা পাবার জন্য সে সর্বদাই ব্যগ্র। লেখা শোনাবার উপযুক্ত লোক পেলে সে আহার-নিদ্রা ভুলে যায়, এবং যারা আগ্রহ ক'রে তার লেখা শোনে তাদের কোনো দোষই সে দেখতে পায় না। বৈকুণ্ঠ-চরিত্রের দ্বিতীয় দুর্বলতা, সে নিতান্ত অসাংসারিক ভালোমানুষ, কাউকে সে অবিশ্বাস করতে জানে না, কাউকে সে আঘাত করতে পারে না। ভালোমানুষি সাধারণ বিচারে একটি গুণ ব'লে মনে হলেও সাংসারিক বিচারে এটি একটি গুরুতর ত্রুটি। বিদ্যার বিদ্যার মতো, আধুনিক জগতে অতিরিক্ত ভালোমানুষি গুণ হয়েও দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈকুণ্ঠের মতো স্বার্থহীন, আত্মভোলা, অসাংসারিক লোক পদে পদেই ঠকে, তাদের ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করার মতো লোকের অভাব সংসারে কোনো কালে দেখা যায় না। এক্ষেত্রেও বৈকুণ্ঠের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেদার ও কেদারের লেজুড় তিনকড়ি এসে জুটলো। কেদারের দায় কেবল নিজেকে নিয়ে নয়, তার আবার শ্যালিকা-দায়, সেটাও যে-সে দায় নয়। কেদারের ভাষায় "কন্যাদায় দায়, কিন্তু — কীবলে ভালো — শ্যালীদায়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।" কাজেই বৈকুণ্ঠের বাড়িতে সে এসে জুটলো বটে, কিন্তু তার জন্য তাকে দাম দিতে হোল সামান্য নয়। এ-বাড়িতে অধিষ্ঠান করার ফলে যখন তখন তাকে মুখ বুজে বৈকুণ্ঠের লেখা শুনতে হোল ; সেটা তার পক্ষে গুরুতররূপে পীড়াদায়ক। মাঝখানে শ্যালিকাটির সঙ্গে অবিনাশের প্রণয় ও বিবাহ ঘটিয়ে শ্যালিকাদায়, পিসিদায়, এমন কি পিসির আত্মীয় বই-বাজানো বিপিনবাবুর দায়ও সাময়িক ভাবে মিটলো বটে, কিন্তু সেই দায়ের গুরুভারে অবিনাশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, ফলে পিসি ও বিপিন-সহ কেদারকে আবার নিজের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে হোল।

এখানে বৈকুণ্ঠের শ্রোতা-সন্ধানের দুর্বলতাই তাকে সপরিবার কেদারের অত্যাচারের পাত্র করে তুলছে; অপরদিকে শ্যালীদায় এবং নিজের ভার বহন করবার অক্ষমতা কেদারকে বৈকুণ্ঠের লেখা এবং অবিনাশের প্রেম-কাহিনী শুনতে বাধ্য করছে। এই উভয় পক্ষের পীড়ন থেকে আত্মরক্ষায় উভয়ের অসহায়তার ফলে তুমুল কৌতুক জমে উঠেছে। বস্তুতঃ, একদিকে বৈকুণ্ঠ অপরদিকে কেদার স্বখাত-সলিলেই নিমজ্জমান, এবং তাদের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলিই তাদের চরিত্রকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির মধ্যে, আমার মনে হয়, 'বৈকুণ্ঠের খাতা'ই শ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক উজ্জ্বল সংলাপ এখানে কয়েকটি বিরুদ্ধ চরিত্রের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাতে যেন আরো প্রবল হাস্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে; আর, হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসাবে বৈকুণ্ঠ উচ্চস্তরের কৃতিত্ব-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কেবল বৈকুণ্ঠই নয়, কেদার-বিপিন-তিনকড়ি এবং সাময়িক-ভাবে অবিনাশ সকলেই হাস্যরসাশ্রিত চরিত্র। পার্শ্বচরিত্রগুলির মধ্যে তিনকড়ি চরিত্রসৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রহসনগুলিতে যেসব হাস্যরসাত্মক চরিত্রের অবতারণা করেছেন, তাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় বৈকুণ্ঠ চরিত্রটিকে যত বিস্তার করে আঁকা সম্ভব হয়েছে কোনো প্রহসনেই অপ্রধান চরিত্রকে তত বিশদভাবে দেখানো সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির অন্যান্য হাস্যরসাত্মক চরিত্রের মধ্যে 'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবু উল্লেখযোগ্য। অকৃতদার, আত্মভোলা, অসাংসারিক লোক নিজের অজ্ঞাতসারে যে প্রচুর কৌতুক উৎপাদন করে, এ-চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বোধহয় রবীন্দ্রনাথের চোখে-দেখা বাস্তব চরিত্রের উপর ভিত্তি ক'রে লেখা ব'লেই এ-চরিত্রটিকে এত জীবন্ত মনে হয়। এ-সম্বন্ধে একখানি পত্রে প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশাল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারায়ণ বসু এবং কতক আমার কল্পনা আছে।" 'জীবনস্মৃতি'তে রাজনারায়ণ বসুর যে বর্ণনা আছে, তাতে প্রধানতঃ তাঁকে অবলম্বন ক'রে চরিত্রটি আঁকা হয়েছিল

বলেই যেন মনে হয়। 'চিরকুমার সভা'র অন্যান্য চরিত্রে হাস্যরস প্রেমে-পড়া জনিত সাময়িক দুর্ববলতা-প্রসূত, সেহেতু তাদের পুরোপুরি হাস্যরসাত্মক চরিত্র বলে গণ্য করা চলে না।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ব্যঙ্গের প্রতি ঝোঁক রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষরক্ষা'য় যেমন ললিত-চরিত্র আশ্রয় ক'রে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী-বাংলা বুক্‌নি-সমন্বিত বাঙালী সাহেবকে বিদ্রূপ করেছিলেন, 'চিরকুমার সভা'য় তেমনি মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরকে অবলম্বন করে তৎকালীন অনাচারগ্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে 'চিরকুমার সভা'র মধ্য দিয়ে চিরকৌমার্যের ব্যর্থতা দেখানোই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই রচনাটির উপভোগের জন্য এইরূপ উদ্দেশ্যের কথা আমাদের মনে রাখবার প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্র-সৃষ্ট সকল হাস্যরসাত্মক চরিত্রের মধ্যে বৈকুণ্ঠ শ্রেষ্ঠ হলেও, এ-চরিত্রটিকেও রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমায় নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয় না। তার কারণ, লেখার এবং লেখা-শোনানোর যে-দুর্বলতার উপর ভিত্তি ক'রে বৈকুণ্ঠ-চরিত্রের প্রবল হাস্যরস জমে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সে-দুর্বলতা বৈকুণ্ঠ-চরিত্রে রাখেন নি। অতখানি উপহাসের আঘাত বৈকুণ্ঠের প্রতি পরিচালিত করতে বোধহয় তাঁর বেদনা বোধ হয়েছে। বৈকুণ্ঠের পীড়ন যেন কবি নিজের পীড়ন বলেই গ্রহণ করেছেন। তাই নাটকের শেষের দিকে বৈকুণ্ঠ যখন বলছে, "আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিস। সবাই হাসে আমি কি তা জানিনে ঈশেন? ও-সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোনো দরকার নেই।" তখনই সে হাস্যরসাত্মক চরিত্রের থেকে সাধারণ, সীরিয়াস চরিত্রে পরিণত হয়েছে। তার লেখা নিয়ে সবাই হাসে, এ বিষয়ে সচেনতার অভাবই তাকে হাস্যরসাত্মক চরিত্রে পরিণত করেছিল। পূর্বাবধি এ-বিষয়ে সচেতন থাকলে সে লেখা শোনাবার জন্য কেদারের পিছন পিছন ঘুরতো না, এবং কেদারও তার এ-দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এতটা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারতো না। বৈকুণ্ঠ যখন তিনকড়িকে বলে "সে-সব খেয়াল ছেড়ে

দিয়েছি।" তখন সে আর হাসির চরিত্র নয়, সাধারণ করুণ চরিত্র মাত্র। তাই বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে বলা যায় যে, পরিপূর্ণ এবং উঁচুদরের হাসির চরিত্র হতে হতেও বৈকুণ্ঠ তা হতে পারে নি। এখানেও আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কোমলপ্রাণজনিত দুর্বলতাই আমরা দেখতে পাই। পরিপূর্ণ এবং প্রবল হাস্যরসে মণ্ডিত করবার জন্য বৈকুণ্ঠের দুর্বলতাকে যতখানি টেনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা' সম্ভব হয়নি।

'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। এর দুটি ভাগ আছে; কতকগুলি রচনা প্রবন্ধাকারে এবং অবশিষ্টাংশ নাট্যাকারে লিখিত। প্রবন্ধগুলি লেখা হয় ১৮৯২ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে, অর্থাৎ 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী'র যুগে। এ সময়ের পরিবেশের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, এটা রবীন্দ্রনাথের তীব্র ব্যঙ্গের যুগ। শশধর তর্কচূড়ামণি-প্রবর্তিত তীব্র হিন্দুয়ানির জের তখনো চলছিল। সুযোগ পেলেই এ মনোভাবকে ব্যঙ্গ করতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়েন নি। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র প্রবন্ধাংশে এই ব্যঙ্গ ছড়ানো। 'প্রত্নতত্ত্ব' (১২৯৮) প্রবন্ধে যে বিদ্রূপ করা হয়েছে, তা বস্তুতঃ 'হিং টিং ছট্'-এর গদ্য সংস্করণ মাত্র। হিন্দুয়ানির অযৌক্তিক গর্ব, পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বকে অস্বীকার করবার দিকে ঝোঁক এবং অর্থ-হীন বাক্যজাল দ্বারা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ভানকে এই দুই রচনায় রবীন্দ্রনাথ অতি তীব্র আঘাত করেছিলেন। 'ডেঞ্জে পিঁপড়ের মন্তব্যে' এ-দেশের তৎকালীন শাসকজাতির মনোভাবকে বিদ্রূপ করা হয়েছে; সে-হিসাবে এ-রচনাটিকে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ বলা যায়। 'পয়সার লাঞ্ছনা' আমাদের সমাজে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে বৈষম্য আছে এবং উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও অনুকম্পা বোধ করলেও উচ্চতর স্তরের সঙ্গে যে আত্মীয়তা দাবি করে তারই ব্যঙ্গরূপক। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সকল মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই মানবসমাজে এ-জাতীয় উচ্চনীচভেদ ও উচ্চের অহেতুক গর্বকে তিনি নানাস্থানে নানাভাবে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। 'কণিকা'য় দেখি

"কেরাসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।

হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরাসিন বলি ওঠে 'এসো মোর দাদা'॥"

ছ'টি গল্প লেখার পর, কর্তৃপক্ষের লঘুতর গল্পের ফরমাশের ফলে যখন 'হিতবাদী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তখন সুরেশ সমাজপতির নবপ্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'প্রত্নতত্ত্ব', 'লেখার নমুনা' ও 'সারবান সাহিত্য' রচনা করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার অনুমান করেছেন যে, এগুলি 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষকে কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল। 'প্রত্নতত্ত্ব' রচনাটি সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি। 'লেখার নমুনা'য় তৎকালীন অর্থহীন উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাকে এবং 'সারবান সাহিত্যে' সে-যুগের উপদেশপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ লেখার প্রাচুর্যকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। 'রসিকতার ফলাফলে' সেকালের পাঠকদের রসগ্রহণে অক্ষমতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। প্রবন্ধাংশের মধ্যে একমাত্র 'মীমাংসা' নামে লেখাটি পুরোপুরি কৌতুকরসাত্মক।

কিন্তু কয়েক বছর পরে লিখিত (১৩০০-১৩০৮) 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র নাট্যাংশে হাস্যরসই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ-সময়ে কৌতুকহাস্যের দিকে রবীন্দ্রনাথের যে প্রবল ঝোঁক হয়েছিল সেকথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি; এ-রচনাগুলিতে সে-কৌতুকপ্রবণতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্যঙ্গকৌতুক' সার্থকনামা গ্রন্থ। এর প্রবন্ধাংশে ব্যঙ্গ এবং নাট্যাংশে কৌতুকই প্রধান। 'বিনি পয়সার ভোজ' এবং 'নূতন অবতার'কে প্রকৃতপক্ষে নাট্যরূপে লিখিত বলা যায় না। কেননা, এ দুটি রচনায় এক-একটিমাত্র চরিত্রের উক্তির মধ্যেই সমস্ত কাহিনীটি ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, এ-উক্তি স্বগতোক্তি নয়, সংলাপ। কাজেই একটি চরিত্রের উক্তির মধ্য দিয়েই অপরের উক্তি প্রকাশ পেয়েছে, ফলে নাটকীয়তাও যথেষ্ট ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এভাবে একের উক্তিদ্বারা সংলাপের অবতারণা বাংলায় এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের টেক্‌নিক্। 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' ব্যঙ্গাত্মক রচনা, 'সারবান সাহিত্যে'র সঙ্গে লেখাটির বিষয়গত প্রভেদ বিশেষ নেই।

'ব্যঙ্গকৌতুকে'র অন্তর্গত 'বশীকরণ' নামে ছোট প্রহসনটির বিশেষ উল্লেখ

প্রয়োজন। 'গোড়ায় গলদ'-'শেষরক্ষা'র মতো এখানেও কৌতুককর ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে প্রেম ও মিলনের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। 'বশীকরণ' নাটকটি ছোট ; 'শেষরক্ষা' বা 'চিরকুমার সভা'র সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই এটি তুলনীয় নয়।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক নাটক-নাটিকাগুলির যে-যে বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেগুলি সংলাপের ঔজ্জ্বল্য এবং ঘটনা-সংস্থানের নিপুণতা। প্রহসন এবং কৌতুকনাট্যগুলিতে হাস্যোৎপাদনের জন্য এ-দুটি উপায়ই রবীন্দ্রনাথ প্রধানভাবে গ্রহণ করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রধানতঃই উইট্-আশ্রিত। গল্প-উপন্যাসের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের চরিত্রগুলিও নিখুঁতভাবে আঁকা সত্য, কিন্তু হাস্যরসাত্মক চরিত্ররূপে সেগুলিকে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণনা করা যায় কিনা সন্দেহ। বোধহয় একটিমাত্র চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত হাস্যাস্পদ রেখেছেন, সেটি তাঁর 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ক্ষীরো। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' কাব্যনাট্য হলেও এর উজ্জ্বল হাস্যময় সংলাপ এবং নিখুঁত চরিত্রচিত্রণ এটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক রচনারূপে চিহ্নিত করেছে। বস্তুতঃ 'ক্ষীরো'র মত এরূপ একটি নিটোল হাস্যরসাশ্রিত চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

যদিও কৌতুক ও ব্যঙ্গ রবীন্দ্রনাথের গভীর ও গম্ভীর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি সকল জাতীয় রচনাতেই ছড়ানো, তবু ১৩৩২-এ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে 'চিরকুমার সভা'রূপে এবং 'গোড়ায় গলদ'কে 'শেষরক্ষা'রূপে নবরূপায়িত করার পর রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি হাস্যরসাত্মক রচনায় হাত দিলেন একেবারে ১৩৪৩ সালে, আবোল-তাবোল জাতীয় পদ্যগ্রন্থ 'খাপছাড়া' রচনা ক'রে।

'খাপছাড়া' নন্‌সেন্স বা আবোল-তাবোল জাতীয় পদ্যসমষ্টি হলেও এর অনেক কবিতায় প্রচুর ব্যঙ্গ আছে এবং এ-ছড়াগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনীষা এবং ব্যক্তিত্বকে সর্বত্রই প্রচ্ছন্ন করতে পেরেছেন এমন কথাও বলা যায় না। নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবার দিকে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ঝোঁক ছিল। এখানেও সেরূপ ব্যঙ্গের দেখা পাওয়া যায়। যেমন,

"দিন চলে না যে, নিলেমে চড়েছে
খাট-টিপাই ;
ব্যবসা ধরেছি গল্পেরে করা
নাট্টি-fy ।
ক্রিটিক মহল করেছি ঠাণ্ডা,
মুর্গি এবং মুর্গি-আণ্ডা
খেয়ে করে শেষ, আমি হাড় দু'টি
চারটি পাই—
ভোজন-ওজনে লেখা ক'রে দেয়
Certify ।"

খাপছাড়া জাতীয় অন্যান্য যে-সব ছড়া রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তার মধ্যেও নিজেকে নিয়ে ঠাট্টার পরিচয় পাওয়া যায়,

"মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল—
ধান পাকাবার মাসে ফোটে বেলফুল।
হঠাৎ আনাড়ি কবি তুলি হাতে আঁকে ছবি,
অকারণে কাঁচা কাজে পেকে যায় চুল।"

'খাপছাড়া'র অধিকাংশ ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ব্যঙ্গের ঝোঁকই বেশি স্পষ্ট।

"মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক'।"
"খ্যাতি আছে সুন্দরী বলে তার,
ত্রুটি ঘটে নুন দিতে ঝোলে তার ;

চিনি কম পড়ে বটে পায়েসে
স্বামী তবু চোখ বুজে খায় সে—
যা পায় তাহাই মুখে তোলে তার,
দোষ দিতে মুখ নাহি খোলে তার।"

"সর্দিকে সোজাসুজি
সর্দি বলেই বুঝি
মেডিকেল বিজ্ঞান না শিখে।
ডাক্তার দেয় শিষ,
টাকা নিয়ে পঁয়ত্রিশ
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলে কাশিকে।"

"লটারিতে পেল পীতু
হাজার পঁচাত্তর,
জীবনী লেখার লোক
জুটিল সে মাত্তর।
যখনি পড়িল চোখে
চেহারাটা চেক্‌টার
'আমি পিসে' কহে এসে
ড্রেইন্‌ইন্‌স্‌পেকটার।
গুরু-ট্রেনিঙের এক
পিলেওয়ালা ছাত্তর
অযাচিত এল তার
কন্যার পাত্তর।"

এগুলিকে কোনোমতে নন্‌সেন্স বা নিরর্থক ছড়ার দলে ফেলা যায় না। 'খাপছাড়া'য় রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি উৎকৃষ্ট ননসেন্স বা খাপছাড়া পদ্যও লিখেছেন সত্য ('ক্ষান্তবুড়ির দিদি শাশুড়ির', 'অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি', 'ভোলানাথ লিখেছিল তিন-চারে নব্বই'), কিন্তু অধিকাংশ ছড়ায় একটি সুসংগত ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে। আপাত-অর্থহীন আবোল-তাবোল জাতীয় রচনায় লেখকের পক্ষে নিজেকে যতখানি প্রচ্ছন্ন

করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বকে ততখানি আড়ালে রাখা খুব কম স্থানেই সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মসচেতন স্রষ্টা ও শিল্পীর পক্ষে সেরূপ ভাবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা সহজ নয়। এ জন্যই 'খাপছাড়া'র মুখবন্ধে তিনি বলেছেন,

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।"

'খাপছাড়া'র ছড়াগুলিতে, লেখার মতো একটা কথা, একটা বক্তব্য, ছন্দ-মিলের আড়াল থেকে উঁকি মারে। এগুলিকে ঠিক সুকুমার রায়ের লেখার মতো আজগুবি খেয়াল-রসের রচনা বলে মনে করা যায় না।

'খাপছাড়া'য় নিজের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাকে সচেতনভাবে প্রচ্ছন্ন করবার প্রয়াস যে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ অনবহিত ছিলেন না। এই জন্যই 'ছড়া' গ্রন্থের অন্তর্গত 'গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি' ছড়াটি 'অবচেতনার অবদান' নামে ১৩৪৬-এ 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হবার সময় মুখবন্ধস্বরূপ কবি লিখেছিলেন, "অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।" এ-উক্তিতে তখনকার অতি-আধুনিক কবিতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গই প্রধান হলেও, "সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য", একথাও কবি উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দুঃসাধ্য বলে বর্ণনা করলেও, আপাত-অসংলগ্ন বচনের দ্বারা যে ভালো আবোল-তাবোল ছড়া রচিত হতে পারে না এমন নয়। সুকুমার রায়ের

"রামখটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্,
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ,

আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার,
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত,
হ্যাংলা হাতী চ্যাংদোলা
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।”

প্রভৃতি ছড়া অসংলগ্ন বচনে গাঁথা সার্থক ননসেন্স ছড়ার দৃষ্টান্ত। Lewis Carroll-এর *Jaberwock*-কেও এই দলে গণ্য করা যায়। অসংলগ্ন কথার ছবি দিয়েও যে রসসৃষ্টি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই ‘ছেলেভুলানো ছড়া’য় তা দেখিয়েছেন। উচ্চস্তরের আবোল-তাবোল জাতীয় ছড়ায় বচনের অসংলগ্নতার মধ্য দিয়েও একটি রস বা অর্থ ফুটে ওঠা অসম্ভব নয়।

‘খাপছাড়া’র অধিকাংশ ছড়ার ধরণটা অনেকটা ‘লিমেরিক’ জাতীয়। এমনকি, বিভিন্ন ছড়ার ছন্দবৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেগুলি প’ড়ে লিমেরিকের কথাই মনে পড়ে।

“কালুর খাবার শখ সব চেয়ে পিষ্টকে।
গৃহিণী গড়েছে যেন চিনি মেখে ইষ্টকে।
পুড়ে সে হয়েছে কালো,
মুখে কালু বলে ‘ভালো’
মনে মনে খোঁটা দেয় দগ্ধ অদৃষ্টকে।
কলিক্-ব্যথায় ডাকে ক্রুসে-বেঁধা খ্রীস্টকে।”

“নাম তার ভেলুরাম ধুনিচাঁদ শিরথ,
ফাটা এক তম্বুরা কিনেছে সে নিরর্থ।
সুরবোধ সাধনায়
ধুরপদে বাধা নাই,
পাড়ার লোকেরা তাই হারিয়েছে ধীরত্ব —
অতি ভালোমানুষেরও বুকে জাগে বীরত্ব॥”

এত স্পষ্টরূপে না হলেও অন্যান্য কতকগুলি ছড়াতেও লিমেরিকের গঠনের যেন কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

অনতিপ্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ এবং বক্তব্যের সুসংগতির দরুণ এসব ছড়াকে খাঁটি আবোল-তাবোল-জাতীয় বলা না গেলেও, এগুলির মধ্যে প্রচুর হাসি আছে। এ-কৌতুক আরো বেশি জমেছে মিলের আকস্মিকতায়। 'আষাঢ়ে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "এই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের ন্যায় হাস্যোদ্দীপনায় পূর্ণ।" রবীন্দ্রনাথের ছড়াগুলি সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। এগুলির অদ্ভুত আকস্মিক অপ্রত্যাশিত অনুপ্রাস ও মিলের মজাটা কেবল পাঠকই উপভোগ করেন না, কবিও করেন। এ যেন খেলা, এবং এই খেলার মজায় কৌতুক আপনিই জমে ওঠে। উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে 'খাট-টিপাই' ও 'নাটি-fy'র মিল একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এরূপ আরো কয়েকটি উদ্ধৃত করা যায়।

"আনবে কট্‌কি জুতো,
মট্‌কিতে ঘি এনো
জলপাইগুঁড়ি থেকে
এনো কই জিয়োনো—
চিনেবাজারের থেকে
এনো তো করম্‌চা,
কাঁকড়ার ডিম চাই,
চাই যে গরম চা।"

"দুজনে না জানে এই বউ কার
মিছেমিছি ভাড়া বাড়ে নৌকার।"

"বরের বাপের বাড়ি
যেতেছে বৈবাহিক,
সাথে সাথে ভাঁড় হাতে
চলেছে দই-বাহিক।"

১৩৪৪ সালে প্রকাশিত 'ছড়ার ছবি' বইটিতে রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া ছড়ার ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। এর ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, "ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরাও ছন্দ।··· এর ভঙ্গীতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা

চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমোর রাখে না।" 'ছড়ার ছবি'র কবিতাগুলি এই হালকা চালে লেখা — কিন্তু এর কথাগুলি হালকা নয়। এটি হাসির রচনার বই নয়, কিন্তু এর রচনাভঙ্গি একটি মৃদু কৌতুকের রশ্মি বিকীরণ করে। এর মধ্যে যে কোথাও হাসির কথা নেই তা নয়, কিন্তু সে-কৌতুক কোথাও প্রধান হয়ে ওঠে নি, শুধু রচনাগুলির ভঙ্গিকে লঘুতায় আকর্ষণীয় করে তুলেছে। স্মৃতিতে কল্পনায় বিজড়িত ছড়ায় আঁকা এ-ছবিগুলি রবীন্দ্রকাব্যে এক নূতন রস উপস্থিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী হাসির বই 'প্রহাসিনী' ১৩৪৫-এ প্রকাশিত হয়। প্রবল কৌতুকবোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিরদিনই ছিল; প্রাচীন বয়সে এ-দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'প্রহাসিনী', 'সে', 'গল্পসল্প', 'ছড়া' প্রভৃতি বই। 'প্রহাসিনী'র কবিতাগুলি কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা। 'রঙ্গ', 'ভোজনবীর' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা কৌতুক-প্রধান। কিন্তু বইটির অধিকাংশ কবিতাকে হাসির বলে গণ্য করা যায় না। কৌতুকের আবরণে রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সীরিয়াস' কথাই বেশি বলেছেন। প্রথম কবিতা 'আধুনিকা'তে কবি বলছেন,

"তোমাদের মুখে থাক্ হাস্যের রোশনাই —
কিছু সীরিয়াস কথা বলি তবু, দোষ নাই।"

এই 'সীরিয়াস কথা' কৌতুকময় ভঙ্গির অন্তরালে 'প্রহাসিনী'র অধিকাংশ কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে অনেকগুলিই আবার পদ্যাকারে চিঠি। কৌতুকাশ্রিত পদ্যে চিঠি লেখার দিকে রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ঝোঁক ছিল। প্রথম জীবনের 'নাসিক হইতে খুড়োর পত্র', 'মানসী'-'সোনার তরী'র যুগের পদ্য-পত্রাবলী, 'পূরবী'র 'শিলঙের চিঠি' এবং 'প্রহাসিনী'র কৌতুক-পদ্যগুলিতে এই ঝোঁকের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে এ সব পদ্য-পত্রে কবি মিল নিয়ে খেলা করবার যে সুযোগ পেতেন, সে সুযোগ তিনি কখনো ছাড়েন নি।

"শামলা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব
একা পড়ে মোর চিত্ত করে ছটফট।"

"শ্রাবণে ডেপুটিপনা এতো কভু নয় সনা-
তন প্রথা এ যে অনাসৃষ্টি অনাচার।"
"তবুও এ পক্ককেশ আর লম্বা দাঁড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় করোনি দুর্বাশা কি যম ভ্রমে।"
"সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক,…"

প্রভৃতি পংক্তিতে এই মিলের খেলার কৌতুক ছড়ানো। 'প্রহাসিনী'র মুখবন্ধ-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু,
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।…
এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা থেকে শেষ জীবনের রচনা পর্যন্ত তাঁর গভীর ভাব, চিন্তা ও মনীষামণ্ডিত লেখাগুলির পাশাপাশি — কোথাও তাদের সঙ্গে মিশে — কৌতুকের শুভ্রোজ্জ্বল ধারা কখনো মৃদু কখনো উচ্ছ্বসিত বেগে প্রবাহিত হয়েছে। তাতে বোঝা যায়, অন্তরে অন্তরে রবীন্দ্রনাথের তারুণ্য চিরদিন অমলিন ছিল। 'প্রহাসিনী'র কবিতাগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, সীরিয়াস কথা আছে, পশ্চাদ্বর্তী জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির বেদনাও দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু সবই কৌতুকহাস্যের স্পর্শে মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। পদ্যে লিখিত পত্রগুলির বক্তব্য অনেক সময়ই গভীর, কিন্তু তার বলার ভঙ্গিটি কৌতুকের। 'প্রহাসিনী'র অন্যান্য অনেক কবিতা সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। 'সুসীম চা-চক্র' শান্তিনিকেতনে চা-বৈঠক প্রবর্তনার একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত। এই চক্রের উদ্বোধনকালে

কবি যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে এই চক্র-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের শেষে রবীন্দ্রনাথের এই ছড়াটি গীত হয়ে সহজেই যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে চা পানের লঘু মেজাজ এনে দিতে পেরেছিল তা আমরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থেকেও অনুমান করতে পারি। চা-চক্রের আমন্ত্রণে কবি কাউকেই বাদ দেন নি —

"এস পুঁথিপরিচারক
তদ্ধিতকারক
তারক তুমি কাণ্ডারী
এস গণিত-ধুরন্ধর
কাব্য-পুরন্দর
ভূ-বিবরণ ভাণ্ডারী।
এস বিশ্বভার-নত
শুষ্ক-রুটিনপথ
মরুপরিচারণ ক্লান্ত !
এস হিসাব-পত্তর ত্রস্ত
তহবিল-মিল-ভুলগ্রস্ত
লোচনপ্রান্ত
ছল ছল হে !"

'প্রহাসিনী'র অনেক কবিতায় যথেষ্ট ব্যঙ্গ আছে, অনেক কবিতায় কৌতুকই বেশি, কিন্তু অধিকাংশ কবিতার অন্তরালেই একটি সীরিয়াস বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। এ-কবিতাগুলি ঠিক হাস্যরসপ্রধান নয়, এদের বাইরেটাই শুধু হাসির।

"সার্থক হতে চাও জীবনে,
কী শহরে, কী বনে
পাঠ লহ প্রয়োজনসিদ্ধের
বিরক্ত করবার অদম্য বিদ্যের—
নিত্য কানের কাছে ভন্‌ভন্ ভন্‌ভন্
লুব্ধের অপ্রতিহত অবলম্বন।" (মাছিতত্ত্ব)।

"ভালো বা খারাপ লাগা
পদে পদে উলোটা-পালোটা—
কভু সাদা কালো হয়,
কখনো বা সাদাই কালোটা,
মন দিয়ে ভাবো যদ্যপি
জানিবে এ খাঁটি ফিলজফি।"

(রেলেটিভিটি)।

১৩৪৮-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'ছড়া' বইটিতে রবীন্দ্রনাথ আবোল-তাবোল জাতীয় খেয়ালরসের ছড়ায় অপেক্ষাকৃত সাফল্য লাভ করেছিলেন। এই বইটির অবতারণার মধ্যেই খাঁটি খেয়ালরসের কবিতার লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে।

"অলস মনের আকাশেতে প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়্ঘড়ানি যে-মুহূর্তে থামে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন টুকরো কথার ঝাঁক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে দিনের বেলার গর্ত —
কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ ···
বাইরে থেকে দেখি একটা নিয়ম-ঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী কেউ তা নাহি জানে।
খেয়াল স্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে—
ওরা কী-যে দেয় না জবাব, কোথা থেকে আসছে।
আছে ওরা এই তো জানি, বাকিটা সব আঁধার —
চলছে খেলা একের সঙ্গে আরেকটাকে বাঁধার।
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি, বাঁধন ছিড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল শূন্যেতে দিক্‌হারা।"

'ছড়া'র ছড়াগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যঙ্গ ও কৌতুক দুই-ই আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে একটি খেয়াল-খুশির ভঙ্গি এগুলিকে সাধারণ ব্যঙ্গাত্মক ছড়ার থেকে পৃথক করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলীর ফাঁকে ফাঁকে ব্যঙ্গকৌতুকাশ্রিত কবিতা, নাটক ছড়া ও গল্প ছড়ানো। এগুলির মধ্যে উচ্চ ও মৃদুহাস্য সবই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিবেশন করেছেন। কৌতুকপ্রবণতা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবজ ছিল। এই কৌতুক প্রথম জীবনে ব্যঙ্গাস্ত্ররূপে প্রয়োগ করে তিনি সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর প্রবল হাস্যরসবোধ কখনো বিদ্রূপে, কখনো নিছক কৌতুকে, কখনো গভীর কথার আবরণরূপে, কখনো বা খেয়াল-খুশির আপাত-অর্থহীনতায় প্রকাশিত হয়েছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার দিকেই শেষ জীবনে কবির ঝোঁক এসেছিল। পদ্যাকারে এ-জাতীয় রচনাগুলির আমরা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছি। খেয়াল-রস-প্রধান দু'খানি গদ্যগ্রন্থও রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে রচনা করেছিলেন —'সে' এবং 'গল্পসল্প'।

১৩৪৪-এ প্রকাশিত 'সে' বইখানি খেয়াল-খুশির রসে ভরা গল্পের ঝুড়ি। এর মধ্যে কবি কথক, পুপেদিদি শ্রোতা, আর 'সে' হচ্ছে জগতের যাবতীয় গল্পের উপাদানস্বরূপ সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি, যাকে নিয়ে পৃথিবীশুদ্ধ লোক চিরদিন গল্প বানিয়ে চলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখেন নি, গল্প বলেছেন ; আর গল্পগুলি এমনই আজগুবি আর অসম্ভব যে, পুপুদিদির চোখ দুটি ক্রমশই বিস্ফারিত হলেও সন্দেহ হয় এগুলি অসম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে আবার নেহাৎ চেনা সত্যের ঘরে এসে পৌঁছে যাচ্ছে।

এই গল্পধারার "মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যই একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হুঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই।···আমাদের এই 'সে' পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে ; এমনতরো কোটিকে গোটিক মেলে। মিথ্যে কথা বলাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা।" আসলে এ-প্রতিভাটা 'সে'-র স্রষ্টিকর্তার কিনা বোঝা শক্ত। বানানো কথাগুলিকে 'সে'-র ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মিথ্যেগুলিও নিতান্ত সোজা মিথ্যে নয়।

"পুপেদিদি এতখানি চোখ করে বললে, সত্যি কি দাদামশায়।
আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি — গল্প।"

এই 'সে' মানুষটির অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্তিকলাপের যদিও কোনোই সীমা নেই, তবু তার আসল রূপটি যে একেবারেই চেনা যায় না এমন নয়। "ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে তারা জানে লোকটা সুপুরুষ, চেহারা সুগম্ভীর। রাত্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীর্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো মস্‌করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।"

শিশুর স্বভাবের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার যে আশ্চর্য ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের ছিল, 'শিশু'তে, 'শিশু ভোলানাথে' যার পরিচয় ছড়ানো, 'সে' বইটি তার আর একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু শিশুর মনের মতন করে বলা হলেও, এবং গল্পগুলি শিশুভোলানো হলেও, সেই গল্পের আড়ালের কথাগুলি সব সময় শিশুসুলভ সরল নয়। এই জন্যে 'সে'-র জবানিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একটু ধমক দিতেও ছাড়েন নি,

"ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ কি রকম গম্ভীর? বোধহয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী করে; তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।"

বুদ্ধির মাত্রাটা কমানো, অর্থাৎ বুদ্ধিকে প্রচ্ছন্ন ক'রে আপাত-অর্থহীন আবোল তাবোল লেখা যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ ছিলনা, 'খাপছাড়া' প্রসঙ্গে আমরা সে কথা উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ যে সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, উপরের উদ্ধৃতিতে তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল লেজ-কাটা রোঁয়া-চাঁছা শেয়ালের গল্পই নয়, গেছো বাবার গল্প, বাঘের গল্প,

বা যে গল্পই আমরা পড়ি না কেন, কোথাও ব্যঙ্গ অল্প নয়। কেবল ব্যঙ্গ বললেই যথেষ্ট হয় না, এর অনেকগুলি রচনাই উৎকৃষ্ট স্যাটায়ারের গুণান্বিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মধ্যাহ্নকালে, যখন কোমলস্নিগ্ধ আবেগের প্রাবল্য তাঁর সকল রচনাকে মাধুর্যে ও প্রেমে মণ্ডিত করে ছিল, তখন হাস্য-রসাত্মক চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি সেরূপ চরিত্রের বেদনাটুকু বেশিক্ষণ ধ'রে রাখতে পারেন নি; আর, স্যাটায়ার রচনা করতে গিয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে রোমান্স-এ পরিণত করেছেন। এর দৃষ্টান্ত 'বৈকুণ্ঠ', এর দৃষ্টান্ত 'তাসের দেশ'। এ-বিষয়ে আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু, শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের আবেগ স্তিমিত এবং মনীষা প্রবলরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে, এ-সময়ের রচনায় ব্যক্তিগত আবেগ অপেক্ষা নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টি বেশি পরিস্ফুট পেয়েছে, subjectiveএর পরিবর্তে objective দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। এ-কারণে শেষজীবনের রচনায় রবীন্দ্রনাথ উঁচুদরের এবং নিটোল স্যাটায়ার লিখতে সমর্থ হয়েছেন, ব্যক্তিগত আবেগের প্রভাবে এবং রোমান্টিকতার প্রতি আকর্ষণে সেগুলি খণ্ডিত হয়নি। এই স্যাটায়ারগুলি ছোট, স্যাটায়ারের প্রচলিত দীর্ঘ ও বিস্তারিত চেহারা এর নেই। বোধহয় সেইজন্যই স্যাটায়ারিস্ট্-রূপে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অনেক সময় চোখ এড়িয়ে যায়। এই বিদ্রূপরচনাগুলির কয়েকটি 'লিপিকা'য় স্থান পেয়েছে, আর কয়েকটি 'সে' বইটিতে ছড়িয়ে আছে। 'লিপিকা'য় মানব-জীবন ও মানবহৃদয়ের বহু গভীর সত্যই রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এমন অন্ততঃ তিনটি রচনার দেখা পাওয়া যায়, যা স্বল্পাকারে নিখুঁত স্যাটায়ারের আদর্শস্বরূপ। 'লিপিকা'র রচনাগুলি প্রায় সবই রূপকাশ্রিত। এই রূপকের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কবি মানবজীবনের বহু সত্যকে গভীর ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে তেমনি আমাদের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে তাঁর দূরপ্রসারী চিন্তাকে স্যাটায়াররূপে উপস্থিত করেছেন। এই তিনটি রূপক রচনার নাম 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত', ও 'তোতাকাহিনী'। এগুলির সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন নিটোল স্যাটায়ার বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'সে'র অন্তর্গত অনুরূপ ব্যঙ্গ-রচনার মধ্যে শেয়ালের গল্প, গেছোবাবার গল্প, বাঘের গল্প প্রভৃতি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাই যদিও 'সে' বইখানি ছোট্ট পুপুদিদির কাছে বলা গল্পের সমষ্টি, আর তার মধ্যে কৌতুকেরও অপ্রাচুর্য নেই, তবু এ-বইখানি ছোটদের চেয়ে বড়দেরই বেশি উপভোগ্য। কিন্তু 'সে' বইটিতে যে-ছড়াগুলি ছড়িয়ে আছে সেগুলি উৎকৃষ্ট খেয়ালরসের রচনা এবং শিশুদের পূর্ণ উপভোগের যোগ্য।

পরবর্তী কৌতুকাশ্রিত গদ্যগ্রন্থ 'গল্পসল্প' রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ বৎসরের রচনা। এটি স্মৃতিতে মাখা, কৌতুকে জড়িত, অপরূপ গল্পের সমষ্টি। স্মৃতিচিত্রময় এ-বইটিকে সমসাময়িক পদ্যগ্রন্থ 'ছড়ার'ই গদ্যরূপ বলে গণ্য করা যায়। এখানেও রবীন্দ্রনাথ কথক, শ্রোতা পুপুদিদিরই মতো ছোট্ট একটি মেয়ে — কুসমি।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটা বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। তা এই যে, রবীন্দ্রনাথ যখনই নিজের কথা বলেছেন, তখনই প্রচুর কৌতুকের আবরণে নিজের অহমিকাকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। 'জীবনস্মৃতি' এর অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'ছড়ার ছবি', 'ছড়া', 'সে', 'গল্পসল্প', সর্বত্রই দেখি, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। এর দু'একটি উদাহরণ আগেই উদ্ধৃত করেছি। নিজের কথা নিজে বলতে গেলেই 'অহং'-এর গর্ব অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে পূর্বতন বহু আত্মজীবনীতে এ-অহমিকার প্রাবল্য দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের সুগভীর বিনয় ও প্রবল কৌতুকবোধ তাঁর রচনাকে সেই অহমিকার প্রাধান্য থেকে রক্ষা করেছিল।

'গল্পসল্প'ও 'সে'র মতো অজস্র মজার ছড়ায় ভরা। এ দু'খানি বই রবীন্দ্রনাথের সকল গদ্যগ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র। স্মৃতিচিত্রে পূর্ণ হলেও আজগুবির রসে মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে গল্পাকারে পরিবেশন করেছে। এগুলির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা', 'আপন কথা'র বরঞ্চ কিছুটা মিল আছে। অবনীন্দ্রনাথের আজগুবি উদ্ভট কল্পনার খেলা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ না হলেও এখানে যেন তার কিছুটা ছায়া পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ হাস্যরসিক লেখক না হলেও, পুরোপুরি ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক ছড়া-গল্প-নাটক তিনি কম লেখেন নি। সহজ ও স্বাভাবিক

ভাবেই তিনি প্রবল হাস্যকৌতুকবোধের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর হাস্যরসাশ্রিত রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যে অতি উচ্চ কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু, তবু একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হাস্যরসে রবীন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব তাঁর পরিপূর্ণ হাস্যরসাত্মক রচনাগুলির মধ্যে নিবদ্ধ নয়। তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিচিত্র সব কিছুতেই অতি সহজভাবে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। গভীর ও গম্ভীররসাত্মক বিষয়কে হাস্যরসের স্পর্শে উপভোগ্য ক'রে তোলার প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্রও উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম স্বভাবতঃই হাস্যরসপ্রবণ লেখক ছিলেন না বলে, তাঁর উপন্যাসের হাস্যরসাত্মক চরিত্রগুলি কিছুটা দুর্বল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের হাসির চরিত্রগুলি নিখুঁত। তার কারণ, তাঁর কবিপ্রতিভা ও মনীষার সঙ্গে প্রবল কৌতুকবোধ স্বাভাবিকভাবেই মিশে ছিলে। গল্প-উপন্যাস-নাটকে কেবলমাত্র রিলিফ বা রসবৈচিত্র্যের প্রয়োজনেই জোর ক'রে হাসির চরিত্র, মজার বর্ণনা বা কৌতুককর রচনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ আমদানি করেন নি। তাঁর মনের ভিতরে যে বিচিত্র রসসমন্বয় ঘটেছিল, রচনাতে তা স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

হাস্যরসে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব, আমার মনে হয়, 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'প্রহসন' বা পুরোপুরি হাসির রচনাগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কৃতিত্ব এই যে, তিনি কেবল গম্ভীর নয়, অতি গভীর-রসের রচনাকেও হাসির ছোঁয়ায় অসামান্য করেছেন। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, আবেগপ্রধান উঁচুদরের কবিতাও তিনি লঘুতার স্পর্শে আরো অন্তরঙ্গ, আরো মর্মস্পর্শী ক'রে তুলেছেন। হাস্যরস চিরদিনই সকল রসের থেকে আলাদা হয়ে আছে। রসের দরবারে তার স্থান আছে বটে, কিন্তু সে স্থান একটু দূরে। রসের মধ্যে সে যেন অন্ত্যজ। অন্যান্য রসের একঘেয়েমিকে ভেঙে দিতে তার ডাক পড়ে, অথবা পুরোপুরি আপন এলাকায় আবদ্ধ থেকে তাকে লোক-মনোরঞ্জনের কাজ চালাতে হয়। একমাত্র করুণ রসের সঙ্গেই তার প্রচ্ছন্ন অন্তরঙ্গতা। এতকাল গভীর ও গম্ভীর রসের মজলিশে যখনি তার ডাক পড়েছে, তখনি তার

কাজটুকু সেরে আবার তাকে গা-ঢাকা দিতে হয়েছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপের সে সহায়, এমন কি কখনো কখনো গভীর চিন্তাকেও নিজের ছদ্মবেশ পরিয়ে দিতে তার ডাক পড়ে বটে, কিন্তু প্রেমাবেগের গভীর কবিতা, বাৎসল্যের অতল রহস্য, তাও যে হাসির সঙ্গে মিলে মিশে বেদনায়, মর্মস্পর্শিতায়, অন্তরঙ্গতায়, এমন অভূতপূর্ব রূপ নিতে পারে, তা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ দেখিয়ে দেন নি। লঘু প্রেমের কবিতা বিদেশী সাহিত্যে অনেক আছে ; কিন্তু তার অধিকাংশ নিতান্তই লঘু। একাধারে লঘু অথচ গভীর, হাসির অথচ বেদনাময়, এমন প্রেমের কবিতা জগতে কমই সৃষ্টি হয়েছে। 'ক্ষণিকা' বইটিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কৃতিত্বে লঘুতা এবং গভীরতাকে একেবারে ওতপ্রোত করে মিশিয়ে দিয়ে হাস্যরসকে শৃঙ্গার করুণ ও শান্তরসের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দিতে সমর্থ হলেন। হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়ে সুগভীর প্রেমবেদনাকে প্রকাশ করার যে শিল্পকৌশল রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা'য় ব্যবহার করলেন, বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব এবং বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

"গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে,
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমন ক'রে?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই—
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই সখী
নিজের কথাটাই।"

ঐহিক প্রেমমোহের জগৎ থেকে ভগবৎপ্রেম ও উপলব্ধির অন্যলোকে উত্তরণের সময় পূর্বতন জীবনের বিচ্ছেদ-বেদনা কবির মনে যে গভীর বিষাদের ছায়াপাত করেছিল, তাকে তিনি কৌতুকের ছলনায় লঘু করতে চেষ্টা করেছেন ব'লেই, এ-বেদনা আরো বেশি ক'রে আমাদের অভিভূত করে।

"ভাবছ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার—
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার।
আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করেই বলি—
আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে আসব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমাচাঁদ আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায় —
এরাও তো নয় যাবার।
সহস্রবার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।" (বিদায়-রীতি)।

ভাবলোকের এই উত্তরণ-বেদনা ছাড়া প্রেমের আবেগকেও রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' বইটিতে হাসির ছদ্মবেশে উপস্থিত করেছেন।

"বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে
ভাগ্য নামে অতি বর্ষাসম!
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়োই আনে শেষাশেষি,
জান তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।" (যুগল)।

'ক্ষণিকা'য় হাস্যরসের এই আশ্চর্য অভিনব ব্যবহার ছাড়াও এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' প্রমুখ কৌতুক-রসাশ্রিত গভীর কবিতাগুলি এবং 'শিশু' গ্রন্থখানির উল্লেখও প্রয়োজন। অবশ্য বড়দের চোখে শিশু ও তার আচরণ, হাবভাব, চালচলন সবই কৌতুকপ্রদ। সেজন্য শিশুপাঠ্য কবিতায় হাস্যরস

স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ‘শিশু’ বইটির সব কবিতাই শিশুপাঠ্য বা শিশুর উপভোগ্য নয়। শিশুকে অবলম্বন ক’রে গভীর বাৎসল্যে সিক্ত কবিতাগুলির মধ্যেও কৌতুকের অভাব নেই।

“মিষ্টি তুমি ভালোবাস
তাই কি ঘরে পরে
লোভী বলে তোমায় নিন্দে করে।
ছি ছি হবে কী।
তোমায় যারা ভালোবাসে
তারা তবে কী।” (অপযশ)।

“একজনেতে নাম রাখবে
কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
ভারি বিষম শাসন এ।
নিজের মনের মতো সবাই
করুন কেন নামকরণ,
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার
খুড়ো ডাকুন রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সঙস্কৃত নামটা ওই।
এতে কারো দাম বাড়ে না
অভিধানের দামটা বই।…” (পরিচয়)।

এসব কবিতার কৌতুক ছোটদের উপভোগ্য নয়।

কেবল কাব্যে নয়, প্রবন্ধ এবং সমালোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে এবং বক্তব্যের গভীরতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না ক’রে হাস্যকৌতুকের অবতারণা করতে সমর্থ হয়েছেন। এ-এক আশ্চর্য কৃতিত্ব। ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ ও সমালোচনা বাংলায় অনেক হয়েছে, কিন্তু অতি গভীর কথাকেও হাসি-কৌতুকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার যে আশ্চর্য কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পেল, তা কেবল রবীন্দ্র-পূর্ব নয়, রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যেও অতি

বিরল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'লোকসাহিত্যে'র অন্তর্গত 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যায়। এটি ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা নয়, একে সমালোচনারূপে নূতন সৃষ্টির পর্যায়ে ফেলা যায়। সমালোচকের কাজ সাহিত্যের গূঢ় এবং অন্তর্নিহিত রস সাধারণের গোচরে আনা। যেহেতু ছেলেভুলানো ছড়াগুলি কৌতুকময়, সেহেতু সেগুলির প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনাভঙ্গিকেই কৌতুকে ভরে দিলেন। ফলে অতি সহজেই তিনি সমালোচনার উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হলেন। 'পঞ্চভূত'-এর রচনাগুলিতেও এরূপ কৌতুকময় ভঙ্গিতে গভীর আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের রচনা হাস্যরসে দুর্বল। এ অভিমতের ভিত্তি এই যে, রবীন্দ্রনাথ অনেক হাস্যরসাশ্রিত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সত্য, কিন্তু 'কমলাকান্ত' বা 'নিমচাঁদে'র মতো হাস্যরসাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি। আবোল-তাবোল বা খাপছাড়া-জাতীয় ছড়াগল্পেও তাঁর কৃতিত্ব সুকুমার রায়ের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এ-সব বিষয় আমরা কিছু কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু হাস্যরস-স্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব, আমার মনে হয়, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো বিশেষ ধরণের হাসির রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে বিচার করা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর হাস্যরস সমগ্রভাবে বিচার্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হয়েও কবি কখনো তাঁর মনের ভারসাম্য হারান নি। ফলে, তিনি নিজের কৃতিত্বকে কৌতুকে লঘু করতে পেরেছেন, এবং মতামতের দুরুত্তর ব্যবধান সত্ত্বেও অপরের গুণের মর্যাদা দিতে পেরেছেন। প্রবল হাস্যরসবোধ অতুলনীয় উইট-এর সঙ্গে মিশে তাঁর কৌতুকময়, ব্যঙ্গাত্মক, গম্ভীর ও গভীর সকল রচনাকেই মনোহর ও সমুজ্জ্বল করেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি হাস্যরসের কোনো বিশেষ বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে নাও পেরে থাকেন, তবু তাঁর সমগ্র রচনাবলী-ব্যাপ্ত হাস্য-কৌতুক-ব্যঙ্গ প্রভৃতির বিচিত্র প্রকাশ তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টারূপে চিহ্নিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হাস্যরসিক লেখক নন সত্য, কিন্তু তাঁর সকল রচনাই হাস্যের আলোক বিচ্ছুরণ করে। এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের অসামান্যতা।

৭

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক প্রায় সকল লেখকই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ এমন অনেক খ্যাতনামা লেখকও রবীন্দ্রপ্রভাব এড়াতে পারেন নি। সমসাময়িক অপ্রধান বা মাইনর লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই, কেবল কবিতায় নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে নূতন আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক বা রবীন্দ্রোত্তর যুগে সে-আদর্শ অনুসৃত হয়েছে বলেই হাস্যরসের ক্ষেত্রেও এ-যুগে পরিচ্ছন্নতা ও প্রাচুর্য দেখতে পাই। রবীন্দ্রপূর্ব যুগের রঙ্গব্যঙ্গ ও হাস্য-কৌতুকের আমরা বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের ব্যঙ্গাত্মক ও হাসির রচনার সঙ্গে সেগুলির তুলনা করলেই প্রভেদটি পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রপূর্বযুগে কয়েকজন উঁচুদরের হাসির লেখকের রচনার আমরা সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু এ যুগের সাহিত্যে দেখতে পাই, হাস্যরস যে গম্ভীর ও গভীর বিষয়কে সমুজ্জ্বল করে, এ কথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। তাই আধুনিক কালের সকল লেখকের রচনাতেই অল্পবিস্তর হাসি-কৌতুকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য উঁচুদরের হাস্যরসিক লেখক সকল যুগেই অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কৌতুকাশ্রিত রচনার যে প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে, তাতে পূর্বযুগের তুলনায় এ-যুগে হাস্যরসের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বেশি ক'রে উপলব্ধ হয়েছে, এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক।

বেণোয়ারীলাল গোস্বামী (১৮৬০—১৯৩৮) প্রথমে 'নব্যভারত' ও পরে 'সাহিত্য' পত্রিকায় গম্ভীর প্রবন্ধাদি লিখে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও ইনি লিখতেন। এঁর প্রথম বই 'খিচুড়ী' প্রকাশিত হয় ১৯০১ (১৩০৮) সালে। এটি নামযুক্ত ও নামহীন কতকগুলি হাসির কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি ইংরেজী শব্দে ভরা এবং

কৌতুকাশ্রিত। এ-রচনাগুলির অধিকাংশই তৎকালীন সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে লিখিত। এগুলির মধ্যে সেকালের সাহিত্য-আসরের নানা বিরুদ্ধ মত ও ধারারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রচনা হিসাবে কবিতাগুলিকে উৎকৃষ্ট বলা চলে না, ছন্দও নিখুঁত নয়। একটু উদাহরণ দেওয়া গেল।

"সুরেন বন্দ্যো যেমনি বক্তা
তেমনি Sincere,
ম্যাটসিনিহুধ আওটা ক'রে
বা'র করেছেন সার।
রমেশ দত্ত, Scottএর খুড়ো
Political ভারি,
কলম দিয়ে Queen's English
বেরোয় কেবল তাঁরি,…"

"হেথায়
রবি বাবুর Polished ভাষায়
বঙ্গভাষা টল্‌টলা,
বুঝি না ব'লে যায় না বোঝা
রঙ্গ ক'রে ছল ধরা।"

বেণোয়ারীলালের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পোলাও' প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। এ বইটিও সাহিত্যিক,সামাজিক ও রাজনৈতিক রসিকতায় পূর্ণ। 'পোলাও'র কবিতাগুলি এগারোটি 'হাঁড়ি'তে বিভক্ত হয়ে একাদশ 'হাঁড়িতে' শেষ হয়েছে। 'খিচুড়ী'র সঙ্গে এর প্রভেদ এই যে 'খিচুড়ী'তে আগাগোড়া এক ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল, এখানে বিভিন্ন 'হাঁড়ি'তে বিভিন্ন ছন্দের অবতারণা করা হয়েছে। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"মর্মবাণীর পাতে পাতে
পোকার কামড় দেখতে পাই,
ভাব-সাগরের "প্রমথ" রোহিত
এলোমেলো দিচ্ছে ঘাই।

রূপনগরের মানসী তার
ভাঙ্গা নূপুর দিয়ে পায়,
রাজার কাছে নাকি সুরে
তালকাটা গান হেসে গায়।"

বেণোয়ারীলালের আর একখানি কবিতার বই 'বেণুবন', 'পোলাও'-এর ভূমিকা-লেখকের মতে, "পুরাতন বৈষ্ণব কবিগানের মূর্চ্ছনার আবেশ আনিয়া দিয়াছে।''

প্রধানতঃ চিন্তাশীল লেখক হলেও, এবং হাস্যরসাত্মক রচনায় হাত না দিলেও হরিদাস হালদারের (১৮৬২-১৯৩৪) নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালে এঁর 'গোবর গণেশের গবেষণা' প্রকাশিত হলে সেটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বইটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন হরিদাসবাবুকে 'সবুজপত্রে'র দলে টেনে নিতে।* কিন্তু ইনি কখনো 'সবুজপত্রে' লেখেন নি।

'গোবর গণেশের গবেষণা' আমাদের স্বাদেশিকতা ধর্ম আইন প্রভৃতি নিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে গভীর চিন্তাপ্রসূত রচনা-সমষ্টি। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় টলস্টয় থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে এই তিনটি জিনিস মানুষের জীবনে কী দুঃখের অভিশাপ নিয়ে আসে, তাই বলা হয়েছে। কিন্তু মননশীল ও সাহসিক মতামতে পূর্ণ এই বইটির রচনায় লেখক আগাগোড়া একটি ব্যঙ্গাত্মক সরস ভঙ্গি রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। বইটির ছয়টি পরিচ্ছেদে ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; যথা, 'ধর্ম ও অনুষ্ঠান', 'আইন ও আদালত', 'গুরু ও গেরুয়া', 'ঋদ্ধি ও সিদ্ধি' এবং 'অবস্থা ও ব্যবস্থা'। নিচের উদ্ধৃতি থেকে হরিদাসবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হবে।

"একদিন কলেজের ছেলেরা আমাকে গোল-দীঘীতে এক স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য লইয়া গেল। আমি সভাস্থলে লাল-পাগড়ির প্রাচুর্য দেখিয়া রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিহার পূর্বক ধর্মের ভিতর দিয়া স্বদেশী চালাইয়া দিলাম। বলিলাম, "গরুর হাড় দিয়া যে লবণ রিফাইন করা হয়, তাহা খাইলে কি হিন্দুর ধর্ম থাকিবে?'' এই কথা শুনিয়া হিন্দু শ্রোতাগণ

* চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড।

সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, না, আমরা ঐ লবণ খাইয়া গো-খাদক হইতে পারিব না।" ইহাতে মুসলমান শ্রোতাগণ আরক্তনয়ন হইয়া উঠিল। আমি বেগতিক দেখিয়া মুসলমানদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম, "শুয়োরের রক্ত দিয়া যে চিনি রিফাইন্ করা হয় তাহা সকলেরই অখাদ্য।"... আমি আসন পরিগ্রহ করিবার সময় হিন্দুগণ "বন্দে মাতরম্" এবং মুসলমানগণ "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিল। তৎশ্রবণে আমি পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া ··· সকলকে একযোগে "আল্লা হো মাতরং" বলাইলাম। একতাভিলাষী ছাত্রবৃন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না।" (ধর্ম ও অনুষ্ঠান)।

১৯২১ সালে হরিদাসবাবু 'বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি' নামে আর একখানি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধের বই প্রকাশ করেন। এ-বইখানি অনেকটা 'কমলাকান্তি' ঢং-এ লেখা। বস্তুতঃ, গাঁজাখোর বক্কেশ্বর আফিংখোর কমলাকান্তেরই প্রতিরূপ। আগাগোড়া 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনুকরণে ও অনুসরণে লেখা এরূপ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ।

বক্কেশ্বর চাষার ছেলে। চাষ-বাসই তার জীবিকা। এক জটাজুটধারী বাবাজীর পাল্লায় প'ড়ে সে গাঁজা খাওয়া অভ্যাস করেছে, এবং গাঁজার নেশার ঝোঁকে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জমিজমা খুইয়ে ভবঘুরে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কিছুদিন মিশনারী স্কুলে ইংরেজী শিখেছে, বাংলা সংস্কৃত ইত্যাদিতেও তার কিছু পড়াশুনা আছে। জমি-জমা খোয়াবার পর কলকাতায় এসে "চাকরীর জন্য সহরের এক নামজাদা ধনাঢ্য বাবুর দ্বারস্থ হইলাম। বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কেউ জামীন আছে?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আমরা চাষার ছেলে, খাটিয়ে লোক, আমরা ফাঁকিদারী জানি না। আমি ভদ্রলোক হলে আপনি security চাইতে পার্‌তেন। আমি গরীব লোক; আমার দ্বারা আপনার তহবিলের embezzlement হবার সম্ভাবনা নেই।" আমার মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া বাবু একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আমার নাম বক্কেশ্বর বাগ।"

বাবু। বক্কেশ্বর! তুমি লেখাপড়া জান?

আমি। আজ্ঞে একটু আধটু জানি।

বাবু। তুমি ইংরেজী কাগজ পড়তে পার?

আমি। আজ্ঞে একটু আধটু পারি।

বাবু। তবে তুমি কেরাণী হও না কেন?

আমি। আজ্ঞে ভগবান আমাকে হাত পা দিয়েছেন। আমি হাত পা খাটিয়ে খেতে চাই। আমার বাপ্‌দাদারা খাটিয়ে লোক ছিল। আমি কেরাণীবাবু হলে আমার বাপ্‌দাদার নাম ডুব্‌বে। আমাদের বংশে ও-পাপ সইবে না।

বাবু। বক্কেশ্বর! তুমি আগে কি কর্‌তে?

আমি। আজ্ঞে আমি সব রকম কাযই করেছি। আমি চাষের কায জানি; কামার, কুমার, ছুতারের কায জানি; ধোপা নাপিতের কাযও জানি। আমি কুলি মজুরের কাযও কর্‌তে পারি।

বাবু। তবে তুমি দেখ্‌ছি সকল কাযই জান।

আমি। আজ্ঞে আমি কতকগুলি কায জানি নি।

বাবু। কি কি কায তুমি জান না?

আমি। আজ্ঞে এই ভদ্র বাবুলোকদের ফাঁকিদারী কাযগুলি আমার জানা নেই।…"

কমলাকান্তেরই মতো বড়লোকের আশ্রয়ে বেশিদিন থাকা বক্কেশ্বরের পোষাল না। "আমি আমার গাঁজার ছিলিম ও তৈজসপত্রাদি গুছাইয়া লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার "ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে" হইতে লাগিল।… এখন আমার তরুতল আশ্রয় হইয়াছে। এই আস্তানা হইতেই আমি পাঠকবর্গকে আমার যাহাকিছু দিবার ছিল তাহা গ্রন্থাকারে দিয়া দিলাম।" এই আত্মবর্ণনায় হুবহু কমলাকান্তকে মনে পড়ে। লেখার একটু দৃষ্টান্ত দিই।

"আপনাদের বড় পেট, এই পেটের দায়েই আপনারা পলিটিক্স করেন। আমাদের ছোট পেট, আমরা পেটের দায়ে চুরি করি। আমাদের উভয়ের কার্য একই, তবে বড় আর ছোট। তাই কাংস্য পাত্র ও মৃন্ময় পাত্রের গল্প স্মরণ করিয়া আমরা আপনাদের পলিটিক্স হইতে তফাতে থাকিতে ইচ্ছা

করি। রাজনীতির চর্চ্চা আপনাদের একচেটিয়া ব্যবসা হইয়া থাকুক।··· মশায় গো! আপনাদিগকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনারা স্বরাজলাভের আশায় কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স করিয়া থাকেন। ১৯০৬ সালের বরিশাল কন্‌ফারেন্সে আপনারা পুলিশের রেগুলেশন লাঠির বহর নিজেদের পিঠে বিলক্ষণ মালুম করিয়াছিলেন। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ভবিষ্যতে আপনারা যখন স্বরাজ করিয়া বসিবেন, তখন আপনাদেরও কি লাঠিওয়ালা পুলিশ থাকিবে? এবং তাহাদের লাঠির বহর কি আমাদের পিঠে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে?"

হরিদাস বাবু এ-দুটি বই ভিন্ন 'কর্মের পথে' নামে একটি সামাজিক উপন্যাস এবং 'মদনপিয়াদা' নামে একটি ছোট গল্পের বইও লিখেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩—১৯১৫) প্রধানতঃ ছোটদের লেখক। কিন্তু ছোটদের লেখক বলে এঁর এবং অন্যান্য শিশু-সাহিত্যিকের কৃতিত্ব লঘু বলে মনে করা উচিত নয়। শিশুসাহিত্য আসলে সাহিত্যেরই একটি শাখা। উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্যের রস তাই সাহিত্যরসিকমাত্রেরই উপভোগ্য। উঁচুদরের শিশুসাহিত্যিককে উচ্চস্তরের সাহিত্যিকরূপেই বিচার করা কর্তব্য। কেননা শিশুসাহিত্যিক অনেকসময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি অর্জন করতে সমর্থ হন।

বাংলায় শিশু-সাহিত্যের সূত্রপাত হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। 'প্রকৃতি', 'বালক', 'সখা', 'সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকাতে আশ্রয় ক'রেই প্রথম ছোটদের জন্য ছড়া-কবিতা-গল্প লেখা হতে আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ ক'রে এবং সে-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে সেগুলির রস রসিকসমাজের সামনে উপস্থিত করেন। তাঁর প্রেরণা ও আদর্শে আমাদের লোকসমাজে ছড়ানো ছড়া, রূপকথা, উপকথা, নীতিগল্প ও উপাখ্যান প্রভৃতি সংগৃহীত হতে আরম্ভ করে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'খুকুমণির ছড়া' সংকলন করেন; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথার বইগুলি বাংলা সাহিত্যে চির-আদৃত হয়ে আছে। উপেন্দ্রকিশোরও ছোটদের কতকগুলি লোকপ্রচলিত নীতিমূলক মজার গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। এ-সংগ্রহ, 'টুনটুনির বই'-ই বোধ হয়

উপেন্দ্রকিশোরের একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। কিন্তু তিনি ছোটদের লেখা লিখেছিলেন অনেক। 'সখা' 'সাথী' 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। রেখাচিত্রাঙ্কণেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন, এবং এদেশে হাফটোন ব্লক তৈরির পদ্ধতিও তিনিই আবিষ্কার করেন। ১৩২০ সালে (১৯১৩) তিনি 'সন্দেশ' নামে একখানি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর অল্পদিন পরে ১৩২২-এ উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হলে এঁর কৃতী জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায় এই সুবিখ্যাত শিশু-পত্রিকাখানির সম্পাদনার ভার নেন। অনেকটা 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রয়োজনেই সুকুমার রায়কে প্রতি মাসে অজস্র মজাদার ছড়া, গল্প, নাটিকা ইত্যাদি লিখতে হোত। সেজন্য 'সন্দেশ' পত্রিকাখানির কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণ অপরিশোধনীয়।

উপেন্দ্রকিশোরের গদ্যপদ্য বিবিধ রচনা 'পুরাতন লেখা' নাম দিয়ে 'সন্দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হোত। এর মধ্যে তাঁর লেখা কতগুলি চিঠি ছাড়া, জীবজন্তু পোকা-মাকড় সম্বন্ধে সহজ ও সরস করে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধ, কয়েকটি মজাদার গল্প, দু'চারটি পৌরাণিক কাহিনী এবং একটি অতি মজার নীতিমূলক শিশু-নাটিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যাঁরা উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' পড়েছেন, তাঁরাই তাঁর আঁকা ছবি ও তাঁর কৌতুকময় রচনাভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত। 'সন্দেশে' প্রকাশিত মজার গল্পগুলিতে এবং নাটিকাটিতে উপেন্দ্রকিশোরের হাস্যরসবোধ আরো প্রবলরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৩২৩-এর পৌষ সংখ্যা 'সন্দেশে' এই পুরাতন লেখাগুলির সূত্রপাত ক'রে সম্পাদক সুকুমার রায় লিখেছিলেন, "তিনি একাধারে সাধক শিল্পী কবি ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নানা সাধনার মধ্যে তিনি নিজে যে আনন্দ পাইতেন তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে কথায় বার্তায় লেখায় বক্তৃতায় তিনি সেই আনন্দ অজস্র বিতরণ করিতেন। বিশেষতঃ শিশুদের কাছে তাঁহার আনন্দের ভাণ্ডার একেবারে অফুরন্ত ছিল। ··· বহু দিন হইতেই "সখা" "সাথী" মুকুল প্রভৃতি কাগজে তিনি ছেলেদের জন্য লিখিয়া আসিতেছেন — সে সকল লেখা এতদিনে প্রায়

লোপ পাইতে চলিল। আমরা সেই সকল পুরাতন লেখা সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে সন্দেশে ছাপিব স্থির করিয়াছি।"

উপেন্দ্রকিশোরের তীব্র হাস্যরসবোধ সত্যই শিশুদের কাছে "আনন্দের ভাণ্ডার" রূপে উন্মুক্ত হয়েছিল। এঁর শিশুপাঠ্য লেখাগুলির মধ্যে তার প্রমাণ অজস্রস্থানে ছড়িয়ে আছে। 'পুরাতন লেখা' পর্যায়ে এঁর 'খুত-ধরা ছেলে' 'পাকা ফলার' 'লাল সুতা নীল সুতা' প্রভৃতি কয়েকটি মজার গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি সবই মৌলিক নয়, কিন্তু রচনাভঙ্গিতে কৌতুক ছড়ানো। উপেন্দ্রকিশোরের 'খুঁত-ধরা ছেলে' থেকে একটু দৃষ্টান্ত দিই।

"একদিন স্বর্গের দরজায় দরোয়ান দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। ··· এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ করিয়া দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন—"অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি কি ভিতরে আসিতে পারি? দরজাগুলি তো মন্দ নয়; কিন্তু স্বর্গের দ্বার বন্ধ থাকিবে কেন? দরজাগুলি আরো বড় হওয়া উচিত।"

"তুই কেরে, পৃথিবীর লোক ক্যাচ্ ম্যাচ্ করিয়া কথা কহিতেছিস্?"

"অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন? — আমি স্বর্গে যাইতে চাই।"

"বটে? তুই করিয়াছিস্ কি?"

"আমি খুঁতধরা কাজ করিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ করিয়াছে তাহার সমস্ত দোষ আমি নোট বহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইট পোড়াইয়াছিল সে আর দুই মণ কয়লা কম খরচ করিলে সুরকী-ওয়ালা সহজেই খোওয়া করিতে পারিত। যার নামে ষ্ট্রীট হইয়াছে সে এত রোগা যে অত বড় ষ্ট্রীটে তাহার কিছু দরকার নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে—"

"আরে থাম্ থাম্; ও সব কি কাজ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্?"

"এই সব নোট লিখিয়াছি।'

"দূর হ বেটা, তুই কি আর কোন কাজই করিস্ নাই? কেবল দোষ ধরা কাজই করিয়াছিস্।

"আর স্মৃতি পুস্তিকায় তাহা লিখিয়াছি।"

"যা, যা! তোর এখানে আসিবার হুকুম নাই।"—"আউ পচারিব কাঙ্কু, জগনাথঙ্কু"— বলিয়া দরোয়ান দেবতা গান ধরিলেন।"

'বেচারাম ও কেনারাম' নামে উপেন্দ্রকিশোরের যে শিশুনাটিকাটি ১৩২৭-এর 'সন্দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল সেটিকে সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি কৌতুক-নাট্যের আদর্শ বলে গণনা করা যায়। অবশ্য, উপেন্দ্রকিশোরের রচনাটি বোধহয় পুরোপুরি মৌলিক নয়, এবং একটি 'মরাল' বা নৈতিক শিক্ষাও এর মধ্য দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে। তবু গঠনে, ভাষায়, ভঙ্গিতে এ-রচনাটির সঙ্গে সুকুমার রায়ের কৌতুক-নাট্যগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুকুমার রায় ছড়া, গল্প, কৌতুকনাট্য সকল রচনারই প্রাথমিক প্রেরণা উপেন্দ্রকিশোরের রচনা থেকেই লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। 'বেচারাম ও কেনারাম' নাটিকাটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করছি।

"[প্রথম দৃশ্য]

(জামা রিপু করিতে করিতে কেনারাম চাকরের প্রবেশ) —

ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল। ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়, তা রীপু করবো কি? ভাল মনিব জুটেছে যা হোক,— এই জামাটা দিয়েই ক বছর কাটালে। তিন বছর ত আমিই এই রকম দেখছি, আরও বা ক বছর দেখতে হয়। তবু যদি চারটি পেট ভরে খেতে দিত! তাও কেমন? সকালে মনিব চারটি ভাত খান, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্তিরে তিনি হাঁড়িটি চাটেন আমি শুঁকি। তার উপর শ্রবণ শক্তিটি কি প্রখর! বাড়ীওয়ালা সেদিন টাকার জন্য কিইনা বল্লে। বাড়ীওয়ালা বলে, 'টাকা দেও, ঢের টাকা বাকী।" মনিব বলেন, 'তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ী আজ নেমন্তন্ন?' বাড়ীওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলে কৈ?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা চাকরটিও সঙ্গে যাবে।' বাড়ীওয়ালা বেচারী রেগে মেগে চলে গেল। বড় লোক হতে হলে বোধ হয় আমার মনিবের মতই কত্তে হয়,

কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড় লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড় লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ এই তিন বছরে একটি পয়সা মাইনে দিলে না? দেখি, আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ করা হচ্ছেনা। (প্রস্থান)

বেচারাম মনিবের প্রবেশঃ—চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথাই বলছিল! সব শুনেছি। বেটা ভেবেছে, আমি সত্যিই কালা। আরে, আমার মত যদি কান থাকতো তা হলে আর চাকরী কত্তে হতো না। আমি যা করে খাই, তাই করে খেতে পাত্তো। ঘরের ভিতরে ক'জন লোক, ক'জন জেগে আছে, কজন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি। কোথায় সিন্ধুকের ভেতর আরশুলা কড় কড় কচ্চে, বাইরে থেকে বুঝে নি। বাপু হে! কানে শুনি, কানে শুনি। কানে শোনাটা ত বেশ ভালই, কিন্তু না শোনার যে স্থবিধে আছে, তাত বুঝবে না! এই সেদিন বাড়ীওয়ালা বেটা ফাঁকী দিয়ে টাকা আদায় কত্তো। কানে না শোনার কত স্থবিধা দেখ,— পাওনাদারের টাকা দিতে হয় না, বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না, চাকরের মাহিনা দিতে হয় না —

কেনারামের প্রবেশ :— (উচ্চৈঃস্বরে) মশাই হয় এই তিন বছরের মাইনে দিন, না হয় আপনার এই সব রইল, আমি চল্লেম।

মনিব — ডাকওয়ালা? চিঠি? দেখি?

কেনারাম — (স্বগত) এই মুস্কিল কল্লে! তা এবারে বাপু এক ফন্দি এঁটেছি — সব লিখে এনেছি। (প্রকাশ্যে) চিঠিই বটে এই নিন্।

মনিব — (পাঠ) "মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসরের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।"

— তাইত, তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় ত কোন বন্দোবস্ত হয় নি, কাজকর্ম্মও তেমন ভালো করে করনি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশী তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নেও। (তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ)"।

উপেন্দ্রকিশোরের কাছ থেকে তাঁর সকল সন্তানই অল্পবিস্তর সাহিত্য-

প্রতিভা এবং হাস্যরসবোধ লাভ করেছিলেন। এঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে সুখলতা রাও ও সুকুমার রায় সুবিখ্যাত। এ-ভিন্ন সুবিনয় রায় এবং সুবিমল রায়ও হাসির ছড়া ও গল্প রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সুবিনয় রায়ের অনেকগুলি বই ছোটদের প্রিয় ছিল। সেগুলি এখন বিস্মৃতপ্রায়। সুবিমল রায়ের অনেক মজার গল্প ছোটদের নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। লেখক হিসাবে তাঁর নামও বিস্মৃত। উপেন্দ্রকিশোরের অপর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী 'সন্দেশে' লিখতেন। সম্প্রতি তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলা মজুমদার বাংলা সাহিত্যে খ্যাতনাম্নী। পৌত্র সত্যজিৎ রায়ের নাম অধুনা সুবিদিত।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) এ-যুগের একজন উল্লেখযোগ্য হাস্যরসিক লেখক। এঁর আত্মকথা থেকে জানা যায় যে এঁর পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণেশ্বর। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই এঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এঁরা তিন ভাই। বড় ভাই পশ্চিমাঞ্চলে কাজ করতেন। তিনি বদলি হয়ে যেখানে যেতেন, সেখানেই কেদারনাথকে স্কুলে ভর্তি হতে হোত। লক্ষ্ণৌয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈরি হবার সময় একটি পারিবারিক বিপদে তাঁকে চাকরিতে ঢুকে যেতে হয়। 'বক্‌সার' হাঙ্গামার ফলে সরকারী হুকুমে তিনি চীনে যান এবং তিন বৎসর সেখানে কাটিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। তিনি অধিকাংশ জীবনই কলকাতার বাইরে — জব্বলপুর, চীন, কানপুর প্রভৃতি স্থানে কর্মনিরত ছিলেন। চাকরি এঁর কোনোদিন ভালো লাগতো না, তাই ১৯০৯এর নবেম্বর মাসে ছুটি নিয়ে ইনি কাশী যান এবং কয়েকমাস পরে অকালে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। বাকি জীবন কেদারনাথ কাশীবাসী হয়েই কাটান।

এঁর পিতা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবির গানের নেশা ছিল। তিনি নিজেও কবিসঙ্গীত রচনা করতেন। কেদারনাথের নয় বৎসর বয়সের সময় গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে গঙ্গানারায়ণ হাতে-লেখা কবিগানের একটি খাতা কেদারনাথকে দিয়ে যান। সে-খাতাখানা

হারিয়ে ফেলায় সেই মনস্তাপে কেদারনাথ 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' নামে প্রাচীন কবি-সঙ্গীতসংগ্রহের একখানি বই প্রকাশ করেন। ইনি 'রত্নাকর' নামে একটি নাটক বা 'অভিনয় কাব্য' লিখেছিলেন। এ ভিন্ন প্রথম যৌবনে ছ' বৎসর ইনি 'সংসার দর্পণ' নামে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন, এবং পরিণত বয়সে কাশী থেকে 'প্রবাসজ্যোতি' নামে আর একখানি পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন।

কেদারনাথের ঝোঁক ছিল ব্যঙ্গকৌতুক ও রহস্যরসিকতার দিকে। ইনি বলেছেন, " 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ও মধ্যে মধ্যে 'বঙ্গবাসী'তে নন্দিশর্ম্মার 'নোট' বা ডায়ারি নামে আমার হাস্যরসাত্মক 'চুটকি' প্রায় তিন বৎসর দেখা দেয়।" বালক-পত্রিকা আশ্রয় ক'রেও ইনি একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কে অগ্রসর হয়েছিলেন। চীনপ্রবাসের অভিজ্ঞতা ইনি 'ভারতী' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩১০; বৈশাখ, ১৩১১) "চীনপ্রবাসীর পত্র" নামে প্রকাশ করেছিলেন।

কাশীপ্রবাসের প্রথম দিকে কাশীর বিবিধ বিষয় নিয়ে কেদারনাথ কতকগুলি পদ্য রচনা করেন। এই লেখাগুলি ১৩২২ সালে (১৯১৫) 'কাশীর কিঞ্চিৎ' নামে প্রকাশিত হয়। এ-বইটিতে কেদারনাথের স্বনাম ব্যবহৃত হয়নি, পুরাতন ছদ্মনাম নন্দি শর্মাই ব্যবহৃত হয়েছিল।*

'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কেদারনাথের রচনার প্রতি সাহিত্যরসিকসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সূত্রেই প্রসিদ্ধ রসিক-প্রাবন্ধিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেদারনাথের যোগাযোগ ঘটে, এবং অনেকটা ললিতকুমারেরই আগ্রহে ও উৎসাহে কেদারনাথ পুরোদমে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন।

'কাশীর-কিঞ্চিৎ' ১১৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কতকগুলি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি। আখ্যাপত্রে বইটিকে "বাঙ্গালীর অভিনব গাইড" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভূমিকার বদলে প্রথমেই 'জমিকা'তে বলা হচ্ছে,

> "ভগবানকে দেওয়া যেমন গুণের সার্টিফিকিট,—
> "ব্রাহ্মণ" বোলে বশিষ্ঠের ভালে মারা টিকিট,

* মলাটের উপরে নাম 'নন্দীশর্মা', আখ্যাপত্রে 'নন্দিশর্মা'।

কাশীর গুণ ব্যাখ্যা করাও — সেইরূপই ধৃষ্টতা,
পরিহাস মাত্র সেটা,— বাহুল্য শিষ্টতা।"

'কাশীর-কিঞ্চিৎ'এর পদ্যগুলিকে ছন্দ মিলের দিক থেকে বা রচনা হিসাবে নিখুঁত বলা যায় না, কিন্তু লেখা যেমনই হোক, কেদারনাথের পরিহাস-কুশলতা এগুলির মধ্যে স্পষ্ট। কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"চিরকালটা বিলাসিতা ছিলেন যাঁরা ভুলে,—
মোর্‌তে কাশী এসে — এখন কলপ লাগান্ চুলে !
না খেয়ে না পোরে যাঁরা — জমিয়ে ছিলেন টাকা,—
দেশ্ ছেড়ে এখানে এসে গজায় তাঁদের পাখা।
দেখে শুনে, দোকান হাজির — হ'চ্চে দাঁত বাঁধা,
হাড় চিবিয়ে মাংস খাবার — নাইক আর বাধা।"

(ধেড়ে রোগ)।

"হৃষ্ট পুষ্ট ক্ষুদ্র হাতী,— ফিরতেছে ষাঁড়গুলো,
যার পেলে খেলে, আর যেথা পেলে শুলো।
জমীদারে ছেলে যেন', চিন্তা নাইক' কিছু,
বে-পরোয়া চলে যায়, চায়না আগু পিছু ;···
আদরে আলাপে বেশ নাদুশ্ নুদুশ্,
কে আসে কে যায়, তার নাহি কিছু হুঁস।"

(শ্রীষাঁড় মহাশয়)।

"শুন্‌তে পাই আছেন হেথা, বড় বড় সব অবধূত,
বড় বড় রোগের জানেন, বড় বড় সব ওউষুধ্।
বড় বড় "ভস্ম" আর, বড় বড় সব রস,—
বড় বড় রাজা রাজড়া, লক্ষপতি বশ।
নিত্য তাঁদের এসে থাকে, বড় বড় মণি-অর্ডার,
ঘেঁশবার্ পথ নাইক' সেথা রামা শামা গদার।"

(অবধূতের অব্যর্থ মহৌষধ)।

'কাশীর-কিঞ্চিৎ' ভিন্ন কেদারনাথ 'কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি' (১৩২৩) ও 'উড়ো খৈ' (১৩৪১) নামে আরো দু'খানি পদ্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। কিন্তু গদ্যই

ইনি বেশি লিখেছেন। এঁর 'চীনযাত্রী' নামে একখানি ভ্রমণ-কাহিনী, 'শেষ খেয়া', 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'ভাদুড়ী মশাই, 'আই হ্যাজ' ও 'পাওনা' নামে পাঁচখানি উপন্যাস, 'আমরা কি ও কে', 'কবলুতি', 'পাথেয়', 'দুঃখের দেওয়ালী', 'মা ফলেষু', 'সন্ধ্যাশঙ্খ' ও 'নমস্কারী' নামে সাতখানি গল্পগ্রন্থ, 'রত্নাকর' নামে একটি নাটক ও একটি 'স্মৃতিকথা' আছে। এ ভিন্ন তাঁর সংগৃহীত 'গুপ্তরত্নোদ্ধারে'র কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

কেদারবাবু আজীবন সাহিত্যসাধনা করেছেন বলা যায় না। সাহিত্যের প্রতি কিছুটা ঝোঁক থাকায় তিনি মাঝে মাঝে কিছু কিছু লিখতেন বটে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের আগে তিনি সাহিত্যচর্চায় পূর্ণ মনোনিবেশ করেন নি। 'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রকাশের পর প্রথমে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ইনি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। সাহিত্য-প্রেরণা কেদারনাথের স্বভাবজ ছিল না। কিছুটা রচনাশক্তি এবং কিছুটা কৌতুক-বোধই তাঁর রচনাকে সুখপাঠ্য করেছে। এ-বিষয়ে কেদারনাথের নিজস্ব বিশ্লেষণই যথার্থ—"প্রতিভাবান্ ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লেখক ভিন্ন তাগাদা তামিল ক'রে কেউ কোন ওয়ার্ক রেখে যেতে পারে কিনা সন্দেহ। আমার স্বভাব ছিল স্বতন্ত্র। যতক্ষণ পেরেছি কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারি নি, লিখতেই হয়েছে।"

বৃদ্ধ বয়সে সাহিত্যচর্চায় অবতীর্ণ হয়ে কেদারনাথ সর্বদা সকল কনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও গুণানুরাগীদের সঙ্গে মিশেছেন ও তাঁদের আব্দার-অনুরোধ রক্ষা করেছেন। ফলে অল্পদিনেই সাহিত্যিক-সমাজে তিনি অন্তরঙ্গ 'দাদামশাই' সংজ্ঞায় ভূষিত হন। তাঁর মধুর ও অমায়িক ব্যবহার এবং কৌতুকময় কথাবার্তা তাঁকে সকলেরই প্রিয় করেছিল। কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তাকে কোনোমতেই কৃতিত্বের মাপকাঠিরূপে গণ্য করা চলে না। বুড়ো বয়সে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা ইনি শুরু করেছিলেন অনেকটা তাঁর অনুরাগীদের তাড়ায়, নিজস্ব প্রেরণাবশে নয়। 'আত্মকথায়' ইনি লিখেছেন, "ললিতবাবুর তাড়ায় তখন আমি কেবল ভাবছিলুম—কি লিখব? আমার লেখা পড়বেই বা কে এবং কেন? উপদেশাত্মক কথা—'সার্ম্মন্' নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। সে সব

পৃষ্ঠাগুলি না দেখেই বাদ দিয়ে যাওয়াই তো সাধারণ অভ্যাস। শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি পাই। প্রয়াসটি আমার পক্ষে সহজ ছিল না। মধ্যবিত্ত ভদ্রদের ও ভদ্রপরিবারের কষ্টের জীবন আমাকে চিরদিনই বেদনা দিয়েছে ও দেয়, বিশেষ মহিলাদের দুঃখের জীবন, যা অন্তরে চেপে প্রসন্ন মুখে নীরবে তাঁরা বহন ক'রে চলেছেন ও চলেন, দুঃসাহসের কাজ হলেও আমাকে তা হাসির আবরণে বলে যেতে হয়েছে।"

এই মধ্যবিত্ত জীবনই কেদারনাথের রচনাগুলির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীবন এবং তাদের সুখদুঃখও কেদারনাথের রচনায় একেবারে অনুপস্থিত নয়। কেদারনাথের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে প্রকৃতপক্ষে চিত্র বা নক্‌শা বলে গণ্য করাই উচিত। উপন্যাস বা গল্পের গুণ তাঁর কাহিনীগুলিতে নেই। সেখানে ঘটনার গতির মধ্য দিয়ে মানবহৃদয়ের ও মানবচরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিকাশ দেখানো হয় নি, এবং প্রেম বা নর-নারীর হৃদয়দ্বন্দ্ব সেগুলিতে হয় একেবারেই নেই, নতুবা অতি অল্পই আছে। তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রধানতঃ কয়েকটি বিশেষ ধরণের চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। যারা পৃথিবীতে নিতান্ত দুঃখী, গরিব বা অসহায় — অথচ মার্জিতবুদ্ধি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্যক্তি ; যারা অর্থবিত্তপ্রতিপত্তি-শালী অথবা ক্ষমতাপন্ন লোক, অথচ স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, পরের দুঃখে উদাসীন এবং পরপীড়নে ইচ্ছুক; আর, যারা নিম্ন বা নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর সাধারণ মানুষ হয়েও সর্বদা নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরোপকার এবং পরদুঃখমোচনে অগ্রসর, সেসব চরিত্রই কেদারনাথের রচনায় বেশি করে ফুটেছে। এই মধ্যবিত্ত কেরানি বা চাকুরে-সমাজের সাহেবভীতি, ভুল ইংরেজী বলা, পারিবারিক ও সাংসারিক ঝঞ্চাটে ব্যতিব্যস্ত অবস্থা, এই সব অবলম্বন করেই প্রধানতঃ কেদারনাথ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। এই মধ্যবিত্তশ্রেণী সংসারভারপীড়িত ও দরিদ্র; কিন্তু এদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা পরের দুঃখ লাঘব করবার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। অন্তর্লীন ঔদার্যে মহৎ হলেও, বাইরে থেকে

দেখতে গেলে এদের কথাবার্তা, চাল-চলন, হাবভাব, অনেক সময়ই অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়। এরা অনুল্লেখ্য অবিশিষ্ট হাস্যকর চরিত্র হলেও, এদের মধ্যে যে মহত্ত্বের বীজ আছে, কেদারনাথ তাকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই সমাজের মধ্যেই আবার ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতারও অভাব নেই। 'আমরা কি ও কে'র ডেইলি প্যাসেঞ্জার 'খুড়ো' এই আপাত-হাস্যকর হৃদয়বান মধ্যবিত্ত কেরানি চরিত্রের একটি নিদর্শন। 'আনন্দময়ী দর্শন'-এ সতীশ, 'আই হ্যাজ়' এ শিবুদা ও বিশু, 'কোষ্ঠীর ফলাফলে' কর্তামশাই ও জয়হরি প্রভৃতিও এই ধরণের উদার চরিত্রের দৃষ্টান্ত। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্বলতাগুলিকে কেদারনাথ হাস্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সংসারভারপীড়িত ব্যতিব্যস্ত সমাজের মধ্যেই যে মানবসহানুভূতিপ্রবণ উদার মন ও প্রকৃত হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, সেদিকেও তিনি বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কেদারনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য খুব বেশি নেই। সন্ধানী পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, তাঁর নানা গল্প-কাহিনীতে মূলতঃ তিন চারটি চরিত্রই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফোটানো হয়েছে। কেদারনাথের হাস্যরস মানবমন বা হৃদয়ের কোনো গভীর অসংগতিসঞ্জাত নয়, এবং সেগুলিকে খুব সূক্ষ্ম-স্তরের বলেও গণ্য করা যায় না। তবুও যে কেদারনাথ হাস্যরসিক লেখক-রূপে এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন তার কারণ, প্রথমতঃ, কৌতুক ও রঙ্গই তাঁর রচনার বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। তার গভীরতা বেশি না থাকতে পারে, কিন্তু ব্যাপকতা প্রচুর। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যাদের অবলম্বন ক'রে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, তারা চাকুরীজীবী সংসার-পীড়িত মধ্যমশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর। বাঙালী সাহিত্যপাঠকও প্রধানতঃ এই শ্রেণীরই। তাই কেদারনাথের রচনায় আমরা আমাদের স্ব-সমাজের হাস্যকর দুর্বলতাগুলি দেখতে পাই বলে তা আমাদের এত ভালো লাগে। একটু আধটু দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

"আমরা হাওড়া রেলের Daily passenger (রোজকার যাত্রী); তায় আজ শনিবার — রেলমুখো লোকই বেশী। সাড়ে পাঁচটার ট্রেণ

ধরবার মতলব সকলেরই। সকলেই দলে দলে বক্তা আর বক্তৃতার প্রশংসা করতে করতে চলেছে। কেহ বলচে আলবৎ Oration (বক্তৃতা বটে); কি pronunciation (উচ্চারণ!)— তেমনি কি accent (দমক্)! একজন বল্লেন —"অমন একটা "notwithstanding" কেউ বলুক দিকি!" অপর একজন বল্লেন্ —"আর ঐ doomed কথাটা,—ওঃ— এখনো যেন মগজের মধ্যে বোঁ বোঁ করে vibrate করচে (কাঁপচে)!" ইত্যাদি—

দেখি কালাচাঁদ খুড়ো ঝাঁ করে তাঁর মোমজামার কোটটার (সেটি আলপাকার হলেও অধুনা মোমজামায় রূপান্তরিত হয়েছিল)— একটা আস্তিন আমূল গুটিয়ে, বাহুটা right-angleএ (সমকোণে) তুলে ফেল্লেন্।

জিজ্ঞাসা করলুম—"কিছু ঢুক্লো নাকি?" তিনি উত্তর করলেন—"না বাবাজি; গুলটো একবার দেখছিলুম,—সেই ভীম-গুল্, বেমালুম হয়ে ব্যাকারি দাঁড়িয়ে গেছে বাবা! ছোলা খেতেই হল।" (আমরা কি ও কে)।

কেদারনাথের রচনা হাসি-কান্নায় মেশানো। এই মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখদুর্দশা যেমন তিনি নানাচিত্রে এঁকে রেখেছেন, তেমনি এ-সমাজের নানা হাস্যকর আচরণ এবং চালচলনও তাঁর রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষ করে, মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের প্রতি গভীর দরদ তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়ানো। তাঁর রচনার অধিকাংশই কতকটা স্মৃতিচিত্রের মতো। কাহিনীগুলি কাল্পনিক হলেও, মনে হয় তাঁর স্মৃতিপটে এ-কাহিনীগুলির কিছু কিছু রেখা আঁকা ছিল। কেদারনাথের হাস্যরস কোনো বিশেষ বর্ণনা বা উক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সমস্ত রচনায় কৌতুকের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর রচনার কৌতুক বোধহয় যথার্থভাবে আস্বাদ করা যায় না, এই কারণেই কেদারনাথের লেখা থেকে আরো উদ্ধৃতি দিতে বিরত হলাম।

'কান্ত কবি' নামে সুপরিচিত, সঙ্গীতরচয়িতা ও কবি রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৮-১৯১০) গান এককালে বাংলার সর্বত্র প্রভূত জনপ্রিয়তা

অর্জন করেছিল। বিশেষ করে এঁর স্বদেশী গানগুলি জনসাধারণের মনে প্রচুর উন্মাদনা এনেছিল। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' এঁর বিখ্যাত স্বদেশী গানের দৃষ্টান্ত। ভক্তিরসাত্মক গানও ইনি অনেক লিখেছিলেন, এবং এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কাঙাল হরিনাথ (মজুমদার) বা ফিকিরচাঁদ বাউলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচয় হবার পর ইনি তাঁর প্রভাবে কিছু কিছু হাসির গানও রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'উহু সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর রসকরা সরপুরিয়া' এই গানটির প্রভাবেই সম্ভবতঃ রজনীকান্ত 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত পান্তুয়া শত শত' এই ভোজনবিষয়ক হাসির গানটি লিখেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার কৃতিত্ব এখানে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। স্বদেশী গান বা ভক্তিমূলক গানে রজনীকান্ত যে কুশলতা দেখিয়েছেন, হাসির গানে সে কৃতিত্ব তিনি অর্জন করতে পারেন নি। ভক্তি বা স্বদেশপ্রেম তাঁর মধ্যে যতখানি ছিল, হাস্যরসও ততটাই ছিল, তাঁর রচনা পড়ে একথা মনে হয় না। তবু তিনি কিছু কিছু হাসির কবিতা ও গান রচনার প্রয়াস করেছিলেন বলে তাঁর নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর 'তিনকড়ি শর্মা' নামক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি।

"(দেখো) আমি তিনকড়ি শর্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা,
(দেখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী
আমি যার জলে নাব্‌ব।
(দীন) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা বলিহারী যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হামবড়া" প্রেসে
সোণার আখরে ছাপ্‌ব।"

রজনীকান্ত 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অমৃত', 'অভয়া', 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'সদ্ভাবকুসুম', 'শেষদান', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এর মধ্যে 'বাণী' ও 'কল্যাণী' এককালে সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিল।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৭-১৯৩৭) শিশু-সাহিত্যিকরূপে সুবিখ্যাত।

ইনি স্যার নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠের মতো ইনিও স্বক্ষেত্রে অতুলনীয় কৃতিত্বের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। শিশুমনে প্রবেশ করবার কৌশল যোগীন্দ্রনাথের সহজায়ত্ত ছিল। তাঁর 'অজগর আসছে তেড়ে আমটি আমি খাব পেড়ে' অর্ধশতাব্দী ধরে শিশুরা ভালোবেসে এসেছে। ইনি ছোটদের জন্য 'হাসিখুসি' দু'ভাগ, 'হাসিরাশি', 'রাঙাছবি', 'পশুপক্ষী', 'আষাঢ়ে স্বপ্ন', 'ছবি ও গল্প', 'হিজিবিজি, প্রভৃতি গদ্যেপদ্যে অনেকগুলি বই লিখেছিলেন, 'হাসিখুসি' বইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদিও বর্ণশিক্ষা, তবু তার মধ্যেও অনেকস্থলে যোগীন্দ্রনাথের স্বতঃউৎসারিত কৌতুকবোধ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এই বইয়ে যোগীন্দ্রনাথ ইংরেজী nursery rhymes থেকে কিছু কিছু মজাদার ছড়া বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ও মৌলিক কৌতুকময় শিশু-কবিতার সংখ্যাও কম নয়।

যোগীন্দ্রনাথের হাস্যময় ছড়াগুলির পরিচয় দেওয়া বৃথা। বাংলাদেশে এমন লোক কমই আছেন, যাঁরা বাল্যকালে সে ছড়াগুলি উপভোগ করেন নি এবং যাঁদের কানে এখনো সেই ছড়াগুলির রেশ লেগে নেই। যোগীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য মজার গল্পও লিখেছিলেন অনেক। তাঁর এই গল্পগুলি 'প্রকৃতি', 'মুকুল' 'সখা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। পরে এই লেখাগুলিকে তিনি 'মজার গল্প', 'ছবি ও গল্প' প্রভৃতি বইর অন্তর্ভুক্ত করেন। ইনি শিশু-সাহিত্যিক সত্য, কিন্তু মজার ছড়া রচনায় বাংলা সাহিত্যে এঁর জুড়ি অল্পই আছেন। এঁর ছড়াগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও একটু আধটু ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন নেই, এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, "আমরা যেমন বীর শিশু তেমন আর কে, ভয় ভাবনা কাকে বলে কিছুই জানিনে" বলে যে ছেলেরা গর্ব করছিল, শেষপর্যন্ত সারসের হাঁ দেখে তাদের ভয় পাওয়া, অথবা যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদলের প্যাঁক প্যাঁক শুনে পালানো যথেষ্ট কৌতুককর হলেও একেবারে ব্যঙ্গবর্জিত নয়।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৮-১৯২৯) বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকার। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে এঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু পাণ্ডিত্যের গুরুত্বে এঁর রচনার সরসতা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

ইনি সাহিত্যসমালোচনা, ভাষাতত্ত্ব-আলোচনা প্রভৃতিকেও রচনার গুণে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন এবং জ্ঞানগর্ভ বস্তুকে একটি কৌতুকময় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একটি মৃদু কৌতুকের প্রবহমান ধারায় তাঁর রচনাগুলি পূর্ণ। লঘু নিবন্ধ — বর্তমানে যাকে রম্যরচনা বলা হয় — ললিতকুমার অনেকগুলি লিখেছিলেন। এ-জাতীয় রচনায় ললিতকুমারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর 'গরুর গাড়ী' 'ফোঁড়ার ফাড়া', 'পাণ', 'মশক সঙ্কট' প্রবন্ধগুলি এ-ধরণের রচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'আমোদর শর্মা' এই ছদ্মনামে তিনি 'ভারতবর্ষে' সরস প্রান্ধ লিখতেন। বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে কৃতবিদ্য এই অধ্যাপক-লেখক আসলে চিন্তাশীল ও গভীর সাহিত্যালোচনাই বেশি করেছেন। কিন্তু তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত আলোচনা ও মন্তব্যগুলিকে তিনি কৌতুকের সঙ্গে পরিবেশন করতেন। বাংলা ব্যাকরণ, বানান অনুপ্রাস প্রভৃতি নিয়ে তিনি কতকগুলি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যথা, 'ব্যাকরণ বিভীষিকা', 'অনুপ্রাসের অট্টহাস', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা', 'বানান সমস্যা' প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী নিয়েও ইনি অনেক আলোচনা করেছিলেন ; সেগুলি তাঁর 'কপালকুণ্ডলা তত্ত্ব', 'সখী', 'প্রেমের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বহু প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধকাররূপে এবং হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য এককালে ললিতকুমারের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কিন্তু নিছক হাসি বা কৌতুক উৎপাদনই তাঁর রচনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ললিতকুমার হাসি পরিবেশন করেছেন গভীর ও চিন্তাপ্রসূত বক্তব্যের আবরণ হিসাবে। হাসির রচনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা কী ছিল, তাঁর রচনা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলে তা পরিস্ফুট হবে।

"সকল দেশের সাহিত্যেই চুট্‌কীর আদর আছে, বিশেষতঃ ফরাসী ভাষায় এই প্রকারের সাহিত্য অতুলনীয়। ··· আমার বিশ্বাস,··· বাঙ্গালা ভাষারও ফরাসী ভাষার ন্যায় কোমলতা, সরসতা ও ভাষালীলার বিচিত্র ভঙ্গী যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আশা হয়, প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে এ ধরণের সাহিত্য খুলিবে ভাল। অতি অল্প কথায় নরচরিত্রের বা মনুষ্য

জীবনের কোনও একটা জটিল তত্ত্ব সরল অথচ সরস ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকারের সাহিত্যের বিশেষত্ব; একটু রসিকতা থাকিবে, কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না, ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য থাকিবে না, চাইকি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃ-সলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপে উজ্জ্বল মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়।" (চুট্‌কী সাহিত্য, ফোয়ারা)।

এ-জাতীয় রস-রচনাই ছিল ললিতকুমারের আদর্শ। 'ফোয়ারা', 'পাগলা ঝোরা' প্রভৃতি বইতে তিনি রসিকতা ও কৌতুক অনেক করেছেন। এ কৌতুক কখনো ব্যাকরণ, কখনো সাহিত্য, কখনো সমালোচনাকে আশ্রয় করেই প্রকশিত হয়েছে। ললিতকুমারের লঘু নিবন্ধগুলিতেও হাস্য-কৌতুকের বহু পরিচয় আছে। কিন্তু সে-কৌতুক চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রায়ই জড়িত হয়ে থাকতে দেখা যায়। ললিতকুমার কতকগুলি ছোট ছোট চুট্‌কিও লিখেছিলেন। দু'একটি উদ্ধৃত করছি।

"বিদ্রূপরসাত্মক কাব্য (Satire) সাহিত্যফলারে পাঁপড়ভাজা। বেশ মুখরোচক বটে, কিন্তু অধিক খাইলে পেট গরম ও বদ-হজম হয়, রুচি বিকার ঘটে, সাধারণ খাদ্য আর ভাল লাগে না। আরও দেখুন, পাঁপর কাঁচা অবস্থায় অখাদ্য, মুখে তুলিতে ইচ্ছা করে না, দাঁতে জড়াইয়া যায়; কিন্তু ঘিয়ে ভাজিয়া গরম গরম পাতে দিলে তোফা মুড়মুড় করে, খাইতে বড় আরাম। ব্যঙ্গবিদ্রূপ জিনিসটারও সামাজিক কদাচার পারিবারিক কুৎসা ব্যক্তিবিশেষের কুৎসিত চরিত্র ইত্যাদি কদর্য উপকরণ। সেই কাঁচা অবস্থায় ঐ সব কুৎসা শুনিলে ভদ্রলোকে কানে আঙ্গুল দেন, শুনিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকে; কিন্তু যখন সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত হালুইকরের আর্টরূপ ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পরনিন্দারূপ কদর্য মাল পাঠকের পাতে দেওয়া যায়, তখন সেটা বড় উপাদেয় লাগে।" (চুট্‌কী, ফোয়ারা)।

আর একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা ললিতকুমারের প্রসঙ্গ শেষ করবো।

"পলাশীর আম্রবনে দুইটি অমৃত ফল ফলিয়াছে, এবং দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশৈশব ইংরেজী পড়িয়া, 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মান

অপমান' করিয়াও বাঙ্গালী ইংরেজী লিখিতে গেলে তাহা 'বাবু-ইংলিশ' হইয়া পড়ে। আবার যদি বেচারা 'রাজার নন্দিনী প্যারী'র পায়ে তেল দেওয়া ছাড়িয়া, দীন দুঃখিনী মা'এর ঘরে ফিরিয়া জননী বঙ্গভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাতে আবার ইংরেজী ইংরেজী গন্ধ পাওয়া যায়। কৃষ্ণকালী যেমন 'পুরুষ কি নারী' চেনা যায় না, ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীর রচনাও সেইরূপ ইংরেজী কি বাংলা বুঝা যায় না। কাল ছেলে কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, জল মাখিলে কালী মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী ইংরেজী লিখিলে বাঙ্গালা-বাঙ্গালা ঠেকে, বাঙ্গালা লিখিলে ইংরেজী-ইংরেজী ঠেকে।" (পাগলা ঝোরা)।

প্রমথ(নাথ) চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্রযুগের একজন প্রধান লেখক। এঁর বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম, জন্ম যশোহরে। এঁর প্রথম ইস্কুলের শিক্ষা হয় কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরে তিনি বিভিন্ন ইস্কুলে পড়েছিলেন, এবং তাঁর নিজের মতে, কৃষ্ণনগরে "বেশীর ভাগ unconsciously শিখেছি, আর কিছু consciously।" তিনি বলেছেন, "বাঙ্গলা ভাষা আমি একমাত্র বই পড়ে শিখিনি। শিখেছি নানাশ্রেণীর নানা লোকের মুখে শুনে; যেমন সকলেই শেখেন। কিন্তু এ সব কথা আজ পর্যন্ত আমাদের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয় নি;··· আমি এ জাতীয় শব্দ আবশ্যক হলে আমার লেখায় ব্যবহার করি। ফলে আমার সাহিত্যিক ভাষারও পুঁজি বেড়ে গিয়েছে।"* তা ছাড়া কৃষ্ণনগরে প্রচলিত নদে-শান্তিপুরের ভাষাকে প্রমথ চৌধুরী—"কি উচ্চারণ, কি অর্থব্যক্তিতে —বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ভাষা" বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন, "আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর। সেই ভাষাই আমার মূল পুঁজি তারপর তা সুদে বেড়ে গিয়েছে। বাঙ্গলা বই ছেলেবেলায় অনেক পড়েছি, কিন্তু বইয়ের ভাষা আমার কস্মিনকালেও আদর্শ ছিলনা।" কৃষ্ণনগরের কাছে প্রমথ চৌধুরী আরো অনেক ঋণ স্বীকার করেছেন। "যার গলায় সুর আছে সে গান করতে বসলে তার সুর যেমন আপনা হতেই বাঁকে-চোরে আর ঘোরে; তেমনি যার মুখের

* আত্মকথা, প্রমথ চৌধুরী।

ভাষা ভাল, সেও ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিক জানতেন, এরই নাম বাকচাতুরী। ··· আমার লেখার ভিতর যদি বাক্‌চাতুরী থাকে ত তার জন্য আমি কৃষ্ণ-নগরের কাছে ঋণী।"* প্রমথবাবু যাই বলুন, তাঁর ভাষায় কৃষ্ণনগরের ভাষার প্রভাব খুঁজে পাওয়া শক্ত। কৃষ্ণনগরে প্রাথমিক শিক্ষার পর প্রমথ চৌধুরী কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ-এ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ ও এম্‌-এ পাশ করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি ফিলজফি অনার্সে প্রথম হন, এবং এম্‌-এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পাশ করেই ইনি বহরমপুর কলেজ, কুচবিহার কলেজ প্রভৃতিতে প্রিন্সিপালের চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এর কোনোটাই গ্রহণ করেন নি। চাকরি সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর এ-সময়ের মনোভাব তিনি তাঁর 'চার-ইয়ারী কথা'র 'সেনের কথা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন। এর কিছুদিন পরে তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যান। ইউরোপের প্রধান প্রধান কয়েকটি ভাষায় প্রমথ চৌধুরীর আগেই দখল জন্মেছিল, বিলেতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেলেন।

কৈশোরে পরপর দুবার rheumatic fever-এ ভুগে উঠবার পর প্রমথ চৌধুরীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এফ-এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং তাঁকে ফুটবল খেলা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু এই রোগাবশেষ দৌর্বল্য প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "আমি এই অসুখের পর ফুটবল খেলা ছেড়ে দিলুম। খেলাধুলা করিনে, ইস্কুল-কলেজের বইও পড়িনে। এ অবস্থায় দিন যাপন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে অনেক ফরাসী বই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, 'তুমি ঘরে চুপচাপ করে বসে থাক, ফরাসী শেখ না কেন? আমি তোমাকে সাহায্য করব।'— সেই থেকে আমার ফরাসী বই পড়ার অভ্যাস

* আত্মকথা।

হয়ে গেল।" শুধু ফরাসী পড়ার অভ্যাস নয়, এ সময়ে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর তীব্র আকর্ষণ ও আগ্রহ জন্মেছিল। ফলে, এই সাহিত্যের রস তিনি গভীরভাবে পান করেছিলেন, এবং এ-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। ইতালীয় ভাষাও প্রমথবাবু কিছু কিছু জানতেন। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের মূলগ্রন্থগুলিই তিনি পড়তে পেরেছিলেন। ফরাসী সাহিত্য থেকে প্রমথ চৌধুরী কিছু কিছু অনুবাদও করেছিলেন। ফরাসী সাহিত্যের বুদ্ধিদীপ্ত wit-উজ্জ্বল গদ্যরীতি, এবং সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত মনোভাব তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল।

প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে সাহিত্যচর্চার প্রচলন যথেষ্টই ছিল। তিনি বলেছেন, "আমাদের পরিবারে প্রায় সকলেই বই-পড়িয়ে লোক ছিলেন।" বিলেতযাত্রার সূত্রে আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব জন্মে। এই বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়, রবীন্দ্রনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহে। পরে কবির আর এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করে প্রমথ চৌধুরী কবির আরো ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিভাজন হয়ে দাঁড়ান। রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর শ্রদ্ধা ছিল অসীম। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "লোকোত্তর পুরুষের কথা বইয়ে ঢের পড়েছি, কিন্তু দেখেছি শুধু একটি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" সাহিত্যসাধনায় ও সাহিত্যিক-সংগ্রামে চিরদিন প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন। অথচ তিনিই বোধহয় রবীন্দ্রযুগের একমাত্র লেখক যিনি রবীন্দ্রনাথের অতি নিকটে থেকে এবং তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেও নিজের রচনায় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন নি, বরং কোনো কোনো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তাঁর এম-এ পড়বার সময় জয়দেবের উপর একটি প্রবন্ধ লিখে এবং একটি সভায় সেটি পাঠ করে। এ প্রবন্ধটির বক্তব্য ছিল যে, জয়দেব উঁচুদরের কবি নন। "আমার এ মত শুনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হ'ন। কিন্তু তাঁরা আমার মতের কোন খণ্ডন করতে পারেন নি।"* এই প্রথম

* আত্মকথা।

রচনাতেই প্রমথ চৌধুরীর রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছিল। যথা, (১) সম্পূর্ণরূপে ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস-বর্জিত যুক্তিপ্রধান বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি-ভঙ্গি; (২) প্রচলিত ধারণা বা মতের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব; (৩) আক্রমণাত্মক (aggressive) রচনাভঙ্গি এবং (৪) তর্কপ্রবণতা। প্রমথ চৌধুরী কবিতা, গল্প প্রবন্ধ, সবই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যা আদপে নেই তা হচ্ছে ভাবপ্রবণতা কিংবা ভাবালুতা। আর, তার মধ্যে যে-জিনিসটি অত্যধিক মাত্রায় আছে, তা বুদ্ধির দীপ্তি, বিশ্লেষণ-প্রবণতা ও তর্কপ্রিয়তা। এ জন্য তাঁর গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের গল্পের মতো কবিতা হয়ে উঠতে না পারুক প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে, আর কবিতাগুলি সমিল গদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিত্ব বস্তুটিকে হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করা, এমন কি বর্ণনা করার ক্ষমতাও প্রমথ চৌধুরীর ছিল, (যার উদাহরণ তাঁর ছোটগল্পে দেখতে পাই), কিন্তু কবিত্ব করা তাঁর ধাতে ছিল না। তাই তাঁর কবিতাও যেন 'যুদ্ধং দেহি' বলে কোমর বেঁধেই আছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশ্লেষণশক্তির অধিকারী হওয়ায় নিজের পদ্যের স্বরূপটি তিনি নিজেই উপলব্ধি করতেন, এবং 'পদচারণে' সেকথা নানাভাবে প্রকাশও করেছিলেন।

"মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য,
লোকে বলে, "ওত শুধু মিলনান্ত গদ্য।"

(কবিতা, সনেট চতুষ্টয়)।

"ভাষার সুসার আছে, নাই ভাব প্রাণ,
গোলাপের ছোপ আছে, নাই তার ঘ্রাণ।" (আমার সনেট)।

প্রমথ চৌধুরীর মতামত ছিল তীক্ষ্ণ, এবং তাঁর আলাপ ছিল বুদ্ধিশাণিত। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা বা তর্কে তাঁর দক্ষতা রবীন্দ্রনাথকে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' রচনায় অনুপ্রেরিত ক'রে থাকা সম্ভব। লোকেন পালিত যখন রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী দিন পনেরো তাঁর অতিথি হয়ে ছিলেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ও 'সিরাজদ্দৌলা'-লেখক অক্ষয় মৈত্রও সেখানে এসে জোটেন। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "আমাদের এই সান্ধ্যসম্মিলনে লোকেন আর আমি ঘোর তর্ক করতুম। তার কারণ, লোকেনের সঙ্গে আমার কি সাহিত্য, কি আর্ট, কি ফিলজফি

কোনো বিষয়েই মতের মিল ছিল না।... রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে কোনোরূপ লেখাপড়া করতেন না। কিন্তু মনে মনে একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করতেন। সে বইয়ের নাম পঞ্চভূতের ডায়ারি; যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং আমাদের তর্কের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।" *

প্রমথ চৌধুরীর রচনার একদিককার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তাঁর স্বভাবের মধ্যে বাইরের রূপের প্রতি যে অতিতীব্র আকর্ষণ ছিল, সেটাও তাঁর সকল রচনাকে অন্যদিক থেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "আমি ছেলেবেলা থেকেই রূপের ভক্ত। প্রথম যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখি, তখন তাঁর অসামান্য রূপই আমাকে মুগ্ধ করে।" এবং অন্যত্র বলেছেন, "রূপজ্ঞানে আমি বর্জিত ছিলুম না। যে রূপ চোখে দেখা যায় সে-রূপের আমি চিরকালই অনুরাগী ছিলুম।"

এ-সমস্ত উক্তি থেকে এবং তাঁর রচনাবলী পড়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত সহজেই মনে আসে। প্রথমতঃ, প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিল বুদ্ধি-সর্বস্ব। এই বুদ্ধি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, শাণিত খড়্গের মতো ধারালো ছিল সত্য, কিন্তু তার মধ্যে আবেগের কোমলতা এক বিন্দু ছিল না। সাহিত্যে বুদ্ধি, মনীষা বা মননশীলতার প্রয়োজন ও মূল্য অতি বৃহৎ সত্য, কিন্তু হৃদয়াবেগকে বাদ দিয়ে কোনো উচ্চসাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হতে পারে না। যা হতে পারে তা বিশ্লেষণ ও বিতর্কমূলক সাহিত্য — এক কথায় মননশীল প্রবন্ধ ও সমালোচনা। প্রমথ চৌধুরীর সকল রচনাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গল্প বা পদ্যাকারে লিখিত হলেও আসলে সেগুলি প্রচ্ছন্ন প্রবন্ধ বা বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই নয়; তাঁর পদ্যে কাব্যের গুণ বা গল্পে কাহিনীর মনোহারিত্ব সন্ধান করা বৃথা। লেখক স্বয়ং তাঁর গল্প-কবিতার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, তাঁর পদ্য থেকে উপরি-উদ্ধৃত দু'চারটি পংক্তিতে তা দেখা গিয়েছে। অন্যত্র, 'পদচারণ' বইটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্য-

* আত্মকথা।

গুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে — rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ — reason. এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই।" Rhyme পদ্যের এবং reasonই যে গদ্যের একমাত্র গুণ নয়, একথা অবশ্য প্রমথবাবুর ভালো করেই জানা ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তাঁর পদ্যে rhyme ভিন্ন অন্য যদি কিছু থাকে তবে reason নামক গদ্যের গুণটি; আর তাঁর গদ্যে ওই গুণটিই একমাত্র গুণ না হলেও, অতিপ্রধান। এজন্য পদ্য লিখলেও তিনি যে প্রকৃতপক্ষে কবি নন এবং গল্প লিখলেও তিনি যে আসলে গল্পলেখক নন, এ-বিষয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "আমি প্রবন্ধলেখক, গল্পলেখক নই। আমি অবশ্য পূর্বে দু চারিটি গল্পও লিখেছি — সে কারণ যদি আমি গল্পলেখক হয়ে উঠি, তা হ'লে আমি কবি বলেও গণ্য — কেননা, আমি পদ্যও লিখেছি।" (কথা-সাহিত্য)।

রূপের প্রতি,—বিশেষতঃ বাইরের রূপ অর্থাৎ গঠন-সৌষ্ঠবের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর যে আকর্ষণ ছিল, তাঁর রচনার সর্বত্র তা অতি স্পষ্টরূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। তিনি যে পদ্য লিখেছিলেন, তার কারণ এ-নয় যে, তাঁর মনে কবিত্বের জোয়ার এসেছিল; আসলে পদ্যের সমিল রূপটিই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তাই তিনি বলেছেন,

"ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"

প্রমথবাবুর দুখানি পদ্যগ্রন্থের সকল রচনাই কবিতার কোনো বিশেষ রূপ বা গঠনবৈশিষ্ট্যের নিপুণ উদাহরণস্বরূপ। 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ছাড়া তাঁর 'পদচারণে'ও অনেকগুলি সনেটের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলিতে সনেটের ভাবগভীরতা, দৃঢ়সন্নদ্ধ শব্দব্যঞ্জনা বা কবিত্ব বিন্দুমাত্র নেই। আছে, অতি নিখুঁতভাবে অনুসৃত পেত্রার্কীয় সনেটের গঠন-সৌষ্ঠব; সরল ও চতুর ভাষায় সে-সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সে হিসাবে, প্রকৃতই প্রমথ চৌধুরীর সনেট এক নূতন স্বাদ বহন করে। এই সনেটগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোন

লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই — এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহুরীর নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরি — তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করচে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হয়নি — কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় তুমি যেন ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।" *

বাস্তবিকই, এই সনেটগুলির মধ্যে যা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হচ্ছে এর craftsmanship, অর্থাৎ শিল্পচাতুর্য। এর মধ্যে যে কোথাও ফাঁকি নেই, তার কারণ, এর মধ্যে ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতা নেই এবং শব্দযোজনায় শিথিলতা নেই। রবীন্দ্রনাথ এ-রচনাগুলিকে কারুকার্য করা ইস্পাতের ছুরি বলে একেবারে মূল সত্যটি প্রকাশ করেছেন। এগুলির বাইরের রূপে অতুলনীয় শিল্পনিপুণতার পরিচয় আর বক্তব্যে আক্রমণ ও আঘাতপ্রবণতা অতি স্পষ্ট— এমন কি রক্তের ছোপও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন একজন ওস্তাদ তার্কিক ; বুদ্ধির শাণিত অস্ত্র নিয়ে খেলা করতে তিনি যত আনন্দ পেতেন এমন আর কিছুতে নয়। প্রমথ চৌধুরীর সনেট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র উক্তি সম্বন্ধে আমরা অন্য মত প্রকাশ করতে পারি। সনেটগুলি লিখে প্রমথবাবু সরস্বতীর বীণায় ইস্পাতের তার চড়ান নি, তিনি সরস্বতীর হাত থেকে বীণা সরিয়ে নিয়ে সেখানে তরবারি দিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সনেট-সরস্বতীর পক্ষে এ বেশ বেমানান হয় নি, কারণ এর আগেই তিনি বাগ্দেবীর মুকুট খুলে নিয়ে তাঁকে বনেট পরিয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা ছিল বুদ্ধিসর্বস্ব। আবেগবর্জিত বুদ্ধির প্রাবল্য মানুষকে স্বভাবতঃই বিতণ্ডাপরায়ণ করে তোলে। তদুপরি ফরাসী সাহিত্যের নিবিড় চর্চা প্রমথবাবুকে সকলপ্রকার কন্‌ভেনশেন্ বা প্রচলিত সংস্কার ও প্রথায় আস্থাহীন ক'রে তুলেছিল। কি সাহিত্যে, কি সমাজে, সকল প্রচলিত মত সংস্কার ও প্রথাকে আঘাত করতে পারলে তিনি মহা আনন্দ পেতেন। বিদ্যা ও বুদ্ধি কোনোটারই অভাব তাঁর ছিল না। তিনি দর্শন ও ইংরেজী-সাহিত্যের কৃতী ছাত্র এবং ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যে বুৎপন্ন ছিলেন। আবার, সংস্কৃত সাহিত্য, অলংকার-

* চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড।

শাস্ত্র ও ভারতীয় দর্শনেও প্রমথ চৌধুরীর যথেষ্ট দখল ছিল। সেই সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধি মিশ্রিত হয়ে সব দিক থেকে তাঁকে সংগ্রামপ্রবণ ও সংগ্রাম-কুশল ক'রে তুলেছিল। প্রথম যৌবনে তিনি জয়দেবের রচনাকে আক্রমণ ক'রে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখানেও তাঁর এই সংগ্রামপ্রবণতা এবং প্রচলিত মতকে আক্রমণ করার মনোবৃত্তিই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, যুক্তি অকাট্য হলেও, কেবলমাত্র বুদ্ধিসর্বস্ব বিচার দ্বারা যে সবসময় সাহিত্যের যথার্থ মূল্য-নিরূপণ করা সম্ভব হয় না, তার প্রমাণ, জয়দেবের কাব্য সম্বন্ধে প্রমথ বাবুর যুক্তিগুলি কেউ খণ্ডন করতে না পারলেও, তিনি যে জয়দেবের রচনা সম্বন্ধে নির্ভুল রায় দিয়েছিলেন, একথা মেনে নেওয়া শক্ত। কয়েক বছর পরে লিখিত জয়দেব সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধটি পড়লেই তুলনায় শুধুমাত্র বুদ্ধিনির্ভর কাব্য-সমালোচনার দুর্বলতাগুলি চোখে পড়ে।

প্রচলিত মত ও সংস্কারের বিরুদ্ধে এই aggressive বা 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব, প্রমথবাবুর প্রথম অনুবাদগল্প 'ফুলদানি' রচনাকালেও দেখা গিয়েছিল। সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রতি প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিন্দুমাত্র প্রতিবাদে সংগ্রাম-প্রবৃত্তির স্ফুরণ দুই-ই এ-ঘটনায় পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর নিজের কথাতেই বলি,—"এর পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় Prosper Merimée'র 'Etruscan Vase' একটি গল্প তর্জমা ক'রে 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করি। সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ সাধনায় আমাকে আক্রমণ করেন। দু'টি কারণে, প্রথমত, 'ফুলদানি'র মত গল্প বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত করা অনুচিত বলে; দ্বিতীয়ত, পাকা ফরাসী লেখকের লেখা কাঁচা বাঙ্গলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গ সাহিত্যে চলতে পারে না, সে কথা মানিনে। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজ্‌ম্‌কে আমি কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি।"* তিনি যে রবীন্দ্রনাথের মত মানেন না, একথা প্রমাণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সোজাসুজি তর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ 'কার্মেন' অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, যা হচ্ছে আরো অশ্লীল।

* আত্মকথা।

এই 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব প্রমথ চৌধুরীর পদ্য, গল্প ও প্রবন্ধ সর্বত্র অতি প্রকট। সেই সঙ্গে কৌতুকবোধও তাঁর মধ্যে অতি প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তিনিও কৃষ্ণনাগরিক ছিলেন, এবং তাঁর প্রবল হাস্যরসবোধও তিনি কৃষ্ণনাগরিক প্রভাব বলেই মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, "চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ান হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিস্‌ম্, ঝুঁটো ধর্ম ও নানাপ্রকার সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।"

যদিও 'বীরবলে'র নামে প্রকাশিত হয় নি, তবু 'পদচারণ' ও 'সনেট পঞ্চাশৎ' এর পদ্যগুলি মিছরির ছুরিই বটে। সেগুলির শিল্পচাতুর্য ও লঘু-হাস্যের আমেজ খুবই চিত্তাকর্ষী, কিন্তু সেই লঘুতার অন্তরালে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের খোঁচাগুলি বেশ অনুভব করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

"জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।
নীতি আর রাজনীতি আর ধর্মনীতি,
যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।"

(বন্ধুর প্রতি, পদচারণ)।

"পোড়া কিম্বা তোড়া নয় যাহার হৃদয়,
বুক আর মুখ যার আছে মেরামত,
কবিতা তাহারে নয় সহজে সদয়,—
শব্দ ধরে জব্দ করা তারি কেরামৎ।"

(কাব্যকলা, সনেট-চতুষ্টয়, পদচারণ)।

"কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কসুর।
প্রথম মুস্কিল মেলা চরণে চরণ,

দ্বিতীয় মুস্কিল শেখা একেলে ধরণ,
তৃতীয় মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বশুর !"
(কবিতা, সনেট-চতুষ্টয়, পদচারণ)।

"এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হ'তে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার জেঠ, আকৃতি কনেঠ।
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ !" (কৈফিয়ৎ)।

অসাধারণ বিশ্লেষণ-ক্ষমতার অধিকারী এই লেখক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে নিজের রচনার যেরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য ও পদ্যরচনা সকলই ক্ষুরধার বুদ্ধির তীক্ষ্নতায় শাণিত, বিচার-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম মননে মণ্ডিত হলেও, এই বুদ্ধিপ্রধান রচনাগুলি প্রমথবাবুর প্রবল হাস্যরস-বোধের স্পর্শহেতু কখনো নীরস হয়ে উঠতে পারে নি। প্রমথবাবুর হাস্য প্রায় সর্বত্রই ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে চতুর বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে, এবং বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মার্জিত বিদগ্ধ মনে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিদ্রূপ করতে যে তিনি ভালবাসতেন, 'সনেট-পঞ্চাশৎ'এর 'হাসি ও কান্না' কবিতায় সেকথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন,

"আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মল অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি।"

'সনেট পঞ্চাশৎ'এর কবিতাগুলি গঠনসৌষ্ঠবে নিখুঁত হলেও সেগুলি ভাবগভীর নয়, ব্যঙ্গাত্মক বা আক্রমণাত্মক এবং মৃদুহাস্যে বিচ্ছুরিত। এ-কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি, নিচের উদাহরণ-গুলিতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

"নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।

বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার
এ কথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ॥” (সনেট)।

“প্রিয় কবি হতে চাও লেখো ভালবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা!” (উপদেশ)।

“হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদ্ঘর্ম
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!”
(Bernard Shaw)।

“বলিহারি কবি-ভর্ত্তা M. A. আর B. A.
বাল-বধূ লতিকার ঝুলিবার তরু।
মানুষ মরুক্ বেঁধে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক কবিতার যত কাম-গরু।” (বালিকা বধূ)।

“মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙ্গেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে ডুবিনি বিলাসে।
চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজলাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ টানিয়া চরসে।
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে।
পয়সা করিনি আমি পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব॥” (ব্যর্থ জীবন)।

“কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কর,
দুদিনে সবাই যাবে বেবাক ভুলিয়ে।

কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর॥”

(আত্মকথা, সনেট পঞ্চাশৎ)।

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, এই কবিতাগুলির মধ্যে আর যাই থাক, কবিত্ব নেই। এ যেন পদ্যাকারে বিবৃতি, সমালোচনা বা উপহাস। প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলি সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করে বলা যায় যে, তার মধ্যে অতি ক্ষীণ গল্পবস্তুর সূত্র ধরে লেখক কোনো সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক বা লৌকিক সমস্যা নিয়ে বিতর্কমূলক বা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এ-গল্পগুলিতে লোকপ্রচলিত মত, বিশ্বাস ও সংস্কারকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন, এবং তার জন্য পুরোপুরি যুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছেন, হৃদয়াবেগের বিশেষ ধার ধারেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ‘চার ইয়ারী কথা’র উল্লেখ করা যায়। এর চারটি গল্পেরই নায়ক বাঙালী হলেও নায়িকারা যে সকলেই বিদেশী, তার একমাত্র কারণ এই নয় যে পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আরো একটি কারণ এই যে, প্রেমের যে চারটি কাল্পনিক (hypothetical) দৃষ্টান্ত লেখক বেছে নিয়েছিলেন, সেরূপ প্রেম বাঙালী সমাজে ঘটা স্বাভাবিক নয়। চার ধরণের লোকের উপর এই চার প্রকার কাল্পনিক প্রেমের প্রভাব কিরূপ হতে পারে, এ-সম্বন্ধে লেখকের মননসঞ্জাত সিদ্ধান্তই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। অবশ্য ‘চার ইয়ারী কথা’র শেষ গল্পটি ভূতের। কিন্তু এখানেও এক বিশেষ ধরণের সামাজিক অবস্থায় একমুখী প্রেমের একটি কাল্পনিক রূপ দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।

‘চার ইয়ারী কথা’য় যেমন, তেমনি ‘আহুতি’ প্রভৃতি অন্যান্য বইয়ের গল্পেও গল্পবস্তুর চেয়ে একটি যুক্তিসমন্বিত বক্তব্য উপস্থিত করবার দিকেই লেখকের ঝোঁক দেখতে পাই। এক কাল্পনিক প্রতিপক্ষ খাড়া করে তিনি সুযোগ পেলেই বিতর্কের অবতারণা করেছেন। এজন্য গল্প বা কবিতা যাই লিখুন, প্রমথ চৌধুরী আসলে একজন প্রবন্ধকার এবিষয়ে সংশয় করা যায় না।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর সকল রচনায়

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অতি স্পষ্ট। তিনি পদ্যে নিখুঁতভাবে সনেট, Terza Rima Triolet প্রভৃতি পদ্যের বিভিন্ন গঠন ও ছন্দকলা বাংলায় আমদানি করেছেন। তাঁর গল্পের পাত্রপাত্রী ও পরিবেশ প্রায়ই ইউরোপীয়, এমন কি ইংরেজী শব্দও তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সর্বত্র অবাধে ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের সামাজিক স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য এবং যুক্তিনিষ্ঠা প্রমথবাবুকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু অন্তরে অন্তরে বাংলাদেশ ও তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যে নিবিড় প্রীতি ছিল, তাই তাঁকে একাধারে সাহিত্যসমালোচক, রাজনৈতিক প্রবন্ধলেখক ও উচ্চশ্রেণীর ভাষাশিল্পীতে পরিণত করেছে। তিনি বলেছেন, "আমি আহারাদি বিষয়ে নকল ইংরেজ হলেও মনোভাবে খাঁটি স্বদেশী বাঙ্গালী ছিলুম। আমাকে পরে কোন কোন সাহিত্যসমালোচক বিলেত-ফেরৎ ব'লে খোঁটা দিয়েছেন। এ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। পদ্যলেখক আমি সরস্বতীর মাথায় বনেট পরিয়েছি; আর গদ্যলেখক হিসাবে আমার লেখার মাথায় হ্যাট পরিয়েছি।"* ইংরেজি সাহিত্যের গঠনকলা, ভাষারীতি, বাক্‌ভঙ্গি, যুক্তিনিষ্ঠা ইত্যাদি প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচনায় আহরণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু মনে মনে তিনি যে খাঁটি বাঙালী ছিলেন, তা তাঁর বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি এবং দেশপ্রেম থেকেই বোঝা যায়। তিনি সাহিত্যবিষয়ে যত তর্ক ও আলোচনা করেছেন, রাজনীতি বিষয়েও তার চেয়ে বিশেষ কম করেন নি। এবং উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি দ্বারা প্রতিপক্ষের যুক্তি ও মন্তব্যকে অবলীলাক্রমে খণ্ড খণ্ড করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর সকল রচনার একটি সাধারণ গুণ, তা মৃদুহাস্যের শুভ্র কিরণে উজ্জ্বল। অবশ্য, প্রমথ চৌধুরীর রচনার হাসি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই উপহাস, তাকে নিছক কৌতুক বলে বর্ণনা করা চলে না। কিন্তু সাহিত্যের হাসি সম্বন্ধে তাঁর মত দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করেছিলেন। "সাহিত্যে কেবল আমাদের মিষ্টি হাসিই হাসতে হবে, এ কথা আমি মানিনে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে বলেছেন যে কাব্যে বিদ্রূপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটার

* আত্মকথা।

প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে শুধু তার উপ্‌টুকু থাকে, তার রূপটুকু থাকে না।" † চিরকাল রূপের ভক্ত প্রমথ চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের মতো ভুল করেন নি। তাই তাঁর বিদ্রূপের হাসিও হাসিই রয়ে গেছে—শুধু 'উপ্‌'টুকুতে পর্যবসিত হয় নি।

তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশ্বাস করতেন যে হাস্যরস সকল বিষয়কেই আলোকিত করে। তাই তিনি লিখেছেন,

"কবিতায় কেহ করে জীবনের ভাষ্য,
কেহ বা প্রকাশে ছন্দে কল্পনার লাস্য,
জ্ঞানের ঔদাস্য কিম্বা প্রণয়ের দাস্য;
এসব ছায়ার গায়ে আলো ফেলে হাস্য।"
(সিকি, পদচারণ)।

এবং তিনি মনে করতেন যে,

"জীবনের দিবসের স্বল্প পরিসর,
ঘিরে তারে আছে ঘন অনন্তের ছায়া।
যদিচ ধরেছি সবে দু'দিনের কায়া,—
হাসির কাজের তবু আছে অবসর।" (হাসি)।

প্রমথ চৌধুরী গদ্য বা পদ্য যাই লিখেছেন, কোনো কিছুতেই ব্যঙ্গ-উপহাস-পরিহাসের স্পর্শ দিতে তিনি ভোলেন নি। তাঁর সকল ব্যঙ্গ ও কৌতুক বুদ্ধিদীপ্ত, চতুর বাক্যে প্রকাশিত, প্রধানতঃ উইট্‌ শ্রেণীর। পদ্য রচনা থেকে যে-সব অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার থেকেই পাঠক তাঁর পদ্যাশ্রিত হাস্যরসের পরিচয় পাবেন। তাঁর উইট্‌মণ্ডিত গদ্যেরও কিছু কিছু উদাহরণ নিচে উদ্ধৃত করছি।

"যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিল্‌লে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিল্‌লে কেন যে তা কবিতা না হয়ে গদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া, বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোন কথাই মেলে না, তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে,— এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি।" (বর্ষার কথা, বীরবলের হালখাতা)।

---

† পৃঃ ৮৯ দ্রষ্টব্য।

"ইতিহাস-শব্দ সম্ভবতঃ হস্ ধাতু হ'তে উৎপন্ন — অন্ততঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এমন কি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্ম-শ্লাঘাপরায়ণ বাঙ্গালীজাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।" (চুটকি, বীরবলের হালখাতা)।

"আসলে ছেলেরা ভালবাসে শুধু রূপকথা,— স্বরূপ কথাও নয়, অরূপ কথাও নয়।" (শিশু-সাহিত্য, বীরবলের হালখাতা)।

"কাগজের বই থেকে জীবনের উপাদান সংগ্রহ করা যদি চুরি হয়, তা হলে জীবনের বই থেকে তা সংগ্রহ করাও চুরি। সত্য কথা এই যে, মানুষের সুমুখে দু'টি জগৎ প'ড়ে রয়েছে — তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকৃতির হাতে গড়া, অপরটি মানুষের হাতে গড়া। এই উভয় জগৎ থেকে মনের খোরাক সংগ্রহ করবার আমাদের সমান অধিকার আছে।" (কথা সাহিত্য)।

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে যা মনোহরণ করে, তা বাক্‌চাতুরী। অর্থাৎ একটি সাধারণ কথাকে প্রমথ চৌধুরী এরূপ চতুরভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, কথাটি কেবল নূতন বলে মনে হয় না, নির্জলা সত্য বলেও মনে হয়; যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের মতভেদ ঘটা সম্ভব।

গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়ে প্রমথবাবু 'বীরবল' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। নামটি তিনি ভেবে চিন্তে না নিলেও, রসিকতা-প্রবণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি 'বীরবলে'র নামটি তাঁকে খুব মানিয়েছিল। এ-সম্বন্ধে ১৩৩৩-এ 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'বীরবল' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "বছর কুড়িক আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করেছিলুম। এ নামের দুটি গুণ: প্রথমতঃ নামটি ছোট, দ্বিতীয়তঃ শ্রুতিমধুর। এ নাম গ্রহণ ক'রে আমি স্বজাতিকে বাদশাহের পদবীতে তুলে দিয়েছি; সুতরাং তাঁদের এতে খুশি হবারই কথা।"

প্রমথবাবুর সকল রচনার মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস

অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু যুদ্ধের চোখা-চোখা অস্ত্রগুলিকে প্রমথবাবু রসিকতা ও চতুর বাক্যের আবরণে আপাতপ্রচ্ছন্ন ক'রে দিতে পেরেছিলেন।

পরিশেষে, 'সবুজপত্রের' ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে দু'চার কথা না বললে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা যাবে না।

সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে যে 'মল্লযুদ্ধে' অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, সে-কথা আমরা কিছু কিছু আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। তাঁদের হাতে বড় বড় জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাও ছিল অনেক। এঁরা যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের উপর গালিবর্ষণ করতেন, ঠিক সে-ভাবে প্রত্যুত্তর দেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সবসময় সম্ভব হোত না। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার কাজও ধারাবাহিক-ভাবে অনেকদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সহায় ছিল তাঁর প্রতিভা ; সমস্ত গালিগালাজ ও আক্রমণকে অতিক্রম করে তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল। বিশেষতঃ, তরুণ ছাত্র ও শিক্ষিত পাঠকমহলে রবীন্দ্রনাথের ভক্তসংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছিল এবং একটি তরুণ শক্তিশালী রবীন্দ্রভক্ত সাহিত্যিক-গোষ্ঠীরও উদ্ভব হয়েছিল। এই দলের লেখকরা অনেকেই পরে 'ভারতী'র লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন।

রবীন্দ্রভক্ত রবীন্দ্রসমর্থক লেখকদলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ লেখকেরা। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিষোদ্গারণ কবি নোবেল প্রাইজ পাবার পরেও শেষ হয় নি। ১৩১৯-এ 'আনন্দ বিদায়ে'র অভিনয়ে বিপর্যয় ঘটার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ একদল রবীন্দ্র-বিদ্বেষী অনেকটা সংযত হলেও, বিপিনচন্দ্র পাল আর একপ্রস্থ রবীন্দ্র-নিন্দার সূত্রপাত করলেন। রবীন্দ্রনাথের পরিত্যক্ত 'বঙ্গদর্শন' এবং চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' হ'ল বিপিনচন্দ্র পালের আক্রমণের মুখপত্র। এই তীব্র আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্র কাব্যালোচনা আরম্ভ করেছিলেন এবং সত্যেন্দ্র দত্ত দু'চারটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখে (যথা 'বস্তুতান্ত্রিক') বিপিন পালকে প্রতিআক্রমণ করছিলেন। কিন্তু

আক্রমণের তীব্রতার তুলনায় সে-জবাব ছিল অতি-মৃদু। এ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বয়ং কোমর বেঁধে প্রবৃত্ত হবার মতো অবসর বা প্রবৃত্তি কিছুই রবীন্দ্রনাথের তখন ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপময় রচনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথকে আগে থেকেই আকৃষ্ট করেছিল। এঁর পরিচালনায় প্রাচীনপন্থী সমালোচকদের আক্রমণের উপযুক্ত উত্তর দেবার জন্য সাহিত্যে নবযৌবনের প্রতীকরূপে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করবার কথা এসময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে আসে। প্রমথবাবুও এইরূপ ইচ্ছা ছিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে উৎসাহিত করতে থাকেন। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো।... কাগজটার নাম যদি "কনিষ্ঠ" হয় তো কিরকম হয়। আকারে ছোট — বয়সেও।" প্রবীণ এবং "পরম পাকা"দের কথা স্মরণ করেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ 'কনিষ্ঠ' নাম দিতে চেয়েছিলেন ; শেষে, যৌবনের প্রতীকরূপে 'সবুজপত্র' নাম স্থির হয়।

এতদিন বিপিনচন্দ্রের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা। এখন 'সবুজপত্র'ও সে আক্রমণের আওতায় এসে পড়লো। 'সবুজপত্রে'র রচনাগুলিকে আক্রমণ করেই বিপিনচন্দ্র ক্ষান্ত হলেন না, তিনি প্রমথবাবুর "অসাধু" ভাষায় আক্রমণের এক বিশেষ ছিদ্র পেলেন। কিন্তু প্রমথবাবুকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রমথবাবুর বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রূপোজ্জ্বল শাণিত বাক্যবাণের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে পারলেন না। চলতি ভাষার প্রচলন করতে গিয়েও প্রমথবাবুকে বহু লেখালেখি করতে হয়েছিল। কিন্তু তর্ক করতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। বরং তর্কে অবতীর্ণ হতে পারলে তিনি যেন মহা আনন্দ পেতেন। প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ তীব্র আক্রমণের মুখে শেষ পর্যন্ত সকল বিরুদ্ধ সমালোচককেই নীরব হতে হয়েছিল।

'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'সবুজপত্র' বলতেই এককালে প্রমথ চৌধুরীকে বোঝাতো। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই লেখক এবং প্রেরণাদাতারূপে এ-পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে এবং চলতি ভাষা চালাবার জন্য ক্লান্তিহীন লেখনীযুদ্ধ বলতে গেলে প্রমথ চৌধুরীকে একাই

চালাতে হয়েছিল। 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে তিনি একটি মননশীল লেখকগোষ্ঠীও গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এঁরা পরবর্তীকালে সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ লেখকদের নাম উল্লেখ করা যায়। 'সবুজপত্রে'র মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ লেখনী রবীন্দ্রনাথের সমালোচকদের যোগ্য উত্তর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পথ অনেকটা সুগম করে দিতে পেরেছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক মহৎ কৃতিত্ব। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকেও গদ্যরচনায় চলতি ভাষা ব্যবহারে প্রবৃত্ত করেন। এ-ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান গদ্যলেখক, পদ্য-রচয়িতা হিসাবেও তাঁর কিছু কৃতিত্ব আছে। কিন্তু কি গদ্যে কি পদ্যে, তাঁকে একজন কারুশিল্পী বা craftsman বলেই গণ্য করতে হবে। তিনি চলতি ভাষাকে গল্প-প্রবন্ধ ইত্যাদি সকল রচনার উপযোগী ক'রে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার বিশেষ গুণ হচ্ছে তার লঘু স্বাচ্ছন্দ্য ও চতুর বাক্‌ভঙ্গি। এ-বিষয়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের মতোই তিনি অভিজাত সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, মার্জিত-মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চতুর ভাষাশিল্পী। ভারতচন্দ্র ভাষা-ছন্দ নিয়ে যে খেলা করেছেন, এবং তাঁর রচনার সর্বত্র যে উইট-আশ্রিত বিদ্রূপাত্মক হাসির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন, তা প্রমথ চৌধুরীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি যে ভারতচন্দ্রের মহাভক্ত ছিলেন, তার কারণ, সাহিত্যিক মেজাজে (temperament) উভয়ের অতি নিবিড় সমধর্মিতা ছিল। শুধু এক জায়গায় প্রভেদ ছিল, ভারতচন্দ্র ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সমাজের কবি, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন চলিষ্ণু সমাজের লেখক। তাই প্রমথ চৌধুরীর রচনায় যে বলিষ্ঠ অগ্রসর মনোভাবের প্রকাশ ছিল, ভারতচন্দ্রের রচনায় তা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। ভারতচন্দ্রকে লিখতে হয়েছিল বিলাসী বড়মানুষের মন-জোগানো অন্তঃসারশূন্য লেখা, কিন্তু প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন তাঁর অন্তরের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত প্রেরণাবশে। তাই প্রমথ চৌধুরীর রচনায় যে-আন্তরিকতার

পরিচয় আছে, ভারতচন্দ্রের রচনায় তা দুর্লভ। ভারতচন্দ্রের ভক্ত হলেও রায়গুণাকরের এ-দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রমথবাবু অনবহিত ছিলেন না, তাই তিনি বলেছেন, "পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন — তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হ'লে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সঙ্ঘটিত হ'ত ; কেন না, Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল।" (সাহিত্যে খেলা, বীরবলের হালখাতা)। কিন্তু 'নটবিটের দলভুক্ত' হলেও ভারতচন্দ্র যে প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯) শুধু কবিতাই লিখেছেন, এবং সে-কবিতাগুলির অধিকাংশই হাসির। এঁর প্রথম বই 'পুষ্পাঞ্জলি' ছাড়া 'ছাইভস্ম', 'আরাম', 'আমোদ', 'পরিহাস' ইত্যাদি সব বই-ই প্রধানতঃ হাসির কবিতার সংকলন, দু'টি-চারটি গম্ভীর কবিতা মাঝে ছড়ানো আছে মাত্র। ইনি অনেকগুলি প্যারডিও লিখেছিলেন, কিন্তু কি প্যারডি, কি মৌলিক হাসির কবিতা, কোথাও যে ইনি খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন, এ-কথা বলা যায় না। 'আরাম' থেকে উদ্ধৃত নিচের পংক্তিগুলিতে পাঠক এঁর রচনার পরিচয় পাবেন।

"বর্গীও আসে না এবং হয় না ক ডাকাতি,
প্রেমেও কারো পড়লাম না ক আমি রাতারাতি,
চারদিকেতে ইলেকট্রিক আর জ্বলছে গ্যাসের বাতি
রাত্রে আঁধার নাই।
ভূত, কি প্রেত, কি বিদ্যাধরী, দেখতে পাই না রাতে,
ইঁদুর লোভে বিড়ালগুলো শুধুই ওৎ পাতে,
কোকিলকণ্ঠ যায় না শোনা এমন জ্যোচ্ছনাতে
চেঁচায় পেঁচারাই।
সহরটাও হ'য়ে এল নেহাৎ গদ্যময়
পদ্য কোথা পাই?" (পদ্য কোথা পাই, আরাম)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। অতুলনীয় চিত্রশিল্পী এবং এ-যুগে ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান স্রষ্টারূপে ইনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছবি আঁকার খ্যাতি তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বকে অনেকটা প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে এবং রবীন্দ্রনাথের অতি-নিকটবর্তী হওয়াতেও সাহিত্যে তাঁর উপযুক্ত খ্যাতি ও মর্যাদালাভে বাধা জন্মেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিত্রশিল্পে ও সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের রূপদৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি প্রায় সমান সার্থকতা লাভ করেছে বলা যায়। ভাষাশিল্পীরূপে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য আর একজন লেখকের নাম করা শক্ত, যাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনা হতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা তাঁর চারদিকে একটি অনুরাগী সাহিত্যিক ও শিল্পীগোষ্ঠী আকর্ষণ করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যমণিস্বরূপ। এই সাহিত্যিক দলের আসর গড়ে উঠেছিল 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে; এবং মনে হয় যে, এ-দলের অনেকেই অবনীন্দ্র-নাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

গান-বাজনা, অভিনয়, চিত্রকলা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের অনুরাগ ও দক্ষতা ছিল। কিন্তু তিনি প্রথমে সাহিত্যরচনায় হাত দিতে সাহস পান নি। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় তিনি 'শকুন্তলা' লিখে সাহিত্যে অবতীর্ণ হন।

অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আগুনের ফুলকি', 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি বই বাঙালী পাঠকমাত্রেরই পরিচিত। কিন্তু তাঁর 'ভূতপত্‌রী', 'খাতাঞ্চির খাতা' প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বইগুলিতে এবং তাঁর শেষ জীবনের যাত্রাপালাগুলিতে অবনীন্দ্র-সাহিত্যের আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, যা বাংলায় সম্পূর্ণ অভিনব ও তুলনাহীন।

সাহিত্যক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের স্থান বিশিষ্ট এবং অদ্বিতীয়। 'সাহিত্য' বলতে সাধারণ পাঠক যা বোঝেন তা গল্প-উপন্যাস-কবিতা। অবনীন্দ্রনাথ অল্পসংখ্যক গদ্য-কবিতা ছাড়া সে-জাতীয় বিশেষ কিছু লেখেন নি ব'লে অনেকসময় লোকে তাঁকে সাহিত্যিক বলে গণ্য করতে ভুলে যায়। তিনি

অনেকগুলি পুরোনো কাহিনীকে নূতন রূপ দিয়েছেন কিন্তু মৌলিক কাহিনী লেখেন নি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কাহিনীকাররূপে নয়, ভাষা-শিল্পী হিসাবে। তাঁর সহজ সরল অথচ চিত্র ও ব্যঞ্জনাময়, আপাত-নিরলংকৃত অথচ কারুকার্যে সমৃদ্ধ, লীলায়িত ও ছন্দোময় অথচ বর্ণনা-বিবরণের উপযোগী ভাষা 'রাজকাহিনী', 'পথে বিপথে', 'আপন কথা'য় সকল পাঠকেরই মন হরণ করে।

অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তাঁর অলোকসামান্য কল্পনার প্রসারে। 'ভূতপত্‌রী' বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ যে উধাও কল্পনাকে মুক্তি দিলেন, সেরূপ বাংলা সাহিত্যে পূর্বে দেখা যায় নি। এ-কল্পনার বৈশিষ্ট্য এই যে তা সম্ভবের সীমানা ছাড়িয়ে আজগুবির স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে, তা খেয়াল-খুশির পথ ধরে চাঁদ-তারার দেশে পাড়ি দেয়; উদ্ভট-অদ্ভুত ছবিতে-কৌতুকে এমন এক অবাস্তব অলৌকিক রাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাতে এই চেনা পৃথিবীটা তার গোলদিঘি-লালদিঘি-জোড়াসাঁকো-হাব্‌ড়ার পুল—সবসুদ্ধ তাঁর পরিচিত রূপ হারিয়ে এক মায়াময় অবাস্তবতার বোধ জাগ্রত করে দেয়; আবার হারুন্দে-কিচ্‌কিন্দে-আকবর-ঔরঙ্গজেব-রণজিৎ সিং-আরব্যোপন্যাস-ইতিহাস-পুরাণ সব তালগোল পাকিয়ে এক অদ্ভুত জাদুতে আমাদের মনের একেবারে অন্দরমহলে এসে হাজির হয়।

বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট-আজগুবি খেয়ালরসের একজন প্রধান কারবারী অবনীন্দ্রনাথ। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কোনো কোনো লেখক অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকা সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের আজগুবি-রসের রচনায় প্রভেদ আছে। সুকুমার রায়ের আপাত-অর্থহীন ছড়াগুলির অন্তরাল থেকে অনেকসময় একটি ব্যঙ্গাত্মক তাৎপর্য উঁকি মারে, একটি প্রচ্ছন্ন বক্তব্যের ছায়া দেখা যায়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট রসের রচনা যেন আমাদের মনকে কল্পনার বিস্তীর্ণ আকাশে নিরুদ্দেশ অলস বিচরণে ডানা মেলিয়ে দেয়। সেখানে কেবল দেখা-শোনা,— ছবির বিলাস আর ধ্বনির আনন্দ। কবি-সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ তাঁদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন,

অবনীন্দ্রনাথ বাস্তব জগৎকেই যেন কল্পনার অলৌকিক রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেন। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়।

আজগুবি-অদ্ভুতের রাজ্যটাই হাসির। যা স্বাভাবিক, গতানুগতিক, প্রথাগত, তা স্বভাবতঃই গম্ভীর, কৌতুকহীন। অবনীন্দ্রনাথের আজগুবি কল্পনার রচনাগুলির মধ্য দিয়েও একটি নিরবচ্ছিন্ন কৌতুকের উজ্জ্বল ধারা বয়ে চলেছে। যেমন, ভূতপত্‌রীর মাঠের শেষে পিসির ছয় পাল্কি-বেহারা— কিচ্‌কিন্দে, কাস্থন্দে, বাস্থন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে আর হারুন্দে পাল্কি বয়ে নিয়ে চললো। কিচ্‌কিন্দে যে কী, সে তো নামেই প্রকাশ। হারুন্দে হচ্ছে আসলে বোগদাদের নবাব হারুন-অল-রশীদ। চার বেহারা পালকি বইছে, কিচ্‌কিন্দে আর হারুন্দে পাল্কির দু'ধারে গল্প শোনাতে শোনাতে চলেছে। হারুন্দে গল্প বলছে, "এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বোলাচ্ছে, ওদিকে রণজিৎ সিং একগাল হাস্‌তে হাস্‌তে কোহিনুর হীরেটার দিকে একচোখে চেয়ে আছে, আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির হয়েছি। দেখি তাজবিবির কবরটার চারিদিকে বুড়ো সাজাহানটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখান থেকে সোজা ফতেপুর শিক্‌রির দিকে সতরঞ্চ চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চমহলের উপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিল। আমাকে দেখে ভারি খুশি! "এসো ভাই বোগদাদি!"— বলে আমাকে পাশে বসালো! তার সঙ্গে পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি তাকে বলি আগরওয়ালা।" কিন্তু কিচ্‌কিন্দে বলে, "শোনো কেন বাবু, ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনো কালে হারুন-অল-রশীদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য-উপন্যাস আর ডিটেকটিভের গল্পের বই পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

পিসির বাড়ী পৌছুবার পর সেখানকার অভিজ্ঞতাও কম কৌতুকাবহ নয়। সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে কুবুদ্ধি ব্যাং মারার ফলে কনস্টেবল রামসিং দোবে এসে তার হাতে দড়ি দিল। ফলে ব্যাঙের দৃষ্টিতে রাম সিং-এর মুখ পুড়ে গেল, —"মুখে আর তার কিছু রোচে না —

নিম লাগে মিষ্টি !
সন্দেশ লাগে তেতো !
মুড়কী লাগে ঝাল।

সে কেবল ঘুস খেয়ে খেয়ে, ধমক খেয়ে খেয়ে, ছিষ্টি ব্যাঙের গালাগালি খেয়ে খেয়ে, বেড়াতে লাগলো।”

ভূতপত্‌রীর দেশের আজগুবি কল্পনায় রূপকথা, উপকথা, ছড়া, ইতিহাস, পুরাণ, প্রবাদ সব মিলে মিশে এমন এক আশ্চর্য অদ্ভুত রাজ্যের সৃষ্টি করেছে যে, কোনটা যে সত্য আর কোনটা সত্য নয় চিনে নেওয়াই শক্ত। কিন্তু এর পরের বই ‘খাতাঞ্চির খাতা’য়, উদ্ভট কল্পনার রাজ্যের সঙ্গে, পুরাণ-ইতিহাস-রূপকথা-ছড়ার সঙ্গে, একেবারে বাস্তব জগতের ঘরসংসার মানুষজন, বুড়ো খাতাঞ্চি আর সোনা-আঙুটি-পাঙুটি-সোনাতন-বোহিম সবাই এক অদ্ভুত-আজগুবির পথ ধরে কোথায় যে উধাও চলেছে তার আর ঠিকানা নেই।

কেউ যেন মনে করবেন না যে, ‘খাতাঞ্চির খাতা’র চরিত্রগুলি সবই পরীদের মতো অবাস্তব কল্পনার হাওয়ায় ফানুসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। খাতাঞ্চি মশায় তো রীতিমত চেনা মানুষ! প্রথম মেয়ের জন্ম-উপলক্ষে সোনাতনকে একটা আধলা বকশিস্ দিয়ে তাঁর মনে আর সোয়াস্তি নেই। ও-আধপয়সা জমাখরচে বকশিস্ বলে লেখা যায়, কি হাওলাত বাদ গত বছরের মাইনে বলে ধরা যায়, সে চিন্তাতেই তিনি গলদ্‌ঘর্ম! তবু বাজে খরচ আটকানো যাবে কিনা বোঝা যায় না! এদিকে পুতুর অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। “একদিন টাপুর-টুপুর বিষ্টি হচ্ছে, আমি একটা ছিপ নিয়ে আদিগঙ্গায় মাছ ধরতে চলেছি, এমন সময় পরীদের রাণীর কাছ থেকে হুকুম এল : নন্দন কাননে শিবঠাকুরের বিয়ে ডানাকাটা পরীর সঙ্গে হবে, সব ঠিক কিন্তু শিবঠাকুরের মন কিছুতেই গলতে চাচ্ছে না, জমে বরফ হয়ে গেছে ; গরম জল খাইয়েও কিছু হয়নি — এখন আমাকে গিয়ে তাঁর মনটি গলিয়ে দিতে হবে, না হলে চলছে না। বিয়েটা দিতে পারলে আমি যা চাই তাই পাব। ··· বিয়ের দিন শিবঠাকুর শিবসদাগর সেজে ময়ূরপঙ্ক্ষিতে চড়ে লালদিঘিতে এসে উপস্থিত। লালদিঘির ঘাটে-ঘাটে, গাছে-গাছে, জলে

স্থলে সেদিন সব জোনাক পোকার পিদিম দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ভূতের কেত্তন, গলাবাজি, ভোজবাজি, ভেল্কিবাজি, বাঁশবাজি, ডিগবাজি, লাঠিবাজি কত বাজিই হচ্ছিল! সবাই জল খাচ্ছিল, হাওয়া খাচ্ছিল, খাবি খাচ্ছিল, বিষম খাচ্ছিল, হোঁচট খাচ্ছিল, চোখ খাচ্ছিল, চুক খাচ্ছিল, সুদ খাচ্ছিল, ঘুস খাচ্ছিল, খাপ খাচ্ছিল, মিশ্‌ খাচ্ছিল, ঘুরপাক খাচ্ছিল, গালাগালি খাচ্ছিল, কিল চড় লাথি ঘুঁসি গুঁতো খাচ্ছিল, মোচড় খাচ্ছিল, কানমলা খাচ্ছিল,— কত খাবারের নাম করব, এমন খাওয়া কোথাও খাই নি। নুন থেকে কচুপোড়া আর ঘণ্টা পর্যন্ত!

এত খাওয়া-দাওয়া, তবু শিবঠাকুরের মন গলছে না।"

অবনীন্দ্রনাথের রচনার জাদুতে আমাদের এই চেনা জগৎ-সংসারের মানুষজন, মাঠ-ঘাট, গলি-ঘুঁজি আর মানুষের সব দুর্বলতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলে মিশে অবাস্তবতার আজগুবি দেশে গিয়ে হাজির হয়। আর এই যে বাস্তবে-অবাস্তবে, কাজে-খেলায়, স্বপ্নে-কল্পনায় মেশামেশি, এর অসংগতির মজাটুকু স্বচ্ছতোয়া নদীর মতো কৌতুকের ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। অবনীন্দ্রনাথকে ঠিক হাস্যরসিক লেখক বলে বর্ণনা করা যায় কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর কোনো রচনাই গম্ভীর মুখে পড়া যায় না; একটি নিরবচ্ছিন্ন মৃদুহাস্যের আমেজ পাঠকের মনকে সর্বক্ষণ ভরপুর ক'রে রাখে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ১৮৭৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী (২২শে মাঘ) জন্মগ্রহণ করেন। এফ্‌-এ পড়বার সময় তাঁর বিবাহ হয়। বি. এ. পাশ করার পর প্রথম অস্থায়ীভাবে কিছুদিন সিমলাতে এবং পরে স্থায়ীভাবে কলকাতায় তিনি ভারত সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অল্পবয়স থেকেই কবিতা লিখতেন; তাঁর কয়েকটি কবিতা 'ভারতী দাসী', 'প্রদীপ' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পদ্যলেখক প্রভাতকুমার প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহেই গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। এ-বিষয়ে তিনি নিজে বলেছেন, "রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম —'কবিতার মা বাপ নাই,

যা খুসী লিখিয়া যাই — কবিতা হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ; সে পাণ্ডিত্য আমার কই ?'

ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, 'গদ্য রচনার জন্য প্রথম জিনিস হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি।' ইহার ফলে 'দাসীতে' চিত্রার এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই, তাহাতে কোন নাম দিই নাই ; আর, প্রদীপের জন্য ওই গল্প (শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি) রচনা করি।" 'প্রদীপে' 'রাধামণি দেবী'র বেনামীতে ছাপা হয় শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' এবং 'বেনামী চিঠি'। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে এই দুটি গল্পেরই প্রশংসাসূচক সমালোচনা করেছিলেন। "দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে 'প্রদীপে' নিজ মূর্তি ধরিয়া বাহির হইলাম। 'অঙ্গহীনা' এবং 'হিমানী' গল্প দুইটি আমার স্বাক্ষর-যুক্ত হইয়া বাহির হইল।" 'রাধামণি দেবী' নামে তাঁর কয়েকটি গল্প 'কুন্তলীন পুরস্কারে' প্রকাশিত ও পুরস্কৃত হয়েছিল।

এ-সব ১৮৯৬-৯৭ সালের কথা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাতকুমারের স্ত্রীবিয়োগ হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারিতে তিনি বিলেত যান এবং প্রায় তিন বৎসর পরে, ১৯০৩-এর ডিসেম্বরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এর পর কয়েক বৎসর দার্জিলিং, রংপুর, গয়া প্রভৃতি স্থানে প্র্যাকটিস করার সময় তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভাতকুমারের গুণানুরাগী নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় 'মানসী' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করলে ইনি তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। পরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'মানসী ও মর্মবাণী' সংযুক্ত-রূপে প্রকাশিত হবার সময় জগদিন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে সহযোগী সম্পাদক ক'রে নিয়ে কলকাতায় তাঁর স্থায়ী বসবাসের সুযোগ ক'রে দেন। মহারাজা প্রভাতকুমারকে আইন কলেজের অধ্যাপনার কাজে প্রতিষ্ঠিত হতেও বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

প্রভাতকুমার ছোটগল্পের বই অনেকগুলিই লিখেছিলেন। যথা, 'নবকথা', 'ষোড়শী' 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি', 'পত্রপুষ্প', 'গহনার বাক্স', 'হতাশ প্রেমিক, 'বিলাসিনী', 'যুবকের প্রেম', 'নূতন বউ'

ও 'জামাতা বাবাজী।' 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'আরতি', 'সত্যবালা', 'সিন্দূর কৌটা', প্রমুখ অনেকগুলি উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমারের প্রধান কৃতিত্ব তাঁর উপন্যাসে নয়, ছোটগল্পে। যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও উৎসাহেই তিনি গদ্য এবং গল্পরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন, তবু, ছোটগল্প-রচনায় প্রভাতকুমারের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পাশাপাশি প্রভাতকুমার এক নূতন এবং বিশিষ্ট গল্পধারারই প্রবর্তন করলেন বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথই আমাদের সাহিত্যে ছোটগল্পের স্রষ্টা ; এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পের রূপ ও রস বৈচিত্র্যে ও গভীরতায় তুলনাহীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি কবির কলমে লেখা, তাই সেগুলির মধ্যে মানুষের হৃদয়াবেগ, বিশেষতঃ স্নেহ-প্রেম-প্রীতি প্রভৃতি মানবধর্ম-সঞ্জাত সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ অথবা ব্যর্থতা ফুটিয়ে তোলবার জন্য যেটুকু উপকরণ প্রয়োজন, সেইটুকুরই মাত্র রবীন্দ্রনাথ অবতারণা করেছেন। এজন্য অতি সামান্য ঘটনার সূত্র ধরে তাঁর একেকটি গল্পের কাব্য গড়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি' 'জীবিত ও মৃত', 'কাবুলিওয়ালা', 'বিচারক', 'ঠাকুরদা', প্রমুখ বহু বিখ্যাত গল্পের নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের যে-সব গল্প অপেক্ষাকৃত ঘটনাবহুল সেখানেও ঘটনাগুলি যেন উপলক্ষ, মানবহৃদয় ও মানবধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি ও চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। যথা, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'গুপ্তধন', 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি। এক কথায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গল্প ঘটনাপ্রধান নয়; বক্তব্যপ্রধান। এজন্য রবীন্দ্রনাথের গল্প অনেক সময়ই একটি সুখসমাপ্তিতে এসে পৌছয় না। এমন কি কাহিনীটি শেষ হল না, এইরূপ একটি বোধ অনেক সময়ই পাঠকের মনে উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যতই কাহিনীবৈচিত্র্য থাকুক, কাহিনীটি কখনোই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে নি। সেখানে আমাদের সমাজের অতি বাস্তবরূপ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকেরা তাঁর গল্পগুলিকে কাব্যধর্মী ব'লে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করলেও মূলতঃ সমালোচকদের উক্তি যথার্থ বলে মানতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গল্প যে ঘটনাবহুল নয়, প্রভাতকুমারও তা লক্ষ্য করেছিলেন,

এবং ফকিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "তাঁহার ছোট গল্পগুলিও ঘটনাবিরল — রসপ্রধান। ধরুন তাঁহার "কাবুলিওয়ালা!" কি বা ঘটিল? কিছুই নহে। ··· রবীন্দ্রবাবুর অনেকগুলি গল্প এইরূপ Emotionএর স্বর্ণরেখায় উদ্ভাসিত।" রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে 'ঘটনাবিরল' বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। কোথাও কোথাও সে-গুলি ঘটনাবহুল হলেও ঘটনা কখনোই প্রাধান্য পায়নি, emotion বা হৃদয়াবেগই প্রাধান্য পেয়েছে।

অপরপক্ষে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পে ঘটনার গতিই পাঠকের মন আকর্ষণ করে। তা কেবল ঘটনা-বহুল নয়, ঘটনা-প্রধান। অবশ্য এর অর্থ নয় যে, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পে হৃদয়দ্বন্দ্ব বা হৃদয়াবেগ অনুপস্থিত; সেরূপ হলে কোনো গল্পই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য, গতি ও পরিণতিই সেখানে সুখদুঃখ প্রণয়সংঘাতের ছবি ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সঙ্গে প্রভাতকুমারের গল্পের আরো একটা প্রভেদ এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে মানবমনের অতিগভীর স্তরের সূক্ষ্মতম আবেগগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন, প্রভাতকুমার সেখানে মানুষের জীবনের সাধারণ স্তরের হাসিকান্না আনন্দনৈরাশ্যকে রূপ দিয়েছেন। এজন্যই রবীন্দ্রনাথের গল্প কাব্যপাঠের আনন্দ দেয়, কিন্তু প্রভাতকুমারের ছোটগল্প কাহিনীর কৌতূহল ও রস উপস্থিত করে; এবং, ঐ একই কারণে, প্রভাতকুমারের গল্প সাধারণ পাঠককে বেশি আনন্দ ও তৃপ্তি দেয়। অনেকেই জানেন যে, ছোটগল্প রচনায় প্রভাতকুমারের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা গল্পলেখক-রূপে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাকে অতিক্রম করেছিল। এর কারণ, প্রভাত-কুমারের ছোটগল্প প'ড়ে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী পাঠের আনন্দ পাওয়া যায়।

শুধু কাহিনীর সম্পূর্ণতার জন্য নয়, আরো দু'টি কারণে প্রভাতকুমারের গল্প অত্যন্ত সুখপাঠ্য। প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রোমান্টিক। তিনি বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ মান-অভিমান প্রভাতকুমারের রচনায় খুব উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে সময়ে সে-সমাজে যে রোমান্স সহজে দেখা দিত না, তাকে প্রভাত মুখো-

পাধ্যায় অতি সহজভাবে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে অবতীর্ণ ক'রে তৎকালীন বাঙালী মনের আকাঙ্ক্ষিত কল্পনাকে তৃপ্তি দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য, প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসের সবই যে মিলনান্ত বা সুখসমাপ্ত তা নয়, কিন্তু একটি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনায় স্বতঃসিদ্ধ ছিল। তাঁর কাহিনীর ঘটনা ও চরিত্রগুলিতে বিন্দুমাত্র অবাস্তবতা নেই, কিন্তু তৎকালীন বাঙালীসমাজে যেটুকু রমণীয় ও চিত্তাকর্ষী, তাকেই তিনি বিশেষভাবে দেখিয়েছিলেন। তিনি বিলেত-ফেরৎ সমাজের এদেশীয় এবং সেদেশীয় জীবন উভয়কেই তাঁর গল্পে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন এবং পশুর সঙ্গে মানুষের স্নেহ-সম্পর্ক নিয়েও কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছিলেন।

প্রভাতকুমারের রচনার আরেকটি আকর্ষণ ছিল তাঁর সহজ সরল ভাষা ও বর্ণনা এবং একটি হাস্যময় রচনাভঙ্গি। প্রথমাবধিই হাস্যরসের দিকে প্রভাতকুমারের ঝোঁক ছিল। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা' প্রকাশের পর তিনি 'অভিশাপ' নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য প্রকাশ করেন। এতেই পদ্য রচনার দিকে এবং হাসি-ব্যঙ্গের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। 'অভিশাপে'র রচনার একটু উদাহরণ দিই।

"তাই আমি নাহি যাব চক্ষুকর্ণ রোধ করি
নাম-জপ-তরণীতে ভক্তি-নদী বাহি ;
হে কাণ্ডারী গুরুদেব, চরণে প্রণাম করি,
অতশীঘ্র অধমের মোক্ষে কাজ নাহি।"

প্রভাতকুমারের রচনা — বিশেষতঃ ছোটগল্পগুলির মধ্য দিয়ে একটি কৌতুকের মৃদু ধারা বয়ে চলেছে। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই—এবং উপন্যাসেও—এই কৌতুকময় পরিবেশের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের বই 'নব-কথা' ও 'ষোড়শী' প'ড়ে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, "তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।" প্রকৃতই, প্রভাতকুমারের গল্পে লঘুস্বাচ্ছন্দ্য এবং হাসির আমেজ একটা বৃহৎ আকর্ষণ।

সমস্ত রচনায় প্রবহমান এই মৃদু হাসির ধারা ছাড়াও, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কতকগুলি গল্পকে বিশেষভাবে হাস্যরসপ্রধান বলে বর্ণনা করা যায়। যেমন, 'নিষিদ্ধ ফল', 'সখের ডিটেক্‌টিভ', 'যুগল সাহিত্যিক', 'প্রণয়-পরিণাম', 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা' প্রভৃতি। হাস্যরসপ্রধান হলেও এ-গল্পগুলি যে বিশেষ একটা কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা, তা নয়; এগুলির মধ্যে যে লেখক বিশেষ কোনো হাস্য-পরিহাস বা রসিকতার অবতারণা করেছেন, তাও নয়। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রচনার হাসি সে-জাতীয় ছিল না। মাঝে মাঝে বর্ণনা বিবরণে মৃদু কৌতুকময় রচনাভঙ্গির দেখা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁর গল্পের হাসি উৎপন্ন হয়েছে প্রধানতঃ ঘটনা-সংস্থান দ্বারা। প্রভাতকুমার এমন কতকগুলি সম্ভাব্য সিচুয়েশন্ কল্পনা করেছিলেন, যা অত্যন্ত হাসির। এখানে লেখক শুধু বিবরণদাতা — narrator। প্রভাতকুমারের রচনাভঙ্গি অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত; Subjective নয়, objective শ্রেণীর। তিনি স্বয়ং কোনো রসিকতা করেন নি বা স্পষ্টতঃ কৌতুক করবার কোনো প্রয়াস করেন নি; ঘটনার গতিতে প্রবল কৌতুক আপনিই জমে উঠেছে। ধরা যাক্, 'বলবান জামাতা'। অল্পবয়সে নলিনী যখন বিয়ে করতে একদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি এসেছিল তখন তার চেহারাটি ছিল নামের মতোই কোমল, এমন কি মেয়েলি বলা যায়। এ নিয়ে শ্যালিকা-পক্ষ থেকে তাকে নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। মর্মাহত হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেই সে শরীরচর্চায় মনোনিবেশ করলো। নিয়মিত স্যাণ্ডো-চর্চার ফলে তার শরীর বলিষ্ঠ হ'ল, চেহারায় কাঠিন্য এল। বেশ কিছুদিন পরে এবার সে যখন শ্বশুরবাড়ি রওনা হ'ল, তখন তার মনে এই আনন্দ যে, এবার আর কেউ তাকে 'কোমল কোমল কোমল অতি' বলে ঠাট্টা করতে পারবে না। ইতিমধ্যে শ্বশুরবাড়ি-অঞ্চলে এক ঠক জামাই সেজে কোনো বাড়িতে ঢুকে টাকাকড়ি চুরি ক'রে পালিয়েছে। সে স্থান তখন সেই আলোচনায় মুখর। এ সময়ে আমাদের জামাই যখন নিজের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পৌছুলো, তখন কোমল-দেহ নলিনী বলবান জামাতারূপে আবির্ভূত হওয়ার ফলে কেউ তাকে চিনতে পারলো না, 'ডাকু' সন্দেহে সে সেখান থেকে অপমান

সহকারে বিতাড়িত হল। তার আগমনবার্তা নিয়ে তার চার আনা দামের টেলিগ্রামখানা যথাসময়ে এসে না পৌছনোতেই এই বিভ্রাট। সে যখন পুনরায় রেলওয়ে স্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তখন শ্বশুর-বাড়িতে টেলিগ্রাম এসে পৌছুলো এবং ভুলের নিরসন হল। এইটুকুই গল্প। কোমল-শরীর জামাতা তার মেয়েলি গড়নের জন্য শ্যালিকাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জ্বালাতন হয়ে যদি বলশালী হবার জন্য শরীরচর্চায় মনোনিবেশ করে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই, একদিন-দেখা দুর্বল জামাতা যদি হঠাৎ বলবান জামাতারূপে শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হয়, তবে তার কপালে কি বিপর্যয় ঘটতে পারে তার মজাটাই, শুধুমাত্র ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে, এ-গল্পে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' শুধু তাঁর হাস্যরসাশ্রিত গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নয়, তাঁর সকল গল্পের মধ্যে এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্পের মর্যাদা লাভের যোগ্য। এ গল্পের মধ্যে শুধু কৌতুক নয়, রহস্য ও ভৌতিক পরিবেশ, সব কিছুর সংমিশ্রণ হয়েছে। আবার এ-গল্পের অন্তরালস্থিত মানবচরিত্রের রূপায়ণও একান্ত সার্থক। গিন্নি যতই দজ্জাল ও কটুভাষিণী হোক, নিজের মৃত্যুর পর অন্য কেউ এসে স্বামীকে দখল করবে এ কল্পনা যে তার পক্ষে অসহ্য, নারীচরিত্রের এই স্বাভাবিক ঈর্ষাপরায়ণতা এ-গল্পে এমনই সুন্দররূপে ফুটেছে যে, সব দিক বিচার করে এটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বলে স্বীকার করতে হয়।

উপরে যা বলা হ'ল, তা থেকে বোঝা যাবে যে, উদ্ধৃতি দ্বারা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরস সম্বন্ধে কোনো ধারণা পাঠকের কাছে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের হাসি কথার কৌতুকে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-রসিকতা দ্বারাও তিনি হাসি উৎপাদনের চেষ্টা করেন নি। ঘটনার বিন্যাসে কৌতুকজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির দ্বারাই প্রভাতকুমার হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

ছোটগল্পলেখকরূপে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি প্রভাতকুমার গল্পের আর একটি ধারা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এ কথা আমরা আগে

আলোচনা করেছি। সংক্ষেপতঃ বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গল্প আবেগ-প্রধান, প্রভাতকুমারের গল্প ঘটনাপ্রধান। এঁদের কনিষ্ঠ সমসাময়িক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী'র গল্প-লেখকগণ স্পষ্টতঃই প্রভাতকুমারকে অনুসরণ করেছিলেন। কেননা, গল্পরচনার সেটাই সহজ পথ। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরল-ঘটনা আবেগপ্রধান গল্প রচনা করা গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ কবির পক্ষে যত সহজ, অপরের পক্ষে ততটা নয়। তাই, ছোটগল্প রচনায় প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, পরবর্তী গল্প-লেখকদের প্রভাতকুমারই বেশি প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, একথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) এ-যুগের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাহিনীকার। তাঁর বাল্যকাল ঘোর দারিদ্র্যে কেটেছে। তিনি বিদ্যালয়গত শিক্ষায় খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। পড়াশুনার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল না, তাই, অধ্যয়নাদি দ্বারাও তিনি সাহিত্য-রচনার মানসিক প্রস্তুতি লাভ করতে পারেন নি। 'শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী'তে যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "তাঁহার জীবনের যে অংশে তিনি তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গল্প রচনা করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে কখনও কোনও পুস্তক অধ্যয়ন করিতে দেখি নাই এবং তাঁহার গৃহে কোনও মুদ্রিত পুস্তক বা মাসিক পত্রিকাও দেখি নাই।" কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতাময়। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের উপকরণ জুগিয়েছিল। তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁকে 'শ্রীকান্তে'র কুমারসাহেব জাতীয় বড়লোকদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। আবার সমাজের অতি নিম্নস্তরের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি প্রথম জীবনের অনেককাল বিহারে এবং পরে চাকরিসূত্রে বারো-তেরো বৎসর ব্রহ্মদেশে কাটান। অল্প বয়সে তিনি একবার গল্পরচনায় হাত দিয়েছিলেন, এবং তাঁর একটি গল্প বেনামীতে 'কুন্তলীন পুরস্কারে' প্রথম হয়েছিল। কিন্তু বলতে গেলে, ব্রহ্ম-প্রবাসকালেই তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। এর ইতিহাস তিনি নিজেই বিবৃত করেছেন। "আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব-দুর্ঘটনার মত। আমার গুটিকয়েক

পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা।...আমি তাঁদের নব প্রকাশিত "যমুনা"র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম।" (বাতায়ন, শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪)।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত ছিলেন, এবং তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কাহিনীর ছায়া বেশ দেখতে পাওয়া যায়। এ ভিন্ন শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার মালমশলা নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কল্পনা থেকেই আহরণ করেছিলেন। কিন্তু সে-কল্পনায় যে খুব গভীরতা বা বিস্তৃতি ছিল, এমন কথা বলা যায় না।

শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় কাহিনীকার অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। বস্তুতঃ, জনপ্রিয়তার সকল উপকরণই তাঁর গল্পে তিনি অতি নিপুণতায় সন্নিবেশ করতে পেরেছিলেন। গল্পের সমাপ্তি সুখজনক হওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করতেন। এ বিষয়ে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "গল্প পারতপক্ষে ট্র্যাজেডি করতে নেই ... গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় "আহা বেশ!" তবে আর গল্প কি? আমি এই লাইনে চল্‌ছি।"

শরৎচন্দ্রের গল্প রোমান্টিক অবাস্তব কল্পনায় রঙিন, ভাবালুতায় কোমল, অগভীর আবেগপ্রবণতায় মুখরোচক। তাঁর রচনায় হৃদয়ের বাহুল্য ও মননের অভাব অতি স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন, কেননা তিনি সমাজ-ব্যবস্থার কোনো প্রকার গুরুতর পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। গতানুগতিক সমাজ, গতানুগতিক জীবন, গতানুগতিক পরিবেশ নিয়ে তিনি তার মধ্য থেকে ভাবালুতাময় বা সেন্টিমেণ্টাল রোমান্স সৃষ্টি করেছেন। রোমান্স-বুভুক্ষু বাঙালী সমাজে এ-জাতীয় মিষ্ট-কল্পনা যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করবে এ আর আশ্চর্য কী? চরিত্র-চিত্রণেও শরৎচন্দ্র জনমনোহরণ

করতে পেরেছিলেন। তাঁর চরিত্রগুলি প্রধানতঃ মহদাশয়, উদার, মহিমময়। কু বা কুটিল চরিত্র নেই এমন নয় (রাসবিহারী প্রভৃতি), কিন্তু সে কেবল প্রধান চরিত্রগুলির মহত্ত্বকে আরো উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্য। আর, নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তো শরৎচন্দ্রের একটু বিশেষ দুর্বলতাই ছিল বলা যায়। বিশেষ ক'রে যে-সকল নারী সমাজ-জীবনে পতিতা তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র সৃষ্টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'অমলা দেবী' ছদ্মনামে লিখিত 'নারীর মূল্য' প্রভৃতি গ্রন্থেও শরৎচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেবল পতিতা নারী নয়, সমাজের নিম্নস্তরের জীবনের প্রতিই শরৎচন্দ্রের গভীর দরদ তাঁর রচনায় খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এ স্তরের চরিত্রকে সুযোগ পেলেই শরৎচন্দ্র বহু সদ্‌গুণে ভূষিত আদর্শ চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় জীবনে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই এই স্তরের পুরুষ-নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, এবং তাদের অন্তঃকরণের ঔদার্যে মুগ্ধও হয়েছিলেন। পতিতাদেরও তিনি আদর্শ প্রেমিকারূপে চিত্রিত করেছেন, এতেই নিম্নস্তরের জীবনের প্রতি তাঁর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

শরৎচন্দ্র গল্প সাজাবার ওস্তাদ ছিলেন। একটি নিটোল গল্প,— যার গতিতে কৌতূহল, বিন্যাসে রোমান্স, সমাপ্তিতে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের তৃপ্তি, শরৎচন্দ্রের মতো বাংলা সাহিত্যে আর কেউই উপস্থিত করতে পারেন নি। তাঁর গল্প বহুবার পড়লেও পড়তে ভালো লাগে, এবং রঙ্গমঞ্চে ও সিনেমায় সর্বরূপে সকলপ্রকার দর্শককে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু তবু, শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠকও অনুভব করবেন যে, শরৎচন্দ্রের গল্পের রস লঘুমানস আলস্যযাপনেই উপভোগ্য, কিশোর-মনের কল্পনাকেই সে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারে।

শরৎচন্দ্রের পরিহাসনিপুণ বৈঠকী আলাপ অনেকেই শুনেছেন। তাঁর হাস্যরসবোধের পরিচয় সে-আলাপে সুপরিস্ফুট হলেও, তাঁর রচনায় প্রকৃত হাস্যরসের সন্ধান অল্পই মেলে। শরৎচন্দ্রের রচনার হাস্যরস বলতে গেলে 'শ্রীকান্তে' সীমাবদ্ধ। সেখানে দু'বার এণ্ট্রান্স ফেল-করা মেজদার আচরণ, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'রূপী ছিনাথ বহুরূপীর গল্প, নতুনদার কাহিনী

ইত্যাদি অনেক কৌতুকজনক চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' বইটি, বিশেষতঃ তার প্রথম পর্ব, স্মৃতি-বিজড়িত কাহিনী। উল্লিখিত চরিত্র ও ঘটনাগুলি শরৎচন্দ্র সম্ভবতঃ বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করেছিলেন, এগুলি তাঁর কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয় না। এর থেকে বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্রের হাস্যরসবোধ যতই প্রবল থাকুক, তাঁর সাহিত্যিক কল্পনায় ও-জিনিসটির প্রাচুর্য ছিল না। চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ বা ঘটনাবিন্যাস, কোথাও হাস্যরসসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের কোনো বিশেষ কৃতিত্ব চোখে পড়ে না। কিন্তু তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি এমনই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী ছিল যে, তাঁর বইগুলিতে যখনই যে কৌতুকজনক ঘটনা তিনি বিবৃত করেছেন, তারই রস বহুগুণে বর্ধিত হয়ে দেখা দিয়েছে। এর প্রমাণ আমরা 'শ্রীকান্ত'র অন্তর্গত এবং অন্যান্য উপন্যাসের ছোট ছোট কৌতুক-কাহিনীগুলিতে দেখতে পাই।

অনেকে মেজদা বা নতুনদার কাহিনী, 'রামের সুমতি'তে রামের কথাবার্তা-কার্যকলাপ, 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে টগর বোষ্টমী ও নন্দ মিস্ত্রির আচরণ ও আলাপ শরৎচন্দ্রের হাস্যরসের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন। বর্মা-যাত্রী নন্দ মিস্ত্রি ও টগরের কাহিনীটি এই :

"নন্দ মিস্ত্রি তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হইতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল — পরিবার! আমার সাত-পাকের সোয়ামী বলছেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না বলে দিচ্চি!...

নন্দ মিস্ত্রি অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বছর —

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই-বা বিশ বছর। পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবর্তের পরিবার! কেন কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি! সে-কথা কারও বলবার যো নেই! টগর-বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না — তা জানো?"

এই ঘটনাটির পর দেখা যাচ্ছে শ্রীকান্ত জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে এই ঘটনাটির গূঢ় তাৎপর্য, অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এ-জাতীয় মনোভাব কিরূপ বদ্ধমূল, এ-নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছে। এরূপ আরো ছোট-খাট হাস্যজনক ঘটনা শরৎচন্দ্রের রচনায় ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে। কিন্তু যথেষ্ট হাসি উৎপাদন করলেও এগুলিকে যথার্থ হাস্যরসের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সন্দেহ। এগুলি, এবং আরো অনেক আখ্যান বা anecdote আমাদের সামাজিক শুচিতা ও সম্ভ্রমবোধের প্রতি শ্লেষাত্মক কটাক্ষপাত ছাড়া আর কিছু নয়। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঘটনাগুলি পড়ে মনে হয়, সেগুলি শরৎচন্দ্রের স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁর কল্পনায় হাস্যরসের স্থান ছিল সংকীর্ণ। অতিরিক্ত ভাবালুতার সঙ্গে হাস্যরসের ঠিক মিল হয় না, অতএব যে লেখক অত্যধিক ভাবপ্রবণ, তাঁর রচনায় কৌতুকবোধের অভাব স্বভাবতঃই দেখতে পাওয়া যায়। তাই, বৈঠকী আলাপে শরৎচন্দ্রের হাস্যরসবোধ যতই প্রবলরূপে প্রকাশিত হোক না কেন, তাঁর রচিত সাহিত্যে হাস্যরসের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এ-কথা মেনে নেওয়া শক্ত।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৩৮) তৎকালীন রবীন্দ্রভক্ত তরুণ সমাজের একজন প্রধান লেখক ছিলেন। গল্পলেখকরূপে এককালে এঁর সমধিক খ্যাতি ছিল। সহকারী সম্পাদকরূপে 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গেও ইনি কিছুকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন। চারুবাবু 'চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী', 'রবিরশ্মি' প্রভৃতি বহু সমালোচনা গ্রন্থের প্রণেতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে তিনিই প্রথম গ্রন্থাকারে আলোচনা করেন। বর্তমান কালে গাল্পিক বা ঔপন্যাসিক অপেক্ষা সমালোচক হিসাবেই লোকে তাঁকে বেশি জানে।

ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু গল্পরচনায় ইনি এবং এঁর সতীর্থরা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রভাতকুমারের মতো এঁর ছোটগল্পও ঘটনা-প্রধান। ইনিও কয়েকটি কৌতুকাশ্রিত গল্প লিখেছেন, এবং সেগুলির হাস্যরস, প্রভাত

কুমারের কৌতুক-কাহিনীগুলির মতোই, ঘটনার বিন্যাসে উৎপন্ন হয়েছে। এ-বিষয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় প্রভাতকুমারের প্রভাব অতি স্পষ্ট। চারুবাবুর এ-জাতীয় কৌতুকজনক গল্পের মধ্যে 'চটির পাটি', 'গোঁপ-খেঁজুরে', 'গুণী' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। 'গুণী' গল্পটিতে চারুবাবু প্রভাতকুমারের 'রসময়ীর রসিকতা'র মতো ভৌতিক পরিবেশ ও কৌতুকজনক ঘটনা মিশিয়ে বেশ একটু নূতনত্ব সৃষ্টি করেছেন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭—১৯৫৭) বাংলার রূপকথা-উপকথা-ব্রতকথা সংগ্রহ ক'রে সুবিখ্যাত হন। এঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' 'ঠাকুরদার ঝুলি' 'দাদামশায়ের থ'লে' 'ঠানদিদির থ'লে' প্রভৃতি বইগুলি এইরূপ সংগ্রহগ্রন্থ। এর আগেই লালবিহারী দে এইরূপ সংগ্রহ-কার্যে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লিখেছিলেন ইংরেজীতে। দক্ষিণারঞ্জন একেবারে ঠাকুরমা-ঠাকুরদার পুরোনো গল্পরচনার ভাষা ও ভঙ্গি নিয়ে এলেন। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' 'ঠাকুরদার ঝুলি' দীর্ঘকাল ধরে যে প্রচুর জনপ্রিয়তা ভোগ করে এসেছে তাতেই দক্ষিণারঞ্জনের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সংগ্রহমালার মধ্যে 'দাদামশায়ের থ'লে' বা 'বাঙ্গালার রসকথা' বাংলাদেশের লোকপ্রচলিত হাসির গল্পের সংকলন। গল্পগুলি তো মজার বটেই, তাছাড়া দক্ষিণারঞ্জনের রচনার গুণে সেগুলির আকর্ষণ আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। হাসির বর্ণনাতে দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ দক্ষতা ছিল, এ বইটিতে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

জন্মতারিখ অনুসারে এর পরই আমরা এ-যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হাস্যরসিক রাজশেখর বসুর (১৮৮০—১৯৬০) আলোচনায় এসে উপস্থিত হলাম। এ-গ্রন্থে রাজশেখর বসুর কীর্তির আলোচনা জীবিত লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু বইটির শেষ পরিচ্ছেদ লেখবার সময় রাজশেখর বসু লোকান্তরিত হলেন। অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর কীর্তির আলোচনা গভীর দুঃখের সঙ্গে মৃত লেখকদের অংশেই সন্নিবেশ করতে হোল। জন্মতারিখ অনুসারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও আগে তাঁর স্থান। কিন্তু সাহিত্যিক কীর্তি রাজশেখরবাবু শেষ বয়সে অপেক্ষাকৃত অল্পকালেই অর্জন করেছেন। এ কীর্তির মহত্ত্ব ও বিশালতা সর্বশ্রেণীর পাঠকের কি বিপুল

শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছে তা বাঙালীমাত্রেরই সুবিদিত, এবং উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

রাজশেখর বসু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ (১২৮৬) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার উলা বীরনগর। তাঁর পিতার নাম ছিল চন্দ্রশেখর বসু। রাজশেখরেরা চার ভাই ছিলেন; শশিশেখর, গিরীন্দ্রশেখর কৃষ্ণশেখর ও রাজশেখর। ভাইদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গিরীন্দ্রশেখর বসুর নাম সুপরিচিত। সাহিত্য-রচনার যে তাঁরও দক্ষতা ছিল 'লাল কালো' বইখানিই তার প্রমাণ। শশিশেখর বসুর স্মৃতিচিত্রগুলি অনেকদিন ধরে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার পাঠকদের আনন্দ দিয়েছে। তাঁরও যে কৌতুকবোধের অভাব ছিল না; এই রচনাগুলিতে সে পরিচয় ছড়ানো আছে।

জীবিকার্জনের চেষ্টায় চন্দ্রশেখর বসুকে নানাস্থানে চাকরি করতে হয়েছিল। রাজশেখর বসুর বাল্যজীবন পিতার সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই কেটেছে। ছেলেদের নিয়মনিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার দিকে চন্দ্রশেখরের বিশেষ নজর ছিল। সে শিক্ষা রাজশেখর বসু তাঁর দীর্ঘজীবনে কোনোদিন বিস্মৃত হন নি। পিতার সঙ্গে তিনি বেশ কিছুদিন বিহারে ছিলেন। তিনি দ্বারভাঙ্গা ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন, এবং সেখান থেকেই এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন। এর পর পাটনা কলেজ থেকে এফ্-এ পাশ করে ১৮৯৭ সালে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস্-সি. পড়তে আসেন। সেই বছরই তাঁর বিয়ে হয়।

বি. এস্-সি. পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং এম্. এস-সি.তে রসায়নবিজ্ঞানে প্রথম হয়ে পাশ করেছিলেন। আরো দুবছর প'ড়ে আইন পরীক্ষাও তিনি পাশ করেন। হাইকোর্টে তিনি নাকি প্র্যাকটিসও শুরু করেছিলেন, কিন্তু মাত্র তিনদিন আদালতে গিয়েই ও কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চোগা-চাপকান বিলিয়ে দিয়েছিলেন।*

* শ্রীরাজশেখর বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। 'কথাসাহিত্য', রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬০।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় রাজশেখর কিছুদিন আচার্য জগদীশ চন্দ্রের কাছে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানা যায় না। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু বহুকাল বিজ্ঞান-সাধনায় এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিচালনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন। ১৯০৩ সালে, আইন পরীক্ষা পাশের এক বছর পরে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। প্রফুল্লচন্দ্র রাজশেখরকে প্রথমে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর রাসায়নিকের পদ দেন, এবং মাত্র এক বছর পরেই তাঁকে রাসায়নিক থেকে ম্যানেজারের পদে উন্নীত করেন। এর দু বছর পরে, ১৯০৬ সালে রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালের সর্বময় কর্তা হন। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং অবসর গ্রহণের পরও আমরণ তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালনা ব্যাপারে সর্বদা উপদেশ-পরামর্শাদি দিতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাজশেখরের উপর কতখানি নির্ভর করতেন, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁর একটি চিঠিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা'র উচ্চ প্রশংসা করার পর প্রফুল্লচন্দ্র কবিকে লিখেছিলেন, "সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "গড্ডলিকার" প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পশুরামকে আমি বলিলাম, এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন "কেষ্ট-বিষ্টু"! সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন!" এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্রবলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভূষণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন। আমার কথা যদি বলেন — আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত

হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েছে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধির কাজে লাগব, যে সব জন্মসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আপনার আর বোধহয় উদ্ধার নেই। যাই হোক আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।"

রাজশেখর বসু সাহিত্যরচনায় অবতীর্ণ হলেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি লিখে। রাজশেখর যখন 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' লেখেন তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। এত বেশি বয়সে সাহিত্যরচনায় অবতীর্ণ হয়ে সুবৃহৎ খ্যাতি ও স্থায়ী কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন, এরূপ সাহিত্যিক জগতে বিরল হলেও অনুপস্থিত নন। পূর্বে উল্লিখিত চিঠিতে রাজশেখর বসু প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "অনেকে বলিয়া থাকেন যে চল্লিশ বৎসরের পর নূতন ধরণের কিছু কেহ রচনা করিতে পারেন না; কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখিয়াছি নিউটন ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সের পূর্বেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন; কিন্তু গ্যালিলিও সেই বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর যুগান্তর সংঘটনকারী আবিষ্কার করেন; আবার (Schumann) শুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে জড়-বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করেন। রিচার্ডসন (Father of English novelists) পুস্তকবিক্রেতা ছিলেন এবং আমার যেন স্মরণ হইতেছে, যখন পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি তখন তিনি নভেল লিখিতে হাত দেন। আমাদের পরশুরামও প্রায় ৪৩।৪৪ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে আর-একটি এমন তীব্র সমালোচনা করুন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে; কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে

কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।'' প্রতিভা ও শক্তি অনেক সময় প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখা যায়, এর উদাহরণ জগতে দুর্লভ নয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেকচাঁদ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা এর দৃষ্টান্ত। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে রাজশেখরের আরো কোনো কোনো বিষয়ে মিল আছে। সে-আলোচনা আমরা যথাস্থানে করবো।

'ভারতবর্ষে' 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সকল সাহিত্যিকের এবং সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি এই অসাধারণ প্রতিভাশালী ছদ্ম-নামধারী লেখকের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর পর জলধর সেন ও 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাগাদায় ইনি 'প্রবাসী'-'ভারতবর্ষে'র জন্য পর পর অনেকগুলি গল্প লেখেন। রাজশেখরের প্রথম গল্প-গ্রন্থ 'গড্ডলিকা' ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। বইটি বেরুনো মাত্রই যে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল, তার কিছু নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ-প্রফুল্লচন্দ্রের পত্রালাপে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি দীর্ঘ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। তিনি মূর্তির মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন-কি, তাঁর ভূষণ্ডীর মাঠের ভূত-প্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণ বিবরণের মধ্যে কোথাও লেখা আছে। এমন-কি, যে পাঁঠাটা কন্সর্টওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশ টাকার নোটগুলো চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাকে আমারই টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া আমার কবিতার খাতাখানা চিবাইতে দেখিয়াছি বলিয়া যেন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।" প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে', লিখেছিলেন, "পরশুরামের ছবি আঁকবার হাত অতি পরিষ্কার। তিনি দুটি চারটি টানে এক একটি লোককে চোখের সম্মুখে খাড়া করে দেন। তাঁর ছবিতে রেখা ও বর্ণের বাহুল্য নেই। তাঁর হাতের প্রতি রেখাটি পরিস্ফুট, প্রতি বর্ণটি যথোচিত।... আমি ভূতকে বেজায় ভয় করি, কিন্তু ভূষণ্ডীর মাঠের যক্ষ নাদু মল্লিকের সাক্ষাৎ পেলে তাকে very pleased to meet you sir না বলে থাকতে পারতুম না।'' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পূর্বোল্লিখিত চিঠিতে কৌতুকচ্ছলে রবীন্দ্র-নাথকে পরশুরামের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করতে অনুরোধ করলেও, নিজে

কিন্তু তাঁর স্নেহভাজন রাসায়নিকের লেখার প্রশংসায় কার্পণ্য করেন নি। তিনি লিখেছিলেন, "তোমার বই খুলিয়া পড়িতে পড়িতে আমি এই বৃদ্ধ বয়সে হাসিতে হাসিতে choked হইতেছি।" পত্র-পত্রিকার সমালোচকদের তো কথাই নেই, তা ছাড়া সার যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরাও বইটির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় "এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে।" কিন্তু এ-সৌভাগ্য বস্তুতঃ রাজশেখরের প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি মাত্র।

'ভারতবর্ষে' 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। লেখক কেন ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন, এ-সম্বন্ধে অবশ্য অনুমানের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। সাধারণভাবে একথাই মনে হয় যে, রাজশেখর জানতেন তিনি নৈষ্ঠিক সাহিত্যিক নন। তখন থেকে যে তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হবেন, এ-কল্পনাও হয়তো তাঁর ছিল না। তাঁর পক্ষে সে-সময়ে একটি ছদ্মনামের আশ্রয় গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু প্রথম গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেটি বিপুল অভিনন্দন ও জনপ্রিয়তা লাভ করলো, এবং জলধর সেন প্রমুখ নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আরো গল্পের তাগিদ আসতে লাগলো, তখন তাঁকে প্রায় নিয়মিতভাবেই গল্প লেখায় ব্রতী হতে হল। কিন্তু প্রথম গল্পে ব্যবহার করলেও 'পরশুরাম' নামটি গোড়াতে রাজশেখরের খুব পছন্দ ছিল না। দ্বিতীয় রচনার প্রকাশকালে তিনি মহাভারত থেকে 'উপরিচর বসু' এই নামটি নির্বাচন করেছিলেন।* বহুলোকের আপত্তিতে শেষপর্যন্ত পরশুরাম নামই বহাল থাকে। 'পরশুরাম' নামটি রাজশেখরকে খুবই মানিয়েছিল, কিন্তু উপরিচর বসু নামটিও যে তাঁর পক্ষে একেবারে বেমানান হোত, তা নয়। তিনি যেন উপর থেকে জাগতিক নানা চরিত্র ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ক'রে যথাযথ লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, উপরিচর নামটির দ্বারা তিনি এ-অর্থ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। পরশুরাম নামটিও যে অন্যদিক

* শ্রীরাজশেখর বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। 'কথাসাহিত্য', রাজশেখর বসু সংবর্ধনা সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬০।

থেকে কত সার্থক তাঁর পরিহাসের ধার পরীক্ষা করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ-প্রসঙ্গে ১৯২৫-এর প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপ-সৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে। মূর্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙা-চোরাই তার কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মতো হয়,— ঠিক ভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি না, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।" রবীন্দ্রনাথ এখানে চরিত্রসৃষ্টিতে রাজশেখরের অতুলনীয় নিপুণতার কথাই বিশেষ ক'রে বলেছেন, কিন্তু ক্ষুরধার বিদ্রূপের জন্যও তাঁর 'পরশুরাম' নাম সার্থক বলে মনে করি।

প্রথম থেকেই রাজশেখর বসুর গল্পগুলি 'নারদ' এই ছদ্মনামধারী যতীন্দ্র কুমার সেনের দ্বারা চিত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রকুমার স্বয়ং কৌতুক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসাবে তো তিনি সুপ্রসিদ্ধ। কৌতুকাঙ্কনে তাঁর জুড়ি বাংলাদেশে অল্পই মেলে। বহুকাল ধরে তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় কার্টুন চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে গদ্যপদ্যে কৌতুকরচনা লিখে এসেছেন। যতীন্দ্রকুমারের মতো প্রবল কৌতুকবোধ ও সাহিত্যরসবোধের এমন সমন্বয় না হলে পরশুরামের গল্পের চরিত্রগুলিকে ছবিতে এরূপ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হোত কি না সন্দেহ। যতীন্দ্র কুমার কেবল সাহিত্যরসিক ছিলেন না, তিনি স্বয়ং সাহিত্যিক ছিলেন। যতীন্দ্রকুমারের ছবিগুলির মধ্যে যে আমরা পরশুরামের মানসচরিত্রগুলিকে এরূপ জীবন্তরূপে দেখতে পাই, তার আরো একটা কারণ এই যে, রাজ-শেখরের কল্পনাকে রূপ দিতে যতীন্দ্রকুমার অনেকটা অভ্যস্ত ছিলেন। রাজশেখর নিজেও এ-ছবিগুলির স্কেচ ক'রে তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলিকে

যতীন্দ্রকুমারের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। রাজশেখরের ছবি আঁকায় বেশ হাত ছিল। 'প্রেমচক্রে'র ছবিগুলি তিনি নিজেই এঁকেছিলেন। ('বসুধারা', আষাঢ়, ১৩৬৭ সংখ্যায় শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন)।

রাজশেখরের বাল্যজীবন দ্বারভাঙ্গায় কেটেছে। দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে কলকাতায় চলে এলেও দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ রাজশেখর বহুকাল রক্ষা করেছিলেন। যতীন্দ্রকুমারও দ্বারভাঙ্গার লোক। সহজেই এই দুই শিল্পীর যোগাযোগ ঘটেছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ভার নেবার পর থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন রাজশেখরই রচনা করতেন, আর, রাজশেখরের রচনা ও কল্পনাকে চিত্রে রূপায়িত করতেন যতীন্দ্রকুমার। এই দুই কৌতুকপ্রবণ অতুলনীয় শিল্পী পরস্পরের মন—চিন্তা ও কল্পনা—যত সহজে যত সুন্দরভাবে বুঝে নিতে পারতেন, অন্য শিল্পীর পক্ষে তা কখনোই সম্ভব ছিল না। এই জন্যই পরশুরাম রচিত ও নারদ বিচিত্রিত গল্পগুলি পড়ে বাস্তবিকই মনে হয়, "এ বলে আমায় ছ্যাখ্ (বা পড়্) ও বলে আমায় ছ্যাখ্।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কি চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নয়। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পালাইবার ফাঁক নাই।" প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্রে' লিখেছিলেন, "যিনি পরশুরামের লেখনীর সঙ্গে তুলির সঙ্গত করেছেন, সেই যতীন্দ্রকুমার সেনের হস্তকৌশল দেখে সহজেই মুখ থেকে এই কটি কথা বেরয়—বাহবা সঙ্গতী! জিতা রহ, তুহারী কাম!"

রাজশেখর বসু গল্পরচনায় হাত দিয়েই 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' এর মতো একটি masterpiece কী করে লিখলেন, এ বিষয়ে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। উল্লিখিত গল্পটি যে একটি masterpiece এ বিষয়ে আশাকরি সাহিত্যরসিক সমাজে দ্বিমত হবে না। বিষয়টি অনুধাবন করতে হলে রাজশেখরের মানসিক গঠন এবং তাঁর শিক্ষা ও ভাষাচর্চার সন্ধান নিতে হয়।

রাজশেখর ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র, নৈষ্ঠিক বিজ্ঞানী। আজীবন তিনি বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন। বিজ্ঞানীর সুনিয়মিত, সুশৃঙ্খল, তথ্যানুসারী,

বিশ্লেষণকুশল মন তাঁর ছিল। বাল্যকাল থেকেই পিতার চেষ্টায় শৃঙ্খলা নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর হস্তলিপির সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা তো সর্বজনবিদিত। দীর্ঘকাল বিজ্ঞান-চর্চা ও প্রতিষ্ঠান-পরিচালনার ফলে নিয়মশৃঙ্খলাবোধ তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল। প্রকৃত বিজ্ঞান-সাধকের মনোভাবও রাজশেখরের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ; প্রতিটি জিনিসের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি পর্যন্ত তিনি লক্ষ্য করতেন — সে সব খুঁটিনাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আপিস-পরিচালনা অথবা মানবচরিত্র ও তার আচরণ, যে বিষয়েই হোক। অবান্তর তথ্য বর্জন করে প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থিত করার কৌশলেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিকোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টি, তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণশক্তি ও সুশৃঙ্খল চিন্তায় অভ্যস্ত হবার পর পরিণত বয়সেই রাজশেখর সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং এ-সকল গুণই তাঁর রচনায় উপস্থিত। বাইরে সুগম্ভীর, মিতবাক্‌, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ হলেও, কৌতুকবোধ যে তাঁর স্বভাবের মধ্যে প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল, একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। আর সাহিত্যপ্রতিভাও যে তাঁর অসামান্য ছিল, তাও তাঁর রচনাতেই স্বয়ম্প্রকাশ। এ-প্রতিভাকে উপযুক্তরূপে প্রকাশ করবার জন্য, ভাষার উপর যতখানি দখল থাকা প্রয়োজন, সৌভাগ্যের বিষয় কর্মজীবনে রাজশেখর তাও আয়ত্ত করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ-সুযোগ ঘটেছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন রচনার প্রয়োজনে। সর্ববিষয়ে পরিচ্ছন্নতা, সদ্‌রুচি ও সৌন্দর্যের পক্ষপাতী রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনগুলিকে সমসাময়িক বাংলা বিজ্ঞাপনের তুলনায় একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর সহায় ছিলেন চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বাল্যের কবিতা রচনার শখের কথা বাদ দিলে, এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ। এখানেই তার হাতে খড়ি বলতে পারা যায়। অবশ্য মূল্যতালিকা তৈরী করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্য করে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের আগে আমার যা কিছু বাংলা রচনা তা এর বাইরে কিছু নয়।"* বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপনাদি রচনার

* পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ। কথাসাহিত্য; পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা।

মধ্য দিয়ে বাংলা লেখার চর্চা রাজশেখর বহুদিন ধরেই করেছিলেন, কাজেই এ-বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা জন্মেছিল। রাজশেখর যে-ধরণের গদ্য লিখেছেন, তাতে তাঁর এ-ভাষানুশীলন কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় নি। কারণ, তাঁর গদ্য সকলপ্রকার সাহিত্যিক অলংকরণ, কবিত্ব বা উচ্ছ্বাসবর্জিত গদ্য। সে ভাষা ঋজু ও অনলংকৃত এবং যথাযথরূপে বক্তব্যপ্রকাশের যথার্থ বাহন। রাজশেখরের বাহুল্যবর্জিত আবেগহীন নিরপেক্ষ রচনার জন্য এ-ধরণের গদ্যেরই প্রয়োজন ছিল। বাল্যকালে যে রাজশেখরের কবিতারচনার অভ্যাস ছিল, তাঁর গল্পে এখানে ওখানে ছড়ানো পদ্যগুলিতে সে-পরিচয় অতিস্পষ্ট। দীর্ঘকালের অনভ্যাসেও তাঁর পদ্যরচনার শক্তিতে ভাঁটা পড়েনি।

সাহিত্যরচনায় অবতীর্ণ হবার উৎসাহ ও প্রেরণা তৎকালে রাজশেখর আরো লাভ করেছিলেন তাঁদের চৌদ্দ নম্বর পার্শীবাগানের বাড়ির সাহিত্যিক আড্ডা Arbitrary Club বা উৎকেন্দ্র সমিতি থেকে। এই ঠিকানাটি 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগানে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং আড্ডাটির ব্যঙ্গরূপ বংশলোচনের বাড়ির আড্ডায় প্রতিফলিত হয়েছিল। রাজশেখরের পুরোনো পৈতৃক বাড়ির এ-আড্ডাটির নিয়মিত সভ্য ছিলেন রাজশেখর, গিরীন্দ্রশেখর, যতীন্দ্রকুমার সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শেষের দিকে জলধর সেন প্রমুখ আরো অনেকে আসতেন বলে শোনা যায়। সকলেই জানেন, সাহিত্যিকদের আড্ডায় সাহিত্যচর্চা বেশি না হলেও, তার প্রাণখোলা আলাপ আলোচনা সাহিত্য-প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়; উৎকেন্দ্র সমিতিও রাজশেখরের সাহিত্যরচনার প্রেরণা অনেক পরিমাণে উৎসারিত করেছিল সন্দেহ নেই। উৎকেন্দ্র সমিতির কোনো নিয়মিত সভ্য যদি এখন এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন, তবে আমরা এ-প্রেরণার পরিমাণ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা করতে পারবো।

রাজশেখরের পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অতি তীক্ষ্ণ। বিবিধ প্রকার লোকের হালচাল, কার্যকলাপ — এবং বিশেষ ক'রে তাদের চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়-গুলি পর্যন্ত নিখুঁতভাবে তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়তো। জগৎসংসার ও মানুষকে

তিনি যেন অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখেছিলেন। অথচ তিনি খুব বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। তিনি বলেছেন, "জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুবই কম। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তাদের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা তা ওই রামায়ণ মহাভারত পুথি-পত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা।"

সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ ক'রে পুরাণেতিহাসে রাজশেখর বসুর প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর মেঘদূত ও রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদেই সে-পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ধর্ম, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সঙ্গে তাঁর অতি নিবিড় পরিচয় ছিল। এর ফলে প্রাচীন ভারতের ধর্ম আর আধুনিক বিজ্ঞানীর যুগোচিত যুক্তিনিষ্ঠ মনোধর্ম তাঁর মধ্যে আশ্চর্যরূপে সমন্বিত হয়েছিল। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থ ই লিখেছেন, "প্রাচীনের উপরেই আধুনিক প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীনের রূপ-পরিবর্তনেই আধুনিক। আধুনিককে, অর্থাৎ নিজেদের বুঝতে হলে, এর প্রতিষ্ঠাকে জানতে হবে। বিশেষত সেই প্রতিষ্ঠার ভিতরে এমন বস্তু যদি থাকে যার কার্যকারিতা আধুনিক মানুষের পক্ষেও আছে, তাহলে তার চর্চা করার, তাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলার তাগিদ আরো বেড়ে যায়।··· সত্য যা তা সব সময়ই সত্য। বাস্তব সত্য আর আধ্যাত্মিক সত্য — এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরস্পরের বিরোধী নয়। এই জন্যই শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু রামায়ণ মহাভারতের বিশ্বমানবিকতা আর যুগাতিগতা মেনে নিয়েও, দেশকালানুযায়ী বিজ্ঞানের স্বাভাবিক শুভ্র জ্যোতিতে তাদের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন — বিশেষ কোনও আস্থাভেদের রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন নি। এই নির্বর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টির মূল্য এ-যুগের মানুষ-মাত্র স্বীকার করবেন। — এ যুগের কেন, সমস্ত যুগের সর্ব দেশের সত্যদিদৃক্ষু মনীষীরাও কার্যতঃ স্বীকার করে এসেছেনও।"* রাজশেখরের রচনায়, বিশেষতঃ পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন ক'রে লিখিত তাঁর গল্পগুলিতে এবং কোনো কোনো প্রবন্ধে প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাস ও ধর্মনীতি প্রভৃতির আধুনিকদৃষ্টিসম্মত বিশ্লেষণ ও আধুনিক কালে

* সুবুদ্ধিবিলাস রাজশেখর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'কথাসাহিত্য', পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা।

তাদের উপযোগিতা-অনুপযোগিতার বিচার দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও রাজশেখর এগুলিকে হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেছেন, কোথাও বা যুক্তিসমন্বিত গম্ভীর প্রবন্ধের মধ্যে সেগুলি ব্যক্ত হয়েছে। অনেক সময় যা পুরাতন, তাকে আধুনিক কালের মানুষ আমরা না ভেবেচিন্তেই বর্জন ক'রে অত্যন্ত হাস্যকররূপে আধুনিকতার বড়াই করি; আবার কখনো বা পুরাতন ধর্ম ও সংস্কার বা শাস্ত্রের বিকৃতিকেও মেনে নিয়ে আমরা হাস্যাস্পদ হই। রাজশেখরের নিরপেক্ষ যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এই উভয় দুর্বলতাকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

রাজশেখরের শিক্ষা, প্রতিভা, মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, আবাল্য তিনি সুশৃঙ্খল, সুনিয়মিত, যুক্তিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীর তথ্যানুসারী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তদনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। সাহিত্যিক প্রতিভা ও তীব্র কৌতুকবোধ তাঁর স্বভাবজ ছিল, কিন্তু অবাস্তব কল্পনাশ্রয়ী ভাবালুতা অথবা মন্তব্য ও রসিকতা দ্বারা কৌতুক উৎপাদন তাঁর তথ্যনিষ্ঠ ঋজু সরল বিজ্ঞানী মনের উপযোগী ছিল না। বাল্যের শিক্ষা, যৌবনের গবেষণা সবই রাজশেখরের মনকে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে অভ্যস্ত এবং যুক্তি ও তথ্যানুযায়ী নিরপেক্ষ বিচারবিশ্লেষণের শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর ভাষাও ছিল বাহুল্যবর্জিত, নিরলংকৃত, সরল ও তির্যক্। তা প্রধানতঃ বিবরণাত্মক (narrative) এবং বর্ণনাত্মক (descriptive)। ঘটনাপ্রধান ব'লে তাঁর গল্পের টেকনিক প্রভাতকুমারের অনুরূপ। তিনি মানবচরিত্র, মানুষের কার্যকলাপ ও আচরণ, এবং চারদিককার পরিবেশ যেমন দেখেছেন, তেমনই লিপিবদ্ধ করেছেন — কিন্তু নিজে সে-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেন নি। তাঁর লেখায় লেখক অন্তরাল-বর্তী। তিনি নিরপেক্ষ ও প্রচ্ছন্ন কিন্তু দুর্নিরীক্ষ্য নন। তিনি বিভিন্ন প্রকার জাগতিক মানুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, কিন্তু নিজে যেন তাদের ভালো-মন্দ বিচারের ভার নেন নি। বিজ্ঞানী যেন সমাজ ও সংসার থেকে বেছে নিয়ে কতকগুলি মানুষের চরিত্র এবং তাদের আচরণ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য এনে উপস্থিত করে বলছেন, "তোমরা এদের ভালো করে দেখে নাও — আমি নিজে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।" শ্রীমৎ শ্যামানন্দ

ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, নেপাল ডাক্তার, তারিণী কবিরাজ, লটবর নন্দী, নাদু মল্লিক, গণেশ মামা, জিগীষা দেবীর স্বামী, 'অ্যাংলো-মোগলাই কেফ্'এর ম্যানেজারটি পর্যন্ত একেবারে আস্ত, নিখুঁত, সম্পূর্ণ। তাদের চরিত্র-আচরণ-কথাবার্তার একটি সূক্ষ্মরেখা পর্যন্ত বাদ পড়েনি। কয়েকটি চরিত্র তিনি স্থায়ীভাবে তাঁর গল্পে উপস্থিত করেছেন। তারা তাঁর নানাগল্পে ফিরে ফিরে এসেছে এবং আমাদের একেবারে চেনা ঘরের মানুষ হয়ে গেছে। যেমন রায়বাহাদুর বংশলোচন, ক্যাদার চাটুজ্যে, নগেন, উদো, জটাধর বকশী, মায় লম্বকর্ণ পর্যন্ত। এরা যে কাল্পনিক চরিত্র তা মনেই হয় না। মনে হয়, এদের অনেকেরই সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে ; আড্ডায়-আসরে, রাস্তায়-ঘাটে, এদের অনেককেই আমরা দেখেছি এবং বেশ চিনি।

রাজশেখরের চরিত্রগুলির এই যে ত্রুটিহীন সম্পূর্ণতা, এই যে জীবন্তবৎ রূপ, তা বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ দ্বারা সৃষ্টি হয় নি, হয়েছে অতিরঞ্জন দ্বারা। এই অতিরঞ্জনের জন্যই তারা জীবন্তবৎ সত্য হয়েও কৌতুকাশ্রিত হয়েছে। চরিত্রগুলি যে অতিরঞ্জিত একথা রাজশেখর প্রচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করেন নি, প্রথম থেকে সোজাসুজি তাদের নামের মধ্য দিয়েই তা ব্যক্ত করেছেন। গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া, পেলব রায়, হুতাশ হালদার, লালিমা পাল (পুং), জিগীষা দেবী, জবরউন্নিসা প্রভৃতি নামেই তাদের চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। আবার তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা সবই একান্ত বাস্তবানুগ হলেও অতিশয় অতিরঞ্জিত। তবু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজশেখরের চরিত্র বা সংলাপ কখনো এতটুকু অতিরঞ্জিত মনে হয় না, বরং সম্পূর্ণ যথাযথ এবং বাস্তব মনে হয়। তার কারণ এই যে, রাজশেখর তাঁর চরিত্রগুলিকে বাস্তবধর্ম থেকে একটুও বিচ্যুত না ক'রে অতিরঞ্জিত করেছেন। বোধহয় একটি উপমা দিলে বক্তব্যটি পরিস্ফুট হবে। অনেক কীটপতঙ্গ আছে যাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাদা চোখে সব দেখা যায় না। কিন্তু অনুবীক্ষণের কাচের তলায় তারা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে দেখা দেয় বলে তাদের শরীরের গঠন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি খুঁটিনাটি খুব স্পষ্ট হয়ে চোখে ভেসে ওঠে। রাজশেখরের অঙ্কিত চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও এ উপমা খাটে। গণ্ডেরিরাম আর পেলব রায়, কেষ্ট আর বিরিঞ্চি বাবা, তিনকড়ি

মুখুজ্যে আর ক্যাদার চাটুজ্যে, জাবালি, খল্বিদং স্বামী, মহেশ মিত্র ও বাঁটলো, যাকেই আমরা দেখি না কেন, তাকেই চারিত্রিক সব খুঁটিনাটি সহ আমরা পুরোপুরি চিনে নিতে পারি, কিন্তু মনে হয়, ঠিক এমনভাবে কোনোদিন আমরা তাদের দেখি নি। রাজশেখরের সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলা হল, তাঁর রচিত সংলাপ সম্বন্ধেও সে-কথা অনেক পরিমাণে খাটে। রাজশেখর তাঁর চরিত্রগুলির মুখে যেসব কথাবার্তা বসিয়েছেন, তা একান্ত বাস্তবানুসারী। কোন চরিত্র কোন স্থানে কিরূপ কথা বলা স্বাভাবিক, নির্ভুলভাবে রাজশেখর তা উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সেসব কথাবার্তায় তিনি একটু রং চড়িয়ে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"অটল। কুমড়োর চামড়া তো ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কষ্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল করলে বোধ হয় ভেজিটেবল্ শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে দেখব।"

কোন B.Sc., A.S.S. বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই উপরের উক্তিটি করা সম্ভব নয়। অথচ এ স্থানে বিপিনের মুখে কথাগুলি একটুও বেমানান বা অবাস্তব বলে মনে হয় না। তারিণী কবিরাজের "হয়, Zানতি পার না" এবং "দেলাম ঠুকে একদলা চ্যবনপ্রাশ", লটবর লন্দীর "মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?", বিরিঞ্চিবাবার "ভয় কি বিবু, আমি আছি।" , ক্যাদার চাটুজ্যের "কাঠ-ফাঠ জানিনে বাবা। পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো ক'রে পরা।" প্রভৃতি এ জাতীয় অতিরঞ্জিত সংলাপের উদাহরণ। অথচ এগুলি চরিত্রের সঙ্গে সুসংগত, যথাযথ ও বাস্তব। বস্তুতঃ, রাজশেখর বসুর হাস্যরসসৃষ্টির প্রধান কৌশলই এই অতিরঞ্জন। বাস্তব চরিত্র, বাস্তব আচরণ, বাস্তব সংলাপকে অক্ষুণ্ণ রেখেও রাজশেখর এই অতিরঞ্জনের কৌশলে বিভিন্ন চরিত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি প্রবলরূপে ফুটিয়ে তুলে আমাদের হাসি উৎপাদন করেছেন। তাই রাজশেখর একাধারে সত্যদ্রষ্টা ও রসস্রষ্টা।

রাজশেখর বলেছেন বটে যে তিনি বেশি লোকের সঙ্গে মেশেন নি, তবু

তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র সাধারণ সাহিত্যিকের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ছিল। বাঙালী কেরানি, ব্যবসাদার মাড়োয়ারী, বড়লোক জমিদার, বিজ্ঞানবিদ্ প্রফেসর ইত্যাদি বহু লোকের সঙ্গে কর্মসূত্রে এবং সাংসারিক জীবনে তাঁকে মেলামেশা করতে হয়েছে। ফলে, বিবিধপ্রকার মানুষের চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি, কথাবার্তা তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যেমন নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছিল, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার মানুষের মনোভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও তাঁর তেমনি ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রায়সায়েব জাতীয় কৃপণ লোক অর্থলোভে কীভাবে ঠক্-জুয়াচোরের ফাঁদে পা দেয়, বড়লোক ব্যবসায়ী অনেক টাকা লোকসান দিয়ে কেমন করে বাবাজীর শরণ নেয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ কীভাবে ভগবানকে নানাপ্রকার ঘুষ দিতে চায়, ইত্যাদি মানবচরিত্রের বিবিধ দুর্বলতা অতি নিখুঁতভাবে রাজশেখর ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজশেখরের গল্পের চরিত্রগুলি সবই আমাদের অতি-পরিচিত। আমাদের চারপাশে যে-সব মানুষকে আমরা নিত্য দেখি, সেই মাস্টার-ছাত্র, জমিদার-পোষ্য, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও প্রবীণ কেরানি, ডাক্তার-কবিরাজ, স্বামীজী-শিষ্য, প্রেমিক-প্রেমিকা প্রভৃতি, যারা আমাদের চেনা লোক ও ঘরের লোক, তাদের হাস্যকর দুর্বলতাগুলিকে রাজশেখর এমন বড় ক'রে দেখিয়েছেন যে এই পরিচিত লোকদের যথার্থ স্বরূপ দেখে আমরা হেসে কুটিপাটি হই।

রাজশেখরের চরিত্র ও সংলাপ একাধারে যথাযথ এবং অতিরঞ্জিত। আমাদের আচরণে ও কথাবার্তায় চরিত্রের এমন কতকগুলি দিক প্রকাশ পায়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যার অসংগতি ও অযৌক্তিকতা ধরা পড়লেও আমরা নিজেরা সব সময় সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। এই অসংগতি ও অযৌক্তিকতার বোধ যদি কেউ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে দেন, তবে নিজেদের স্বরূপ দেখে আমরা নিজেরা হেসে মরি। রাজশেখর অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত সরল নিরলংকৃত ভাষায় আমাদের চরিত্র ও আচরণের সেই দুর্বলতা ও অসংগতিগুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেজন্য কোনো উদ্ভট, অবাস্তব অস্বাভাবিক বিষয় বা বর্ণনার অবতারণা না করেও তিনি অতি প্রবল হাস্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছেন।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজশেখরকে 'সুবুদ্ধিবিলাস' বিশেষণে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "রসবস্তু যা তাঁর লেখায় আমরা পাই, আর পাই বলেই তাঁকে আমরা ছাড়তে পারি না, তাঁকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূত এক অতি অসাধারণ সাধারণ-বুদ্ধি, ইংরাজিতে যাকে বলব most uncommon commonsense বা সুবুদ্ধির জ্যোতি।" বাস্তবিক পক্ষে আমরা যতপ্রকার হাস্যকর কাজ করি তা সবই সাময়িক বা স্থায়ীভাবে আমাদের সাধারণ-বুদ্ধির অভাবপ্রসূত। এই uncommon commonsenseএর অভাব হেতুই আমাদের আচরণ কার্যকলাপ ও কথাবার্তা সময় সময় নিতান্ত হাস্যজনক হয়ে দাঁড়ায়। রাজশেখর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত যুক্তিনিষ্ঠ সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা বিচার ক'রে সেগুলির অসংগতি ও অসামঞ্জস্য সুস্পষ্টভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা নিজেরা গম্ভীর হয়ে কথা বলেন, কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা শুনে শ্রোতারা হেসে গড়িয়ে পড়ে। রাজশেখরও হচ্ছেন সেই ধরণের গম্ভীর সূক্ষ্মদৃষ্টি লেখক। তিনি আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের বিশ্লেষক ও সমালোচক। কিন্তু তাঁর common senseএর আলোকে দেখলে সবই প্রচুর হাস্যজনক হয়ে দাঁড়ায়।

হাস্যরসসৃষ্টির উপায় ও উপকরণরূপে রাজশেখর তিনটি জিনিস ব্যবহার করেছেন ; এক, হাস্যরসাত্মক চরিত্র ; দুই, কৌতুকজনক পরিস্থিতি বা ঘটনাসংস্থান এবং তিন, হাস্যময় সংলাপ। তাঁর সৃষ্ট হাস্যময় চরিত্রের উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই — তাঁর প্রথম দিকের রচনার প্রায় প্রতিটি চরিত্রই হাস্যরসাশ্রিত — লম্বকর্ণ ও রামগিধর পর্যন্ত। তিনি আমাদের সমাজ থেকে সেই সব চরিত্রই তাঁর গল্পে প্রধানতঃ বেছে তুলে নিয়েছিলেন, যাদের আচরণে ও কাজে মূর্খতা, হীনতা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, ঠকামি, জুয়াচুরি প্রভৃতি অতিপ্রকট ; অথচ যারা বন্ধু, আত্মীয়, সহকর্মী, বিজনেস পার্টনার, গুরু, রাজনৈতিক নেতা, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি নানারূপে আমাদের আশে পাশেই বর্তমান রয়েছে। এদের আমরা দেখেও দেখি না এবং নিত্য দেখার অভ্যস্ততার ফলে এদের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি হয়তো আমাদের চোখেও পড়ে না। রাজশেখর সেই দুর্বলতাগুলি যেন

অতিরঞ্জনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। ব্রহ্মচারী ও ব্রাদার-ইন-ল, গণ্ডেরিরাম, ডাক্তার তরফদার, নেপাল ডাক্তার, তারিণী কবিরাজ, লাটুবাবু, চুকন্দর সিং, বিরিঞ্চি বাবা, মৌলবী বছিরুদ্দি, ব্যারিষ্টার ও কে সেন, কেষ্ট, পেলব রায় ও খল্বিদং স্বামী, এরা আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ মাত্র। কিন্তু সাধারণ-বুদ্ধির নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এদের কতকগুলি চারিত্রিক অসংগতি হাসির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজশেখরের হাস্যরসসৃষ্টির দ্বিতীয় উপকরণ ঘটনাসংস্থান বা হাস্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি। যেমন, আফিংখোর কেরানি বরদা খুড়োর "তিনে কত্তি তিন", সত্যর "পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জিলিং মেলের কলিশন — রক্তারক্তি — পিসীমা", হিন্দ্রলিনীর "সম্মার্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া ঘৃতাচীর পৃষ্ঠে ঘা-কতক" বসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "কন্দর্প বসন্ত শশধর মলয়ানিল সকলেই মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া বেগে প্রস্থান" করা, কেষ্টর হাইকোর্টশিপ, চুরি করতে গিয়ে কার্ত্তিকের হোঁচট খাওয়া ইত্যাদি অসংখ্য ছোটবড় হাস্যকর ঘটনা ও পরিস্থিতি রাজশেখরের লেখার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে; সেগুলির বিস্তৃত উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

শুধু চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাসংস্থানেই রাজশেখরের কৌতুক সীমাবদ্ধ নয়। রাজশেখরের সৃষ্ট চরিত্র ও ঘটনার কৌতুক বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে তার সংলাপের সরসতায়। আগেই বলেছি রাজশেখরের সংলাপ যথাযথ, তবু তা অতিরঞ্জিত। তার অর্থ এই যে, যে-ধরণের চরিত্র যেরূপ অবস্থায় যে-কথা বলতে পারে, রাজশেখর তার মুখে সে-অবস্থায় সে-জাতীয় সংলাপই বসিয়েছেন, কিন্তু ঠিক সে-কথাগুলি বসান নি। এরূপ কয়েকটি সংলাপের উদাহরণ আগে দিয়েছি। আরো দু'চারটি উল্লেখ করা যায়। যথা, গণ্ডেরিরামের উক্তি "পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। আমি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরাস্‌মে। ··· যদি ফিন কুছ দোষ লাগে — জানে রণছোড়জী — হামার পুন্‌ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদসী, সিউরাত, রামনওমীমে উপবাস, দান-খয়রাত ভি কুছু করি। আট-আটঠো ধরমশালা বানোআয়া — লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে···আশরফিলালকা পুন্‌ যদি সোলহ

লাখকা হোয়, মেরা ভি অস্‌সি হাজার মোতাবেক হোনা চাহতা।" এখানে কলকাতাবাসী মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের ভাষা নিখুঁত, মনোভাবও হয়তো নিখুঁত, কিন্তু কোনো মাড়োয়ারীর পক্ষেই বোধহয় ঠিক এরকম উক্তি করা সম্ভব নয়। হোমিওপ্যাথ নেপাল ডাক্তারের "ভাবছো আমার আল-মারির ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে? সে ভয় নেই, আমার তামাকে সালফার থার্টি মেশানো থাকে"; নরহরির "হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না! কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেছে। লোট তো লোট — ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইষ্টিলের কত্তাল"; অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছেলে বাঁটলোর "নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমরা কি করি না করি আপনার পিতার তাতে কি?" এবং কার্তিকের "নাইন্‌থ্ সিম্‌ফোনি বাজাচ্ছেন বুঝি?" তদুত্তরে গোবিন্দর, "উঁহু, ওসব সেকেলে সুর নেড়ীর পছন্দ নয়, বোধহয় শালা-লুট-লিয়া বাজাচ্ছে।" এ জাতীয় কথাবার্তা চরিত্রানুযায়ী হলেও অনতিরঞ্জিত নয়।

এখন রাজশেখরের বর্ণনাশক্তি সম্বন্ধে দু'একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। রাজশেখরের বর্ণনা —তা সে মানুষের চেহারা ও বেশভূষারই হোক, নিসর্গ-প্রকৃতির হোক, অথবা আসবাবপত্র চালচলন বা কার্যকলাপের হোক, অতি বাস্তব বা সত্যবৎ। রাজশেখরের তীব্র সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দখলের ফলেই এরূপ ত্রুটিশূন্য বর্ণনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ-বর্ণনা ফোটোগ্রাফের মতো নিখুঁত হলেও এর মধ্য দিয়ে কৌতুক উৎপাদিত হয়েছে কম নয়। কেননা, আমাদের হালচাল, ভাবভঙ্গি, কার্যকলাপে এমন অনেক কিছু আছে যা অত্যন্ত হাস্যকর। তার মজাটি নিখুঁত বর্ণনাতেই যথেষ্ট ফুটে ওঠে, তার আর অতিরঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। যেমন, "বংশালোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত; অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আশমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা আছে — CAT।" (লম্বকর্ণ)। রাজশেখরের

বর্ণনাশক্তি যে কীরূপ ছিল, তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনার থেকে একটু সামান্য উদাহরণ দিলে তা পরিস্ফুট হবে। "ক্রম্ দুদ্দূড় দুড়্ দড়ড়ড় ড়! আকাশে কে ঢেটরা পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের আস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পালাইতেছে। সমস্ত চুপ— গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ব হইয়া গিয়াছে।" সর্বপ্রকার কবিত্ব-কল্পনা-বর্জিত এরূপ অপূর্ব নিখুঁত প্রকৃতি-বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অল্পই খুঁজে পাওয়া যাবে।

রাজশেখরের গল্পের টেকনিক প্রভাতকুমারের অনুরূপ। বর্ণনাভঙ্গি ও চরিত্রসৃষ্টিতেও উভয়ের রচনার সাদৃশ্য আছে। প্রভাতকুমারের মতো রাজশেখরের গল্পও ঘটনাপ্রধান — ঘটনার গতিতেই পাঠকের কৌতূহলকে টেনে নিয়ে যায়। উভয়ের রচনাই লেখকের স্বকীয় মন্তব্যবিরল, উচ্ছ্বাসহীন। দুজনের রচনাই কৌতুক বা হাস্যের আমেজে পরম উপভোগ্য। উভয়ের রচনাতেই কপট, শঠ ও ভণ্ড চরিত্রের দুর্বলতাগুলি সুন্দরভাবে ফুটেছে। চরিত্রসৃষ্টিতেও উভয়ের রচনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এ-চরিত্রগুলি যেমন বাস্তব ও জীবন্ত, তেমনি আমাদের সমাজে অতি পরিচিত। প্রভাতকুমারের 'অদ্বৈতবাদে' অদ্বৈত নিজের কাঠের গুদামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টায় আছে। ধর্মভীরু কনিষ্ঠকে সে বোঝাচ্ছে, "হ্যাঁ, এমন যদি হত, যে, একজন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের করে নিচ্ছি— ও টাকাটা দিয়ে তার ব্যবসা মাটি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে বটে অধর্ম আছে — তার ক্ষতি করছি। এ যে কোম্পানী হে, কোম্পানি। এ কি একজনকার? এই ধর, শিবপুরে কোম্পানির বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি দুটো কুল পেড়ে খাই তাতে কি কোনও পাপ আছে? লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই-ই — যার কুলগাছ সে ত জানতেও পারবে না। অধর্ম হবে বলে তুমি কেন ভয় করছ?" আমাদের সমাজে অনুরূপ মনোবৃত্তির প্রাবল্য রাজশেখরও লক্ষ্য করেছেন, "এ দেশের অসংখ্য কৃতকর্মা চতুর লোকের যে নীতি মুচুকুন্দরও তাই ছিল। যুধিষ্ঠির বোধহয় একেই মহাজনের পন্থা বলেছেন। এদের

একটি অলিখিত ধর্মশাস্ত্র আছে ; তাতে বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে যেমন সংসর্গদোষ হয় না তেমনি বৃহৎ বা বহুজনের ব্যাপারে অনাচার করলে অধর্ম হয় না। রাম শ্যাম যদুকে ঠকানো অন্যায় হতে পারে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটি রেলওয়ে বা জনসাধারণকে ঠকালে সাধুতার হানি হয় না।”

(লক্ষ্মীর বাহন, ধুস্তরী মায়া)।

আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিচার করলে আর একজন লেখকের সঙ্গে রাজশেখরের রচনার বিশেষ মিল দেখা যায়। তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখর এই দুজনেই বাংলাসাহিত্যের প্রধান স্যাটায়ারিস্ট বা ব্যঙ্গরচয়িতা, এবং উভয়ের রচনাই তুমুল হাস্য উৎপাদন করে। ত্রৈলোক্যনাথ মানবচরিত্র বিচার করেছিলেন ধর্ম ও সমাজের দিক থেকে। হিন্দু সমাজে যে একদল লোক বাহ্যিক ধর্মনিষ্ঠার মুখোশ পরে হীনচরিত্র হয়েও সামাজিক মর্যাদা পেত, ত্রৈলোক্যনাথ ভণ্ডামির আবরণ খুলে তাদের স্বরূপটি দেখিয়েছেন। সামাজিক আচার-বিচার ও ফোঁটা-টিকির চেয়ে যে মানবজীবন ও মানবহৃদয়ের মূল্য অনেক বেশি, ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর নানা গল্প-কাহিনীতে এই কথাই বারবার বলতে চেয়েছেন। রাজশেখর কিন্তু তাঁর বিদ্রূপ কেবলমাত্র হিন্দুর ধার্মিক ও সামাজিক ভণ্ডামির প্রতি পরিচালিত করেই ক্ষান্ত হন নি। আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকলপ্রকার অসাধুতা, কপটতা, মূ[illegible], সংস্কারাচ্ছন্নতা, অর্থগৃধ্নুতা প্রভৃতি সকলপ্রকার দুর্বলতা ও হীনতার প্র[illegible] তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে, তাঁর বিজ্ঞানী যুক্তি[illegible] মন ধর্মের বাহ্যানুষ্ঠান ও আড়ম্বর, পরলোক, দৈব, গুরু, গেরুয়া, ফ[illegible] জ্যোতিষ ইত্যাদির প্রতি আমাদের আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপকে সু[illegible] পেলেই বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি। এ বিষয়ে রাজশেখরের মতামত [illegible] দৃষ্টিভঙ্গি 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করেছেন। ত[illegible] তাঁর রচনায় বিরিঞ্চিবাবা, খল্বিদং স্বামী, বিঘোর বাবা, এমন কি মিরচা[illegible] বাবা, করাত বাবা পর্যন্ত তাদের হাস্যকর ভণ্ডামি ও ভড়ং নিয়ে উপস্থি[illegible] হয়েছে। এ বিষয়েও ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে রাজশেখরের সাদৃশ্য আছে[illegible] গুরুগিরি করা যাদের ব্যবসা, সেই কপট ও ভণ্ড চরিত্রদের স্বরূপ দেখা[illegible]

দুজনেরই খুব উৎসাহ ছিল। আরও একটা বিষয়ে উভয়ের মিল ছিল, সে হচ্ছে তাঁদের গল্পকাহিনীতে ভূতপ্রেতের অবতারণায়। এই ভূতজাতির দ্বারা সংসারে কতপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়, এই দুই ভিন্নকালীন স্যাটায়ারিস্ট তা অনেকটা একই দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মানব-প্রতিবেশী এই ভূতজাতি আসলে কী, সে বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্য আমরা আগে উল্লেখ করেছি।* রাজশেখরের রচনা থেকে অনুরূপ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করি। "এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে — কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু — তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর।" "দেবতারা হচ্ছেন উদারপ্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন।" (মহেশের মহাযাত্রা)।

'ভূশণ্ডীর মাঠে' (গড্ডলিকা) 'মহেশের মহাযাত্রা' (হনুমানের স্বপ্ন) ও 'বদন চৌধুরীর শোকসভা' (ধুস্তুরীমায়া) এই তিনটি গল্পে দেখা যায় ভূতদের কার্যকলাপ কী ভীষণ, এবং মনুষ্যসমাজে তাদের প্রভাবই বা কী মারাত্মক। ভূতগণ মানুষের ঘাড়ে চাপলে তারা যে কী বলতে কী বলে আর কী লিখতে কী লেখে তা তারা নিজেরাই জানে না। 'বদন চৌধুরীর শোকসভা'য় এর দৃষ্টান্ত আছে, ত্রৈলোক্যনাথের গোঁগাও অদৃশ্যভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্র আপিসে গিয়ে সম্পাদকদের ঘাড়ে চেপে এ-জাতীয় কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে থাকেন।

এইরূপ আরও নানা বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে রাজশেখরের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন, ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর বহু কাহিনীতে কখনো হাস্যোৎপাদনের জন্য, কখনো বা বিদ্রূপের বাহন হিসাবে অনেক tall tales বা গাঁজাখুরি জাতীয় উদ্ভট গল্প আমদানি করেছেন; রাজশেখরেরও এজাতীয় উদ্ভট আজগুবি গল্পের অভাব নেই। কিন্তু এই দুই লেখকের সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য এই যে, উভয়েই ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং কপটতা ও শঠতাকে

* পৃঃ ২৮৬-২৮৮ দ্রষ্টব্য।

অতি প্রবলভাবে বিদ্রূপ করেছেন। প্রভেদ এই যে, ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্রূপ ধর্ম ও সমাজসংশ্লিষ্ট অন্তঃসারশূন্য ও যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার ও ভড়ং প্রভৃতির দিকেই পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু রাজশেখরের ব্যঙ্গ ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্যনীতি, স্বার্থপরতা, অর্থগৃধ্নুতা, অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, এক কথায় বাঙালী জীবনের ও জাগতিক ব্যাপারের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল। আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের এমন দিক অল্পই আছে, যেদিকে রাজশেখরের মনন ও চিন্তা কখনো ব্যঙ্গ-গল্পরূপে কখনো যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত না হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখর উভয়ের রচনাই বাইরে থেকে অত্যন্ত লঘু ও মজাদার মনে হলেও উভয়েরই রচনার অন্তরালে একটি যুক্তিনিষ্ঠ মানবসহানুভূতিপ্রবণ সংস্কারেচ্ছু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজশেখর নিজের রচনা সম্বন্ধে বলেছেন, "পরিহাস ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে লিখি নি। কখনও কোন লোককে লক্ষ্য করে আক্রমণের জন্য কিছু লিখি নি।...কেদার বাবু নামটা ব্যবহার করেছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কেদারবাবুকে একবার বললুম, মশাই, আপনার নামটি ব্যবহার করছি, আপত্তি নেই তো? ...অবিশ্যি আমার গল্পের কেদার চাটুয্যের চেহারা বা চরিত্রের সঙ্গে আপনার কোনো মিল থাকবে না।"* রাজশেখর পরিহাসই করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানী দৃষ্টি আমাদের সমাজে ও জীবনে যে সকল হীনতা, দুর্বলতা ও অসংগতি লক্ষ্য করেছিল, সেসব দিকেই তাঁর পরিহাস পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর ব্যঙ্গ ব্যাপকভাবে আমাদের সমাজের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত, ব্যক্তিগত বিদ্রূপের সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়, এ-পরিহাস ও ব্যঙ্গ কাউকে আঘাত করে না। তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ দুর্দশার প্রতি যে সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতেও তাঁর রচনা অসাধারণ মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর বিদ্রূপ পরশুরামের কুঠারের মতোই তীক্ষ্ণ ও তীব্র বটে, কিন্তু তা এতই নৈর্ব্যক্তিক এবং প্রবল হাস্যরসে এমনই ওতপ্রোত যে, তাকে আর আঘাত বলে মনে হয় না।

* শ্রীরাজশেখর বসু, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। কথাসাহিত্য, উল্লিখিত সংখ্যা।

রাজশেখরের প্রথম দু'খানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৩২ ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে। মাঝখানের তিন বৎসর সময় 'কজ্জলী'র গল্পগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ দু'টি বই-ই রাজশেখরের প্রবলতম হাস্য-রসাত্মক গ্রন্থ। বই দু'টিতে 'মহাবিদ্যা' ছাড়া আর কোনো গল্পেই ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার অতিপ্রকট নয় এবং প্রায় প্রতিটি গল্পই এক একটি masterpiece। কি হাস্যরসে, কি সমাজজীবনের ব্যঙ্গাত্মক চিত্ররূপে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এ গল্পগুলির কোনোই তুলনা নেই। 'লম্বকর্ণ' ও 'ভূষণ্ডীর মাঠে'র মতো গল্প রাজশেখরও বেশি লেখেন নি; এগুলি আমাদের সাহিত্যের অতুলনীয় ও চিরস্থায়ী সম্পদস্বরূপ। সে-সময়ে শরৎচন্দ্র ও নরেশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকেরা তাঁদের রচনায় নারীত্ব ও সতীত্ব সম্বন্ধে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছিলেন, এবং এর ফলে যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতির রচনায় সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছিল, 'ভূষণ্ডীর মাঠে'তে ভৌতিক পরিবেশ উপস্থিত করে এ-বিতর্কের কচকচিকে রাজশেখর এক অপরূপ ভৌতিক সমস্যায় পর্যবসিত করেছিলেন। এ-গল্পটির চরিত্রচিত্রণ, সংলাপ, পরিবেশ, এমনকি গানগুলি পর্যন্ত এমনই নিখুঁত, এর ব্যঙ্গ এতই সূক্ষ্ম, এর সমাপ্তি এরূপ কৌতুকময় যে, 'ভূষণ্ডীর মাঠে'কে রাজশেখরের শ্রেষ্ঠ গল্প বলে অভিনন্দন জানাতে হয়। আর, ব্যঙ্গাত্মক পদ্যরচনায় রাজশেখরের যে কী অসাধারণ দক্ষতা ছিল, নাদু মল্লিকের গান-গুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। পাখোয়াজের একটি বোলকে রাজশেখর যে ভৌতিক গানে রূপায়িত করেছিলেন, সে গানটি অসূয়াবর্জিত হাস্যময় ব্যঙ্গকবিতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অথচ রাজশেখরের বিনয় এমনই সুগভীর ছিল যে, গানটি সম্বন্ধে একটি পত্রে বর্তমান গ্রন্থকারকে তিনি লিখেছিলেন, "ভূষণ্ডির মাঠের কবিতার সবটা আমার রচনা নয়। একজন ওস্তাদের মুখে এই প্রাচীন বোল শুনেছিলাম। স্থানে স্থানে অবোধ্য শব্দ ছিল, আমি তাই বদলে দিয়েছি।··· এই পাখোয়াজী পদ্যটির মূল যে অতি প্রাচীন তা উল্লেখ করা দরকার।" রাজশেখরের পদ্যরচনার নিদর্শন বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নাদু মল্লিকের গানটিকে বাংলাসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক কবিতা বলে মনে করি। যদিও রচনাটি সুপরিচিত তবু

এখানে সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না।

"ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্‌টে পালটে ফ্যালে
ধাক্কা ধুক্কি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—"

'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী'র পর রাজশেখরের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালে। 'কজ্জলী' প্রকাশের পর কিছুকাল তিনি একটি অতি গুরুতর কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেটি 'চলন্তিকা' অভিধানের সংকলন ও প্রকাশ। হাস্যরসাত্মক লঘু রচনা দিয়ে সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত করলেও রাজশেখরের মানস-গঠন লঘু ছিল না, অতি গভীর চিন্তাশীলতায় তা পরিপূর্ণ ছিল। তাই 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী'র পর থেকেই দেখতে পাই রাজশেখরের রচনা লঘুতা থেকে ক্রমে গভীরতর বিষয়ের দিকে মোড় নিতে থাকে। 'হনুমানের স্বপ্নে'রও কতকগুলি গল্প প্রচুর হাস্যরসে মণ্ডিত বটে — বিশেষ করে 'মহেশের মহাযাত্রা' ও 'রাতারাতি'র নাম করা যায় — কিন্তু কয়েকটি গল্প সংক্ষিপ্ত চিত্র বা নকশা জাতীয় এবং অন্ততঃ একটি গল্পকে হাসির গল্প না বলে গভীর চিন্তা ও মনীষাময় রূপক-রচনা বলে বর্ণনা করলেই ঠিক হয়। এ রচনাটির নাম 'দশকরণের বানপ্রস্থ'। গল্পটির রচনাভঙ্গিতে রাজশেখরের স্বাভাবিক কৌতুকধারা অক্ষুণ্ণ থাকলেও এটিকে কোনোমতে হাস্যরসাত্মক গল্প বলে বর্ণনা করা যায় না। 'হনুমানের স্বপ্নে'র পর রাজশেখরের রচনা আরও বেশি সীরিয়াস বা গভীর হতে থাকে। এসময়ে তিনি অনেকগুলি গুরুতর চিন্তাশীল পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি এ সময়েই হাত দেন। ১৩৪৪ থেকে ১৩৫৭ পর্যন্ত তাঁর যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়, তা এই। 'লঘুগুরু' (প্রবন্ধ) ১৩৪৬, 'মেঘদূত' (সটীক বাংলা অনুবাদ) ১৩৫০, 'ভারতের খনিজ' (প্রবন্ধ) ১৩৫০, 'কুটীরশিল্প' (প্রবন্ধ)

১৩৫০, 'বাল্মিকী রামায়ণ' (সারানুবাদ) ১৩৫৩, 'মহাভারত' (সারানুবাদ) ১৩৫৬, 'হিতোপদেশের গল্প' (চুম্বকানুবাদ) ১৩৫৭। পরবর্তী গল্পগ্রন্থ 'গল্প-কল্প'ও ১৩৫৭ সালেই প্রকাশিত হয়।

'গল্পকল্প' এবং তৎপরবর্তী গল্পগ্রন্থগুলির সঙ্গে 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলী'র প্রভেদ বিস্তর। 'গল্পকল্পে'র একমাত্র 'রাজভোগ' ভিন্ন আর কোনো গল্পকেই প্রকৃতপক্ষে হাসির গল্প বলে বর্ণনা করা চলে না, যদিও 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ' গল্পটিতে রাজশেখর নারীর বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি প্রবল কৌতুকের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। 'গামানুষ জাতির কথা' তো বর্তমান মারণাস্ত্রসঙ্কুল পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ অধ্যুষিত রাষ্ট্রনীতির প্রতি অতি তীব্র স্যাটায়ার। অন্যান্য গল্পগুলিকে কথোপকথনচ্ছলে রচিত প্রবন্ধ বললে অত্যুক্তি হয় না। 'চলচ্চিন্তা' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে 'আমিষ নিরামিষ' প্রবন্ধটিতে একটি সুচিন্তিত আলোচনা রাজশেখর যেরূপ সংলাপের মধ্য দিয়া উপস্থিত করেছেন, 'রাম-রাজ্য' ও 'শোনা কথা' বস্তুতঃ সেরূপই। 'শোনা কথা'কে স্বচ্ছন্দে 'চলচ্চিন্তা'র অন্তর্ভুক্ত করা চলতো।

রাজশেখরের পরবর্তী গ্রন্থগুলির প্রকাশকাল এরূপ — 'ধুস্তুরীমায়া' (গল্পগ্রন্থ) ১৩৫৯, 'কৃষ্ণকলি' (গল্পগ্রন্থ) ১৩৬০, 'বিচিন্তা' (প্রবন্ধ) ১৩৬২, 'নীলতারা' (গল্পগ্রন্থ) ১৩৬৩, 'আনন্দীবাঈ' (গল্পগ্রন্থ) ১৮৭৯ শক (১৩৬৪), 'চলচ্চিন্তা' (প্রবন্ধ) ১৮৮০ শক (১৩৬৫), 'চমৎকুমারী' (গল্পগ্রন্থ) ১৮৮১ শক (১৩৬৬)। এ বইগুলিতে কতকগুলি কৌতুকপ্রধান গল্প বা চিত্র আছে, আর কয়েকটি আছে তীব্র স্যাটায়ার অথবা গল্পকারে কোনো গভীর জটিল বা প্রয়োজনীয় সমস্যার আলোচনা। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 'যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট', 'রটন্তীকুমার', 'জটাধর বকশী' 'সরলাক্ষ হোম', 'আতার পায়েস', 'নীলতারা', 'তিরি চৌধুরী', 'জয়হরির জেব্রা', 'কৃষ্ণকলি', 'চাঙ্গায়নী সুধা', 'চিঠিবাজি', 'কামরূপিণী', 'চমৎকুমারী', 'গণৎকার', প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই বইগুলির অধিকাংশ গল্পই অতি তীব্র স্যাটায়ার অথবা গল্পচ্ছলে কোনো গুরু বিষয়ের আলোচনা। 'ষষ্ঠীর কৃপা', 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি', 'গগনচটি', 'মাৎস্য ন্যায়' প্রভৃতি অতি তীব্র স্যাটায়ার। রাজশেখরের চিন্তাশীল মন দেশের ও জগতের

নানা সমস্যা নিয়ে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকতো। যে-বিষয়গুলি তাঁর মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করতো, তার মধ্যে আমাদের তরুণ সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যবসায়ী সমাজের অসাধুতা এবং জগতের রাষ্ট্রনায়কগণের হিংস্র ও অদূরদর্শী মনোবৃত্তি প্রভৃতি প্রধান। রাজশেখরের বিজ্ঞানী যুক্তিনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল মন আচরণে ও চিন্তায় সর্বপ্রকার সংযম ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিল। আধুনিক সমাজের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষতঃ তরুণসমাজে, অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শ্রদ্ধাহীনতা রাজশেখরকে বিশেষভাবে পীড়িত করতো। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্রদ্ধার মনোভাবকে রাজশেখর নানা গল্পে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' (কৃষ্ণকলি) গল্পটিতে তরুণ-সমাজের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবকে তিনি যেরূপ তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় নি। ক্রতুপুত্র অজাত-বালখিল্য নেতা মাতৃগর্ভ থেকেই অন্যান্য বালখিল্যগণকে সম্বোধন ক'রে বলছে—

"—বিশ্বের অপোগণ্ড এক হও।

—এক হব।

—সকলে আরাব উত্তোলন কর — প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা মানব না।

—মানব না।

—পিতামাতা গুরু কারও শাসন মানব না।

—মানব না।

—গুরুকে আর ডরাব না, গুরুর গরু চরাব না। গুরুকুলে নাহি রব, না পড়ে পণ্ডিত হব।

—না পড়ে পণ্ডিত হব।"

মনে হয়, বালখিল্যগণের এই আরাব যেন অহরহ কানে শুনতে পাচ্ছি। এমনকি অকালে গর্ভচ্যুত এই গর্ভস্রাবগণের পরবর্তী হুংকারও আমাদের কাণে এসে পৌছয় —"বালখিল্যা বর্ধন্তাম্, আর সবাই ক্ষীয়ন্তাম।"

আধুনিক তরুণ-সমাজের সর্বপ্রকার শাসন ও শৃঙ্খলার প্রতি এই বিদ্রোহী মনোভাবকে রাজশেখর 'রাতারাতি' গল্পেও বিদ্রূপ করেছিলেন।

কার্ত্তিকের বাবা চরণ ঘোষের প্রতি কার্ত্তিকের বন্ধু মিষ্টভাষী ও বিনয়ী বাঁটলোর উক্তি আগেই উদ্ধৃত করেছি। অপর বন্ধু ঘনেন বলছে,—"দেখুন আমরা বড়ই অপমানিত নির্যাতিত হয়েছি, একেবারে পাবলিক হোটেলে দু'শ লোকের সামনে। কেন? যেহেতু আমরা পরাধীন, অভিভাবকের অন্নদাস। এই অবস্থা আর সহ্য হয় না,…।" পিতা বা পিতৃস্থানীয়ের প্রতি এই অশ্রদ্ধাসূচক মনোভাবকে 'রাতারাতি'তে রাজশেখর প্রচুর হাস্যের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি'তে হাসি অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন হয়ে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ আগেই উল্লেখ করেছি; প্রথম তিনখানি প্রবল হাস্যরসাত্মক গ্রন্থরচনার পরে রাজশেখর গভীর ও গম্ভীর অনুবাদ, টীকারচনা, প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রভৃতি গুরুবিষয়ে বহুকাল নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। ফলে, এই সময় থেকে তাঁর সকল রচনাই অনেকটা সীরিয়াস হতে আরম্ভ করে। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্নে'র তুলনায় পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে রাজশেখরের হাস্যরস অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আরো দু'একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়, যেগুলিকে রাজশেখর আগাগোড়াই ব্যঙ্গ করেছেন, কিন্তু প্রথম জীবনে সে-ব্যঙ্গ প্রচুর কৌতুকহাস্যের সঙ্গে তিনি পরিবেশন করেছিলেন, আর শেষজীবনে সেগুলি অবলম্বন করে তিনি করেছেন গভীর আলোচনা অথবা তীব্র অপ্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। যেমন ধরা যাক, সাধু-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পটির বিষয় এই, খল্বিদং স্বামীর গল্পটিও ঐবিষয় নিয়ে লেখা আর একটি হাস্যরসাত্মক কাহিনী। এই বিষয়টিরই অপরপিঠ আমরা দেখতে পাই 'কৃষ্ণকলি'র অন্তর্গত 'ভবতোষ ঠাকুর' গল্পে। প্রকৃত সদাচারী ভড়ংহীন ধর্মোপদেষ্টার যে ভক্ত জোটে না, এ-গল্পটিতে তাই অতি মৃদু কৌতুকময় ভঙ্গিতে উপস্থিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ব্যবসায়িক অসাধুতাকে রাজশেখর 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'এ প্রচুর হাস্যের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। পরবর্তীকালে রচিত তাঁর 'মাৎস্যন্যায়', 'সত্যসন্ধ বিনায়ক', 'নিধিরামের নির্বন্ধ' প্রভৃতি ঐ একই বিষয় নিয়ে লেখা হলেও এগুলিকে অনেকটা গভীর আলোচনার পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। আধুনিক জগতের রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্রনায়কদের

মনোভাব ও কার্যকলাপকে রাজশেখর কয়েকটি গল্পে অতি তীব্র বিদ্রূপ করেছেন। 'গামানুষ জাতির কথা', 'রামরাজ্য' (গল্পকল্প), 'গন্ধমাদন বৈঠক' (ধুস্তুরীমায়া), 'মাঙ্গলিক' (নীলতারা) ও 'গগন চটি' (আনন্দীবাঈ) প্রভৃতি গল্পগুলি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য স্যাটায়ার। বস্তুতঃ 'গগন চটি' আকাশে উদিত হলেও বর্তমান জগদ্ব্যাপী অসাধুতা এবং রাষ্ট্রনেতাদের হিংস্র মনোভাবকে বেশ একটু পিটিয়ে দিয়ে গেছে।

রাজশেখরের সহজাত প্রবল হাস্যরস তাঁর সকল গল্পেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হয়েছে। এমন কি, কোনো কোনো প্রবন্ধের রচনাভঙ্গিতেও একটু কৌতুকের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, প্রথম দু'তিনখানি গল্পগ্রন্থে রাজশেখর যত প্রবল হাস্যরস উপস্থিত করেছেন, পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে সেরূপ পাওয়া যায় না। এর কারণ, রাজশেখরের মন ছিল বিজ্ঞানানুসারী, যুক্তিনিষ্ঠ, চিন্তাশীল ও মনীষামণ্ডিত। তাই, তাঁর প্রায় সকল গল্পই তাৎপর্যপূর্ণ এবং 'স্যাটায়ার' জাতীয়। প্রথমাংশের গল্পগুলিতে রাজশেখর বাঙালী সমাজের এবং মানবচরিত্রের হাস্যকর দুর্বলতাগুলিই খুব বড় করে দেখিয়েছিলেন। সেখানে হাস্যরস এরূপ প্রবল যে, এর অন্তরালে যে তীব্র বিদ্রূপ আছে, তা সব সময় চোখে পড়ে না। কিন্তু শেষ জীবনের গল্পগুলিতে রাজশেখর এ বিদ্রূপকে আর ততটা প্রচ্ছন্ন করবার প্রয়াস করেন নি। এগুলি রাজশেখরের রচনার স্বাভাবিক হাস্যরসবর্জিত নয় সত্য, কিন্তু এগুলিকে হাস্যরসপ্রধান বলেও ঠিক বর্ণনা করা যায় না।

রাজশেখর তাঁর বক্তব্যের বাহনরূপে বহু পুরাণ-কাহিনী ব্যবহার করেছেন। অসম্ভব অলৌকিক ঘটনাও তাঁর রচনায় বিরল নয়। লোকমনোরঞ্জক গল্পরচনাই যদি রাজশেখরের উদ্দেশ্য হোত, তবে তিনি পুরোনো গল্পে ঢেলে সাজতে যেতেন না, অথবা অসম্ভব অলৌকিক কাহিনীরও অবতারণা করতেন না। তাঁর গল্পগুলি চিন্তা, যুক্তি ও বক্তব্যপ্রধান স্যাটায়ার বলেই যে-কোনো পুরাতন বা অসম্ভব কাহিনীর রূপকে তিনি তাদের উপস্থিত করেছেন।

বাংলাসাহিত্যে দু'জন প্রধান স্যাটায়ারিস্ট-এর মধ্যে রাজশেখর অন্যতম। স্যাটায়ারিস্টের প্রধান অস্ত্রই হাস্যরস — হাসির আড়ালে থেকেই স্যাটায়া-

রিস্ট বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেন। হাস্যরস উৎপাদনে অপর স্যাটায়ারিস্ট ত্রৈলোক্যনাথের চেয়ে রাজশেখরের কৃতিত্বই বেশি। বিশেষতঃ ত্রৈলোক্যনাথের স্যাটায়ারের গণ্ডি ছিল সংকীর্ণ। বাঙালী হিন্দুর ধর্মাচার ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সে-সমাজের ভণ্ডতা, কপটতা ও হৃদয়হীনতার মধ্যেই সে বিদ্রূপ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজশেখরের ব্যঙ্গ কেবল হিন্দুর সামাজিক জীবনে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা আমাদের জীবনের সর্ববিধ কপটতা, অসাধুতা, এবং আধুনিক জগতের হিংস্রতা ও অন্যায়ের প্রতি পরিচালিত হয়েছিল। এ-জন্য, রাজশেখর বাংলা সাহিত্যের শুধু একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখক নন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কও বটেন।

বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও রাজশেখরের অনেক আগেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে তিনি (১৮৮২-১৯২২) এককালে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় ছিলেন। স্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যে প্রতিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কম লেখকের দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে। আয়ুর পরিসরের তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেনও প্রচুর। ইনি প্রধানতঃ কবি হলেও গদ্যরচনাতেও এঁর বেশ দক্ষতা ছিল। ইনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অধিকাংশই সাহিত্যিক বিতর্ক-বিতণ্ডা শ্রেণীর। ইনি 'জন্মদুঃখী' নামে নরওয়ের লেখক Jonas Lie-এর একটি উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। তাছাড়া 'চীনের ধূপ' নামে ইনি কয়েকটি অনুবাদ-প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। 'ডঙ্কানিশান' নামে একটি মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়ও তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। ইনি 'রঙ্গমল্লী' নামে সংকলিত কয়েকটি অনুবাদ-নাটিকা এবং 'ধূপের ধোঁয়ায়' নামে একটি মৌলিক নাটিকাও রচনা করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান গদ্যলেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা রজনীকান্ত দত্তও কৃতবিদ্য ছিলেন। মাতুল কালীচরণ মিত্র 'হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক ও গল্পলেখকরূপে তৎকালীন বাংলায় সুপরিচিত ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য-

চর্চার পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়েই জন্মেছিলেন, এবং অতি বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যালয়গত লেখাপড়ায় এঁর মন ছিল না। বি. এ. পড়বার সময়ই তাঁর বিয়ে হয়। পরীক্ষাটিতে কিন্তু ইনি পাশ করতে পারেন নি।

প্রমথ চৌধুরীর মতো ইনিও 'সাহিত্য'-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কৈশোরেই এঁর প্রথম কবিতার বই 'সবিতা' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। এখানি এবং এঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫) বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। এগুলি আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি, কিন্তু বই দু'টির কোনো কোনো কবিতা পরবর্তী কবিতার বই 'বেণু ও বীণা'র (১৯০৬) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর পরের কাব্যগ্রন্থ 'হোমশিখা' (১৯০৭)। এর কবিতাগুলিও প্রথম বই দুখানির অনুরূপ বিষয় নিয়ে লেখা। এগুলির মধ্যে জাতি ও দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং দর্শন-বিজ্ঞানে ভারতের উন্নতিকামনাই প্রধান। এ বইগুলি প্রকাশের পর অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রভক্ত লেখকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং সেই সূত্রে তিনিও রবীন্দ্রনাথের একজন গোঁড়া ভক্ত হয়ে দাঁড়ান। এ সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এঁর রচনায় ক্রমেই প্রবলরূপে দেখা দিতে আরম্ভ করে। ভাষা ও ছন্দের যে লঘু ও বিচিত্ররূপ তাঁর কবিতায় প্রকাশিত, তা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। অনতিদীর্ঘ জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। সেগুলির নাম যথাক্রমে 'সবিতা' (১৯০০), 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'হোমশিখা' (১৯০৭), 'তীর্থসলিল' (১৯০৮), 'তীর্থরেণু' (১৯১০), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'জন্মদুঃখী' (১৯১২), 'চীনের ধূপ' (১৯১২), 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণিমঞ্জুষা' (১৯১৫), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬) ও 'হসন্তিকা' (১৯১৭)। মৃত্যুর পরে তাঁর আরো তিনখানি বই প্রকাশিত হয়, 'বেলাশেষের গান' (১৯২৩), 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) এবং 'ধূপের ধোঁয়ায়' (১৯২৯)।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছন্দ সম্বন্ধীয় phantasy 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধটি সুপরিচিত। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিতর্কমূলক যেসব

সাময়িক প্রবন্ধ ইনি লিখেছিলেন, সেগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। এই প্রাচুর্য থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের রচনার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়গত শিক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি বটে, কিন্তু সর্বপ্রকার বিদ্যা আহরণের দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। পিতামহের বিজ্ঞানানুসারী তথ্যসন্ধানী মন তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন, আর লাভ করেছিলেন পিতামহের একটি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার। বিবিধ বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল, এবং তিনি পড়াশুনাও করেছিলেন অনেক। নিজের চেষ্টায় নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি ফার্সী মোটামুটি ভালো জানতেন, অন্যান্য অনেক উত্তরভারতীয় ভাষায়ও তাঁর কিছু কিছু দখল ছিল। ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে ফরাসী তিনি ভালোই জানতেন। জার্মান প্রভৃতি অন্যান্য ভাষাও তাঁর কিছু কিছু জানা ছিল। ফরাসী ভালো জানা থাকাতে ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক মূলগ্রন্থ তিনি পড়তে পেরেছিলেন। প্রচুর পড়াশুনা করবার অভ্যাস তাঁর ছিল, এবং বিবিধ ভাষা ও জ্ঞানের চর্চা তাঁর রচনাতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথম জীবনের রচনায় বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়, কিন্তু ক্রমে বিজ্ঞানের রূপধ্বংসকারী বিবিধ উপকরণের প্রতি তাঁর বিরাগ প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এ-পরিবর্তন রবীন্দ্রপ্রভাবের ফল।

সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল জ্ঞানানুসারী, তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিপ্রবণ, কিন্তু পরিবর্তনশীল। যদি কোনো একটি বিষয় বা ভাবকে তাঁর রচনায় আগাগোড়া প্রবলরূপে প্রকাশিত হতে দেখা গিয়ে থাকে, তবে তা দেশাত্মবোধ। এ ভিন্ন, ভাবে ও চিন্তায়, ভাষায় ও ভঙ্গিতে, মতামতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সমালোচকেরা সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় বহু কবির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতির দ্বারা তিনি কোনো কোনো কবিতায় স্পষ্টরূপেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা তো বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে বিষয়বস্তুতেও, বিবিধ প্রকার উপকরণ তথ্য ও চিন্তা নানা সময়ে তাঁর

কবিতায় দেখা দিয়েছে। এর কারণ, সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল বেতস-পত্রের মতো। সামান্যতম বায়ুর স্পর্শে তা আন্দোলিত হোত। অল্পবয়সে 'চারুপাঠ' তাঁর কবিতার উপকরণ জুগিয়েছিল। পরে বিভিন্ন কবির রচনা ও সামসাময়িক জাগতিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সবই তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছিল। তিনি যখন যা পড়তেন, দেখতেন বা শুনতেন, তা-দ্বারাই সাময়িকভাবে অভিভূত হতেন এবং তাঁর কবিতায় তা প্রতিফলিত হোত। তিনি যখন যে-কবির রচনা পড়তেন, তখন তাঁর ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেতেন। এই জন্যই অনুবাদে তাঁর এত প্রবণতা ও কুশলতা ছিল। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের যথার্থ জনমানসের প্রতিনিধি। জন-সাধারণের মধ্যে যখন যে প্রভাব, যে চিন্তা, যে প্রীতি বা অপ্রীতি প্রবলরূপে দেখা দিয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তখনি তার ছায়াপাত হয়েছে। স্বদেশী যুগের গণচিন্তাধারা তাঁর কবিতায় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গ, মডারেটবিদ্বেষ, কংগ্রেস, চরকা, গান্ধীজি, গণচিন্তার এমন দিক অল্পই আছে যা তাঁর কবিতায় কোনো না কোনো সময়ে প্রবলরূপে প্রকাশিত হয়নি। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, জাগতিক সকল বিষয় নিয়েই তিনি কবিতা লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়, আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারী, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন।" এ মন্তব্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিও প্রযুক্ত হতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে সমধর্মিতা ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মতোই সত্যেন্দ্রনাথের নীতিবোধ ও তথ্যনিষ্ঠা প্রবল ছিল। উভয়েই খাঁটি বাঙালী কবি ছিলেন। বর্ণনাশক্তি এবং ব্যঙ্গকুশলতাও উভয় কবির মধ্যেই অতি প্রবলরূপে বিদ্যমান ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুপ্ত নবযুগের একমাত্র নীতিবোধ ছাড়া অন্য কোনো ভাব বা অগ্রসর চিন্তা আত্মস্থ করতে পারেন নি। তিনি উচ্চশিক্ষা পান নি, ইংরেজী বা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর তেমন পরিচয় ছিল না,

—পাশ্চাত্ত্য ভাব ও চিন্তা হৃদয়ংগম করা তো দূরের কথা। অপরপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের মন পাশ্চাত্ত্য ভাব ও চিন্তায় সমৃদ্ধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন রক্ষণশীল, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নিত্য উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষপাতী। ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ভাবাবেগ সম্পূর্ণই অনুপস্থিত; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ভাব ও আবেগ দুইয়েরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যদিও অধিকাংশ স্থলে এ-দুটির সমন্বয় ঘটে নি। প্রকৃত হৃদয়াবেগের পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্বল্প। এ-বিষয়ে সুকুমার সেনের উক্তি যথার্থ মনে করি। তিনি লিখেছেন, "সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে কবির নিজের কথা নাই বলিলেই হয়।··· সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিতান্তই বিরল। তাঁহার কবিমানসের যে আবেগ তাহা বুদ্ধি পরিচালিত ইমোশন, কদাপি প্যাশন নয়।" *

সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান কৃতিত্ব ছিল বর্ণনায়। এ বিষয়ে তাঁর প্রকৃত কৃতিত্বের উপযুক্ত আলোচনা অদ্যাবধি হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথের বর্ণনার মতো পদ্যে এরূপ নিখুঁত বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে অল্পই দেখা গেছে। সকল প্রকার বর্ণনাতেই সত্যেন্দ্রনাথ অতি দক্ষ ছিলেন — কিন্তু প্রকৃতি, বিশেষতঃ পল্লী প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর সুপরিচিত কবিতা 'পাল্কীর গান' ও 'দূরের পাল্লা'য় এ শক্তির পরিচয় আছে। দ্বিতীয় যে কৃতিত্বের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ অতি বিখ্যাত ও জনপ্রিয়, তা তাঁর ছন্দনিপুণতা। তিনি ছন্দ নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, এবং বহুবিধ সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের রূপ ও ধ্বনিতরঙ্গ বাংলায় তুলে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। বলদেব পালিত যা পারেন নি, সত্যেন্দ্রনাথ তা অনায়াসে সম্পন্ন করেছিলেন। এর আগেই রবীন্দ্রনাথ ছন্দ নিয়ে বহু পরীক্ষা করেছিলেন, যুক্তাক্ষর ও হসন্ত বর্ণের গুরুত্ব লঘুত্বকে ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্পাদনে তিনিই প্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন। 'মানসী', 'সোনার তরী'তেই প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রতি চরণের পদসংখ্যা এবং প্রতিপদের মাত্রা বা অক্ষর সংখ্যা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ পরীক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ছন্দের পরীক্ষা নিয়ে বেশিদিন মেতে

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড।

থাকেন নি। কিন্তু তাঁর বিবিধ প্রকার পরীক্ষা বাংলা ছন্দের যে-সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, তা কনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের মতো আর কেউই তেমনভাবে হৃদয়ংগম করতে পারেন নি। মূল প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ হলেও, সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দে যত বৈচিত্র্য উপস্থিত করেছিলেন, এরূপ আর কোনো কবির দ্বারাই সম্ভব হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেরই পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তাঁর রচনায় সে জাতীয় ছন্দেরই প্রাবল্য বা বহুলতা দেখা যায়, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত বা পয়ার জাতীয় ছন্দেও তাঁর যথেষ্ট কুশলতা ছিল। নব নব ছন্দ রচনায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল চটুলতার দিকে, গাম্ভীর্যের দিকে নয়। তবু, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের যে বিচিত্র সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, সে-পথ ধরে সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম তাকে বহুবিচিত্ররূপে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান দুই গুণ বর্ণনাকুশলতা ও ছন্দনিপুণতা তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল কবিকেই প্রভাবিত করেছিল। প্রকৃতির বর্ণনা, বিশেষতঃ পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির রূপের প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কলমে ধরা পড়তো। এখানেই সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবর্ণনার পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনা খুব কম স্থানেই খুঁটিনাটি বিষয়ে নিবদ্ধ। সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অনেক কবি পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীপরিবেশ নিয়ে কবিতা লিখে নাম করেছিলেন, ছন্দেরও নানা কৌশল দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এসব বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথকেই তাঁরা অনুসরণ করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তথ্য ছিল, যুক্তি ছিল, বহু বিষয়ে চিন্তার পরিচয় ছিল এবং বুদ্ধির প্রভা ছিল, কিন্তু প্রকৃত মননের পরিচয় ছিল বলা যায় না। অপরপক্ষে তাঁর ছন্দনৈপুণ্য ছিল, বর্ণনায় অসামান্য কুশলতা ছিল এবং আন্তরিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর রচনায় ভাবগভীরতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কোনো উন্নত বা গভীর ভাবের বর্ণনাটুকু সত্যেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্টরূপে উপস্থিত করতে পেরেছেন সত্য, কিন্তু খুব অল্প স্থানেই তা তাঁর নিজস্ব অনুভূতি বা উপলব্ধির স্বাক্ষর বহন করে।

সমসাময়িক ঘটনা দ্বারা তিনি যে বিশেষভাবে প্রভাবিত, এমন কি

উত্তেজিত হতেন, একথা আগে উল্লেখ করেছি। হাস্যরসবোধও তাঁর প্রবল ছিল। তিনি যখন কোনো বিষয়ে বিচলিত বা উত্তেজিত হতেন তখন তাঁর তীক্ষ্ণ হাস্যরসবোধকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রকাশ করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের বেশির ভাগ হাসির রচনাই বিদ্রূপাত্মক, আবার এগুলির প্রায় সবই কোনো না কোনো সমসাময়িক ঘটনাজনিত উত্তেজনার ফল। নিছক হাসির কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন নি এমন নয়, কিন্তু পরিমাণে তা অল্প।

সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্রূপাত্মক গদ্য-পদ্য রচনায় হাত দেন প্রধানতঃ রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের লক্ষ্য করে। ১৩১৩ সাল থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রকাশ্য-ভাবে রবীন্দ্র-নিন্দার সূত্রপাত করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'কাব্যে নীতি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রভক্ত লেখকগণের মধ্যে এ প্রবন্ধ প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধটি প্রকাশের কয়েক মাস পরে এটি উপলক্ষ ক'রে 'মানসী'তে সত্যেন্দ্রনাথ 'মরাল ও পেচক' নামে একটি ব্যঙ্গ-কবিতা লেখেন। এ-কবিতাটি লিখেই সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি, একাধিক প্রবন্ধে এবং আরও কয়েকটি ব্যঙ্গ-কবিতায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্যঙ্গ-কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ 'নবকুমার কবিরত্ন' এই ছদ্মনামেই লিখেছেন। কিন্তু কখনো কখনো প্রবন্ধে তিনি 'নবকুমার দত্ত' নামও ব্যবহার করেছিলেন। এ-ভিন্ন বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ ও কবিতা 'কলমগীর', 'সলিলোল্লাস সাঁৎরা', 'অশীতিপর শর্ম্মা' প্রভৃতি ছদ্মনামেও তিনি কিছু কিছু লিখেছিলেন।

'নারায়ণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্র-সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাবের অভিযোগ উপস্থিত করেন। এর উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ 'শ্রীশ্রীবস্তুতন্ত্রসারঃ (বাস্তুঘুঘুরুরাচ)' কবিতাটি লেখেন। যথা,

"(ছ্যাখ) কাব্য লেখ বস্তুতন্ত্র বাঁচিবে যদ্যপি।
(ওগো) ফুল ছেড়ে কণ্ঠে গেঁথে পর ফুলকপি॥
(বস্তু) তন্ত্র মতে গোলাপ চামেলী চাঁপা ওঁচা!
(আহা) ফুল বটে ফুলকপি আর ওই মোচা॥
(ছি ছি) অবস্তু আতর কেন মাখ বাছাধন।

(হাঁ হাঁ) গন্ধ চাই? শিরে ধর শ্রীগন্ধমাদন॥
(ছাখ) সর্বগ্রাহ্য বস্তুতন্ত্র, নেই ইথে ধোঁকা।
(মরি) ফুল ঢোকাইয়া নাকে যেন ফুল শোঁকা॥
(ওগো) বস্তুতন্ত্র আমসত্ত্বে থাকিবেক আঁশ।
(আর) খুঁজিলে আঁটিও পাবে করহ বিশ্বাস॥"

(হসন্তিকা)।

১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনে মূল সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "…বেশীদিন ভাবিয়া, বেশীদিন চিন্তিয়া বড় একখানা কাব্য লিখিয়া জীবন সার্থক করিব — সে চেষ্টাই লোকের মনে নাই। চটক্‌দার দু'চারটা গান লিখিয়া চট্ করিয়া নাম লইব, সেই চেষ্টাই যেন অধিক। গানের দিকে, ছোট ছোট কবিতার দিকে, চুটকীর দিকেই লোকের ঝোঁক বেশী।… চুটকীতে সময় সময় আমাদের মুগ্ধও করে, কিন্তু চুটকীই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? বড় জিনিস কি আর হইবে না? …রবিবাবু "নোবেল প্রাইজ" পাইলেন, বাঙলা ভাষার জয়জয়কার হইল; ইহাতে কে না আনন্দিত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভবিষ্যতের কি হইতেছে?" এই অভিভাষণের উত্তরে প্রমথ চৌধুরী 'চুটকী' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন। আর, এ-উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ পদ্যাকারে লিখলেন 'অ!' এ-রচনার ব্যঙ্গও কম তীব্র নয়।

"দেখ চুটকি সূত্র গোটা সত্তর
লিখিল সাংখ্যকার,
তাই কন্‌ফারেন্সে ডায়েসের পরে
চেয়ার পড়েনি তার।
দাদা তিনটি ভালুমে লিখিলে মালুম
হইত এলেম যত,
আর দর্শন-শাখে হত যোগে-যাগে
শাখা-পতি অন্তত।…
দেখ ছ-শো-পাতা রেগুলেশন নভেল
বটতলা লিখেছেন—

বাপু, বঙ্কিম যার তুলনে চুটকি
bambooর কাছে cane !…
দেখ দু-এক অঙ্কে মেটারলিঙ্কী
চুটকি নাটক আছে,
হুঁ হুঁ দাঁড়াতে কি তাহা পারে দেড়-সেরী
যাত্রা-পালার কাছে !…"

রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের দ্বারা 'কবি-সম্রাট' উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক পণ্ডিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ এ রচনাটিকে তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করেন 'বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ' লিখে।

"পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, মূর্খে বছর চল্লিশে,
তারও দ্বিগুণ কাটলে বয়স আর বোধোদয় হয় কিসে ?"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াবার সময় বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের এক উদ্ভট অভিনব ব্যাখ্যা দেন। এ-অধ্যাপককে সত্যেন্দ্রনাথ অতি ঝাঁঝালো বিদ্রূপ করেছিলেন 'নাপ্পি-পীরিতি কথা'য়।

"বাজাইয়া ধামি রজকিনী রামী কহিছে চণ্ডীদাসে,
'চল বন্ধু, রসতত্ত্ব শিখিব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে'।"

অধ্যাপকটির জন্মস্থানের প্রতি কটাক্ষ করে লেখা এ-কবিতার আর একটি পংক্তি বহু সাহিত্যিকের মনে আঘাত দিয়েছিল—

"রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে পদ্মাপারের দল।"

উল্লিখিত অধ্যাপককে সত্যেন্দ্রনাথ 'কলেজ ষ্ট্রীটের ঝাঁকামুটে' এবং 'কুক্কুট-পাদ মিশ্র' বলেও অভিহিত করেছিলেন।

এই শেষোক্ত বিদ্রূপরচনা দু'টি সত্যেন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। তবু এগুলির মধ্যে বাক্‌সংযমের অভাব দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ সহজেই উত্তেজিত হতেন এবং তাঁর মনোভাবকে প্রচ্ছন্নরূপে ইঙ্গিতে প্রকাশ করার কৌশল তিনি জানতেন না। এই অভাবই তাঁর গম্ভীর বা উচ্চ ভাবের কবিতাকেও কাব্য হিসাবে অগভীর করেছে। তাঁর রচনায় ভাব আছে, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা নেই বললেই হয়। আর

তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও অতি তীব্র ও ঝাঁঝালো। 'ভারতী' পত্রিকার সমালোচক তাঁর ব্যঙ্গ-রচনা সম্বন্ধে ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন, "বঙ্গভারতীর নবকুমারের জন্ম-পত্রিকায় দেখা গেল যে তিনি কখনো মন যোগাইতে পারিবেন না।" সত্যেন্দ্রনাথের মনে কিশোরসুলভ অনেক গুণ বা দোষ ছিল। তিনি সহজে অপরের মত ও চিন্তা — এমন কি জনমত দ্বারাও প্রভাবিত হতেন; তিনি নিজের মনোভাবকে বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্ন করতে জানতেন না, এবং উত্তেজিত হলে বা চটে গেলে যা খুশি তাই বলতেও ইতস্তত করতেন না।

সাহিত্যিক বিতর্কমূলক বিদ্রূপাত্মক কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ অনেক লিখে-ছিলেন; আর, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-কবিতাও তিনি কম লিখেন নি। সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি তাঁর হাস্যরসাত্মক কবিতা-সংগ্রহ 'হসন্তিকা'র অন্তর্ভুক্ত হয় নি; গ্রন্থপ্রকাশকালে সত্যেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এগুলির ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। 'হসন্তিকা' সত্যেন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। বইটি 'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন কর্তৃক প্রজ্বালিত ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা ফুৎকৃত' হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'অদ্ভুত-ভূমিকা বা ফুৎকার'এ সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"ভূতপূর্ব-কেওকেটা লিখুন ভূমিকা,
ক'সে লিখুক সেরেস্তাদার সাহিত্যের টীকা;
কানুন্-গোয়েরা কাব্য-কাননে চরুক,
যত কামারে কুমোর বৃত্তি সানন্দে করুক।"

বইটি "সরস-সাহিত্য-সংরচনায় সুকৌশলী, সাহিত্য-বস্তুর বিচার-বিচক্ষণায় সু-কৌঁসুলী সবুজ পত্রের সমঝদার সম্পাদক, সুধী, সুরসিক ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের স্বহস্তে" উপহার দেওয়া হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর 'পদচারণ' বইখানি সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা তো ছিলই, উপরন্তু কোনো কোনো বিষয়ে মিলও ছিল। দু'জনে একই সঙ্গে রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, দু'জনেরই রচনায় rhyme ও reason-এর প্রাবল্য ছিল এবং উভয়েই ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক রচনায় নিপুণ ছিলেন।

'হসন্তিকা'র মূল অর্থ হাঁপর। কিন্তু আগুন পোয়াবার অগ্নিপাত্র এই অর্থে সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। বইটির শেষ কবিতা 'হসন্তিকা'য় এ-অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"বন্ধু, ঘনিয়ে ব'স শীতের রাতে
হসন্তিকার পাশে,
'জ্বলদ্-বহুচ্ছিদ্র' যাহার
দাঁতের মতন হাসে।
হসন্তিকা — আঙারধানী —
চানকে তোলে মন,
আঁচ লাগিলেও আরাম আছে
মজলিসীরা কন।"

প্রকৃতই 'হসন্তিকায় আঁচ ও আরাম দুইই আছে। যদিও কোথাও কোথাও আঁচটা একটু বেশি, তবু কৌতুকের সংমিশ্রণে অধিকাংশ স্থলেই তা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-কবিতা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে-কথা বলা হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথের এ-জাতীয় রচনা সম্বন্ধেও তা অনেকাংশে প্রযোজ্য। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি নিতান্তই সমসাময়িক ঘটনার তারিখযুক্ত। এখন আমাদের কাছে সে-ঘটনাগুলির গুরুত্ব কমে যাওয়ায় এই সব রচনার রসও ফিকে হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলি সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তবু, সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকবিতা এখনো উপভোগ করা চলে। তার কারণ, হেমচন্দ্রের তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথের হাস্যরসবোধ প্রবলতর ছিল, পদ্যরচনার শিল্পকৌশলেও সত্যেন্দ্রনাথের দখল অনেক বেশি ছিল বলে মনে করি।

সত্যেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা যত লিখেছেন, নিছক হাস্যরসাত্মক কবিতা তত বেশি লেখন নি। বোধহয় হাসির কবিতা রচনার দিকে ততটা মনও দেন নি। তার কারণ, হাস্যরসটাকে তিনি অতি নিকৃষ্ট রস বলে গণ্য করতেন। 'হসন্তিকার' অন্তর্গত 'হাস্যরসের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন।

"শান্ত করুণ বীরের Chair
দখল করা নয়কো Fair,

মোটেই সহ্য করবেনা ত কেউ সে ;
সিংহ, ব্যাঘ্র তোমায় কে কয় ?
গোবাঘা কি নেকড়েও নয়,
হাস্য-রসটা রসের মধ্যে ফেউ যে।
(তোমায়) পদ্ম বলে হয়নাক ভুল,
(তুমি) নও কদম্ব, চম্পা, বকুল,
নেহাৎ ক্ষুদ্র, নেহাৎ কৃপার পাত্র ;
(তুমি) মধ্যে-ছিন্ন,— শূন্য-গর্ভ,—
হাদা-হাবা-ভূতোর গর্ব,—
ঊর্দ্ধমূল মূলার ফুল মাত্র !"

সত্যেন্দ্র দত্ত যদি হাস্যরসের প্রতি আর একটু শ্রদ্ধাশীল হতেন, তবে হয়তো তিনি এ-জাতীয় রচনায় আরো বেশি মনোযোগী হতেন, এবং তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক ভালো ভালো হাসির কবিতা আমরা পেতে পারতাম।

'হসন্তিকা'য় কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতার লক্ষ্য অনেকটা ব্যাপক, কোনো সাময়িক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গল', 'হুঁঃ' প্রভৃতি। টিকির প্রতি — বস্তুতঃ ধর্মের সকল প্রকার ভড়ং-এর প্রতিই — সত্যেন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠ মনে বেশ বিরূপতা ছিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দেই 'ভারতী'তে তিনি 'অথ টিকিমেধযজ্ঞ' লিখেছিলেন। 'শ্রীশ্রীটিকিমঙ্গলে'র 'দোহার-কী-গোহার' অর্থাৎ refrainটি এই

"এ-রি-হুম !—তেরি না !—
টিকি রাখ !—দেরি না—আ—আ !"

এবার 'মূল গায়েন' থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি,—

"আর টিকি না রাখিলে প্রেমিকই হয় না
শাস্ত্রে রয়েছে লেখা,
যখন প্রেমে হাবুডুবু, লোকে বলে "আহা
টিকিও যায় না দেখা !"...
ওগো শুধু 'এক' লেখ অর্থ হবে না,

এলেকটি দাও দিকি,
তখন একের অর্থ হবে এক টাকা
অঙ্কে এলেক — টিকি।…
আহা সুরাসুর হন টিকির বাহন,
ত্রিলোক টিকি-ব্রত,
ওরে টিকি আছে ব'লে ট্রামগাড়ী চলে
নহিলে অচল হ'ত।"

'হুঁ' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ বলছেন,

"(হ্যাখো) ব্রহ্মা করেন সৃষ্টি, এবং
ধ্বংস মহেশ্বর,
(তবু) শিবেরই দেউল গাঁয়ে গাঁয়ে, কই
ব্রহ্মার নেই ঘর !…
(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি ?
শোনো তোমাদের বলি —
(লাখো) লাখো খুন যারা করেছে তাদের
নাম লেখা নামাবলী !"

'হসন্তিকা'র অন্তর্গত সকল কবিতাকেই হাস্যরসাত্মক বলে বর্ণনা করা শক্ত। কয়েকটি কবিতা, যথা 'মৌলিক ঝাঁকামুটে' 'কুক্কুটপাদ মিশ্রের প্রশস্তি' প্রভৃতি এতই ব্যক্তিগত এবং সেগুলির ঝাঁঝ এমনই তীব্র, যে সেগুলি বড় বেশি হাসি উৎপাদন করে না। 'জবান-পঁচিশী', 'কাশ্মীরী ভাষা' প্রভৃতি ঠিক হাস্যরসাত্মক রচনা নয়, যদিও কিছুটা কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা। 'হরফ রিপাব্লিকে' বাংলা টাইপরাইটিং যন্ত্র আমদানি হওয়ার ফলে 'ঙ' 'ঞ' অক্ষরগুলির বিশ্লিষ্ট ব্যবহার নিয়ে রসিকতা করা হয়েছে। বর্ণমালা থেকে এ-তুটি অক্ষরের বর্জন প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ-জাতীয় রচনার পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। এ ভিন্ন 'হসন্তিকা'য় কিছু সংখ্যক প্যারডি আছে। তার মধ্যে 'দশা-বেতর স্তোত্র'জয়দেবের 'দশাবতার স্তোত্রে'র, 'অম্বল-সম্বরা কাব্য' মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের, 'সর্ব্বশী' রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র এবং 'মদিরামঙ্গল' ও 'গন্ধমাদন', দ্বিজেন্দ্র-

লালের গানের প্যারডি। 'নাক-ডাকার গান', 'রামপাখী' ও 'কেরাণী-স্থানের জাতীয় সংগীত' কয়েকটি প্রচলিত গানের ছকে রচিত। কিছু কিছু উদ্ধৃতির দ্বারা এদের পরিচয় দেওয়া গেল।

"পোলাওয়ে করেছ সুধাময় আর কালিয়ায় অতি 'টেষ্টফুল'!
মারিয়া রেখেছ সৌরভে অহো! বিল্‌কুল্!
দেবতা! হইলে মছলি বেবাক্!
বলিহারি যাই তোমারি। ১।
ঝোলাতে ঢুকেছ ঝোল্ হ'তে, আহা! তরায়েছ কত বোষ্টম্!
ভিতরে নবনী — বাহিরে শুষ্ক কাষ্ঠম্!
দেবতা! হইলে কাছিম নাপাক্!
বলিহারি যাই তোমারি। ২।" (দশা-বেতর স্তোত্র)।

"স্বামী নয়, ঘুমের শনি,—
প্রাণ কাঁপে নাকের ডাকে;
বাপ মা যখন পাত্র ছাখেন
ছাখেন নি ঘুম পাড়িয়ে তাকে।" (নাক-ডাকার গান)।

'অম্বলসম্বরা কাব্য', 'সর্বশী' প্রভৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'হসন্তিকা'র অনেকগুলি কবিতাতেই খাদ্যরসের সঙ্গে হাস্যরসের যথেষ্ট মিশ্রণ ঘটেছে,— এবিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বেশ রক্ষা করে চলেছেন বলা যায়।

নিছক হাস্যরসের কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত কমই লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি ভোজনবিষয়ক ও কয়েকটি প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উক্তিটিতে বেশ কৌতুক আছে।

"(ওগো) শাস্ত্রে কি বলে জানো কি তা প্রিয়ে
বলিব কি তাহা আজ?
(নিয়ে) যেতে যম-ঘরে দ্বিতীয়-পক্ষ
দ্বিতীয় পক্ষিরাজ!...
(ওগো) প্রথম-পক্ষ পক্ষই নয়
শোনো মানময়ী নারী!

(মোর) দ্বিতীয় পক্ষ গজায়েছ তুমি
তাই তো উড়িতে পারি।"

সত্যেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক কবিতা নিঃসন্দেহে 'রাত্রি-বর্ণনা'। কেবল সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে নয়, বাংলা সাহিত্যে পদ্যাকারে এরূপ উৎকৃষ্ট বর্ণনা এবং কৌতুকের সমন্বয় কমই আছে। ছন্দোবদ্ধ বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথের যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বর্ণনাশক্তির সঙ্গে হাস্যরসবোধের অপূর্ব সমন্বয় এই 'রাত্রি বর্ণনা'য় দেখতে পাই।

"ঘড়িতে বারোটা, পথে 'বরোফ' 'বরোফ'
লোপ !
উড়ি উড়ি আরসুলা দ্যায় তুড়িলাফ্ !
সাফ্ !
পালকী-আড়ায় দূরে গীত গায় উড়ে
তুড়ে !
আঁধারে হা-ডু-ডু খেলে কান করি উচা
ছুঁচা !…
তন্দ্রাবশে তক্তপোষে প্রচণ্ড পণ্ডিত
চিৎ।
যুৎ পেয়ে চুরি করে টিকির বিদ্যুৎ
ভূত ! …
ত্রিশূন্যে ঝুলিয়া মন্ত্র জপিছে জাদুর
বাদুড় ! …
আবরি' সকল গাত্র মশা ধরে অন্তে
দন্তে !
জগৎ ঘুমায়, শুধু করে হাঁকডাক
নাক !"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের হাস্যরসবোধ যথেষ্টই ছিল সন্দেহ নেই। দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রভাবেও তাঁর এ-বোধ কিছুটা উদ্রিক্ত হয়ে থাকা সম্ভব। কিন্তু

ব্যঙ্গের তীব্রতা অধিকাংশ স্থানে তাঁর হাস্যরসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাছাড়া, হাস্যরসের প্রতি তাঁর ঝোঁক থাকলেও শ্রদ্ধা ছিল না, নতুবা এ-বিষয়ে তিনি আরো অনেক বেশি কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারতেন।

এ-সময়ের আর একজন উল্লেখযোগ্য হাস্যরসিক লেখক ছিলেন সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫—১৯৩২)। ইনি গদ্যপদ্য উভয়বিধ রচনাতেই পারদর্শী ছিলেন। নাটকও ইনি কয়েকখানি লিখেছিলেন, এবং সকল প্রকার রচনায় প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলালকেই অনুসরণ করেছিলেন। প্যারডি বা 'লালিকা' রচনায় এঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল, এবং এ-বিষয়ে এঁর খ্যাতি অতি বিস্তৃত ছিল। এঁর প্রথম বই 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এটি পদ্য ও গদ্য রচনার সংগ্রহ। বইটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল, এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটির প্যারডি দ্বারাই বইটি শুরু হয়েছিল। যথা,

"ধন মান্য যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস্ আছে সব আপিসের সেরা
ওযে ইটপাথরের তৈরী সেটি, রেলিং দিয়ে ঘেরা।
কোরাস { এমন আপিস্ কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল বুদ্ধি-হানি-করা আমার কর্মভূমি।"
(আমার কর্মভূমি)।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আষাঢ়ে'তে গদ্যের যে বাঁকাচোরা রুক্ষভঙ্গি পদ্যে অতি আশ্চর্য নিপুণতায় সন্নিবেশ করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালকে অনুসরণ ক'রে সতীশচন্দ্রও সে-বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গে'র অন্তর্গত তাঁর 'কেশ সমস্যা' কবিতাটি থেকে নিচের উদ্ধৃতিটিতে এ-বিষয়ে সতীশচন্দ্রের কুশলতা এবং দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য পরিস্ফুট হবে।

"এখন হল ইহাই কিন্তু সমস্যা প্রধান,
কি প্রকারে চুল রাখা উচিত বিধান।
চুলটা দেখে মানুষের ধরণ ধারণ
প্রায়ই লোকে অনুমান করে, এ কারণ

চুলটা নিয়ে হওয়া চাই বড়ই সতর্ক,
এবম্বিধ মনে মনে করি নানা তর্ক,
দেখলাম যে বেণী রাখা নহে সমীচীন ;
কারণ তাতে হতে হয় নারী কিম্বা চীন ;
কিম্বা বড় ক'রে যদি রেখে দিই জটা,
ভণ্ড বলে সবাই হবে আমার পরে চটা।
আর যদি খুব ছোট করে ছেঁটে ফেলি চুল,
তেড়ীকাটার সখটা হবে সমূলে নির্মূল। ···
আর যদি চুল সমান ক'রে ছাঁটি আগাগোড়া,
বলবে সবাই মাথা যেন কদমের তোড়া।
যদি বা সুমুখে চুল রাখি কিছু বড়,
বুড়োরা সব বল্‌বে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চড়।"

সতীশচন্দ্রের গদ্যরচনা থেকেও কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। গদ্যরচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করেছিলেন।

'হে টাকে, তুমি যথার্থই দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী। তুমি আপন চক্রের উপর জগৎসংসার ঘুরাইতেছ। তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষায় লোকে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে, ভিক্ষা করিতেছে, দাসত্ব করিতেছে। হে কমনীয়, হে রমণীয়, হে চিরবাঞ্ছিত, তোমাকে কাহার সহিত তুলনা দিব ? তুমি যথার্থই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অথবা কবির ভাষায় "তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।" " (টাকা, রঙ্গ ও ব্যঙ্গ)।

"তুমি সকল ঋতুর সহায় ; দারুণ গ্রীষ্মে তোমাকে পাখায় পরিণত করা যায়, বর্ষায় তোমাকে ছত্র করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাওয়া যায়, শরৎ-কালে তোমাতে ধান্য পরিমাণ করা যায়, শীতকালে তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া কাষ্ঠের কার্য করা যায়। তুমি ঋষি, কারণ বিবাহাদি শুভ কার্যে মন্ত্রদ্রষ্টা। তুমি শাস্ত্র, কারণ অতি পুরাতন।'' (কূলা, রঙ্গ ও ব্যঙ্গ)।

সতীশচন্দ্র দুখানি কৌতুক-কবিতার বই লেখেন, 'ঝলক' ও 'লালিকা-গুচ্ছ',— এর মধ্যে দ্বিতীয়খানি প্যারডির সংগ্রহ। প্যারডি রচনাতেই

সতীশচন্দ্রের বিশেষ দক্ষতা ছিল একথা উল্লেখ করেছি। তিনি 'সতীর জেদ' ও 'দুই চিঠি' নামে দুটি ছোটগল্পের বই লিখেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি কিছু নাটক-প্রহসনও লিখেছিলেন ; এগুলি 'নাটিকাগুচ্ছ', 'হাঁটে হাড়ি' এবং 'অগ্নিশিখা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

কৌতুকের ভঙ্গিতে হাস্য ও ব্যঙ্গাশ্রিত গল্পরচনায় এ-সময়ে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (? — ১৯৩৮)। এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট লেখকের রচনাভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট এবং আগাগোড়া কৌতুকে মিশ্রিত। ইনি শুধু ছোটগল্পই লিখতেন। 'ছোট ছোট গল্প' ও 'কর্মযোগের টীকা' নামে এঁর দু'খানি ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়েছিল।

সুকুমার রায় (চৌধুরী) (১৮৮৭—১৯২৩) ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই কার্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র। উপেন্দ্রকিশোর মৌলিক তেমন কিছু না লিখলেও সাহিত্যক্ষেত্রে এঁর দান সামান্য নয়। ছোটদের জন্য ইনি অপূর্বসুন্দর সহজ সরল ভাষায় রামায়ণ মহাভারত লিখেছিলেন। পুরাণের অনেক গল্পও তিনি ছোটদের জন্য সুন্দর সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর প্রবল হাস্যরসবোধের কিছু পরিচয় আমরা অন্যত্র উপস্থিত করেছি। এ-দেশে ব্লক-তৈরী পদ্ধতি আবিষ্কার এবং প্রচলনেও তাঁর বৃহৎ কৃতিত্বের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারটিই ছিল সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন। এঁরা পাঁচ ভাই ছিলেন। ভাইদের মধ্যে কুলদারঞ্জন রায়ের নাম সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। 'বনের খবর' রচয়িতা প্রমদারঞ্জন এঁর আর এক ভাই। উপেন্দ্রকিশোরের পুত্রকন্যাদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর এক ভগ্নীর স্বামী এইচ্. বোস্, পারফিউমার, কেবল নামজাদা ব্যবসাদার ছিলেন না, 'কুন্তলীন পুরস্কার' এর পরিচালক হিসাবে তাঁর নামও বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। এইচ. বোসের পুত্ররাও নানা বিষয়ে কৃতী। জ্যেষ্ঠ হিতেন্দ্রমোহন ভারতীগোষ্ঠীর একজন লেখক ছিলেন।

এই রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার রায়ের মধ্যে। অসাধারণ সাহিত্যিক

প্রতিভা ছাড়া তীক্ষ্ণ মেধাও তাঁর ছিল। তিনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র দুই বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি.এস-সি. পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার্থ বিলেত যাবার জন্য গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১১ সালে তিনি বিলেত যান এবং ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুল অব্ টেকনোলজি থেকে ফটোগ্রাফি ও ব্লক তৈরির পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা লাভ ক'রে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। ম্যাঞ্চেষ্টার স্কুলে তাঁর বিষয়ে তিনি প্রথম স্থান লাভ ক'রে একটি পদক পুরস্কার পান। তিনি Royal Photographic Societyর ফেলো ছিলেন।

এর আগেই উপেন্দ্রকিশোর এদেশে ব্লক তৈরির এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে ইউ. রায় কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সুকুমার রায়ের শিক্ষা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সুকুমার রায়ই ইউ. রায় কোম্পানি পরিচালনা করতেন। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় সুকুমার রায়ের ব্যুৎপত্তি ছিল। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ মেধা ছিল। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের যে অতুলনীয় প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন, তার সঙ্গে তাঁর অন্য কোনো কৃতিত্বেরই তুলনা হয় না। আর, তাঁর সঙ্গে তুলনা হতে পারে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ-ধরণের লেখকের সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব।

সুকুমার রায়ের প্রতিভা গতানুগতিক সাহিত্যের পথ ধ'রে চলে নি। তাঁর রচনার বিষয়-ভাব-ভঙ্গি সবই নূতন, সকলই অভূতপূর্ব। তাঁর ছবি সম্বন্ধেও এ-কথা বলা যায়। তাঁর সকল রচনার একটি সাধারণ গুণ, সেগুলি প্রায় সবই হাস্যরসে মণ্ডিত। সে-হাস্যরসে এমন প্রবল, এতই নূতন ধরণের, এরূপ অসূয়াবর্জিত এবং উদ্বেল যে, সুকুমার রায়কে বিনা দ্বিধায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক বলে অভিনন্দন জানানো চলে।

সাহিত্য-প্রতিভা ও চিত্রশিল্প-প্রতিভা সুকুমার রায় তাঁর পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। কিন্তু উভয় বিষয়েই তিনি পিতার কৃতিত্বকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর কবিপ্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল; তাঁর আট-ন'বছর মাত্র বয়সের লেখা দু'টি কবিতা শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্যক্তিগত স্বভাবেও সুকুমার রায় অত্যন্ত আমুদে ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। মাত্র আঠারো-উনিশ বছর বয়সের সময়—অনুমান ১৯০৫-৬ সালে—তিনি 'নন্‌সেন্স ক্লাব' নামে একটি ক্লাব বা আসর প্রতিষ্ঠা করেন। যতদূর জানা যায়, এই ক্লাবের সভ্যসংখ্যা অনেকটা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সুকুমার রায়ের পরিবারের কৌতুকপ্রিয়তা ও পরিহাস-কুশলতা তো ছিলই, তা ছাড়া, এই প্রতিভাশালী বৃহৎ পরিবারে লেখক সংখ্যাও কম ছিল না। এই ক্লাবে প্রধানতঃ সুকুমার রায়ের রচিত মজার মজার গান গাওয়া হোত এবং মজার মজার নাটকের অভিনয় হোত। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' প্রভৃতি নাটকগুলি এখানেই অভিনীত হয়েছিল। এ ভিন্ন স্বদেশীর যুগে 'রামধন বধ' নামে তিনি আর একটি কৌতুকনাট্য লিখে অভিনয় করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এতে উগ্র বাঙালী সাহেব মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেনকে উপলক্ষ করে স্বদেশী-বিরোধী দেশী সাহেবদের ঠাট্টা করা হয়েছিল। এই আড্ডা থেকে 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে একখানি হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশিত হোত, তাতে লেখকেরা নিজের নিজের লেখা নিজের হাতে লিখে দিতেন। এ পত্রিকায় কৌতুক ছাড়া আর কিছু থাকতো না। পত্রিকাটিতে নানারূপ বিজ্ঞাপনও থাকতো। সেগুলি অবশ্য সভ্যদের দ্বারা—প্রধানতঃ সুকুমার রায়ের দ্বারাই রচিত হোত। একটু উদাহরণ দেওয়া গেল।

"বিজ্ঞাপন

আমাদের গন্ধবিকট তৈলের নাম আপনি অবশ্যই শুনিয়াছেন। অ্যাঁ? শোনেন নি? আমরা এক মাস ধ'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেরাসিনের টিন বাজিয়ে বাজিয়ে তেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে হয়রান হ'য়ে গেলাম, আর আপনি একদম শুনলেন না! তবে শুনুন।

এই তেল ঘরে রাখলে গন্ধের তেজে মশা, ছারপোকা, উকুন, আরশুলা সব মরে যাবে। চোর, ডাকাত, পাগলা কুকুর এসব ঘরে প্রবেশ করবে না। মানুষ তো দূরের কথা, ভূত পেত্নী পর্যন্ত পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে বাপ্ বাপ্ ব'লে দৌড়িয়ে পালাবে।"* এই তেল যারা ব্যবহার করবে, তাদের

* শ্রীসুবিমল রায়ের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত।

অবস্থা কী হবে তা অবশ্য এই বিজ্ঞাপনে খুলে বলা হয় নি, সেটা অনুমান ক'রে নিতে হবে!

'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' মজার মজার লেখায় একদম ভরা থাকতো, এমন কি গম্ভীর বিষয় নিয়েও মজার ভঙ্গিতে লেখা হোত। যেমন,

"লর্ড কার্জন, অতি দুর্জন, তর্জন গর্জন সার,
দীন বাঙ্গালী, সুখের কাঙ্গালী, ভুঞ্জিছে গঞ্জনা তার।"*

গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভ ক'রে ১৯১১ সালে সুকুমার রায় উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যান। যাবার আগে মুদ্রিত পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করে তিনি একদিন বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ান। 'ছড়া'য় লেখা দুষ্প্রাপ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক এই নিমন্ত্রণ পত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"ক'রে তাড়াহুড়ো বিষম চোট্
কিনেছি হ্যাট্ কিনেছি কোট্,
পেয়েছি passage এসেছে Boat,
বেঁধেছি তল্পি তুলেছি মোট্,
বলেছে সবাই,"তা হ'লে ওঠ্,
আসান্ এবার বিলেতে ছোট্।"
তাই সভা হবে, বিদায় ভোট্,
কাঁদ কাঁদ ভাবে ফুলিয়ে ঠোঁট্
হেথায় সকলে করিবে জোট্
(প্রোগ্রামটুকু করিও Note)।

প্রোগ্রাম—

শুক্রসন্ধ্যা সঠিক সাত—
আহার, আমোদ, উল্কাপাত।" †

সুকুমার রায়ের বিদেশ যাওয়ায় সময় অথবা তার আগেই এই নন্‌সেন্স ক্লাব ভেঙে যায়। কিন্তু তিনি বিলেত থেকে ফিরে আসার পর ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি সাহিত্যিক আসরের পত্তন হয়।

* শ্রীসুবিমল রায়ের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত।
† শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এ আসরের প্রথম অধিবেশন হয়েছিল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এ-বাড়িতেই একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তখন অজিত চক্রবর্তী থাকতেন। প্রধানতঃ অজিতকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস নাগ, শিশিরকুমার দত্ত, সুকুমার রায় প্রভৃতির উদ্যোগেই আসরটি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে আরো অনেকে এসে জোটেন। সোমবারে সোমবারে সভ্যদের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে এর অধিবেশন বসতো। তাই এটি Monday club নামে পরিচিত হয়। সভার প্রত্যেক অধিবেশনে কিছু খাওয়া দাওয়া হোত। তাই সভ্যরা এ নামটিকে মণ্ডা ক্লাবে পরিণত করেন।* সুকুমার রায় আবার তাকে "খায়ত খায়" নামে রূপান্তরিত করেন। তৃতীয় বছরের (সেপ্টেম্বর ১৯১৭—আগস্ট ১৯১৮) কার্যবিবরণীতে ঐ নাম পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খাদ্যের দিকে যে সভ্যদের বিশেষ ঝোঁক ছিল, ঐ বিবরণীর আয়ব্যয়ের হিসাবের পরিশিষ্ট স্বরূপ 'অনাহারী সম্পাদক' শ্রীশিশিরকুমার দত্তদাস মহাশয়ের বিবৃতিতেই তা বেশ বোঝা যায়। তিনি, অথবা তাঁর জবানীতে সুকুমার রায় লিখছেন, "আমার হাতে অর্থাৎ বাক্সে এখন এই সওয়া চৌদ্দ আনা পয়সা মজুত আছে। সভ্যরা যদি অসভ্যের মত খাই-খাই না করিয়া চা-বিস্কুটে খুসী থাকিতেন — যাক্, সে কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।" এই আয়ব্যয়ের হিসাবটিও একটু অদ্ভুত। হিসাবে দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী বৎসরের জের এক আনা সহ মোট আয় ছিল ৭৩/৯ (আসলে যোগে হয় ৪৮/০), আর ব্যয় হয়েছিল ৮৩৶/১৫ (যোগে দাঁড়ায় ৭২॥০)। কাজেই কী করে যে অনাহারী সম্পাদকের হাতে ৶৵৫ পয়সা ছিল বোঝা যায় না। এই রকম হিসাবের জের টানতে বাধ্য হয়ে এবং সভ্যদের 'খাই-খাই'তে অতিষ্ঠ হয়ে যে সম্পাদক মহাশয়ের বৈরাগ্য এসেছিল, এই বিবরণীর অন্যত্র মুদ্রিত একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন থেকে তা জানতে পারি। এই বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে, "আমাদের অভূতপূর্ব সম্পাদক সংসারবিমুখ ও উদাসীন হইয়া, লোটা কম্বল ও চা বিস্কুট সহযোগে বানপ্রস্থ অবলম্বনের সংকল্প জানাইয়া, ক্লাবের মায়া কাটাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন। তাঁহাকে উক্ত সংকল্প হইতে নিরস্ত

* তথ্যগুলি শ্রীহিরণকুমার সান্যালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

করিবার জন্য কয়েকটি বলিষ্ঠ ভক্তের প্রয়োজন। ভক্ত সভ্যগণ সত্বর হউন।" অনাহারী সম্পাদকের এই শোচনীয় অবস্থাই সম্ভবতঃ সুকুমার রায় 'সম্পাদকের দশা' (বর্ণমালাতত্ত্ব) কবিতায় বর্ণনা করেছিলেন।

তৃতীয় বৎসরের বিবরণীতে Monday বা 'মণ্ডা ক্লাব'এর পঁচিশ জন নিয়মিত ও অনিয়মিত সভ্যের নাম পাওয়া যাচ্ছে। যথা, কালিদাস নাগ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, হিরণকুমার সান্যাল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, শিশিরকুমার দত্তদাস, সুশীল কুমার গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অতুলপ্রসাদ সেন, সুবিনয় রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র শর্মা, কিরণকুমার বসাক ও হিমাংশুমোহন গুপ্ত।

তৃতীয় বৎসরে এই সমিতির সর্বসমেত সাড়ে-চল্লিশটি অধিবেশন হয়েছিল। এই ৪০॥টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অধিবেশনে (৩৬টি) উপস্থিত ছিলেন সুকুমার রায়। আর যাঁরা এসব অধিবেশনে খুব নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী, শিশিরকুমার দত্তদাস, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বেশ নিয়মিত আসতেন; ১৯১৮ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে তাঁর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ডিগ্রি প্রাপ্তি উপলক্ষে একটি ভোজ হয়েছিল। আয়-ব্যয়ের হিসাবে এটি 'প্রেমচাঁদ ভোজ' বলে বর্ণিত আছে।

Monday Club-এর আসর আসলে কৌতুক-প্রধান আড্ডা ছিল না। সভার বিভিন্ন অধিবেশনে যে বিষয়গুলি আলোচিত হোত তাও মোটেই লঘু নয়। তৃতীয় বৎসরে আলোচিত বা পঠিত বিষয়গুলির মধ্যে 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ', 'Bengali Dialects'এর উপর প্রবন্ধ পাঠ (সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়), 'জীবনের হিসাব', 'দৈবেন দেয়ম্', 'ক্যাবলের পত্র' (সুকুমার রায়), প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া পঠিত বা আলোচিত হয়েছিল, খেয়া—রবীন্দ্রনাথ, In the Balcony—Browning, "The

Stranger"—Strindburg, Turgenev's Novels, Plato—Emil Reich, প্রভৃতি। এ-সব গম্ভীর পাঠ ও আলোচনা ছাড়া "সঙ্গীতাদি ৮ বার, জল্পনা ও গবেষণা ৫ বার, রবীন্দ্র সংবর্ধনা, উদ্যান যাত্রা" ইত্যাদিও হয়েছিল।

সুকুমার রায়ের অধিকাংশ রচনাই হাস্যময়, কিন্তু গম্ভীর ও গভীর বিষয় নিয়ে তিনি যে একেবারেই লিখতেন না, তা নয়। এই Monday Club-এর আসরে পঠিত 'দৈবেন দেয়ম্' ও 'জীবনের হিসাব' প্রবন্ধ দু'টিতে তাঁর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্প সম্বন্ধেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন; সেগুলি 'বর্ণমালা-তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ভারতী' গোষ্ঠী, জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-সভা, 'কল্লোলে'র আড্ডা এবং 'উৎকেন্দ্র-সমিতি'র মতো এই 'মণ্ডা ক্লাবের'ও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিশেষতঃ সুকুমার রায়ের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস এই ক্লাব এবং এর আগেকার 'নন্‌সেন্স ক্লাবে'র সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। অনেকের ধারণা আছে, এবং সাহিত্যের ইতিহাসেও এ কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, সুকুমার রায় 'ভারতী'-গোষ্ঠীর একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। আসলে কিন্তু তিনি কোনোদিনই 'ভারতী'র দলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন না। 'ভারতী'র দলের অনেক লেখক, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, প্রথম থেকে না হলেও, মণ্ডা ক্লাবেরও সভ্য ছিলেন। সেই সূত্রে সুকুমার রায়ের সঙ্গে 'ভারতী'-গোষ্ঠীর যোগাযোগ ছিল সত্য, কিন্তু তিনি 'ভারতী'র আড্ডায় খুব কমই যেতেন। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি বেশি কিছু লেখেনও নি, প্রথমে 'প্রবাসী' এবং পরে 'সন্দেশে'ই তাঁর রচনা প্রকাশিত হোত। বরঞ্চ তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল 'বিচিত্রা' সভার সঙ্গে। বিলেতে থাকতে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জন্মে। আগে থেকেই তিনি রবীন্দ্রভক্তদলের একজন ছিলেন। এই বন্ধুত্বসূত্রে ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং 'বিচিত্রা' সভার তিনি একজন উৎসাহী সভ্য হয়ে দাঁড়ান।

রবীন্দ্রভক্ত হলেও উপযুক্ত ক্ষেত্রে অন্য রবীন্দ্রভক্ত, অথবা বন্ধুবান্ধবদের

খেপিয়ে সুকুমার রায় খুব আমোদ পেতেন। কারুর কোনো মুদ্রাদোষ দেখতে পেলে সুকুমার রায় যে তা নিয়ে প্রচুর কৌতুক করবার সুযোগ ছাড়তেন না, মণ্ডে ক্লাবের ইতিহাসে এর দু'একটি দৃষ্টান্ত আছে। এইরূপ একটি অসূয়াবর্জিত পরিহাস সাহিত্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেটি মণ্ডে ক্লাবে পঠিত এবং 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ক্যাবলের পত্র'। সম্প্রতি 'বর্ণমালা-তত্ত্বে' পুনর্মুদ্রিত এই লেখাটিতে তিনি প্রমথ চৌধুরীর রচনাভঙ্গির প্যারডি করেছিলেন। গদ্যে এইরূপ অপূর্ব ব্যঙ্গানুকৃতি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব ও তুলনাহীন। প্রমথ চৌধুরী গদ্য রচনায় এক নূতন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর রচনায় কতকগুলি মুদ্রাদোষ বা mannerism ছিল। এগুলি তৎকালীন পাঠকের ততটা নজরে না পড়লেও সুকুমার রায়ের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়েছিল, এবং এই মুদ্রাদোষসঙ্কুল রচনারীতিকে সুকুমার রায় আশ্চর্য কুশলতায় অনুকরণ করেছিলেন 'ক্যাবলের পত্রে'। নিচের এই উদ্ধৃতিটুকুতেই সুকুমার রায়ের এ-অনুকৃতির কৌতুকটি বোঝা যাবে। প্রমথ চৌধুরী কথা নিয়ে যে খেলা করতেন, সুকুমার রায় সেটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

"আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না। শুন্‌লুম সেদিন একজন আক্ষেপ ক'রে বলেছেন যে আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না।" বোঝা যে যায় না, এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না — তাকে কষ্ট ক'রে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ — অর্থাৎ ও বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এ বিষয়ে যাঁদের কিছু কম্‌তি আছে তাঁরা বোধহয় এইটে বোঝেন না যে ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।"

আগেই বলেছি Monday Club সাহিত্যচর্চার আসর ছিল, কৌতুক করবার আড্ডা ছিল না। এ-আসরে পঠিত ও আলোচিত বিষয়গুলির

দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যাবে। কিন্তু তবু যে এ-আসরে প্রচুর হাস্য-কৌতুকের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তার সাড়ে পনেরো আনাই আমদানি করেছিলেন সুকুমার রায়। তিনি এই ক্লাবের জন্য রবীন্দ্রনাথের "মেঘ বলেছে যাব যাব" গানটির অনুকরণে একটি গান বেঁধেছিলেন। তার দুটি পংক্তি এই রকম,—

"ছোটকা বলে খাব খাব, জীবন বলে খাই,
জংলী বলে রামছাগলের মাংস খেতে চাই।" *

এই সব আসরের পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ সাধারণতঃ চিঠি দিয়ে সভ্যদের জানিয়ে দেওয়া হোত। এই চিঠিগুলিতে অনেক সময় সুকুমার রায় একটু-আধটু ছবি এঁকে বা দু'চার লাইন পদ্য লিখে দিতেন। সুকুমার রায়ের নিজস্ব ছাপাখানা থাকাতে তিনি বার্ষিক কার্যবিবরণীগুলি ছাপিয়ে দিতেন, আর সেগুলি যে কিরকম মজার করে লিখতেন, সে-পরিচয় আগেই দিয়েছি। কার্যবিবরণীতে মুদ্রিত "খায়ত খায়" নামটি তাঁরই দেওয়া।

১৯১৯ সালের প্রথম দিকে 'অনাহারী সম্পাদক' শিশিরকুমার দত্তদাস কর্মসূত্রে বিহারে বদলি হন। তিনিই এ-আসরটি পরিচালনা করতেন এবং অধিবেশনাদির ব্যবস্থা করতেন। বস্তুতঃ তিনিই আসরটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন, এজন্য সুকুমার রায় এঁকে অধিকারী নাম দিয়েছিলেন এবং দত্তাধিকারী বলেই ডাকতেন। এঁর অনুপস্থিতিতে সভার কার্যকলাপ স্থগিত ছিল। কয়েক মাস পরে ইনি কলকাতায় ফিরে এসেই আসরটি আবার চালাবার সংকল্প করেন, এবং সকলের কাছে চাঁদা চেয়ে পাঠান। এ ১৯১৯ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। পরবর্তী অধিবেশনটি ক্লাবের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনরূপে ২৫শে আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই চতুর্থ বৎসরের কার্যবিবরণী সুকুমার রায় সংক্ষিপ্তাকারে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। এ-অধিবেশনের 'প্রোগ্রাম্' কার্যবিবরণীতে এইরূপ পাওয়া যাচ্ছে —

---

* ছোটকা — ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, জীবন — জীবনময় রায়, জংলী—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। রচনাটি শ্রীহিরণকুমার সান্যালের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত।

"(১) অধিকারীর মানভঞ্জন
(২) সুনীতিবাবুর সাগরযাত্রার সংবাদ
(৩) সভ্যগণের আক্ষেপ ও প্রেমাশ্রু
(৪) "আবার খাব"
"আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল"* "

এ মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে সুকুমার রায় ছুটি ছড়া লেখেন। যথা,

"কৈফিয়ৎ
ক্লাবটিরে মারি
হ'ল অধিকারী
মাস তিন চারি
বিহারবিহারী।
বিরহেতে তারি
ব্যথা পেয়ে ভারি
নিশ্বাস ছাড়ি
ভিজাইল দাড়ি
যত বুড়োধাড়ি
সভ্যের সারি —
(ঘোর বাড়াবাড়ি —।)"

দ্বিতীয় ছড়াটি একটি 'নূতন ধাঁধা'— সেটি ভয়ানক সীরিয়াস্। যথা,

"শুনেছিনু গেছে গেছে, শুনেছিনু নেই সে,
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায় শনিবারে তেইশে।" বলা বাহুল্য, এই 'সে' হচ্ছেন 'অনাহারী সম্পাদক' শিশিরকুমার দত্ত মহাশয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম থেকে এ-আসরের সভ্য ছিলেন না। তিনি এ-আসরে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের "আমাদের শান্তিনিকেতনে"র অনুসরণে "আমাদের মণ্ডা-সম্মিলন" বলে একটি গান লেখেন। এ গানটি মাঝে মাঝে সভ্যরা সমস্বরে গান করতেন। একটি রবীন্দ্রসংগীতও অধিবেশনের শেষে অনেক সময় সভ্যেরা সমস্বরে গাইতেন। গানটি 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার

* তৃতীয় এবং চতুর্থ বাৎসরিক কার্যবিবরণী শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দল'। একবার এই গান নিয়ে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার ঘটেছিল। সুকুমার রায়ের বাড়িতে এই গানটি হওয়ার সময় পাশের বাড়ির লোকেরা অভিযোগ করেছিলেন যে এরা সব মাতাল হয়ে থিয়েটারের গান গাইছে। তখনো রবীন্দ্রসংগীত এত সুপরিচিত ছিল না। পাশের বাড়ির অধিবাসীরা গানটিকে থিয়েটারের গান বলে ভুল করেছিলেন।*

সুকুমার রায়ের উচ্ছ্বসিত হাসির রচনাই বেশি। তাঁর প্রায় সব রচনাই তাই। যদিও বা কখনো কখনো তিনি ব্যঙ্গ করে থাকেন, তবু সে ব্যঙ্গকে এমন ব্যাপক ও নৈর্ব্যক্তিকরূপে উপস্থিত করেছেন যে, তার মধ্যে কোনো রকম খোঁচা বা আঘাত আবিষ্কার করা যায় না। কোথাও যদি একটু আধটু খোঁচাও থাকে, তবে তা বেদনা দেয় না, সুড়সুড়ি দেয় মাত্র। সুকুমার রায়ের বোধহয় একমাত্র রচনা 'ক্যাবলের পত্র', যেখানে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়। কিন্তু এখানেও তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন ঠিক ব্যক্তিকে নয়, তৎকালে আভির্ভূত এক বিশেষ ধরণের রচনারীতিকে। ১৩২১ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিজের আঁকা ছবিসহ প্রকাশিত 'ভাবুক সভা' নামে দীর্ঘ কবিতাটিকে তাঁর এই নৈর্ব্যক্তিক ব্যঙ্গের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের অতি-ভাবুকতা এবং ভাবের ঝোঁকে কবি-কবি ভাব ধারণ করাকে সুকুমার রায় এই কবিতাটিতে বেশ একটু ঠাট্টা করেছিলেন। নাট্যাকারে লিখিত এ-পদ্যটি ভাবুক দাদা ও তাঁর দুই ভক্তের কথোপকথনেই সম্পূর্ণ। ভাবুক দাদা নিদ্রাবিষ্ট, এমন সময় ছোকরা ভাবুকদলের প্রবেশ।

"ভাবুক নং ১

ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারটা ?
ভাবুকদাদা মূর্চ্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা !

ভাবুক নং ২

তাই ত বটে ! আমি বলি এত কি হয় সহ্য ?
সকালবিকাল এমন ধারা ভাবের আতিশয্য !

* তথ্যগুলি শ্রীহিরণকুমার সান্যালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

নং ১

অবাক কল্লে ! ঠিক্ যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত ।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম !”

এরপর ভাবুক ছোকরাদের বিলাপ-কীর্তনের চেঁচামেচিতে ভাবুকদাদার নিদ্রাভঙ্গ হোল। এটি যে ঘুম নয়, ভাবাবেশ, তা সাব্যস্ত হলে হঠাৎ ভাবুক দাদার মনে ভাবের এক প্রবল ধাক্কা এল।

“দাদা

সবুর কর স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আস্‌ছে, সরে দাঁড়াও এক্ষণি !”

ভাবুকদাদার থেকে ভাবের এই ধাক্কার ঢেউ যখন ক্রমে ভক্ত ভাবুকদলের মনেও এসে পৌঁছুল, তখন,

“নং ১

চিন্তা পরাহতা বুদ্ধি বিশুষ্কা
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোস্কা !
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে !
ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা রক্ষে।

নং ২

সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব,
ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ !

দাদা

অর্থ ! অর্থ ত অনর্থের গোড়া !
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।
যতসব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
“অর্থ-অর্থ”— করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে !
(আরে) অর্থের শেষ কোথা, কোথা তার জন্ম
অভিধান ঘাঁটা, সেকি ভাবুকের কম্ম ?

অভিধান, ব্যাকরণ, আর ওই পঞ্জিকা—
ষোলআনা বুজরুকী আগাগোড়া গঞ্জিকা !
মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা — ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ !

ভাবের নামতা

ভাবের পিঠে রস তার উপরে শূন্যি—
ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড়বে কত পুণ্যি—
(ওরে মাণিক মাণিক রে নামতা পড় খানিক রে)
ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিস্‌পেপসিয়া — ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
(ওরে মাণিক মাণিক রে, চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড় —
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড় ।
(ওরে মাণিক মাণিক রে (এবার) গাছে চড় খানিক রে) ।

যবনিকা পতন ।"

গাদা গাদা বাজে কবিতার বই ছাপিয়ে নাম জাহির করার চেষ্টাকেও সুকুমার রায় বেশ ঠাট্টা করেছিলেন ।

" 'গবদ্‌গীতার' গ্রন্থকার মেঘমালতীর কবি,
আজ এসেছেন কলকেতাতে পাঠাচ্ছি তাঁর ছবি ।
আসছে মাসে 'নিরঙ্কুশে' ছাপিয়ে দিতে হবে,
এই অনুরোধ নাছোড়বান্দা করছি মোরা সবে ।
সংগে দিলাম সংক্ষেপেতে জীবনী তাঁর লিখে,
সবাই হবেন উপকৃত নূতন কথা শিখে ।
আরও দিলাম এক পুঁটলী কাব্য তাঁরি লেখা
'কাকুতি' আর 'কৃষ্ণকাজল' 'কম্বু' 'তস্মরেখা',
'প্রপঞ্চ' আর 'আহ্লাদিকা' 'মুঞ্জী' 'মিহিদানা'
'ভৃঙ্গী' 'ভঙ্গী' ইত্যাদিতে মোদ্দা উনিশখানা ।
করতে হবে সমালোচন বিশেষ দরদ করে—

আরেক কথা, ছবিখানার নিচের দিকে ফাঁকে,
'কিশোরী চাঁদ কাব্যকুলিশ' নামটি যেন থাকে।
আপনারাই তো দেশের শক্তি এবং জ্ঞানদাতা,
দেশের গতি, দেশের কণ্ঠ, জিহ্বা ঘিলু মাথা।
অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন মহাশয়দের কাছে,
ফিরাবেন না নিরাশ করে এই ভরসা আছে।"

এর উত্তরে সম্পাদক লিখছেন,

"আপনারা সব ধন্যি বলুন, কবির বাড়ুক পুণ্যি
মোদের কাছে এগ্‌জামিনে পেলেন তিনি শূন্যি!"
(বর্ণমালাতত্ত্ব)।

প্রথম বৎসরের (১৩৩৪) 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত অসমাপ্ত রচনা 'বর্ণমালা-তত্ত্ব' কবিতাটিতে সুকুমার রায়ের মনের গভীরতা, তাঁর সূক্ষ্ম ধ্বনি-চেতনা এবং মৃদু কৌতুকবোধের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

"শুন শুন শুন তত্ত্ব নূতন, কে যেন স্বপন দিলা,
ভাষা-প্রাঙ্গণে স্বরে-ব্যঞ্জনে ছন্দ করেন লীলা।
স্বর-ব্যঞ্জন যেন দেহ-মন, জড়েতে চেতন বাণী,
এক বিনা আর থাকিতে না পারে, প্রাণ-হারা যেন প্রাণী।...
স্তিমিত-চেতন জগৎ যখন, মগম আদিম ধূমে,
অঘোর-তিমির, স্তব্ধ বধির, স্বপ্ন-মদির ঘুমে;
আকুলগন্ধে আকাশ-কুসুম উদাসে সকল দিশি,
অন্ধ জড়ের বিজন আড়ালে কি যেন রয়েছে মিশি।
জাগে হাহুতাশ স্বরের বাতাস, জড়ের বাঁধন ছিঁড়ি
ফিরে দিশাহারা, কোথা ধ্রুবতারা, কোথা স্বর্গের সিঁড়ি।
অ আ ই ঈ উ ঊ, হা হা হি হি হু হু, হাল্কা শীতের হাওয়া,
অলসচরণ প্রেতের চলন, নিঃশ্বাসে আসা যাওয়া,
খেলে কি না খেলে, ছায়ার আঙুলে, বাতাসে বাজায় বীণা
আলস-বিভোর, আফিঙের ঘোর, বস্তুতন্ত্রহীনা।"

এর পর ক্রমে ব্যঞ্জনবর্ণের জন্ম হোল। যথা,

"আকাশ-বিহনে বস্তু অচল, চলে না জড়ের চাকা,
আইল আকাশে ফোকলা বাতাস, কেবলি আওয়াজ ফাঁকা।
সৃষ্টিতত্ত্ব বিচার করনি, শাস্ত্র পড়নি দাদা—
জড়ের পিণ্ড আকাশে গুলিয়া, ঠাসিবে ভাষার কাদা!
শাস্ত্রবিধান কর প্রণিধান, ওরে উদাসীন অন্ধ,
ব্যঞ্জন-স্বরে, যেন হরি-হরে, কোথাও রবে না দ্বন্দ্ব।
(তবে) আয় নেমে আয়, জড়ের সভায়, জীবন-মরণ-দোলে,
আয় নেমে আয়, ধরণীধূলায় কীর্তন কলরোলে।
আয় নেমে আয় কণ্ঠ বর্ণে, কাকুতি করিছে সবে,
আয় নেমে আয় কর্কশ ডাকে, প্রভাতে কাকের রবে॥"

সুকুমার রায়ের পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি এবং সাহিত্য ও শিল্পবোধ যে কিরূপ প্রখর ছিল, অধুনা 'বর্ণমালাতত্ত্ব' নামে প্রকাশিত বইটির অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিতে তা অতি স্পষ্ট। উপরে উদ্ধৃত 'ভাবুক সভা' রচনাটিও বড়দের রচনা। বড়দের পত্র-পত্রিকাতেই এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩২০ (১৯১৩) সালে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকেই 'সন্দেশে'র জন্য সুকুমার রায় লিখতেন বটে, কিন্তু এ সময়ে বড়দের উপযোগী গম্ভীর ও হাস্যরসাত্মক রচনাও তিনি কিছু কিছু লিখতেন এবং 'প্রবাসী' প্রমুখ পত্রপত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হোত। অবশ্য কোনোদিনই তিনি খুব বেশি লেখেন নি (এক 'সন্দেশে'র প্রয়োজনে ছাড়া), কারণ দলবেঁধে ফুর্তি বা মজা করায় তাঁর প্রচুর উৎসাহ থাকলেও লেখা বিষয়ে তিনি বেশ একটু অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন। মজার মজার নাটক লিখে সেগুলি অভিনয় করার দিকে ঝোঁক তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই ছিল। নন্‌সেন্স ক্লাবে অভিনীত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' প্রভৃতি নাটকগুলি সেই সময়েরই রচনা। মজা করবার জন্য ছড়া লেখার অভ্যাসও তাঁর ছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে খুব বেশি লেখার দিকে তাঁর বিশেষ মন ছিল না।

কিন্তু ১৩২২ বঙ্গাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' পত্রিকার সমস্ত ভারই সুকুমার রায়ের উপর এসে পড়লো। 'সন্দেশ' পত্রিকাটি অনেকটা

পারিবারিক কাগজ ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের পুরাতন লেখাগুলি এতে প্রকাশিত হোত, একথা আগে উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া সম্পাদক ও তাঁর কনিষ্ঠ দুই ভাই সুবিনয় ও সুবিমল, দুই বোন সুখলতা ও পুণ্যলতা, কুলদা-রঞ্জন রায়, দাদামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিরাই প্রধান লেখক ছিলেন। 'সন্দেশে'র প্রয়োজনে আলস্য ত্যাগ ক'রে প্রতিমাসে সুকুমার রায়কে কিছু না কিছু ছড়া-গল্প-নাটক লিখতেই হোত। 'সন্দেশে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'হযবরল'ও এই সময়ের লেখা। এ সব রচনাই 'আবোল তাবোল', 'হযবরল', 'খাইখাই', 'পাগলা দাশু', 'ঝালাপালা', 'বহুরূপী' ইত্যাদি বইতে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু তাঁর কিছু কিছু রচনা, অন্ততঃ কয়েকটি বড়দের লেখা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে বাকি আছে। উপরে উল্লিখিত 'ভাবুক সভা' তার মধ্যে একটি, 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'চলচিত্তচঞ্চরী' আর একটি। 'সন্দেশে' প্রকাশিত মজাদার আজগুবি অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী' নামে লেখাটিও এখনো বই হয়ে প্রকাশিত হয় নি। সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত রচনা কিছু থাকলে তাও এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন মনে করি।

শেষের দিকে 'সন্দেশ' পত্রিকাটির প্রকাশ অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ, তৎকালে-দুরারোগ্য কালাজ্বর রোগের আক্রমণে সুকুমার রায়ের শরীর অসুস্থ ও নির্জীব হয়ে পড়েছিল। প্রায় আড়াই বৎসর ভুগে এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কাজকর্ম বেশি দেখতে পারতেন না, বেশি লিখতেও পারতেন না। তাঁর প্রথম যৌবনের অনেক লেখা, যেমন ছোটদের নাটকগুলি, এ সময়েই 'সন্দেশে' প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ দু'এক বছর সুকুমার রায় অপেক্ষাকৃত কম লিখেছেন, কিন্তু তাঁর রচনার দীপ্তি একটুও নিষ্প্রভ হয় নি।

'সন্দেশে'র চাহিদা মেটাবার চাপে সুকুমার রায়কে বড়দের লেখা প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছিল। তিনি 'সন্দেশ' সম্পাদনার ভার নেবার পর তাঁর বড়দের লেখা বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। কিন্তু ছোটদের জন্য লেখাগুলিতেই সুকুমার রায়ের প্রতিভার উজ্জ্বলতম বিকাশ

দেখা গিয়েছিল। অসূয়াহীন আঘাতবর্জিত নির্জলা কৌতুকহাস্য সৃষ্টিতে সুকুমার রায় বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অদ্বিতীয়। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর লেখার উচ্ছ্বসিত উচ্চপ্রশংসা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাঁর নাম সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হয়ে আছে। সকলেই তাঁকে জানে ছোটদের লেখকরূপে। কিন্তু ছোটদের জন্য লিখে অথবা ছোটদের উপভোগ্য লেখার মধ্য দিয়েও যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতিত্ব অর্জন করা যায়, এবং জগতের বহু শ্রেষ্ঠ লেখক যে আপাত-শিশুপাঠ্য রচনার মধ্য দিয়েই নিজেদের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাকে প্রকাশ করেছেন, একথা আমরা অনেক সময়েই ভুলে থাকি।

সুকুমার রায় প্রথম যৌবনে যে সব মজাদার ছড়া ও নাটক লিখেছিলেন, সেই নন্‌সেন্স ক্লাবের যুগের তাঁর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা' নাটক দু'টি কৌতুকে একেবারে ভরপুর। কিন্তু উচ্ছ্বসিত ও পরিচ্ছন্ন হাসি উৎসারিত করলেও এ-দুটি রচনার মধ্যে সেই গভীর ও সূক্ষ্ম রসসৃষ্টির পরিচয় নেই, যা হাসিকেও অতুলনীয় মহিমায় মণ্ডিত করে। সেরূপ উদ্দেশ্য-বর্জিত অসূয়াহীন খাঁটি ও উঁচুদরের হাস্যরস সুকুমার রায় উপস্থিত করলেন 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছোট ছোট পাঠকদের জন্য লেখা তাঁর ছড়া-গল্প ও নাটক-নাটিকাকে অবলম্বন ক'রে, বিশেষতঃ কবিতাগুলিতে। এই রচনাগুলিই তাঁর 'আবোল তাবোল', 'হযবরল', 'পাগলা দাশু', 'খাই খাই', 'বহুরূপী' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

মৃত্যুর পূর্বে সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' ও 'হযবরল' এই দুখানি বই মাত্র প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'আবোল তাবোল' বইটির প্রথম ও শেষ কবিতা এই বইটি প্রকাশের প্রয়োজনেই লিখিত হয়েছিল। শেষ কবিতাটি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে রচিত। ঘনায়মান মৃত্যুর অন্ধকার তখন লেখকের মনে যে ছায়াপাত করছিল, কবিতাটির কৌতুকময় অর্থহীনতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকেও তা সহৃদয় পাঠক মাত্রকেই অভিভূত করে। কবি বলেছেন,

"আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে জাগে

নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।"

মেঘমুলুকের ঝাপসা রাতের বিচিত্র বর্ণ আর অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি-তরঙ্গ যখন চেতনাকে আবিষ্ট করে ফেলছে, কল্পনা যখন গতানুগতিক দেখাশোনার এবং জীবন ও জগৎ-এর সীমানা ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশ অর্থহীনতায় পাড়ি দিতে চলেছে, জীবনের সেই গোধূলিলগ্নের ভাষা ও ছবি এ-কবিতাতে সুকুমার রায় যেমনভাবে উপস্থিত করেছেন, তা কেবল সম্পূর্ণ নূতন ও অপূর্ব নয়, অতি গভীর ও বিষাদময় হয়েও লঘু এবং সার্থক কাব্যরসে সমুজ্জ্বল। আপাত-অর্থহীন আজগুবি কল্পনার পথ বেয়ে কবিত্বের কী চরম সার্থকতায় পৌছানো যায়, 'আবোল তাবোল'-এর এই শেষ কবিতাটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'বেবাক্ লোক' এ-কবিতার গভীর বিষাদময় মাধুর্য না বুঝতে পারে, কিন্তু এখানে যে সুকুমার রায় কবিত্বের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বে পৌছেছেন, রসিক ব্যক্তিমাত্রই একথা মানবেন।

'আবোল তাবোল'-এর কবিতাগুলি 'সন্দেশে' প্রকাশিত তাঁর সকল কবিতা থেকে স্বয়ং কবি কর্তৃক নির্বাচিত। এবং এই কবিতাগুলিতেই কি কবিত্বে, কি হাস্যরস উৎপাদনে, কি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে সুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মানবচরিত্রে গভীর জ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে অতুলনীয় দক্ষতা, বর্ণনায় অপূর্ব নিপুণতা 'আবোল তাবোল' বইটিতে ছড়িয়ে আছে। আর, এ ছড়াগুলিতে শিল্পেরই বা কী ত্রুটিহীন কারুকার্য! সুকুমার রায়ের নিজের আঁকা ছবিগুলি এ সব কবিতার শিল্পরূপকে আরো উজ্জ্বল এবং চরিত্রগুলিকে আরো জীবন্ত ক'রে তুলেছে। দুঃখের বিষয়, 'আবোল তাবোল' ও 'হযবরল' বই দুটির সকল প্রকার অঙ্গসজ্জা ও অলংকরণ প্রস্তুত ক'রে ছাপতে দিয়েও কবি জীবৎকালে এ-দুটি বইয়ের প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি।

ছোটদের জন্য লেখা হলেও এ কবিতাগুলির ভিতরে জাগতিক মানুষের চরিত্র ও মনস্তত্ত্ব অতি নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। ঐ যে ট্যাঁশ গরু — যে গরু হয়েও গরু নয়, আসলে পাখী; আর ঐ যে ভদ্রলোক রাস্তায় কাউকে দেখলেই তাকে পাকড়াও করে বড় বড় কথা কানের ভিতর গোঁজাবার জন্য

বদ্ধপরিকর হয়ে আছেন ; আর যে লোক দুটি কারণে বা অকারণে অন্যের উপর চোটপাট করতে চায়, কিন্তু অপরপক্ষের মারমূর্তি দেখলেই 'ভেরি ভেরি সরি' বলে 'সেক হ্যাণ্ড' করে ; আর যে লোকটি ছায়া ধরার ব্যবসা করে ; আর যে বিদ্ঘুটে জানোয়ারটা তার বীভৎস মারমুখো চেহারা আর প্রকাণ্ড মুগুর নিয়ে নিরীহ ভালোমানুষদের শিকার করবার সুযোগ খোঁজে এবং 'ভয় পেয়ো না' ব'লে আশ্বাস দেয় ; আর ঐ যে বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোক ভালো ভালো কথা নোটবইতে টুকে রাখেন এবং ঐ যে লোকটি রাস্তায় চেনা লোক পেলেই তাকে পাকড়াও ক'রে দূর-দূরান্তের ক্ষীণতম সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের নাড়ীনক্ষত্রের ঠিকানা খুঁজে বেড়ায়, এরা সবাই সার বেঁধে সুকুমার রায়ের ছড়াগুলিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। অথচ হাসির মুখোশে তাদের চেহারা এমনই পাল্টে গেছে যে, হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না যে এ-লোকগুলি আমাদের নিতান্ত পরিচিত। আপাত-মজাদার আজগুবি ছড়ার মধ্য দিয়ে মানব-মনস্তত্ত্বের অতি গভীর স্তরের গতি ও অসংগতিও সুকুমার রায় অতি আশ্চর্যরূপে উপস্থিত করেছিলেন। 'হুলোর গান' কবিতাটির কথা ধরা যাক।

"চুপচাপ চারদিকে ঝোপঝাড়গুলো,
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে
কোন্ গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে।
পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ্ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্ করে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়্ দুড়্ ছুটে যাই, দূর থেকে দেখি,
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কাণকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা,
ধুক ক'রে নিভে গেল বুকভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি,

বিল্‌কুল্ সব দেখি ভেলকির ফাঁকি ।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নীর মুখ যেন চিম্‌নির কালি ।”

আকাশে আধখানা চাঁদ দেখে চট করে আধখানা মালপোয়ার কথা মনে পড়ে যাওয়া অবশ্য আশ্চর্য নয়, কিন্তু যখন দেখা যায় কাণকাটা নেকীর গালফোলা মুখে সেই আধখানা মালপোয়া ইতিমধ্যেই পাচার হয়ে গেছে, তখন কার না সংসারে বৈরাগ্য আসে ? আর, যে রাত্রির শোভায় একটু আগেই গলায় গান জেগেছিল, সেই শোভাই ‘সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি’ হয়ে দেখা দেয় — এমনকি গিন্নির সুন্দর মুখখানা পর্যন্ত চিম্‌নির কালির মতো কুচ্ছিত হয়ে দাঁড়ায় ।

মানবমনের গভীরতম স্তরের স্বরূপ কৌতুকের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করতে সুকুমার রায় অদ্বিতীয় ছিলেন । ‘হুলোর গান’ এদিক থেকে একটি আশ্চর্য রচনা । উপরে যে কবিতাগুলোর নাম করা হয়েছে, তার মধ্যেও অনেক-গুলিতে উচ্ছ্বসিত হাসির আবরণে মানবমনের ও মানবচরিত্রের অতি গভীর স্তরে আলোকপাত করা হয়েছে । এ ধরণের মানস-রহস্যের ব্যঞ্জনাময় আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘প্যাঁচা আর প্যাঁচানী’ ।

“প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী,
খাসা তোর চ্যাঁচানি
শুনে শুনে আন্‌মন
নাচে মোর প্রাণমন !
মাজা গলা চাঁচা সুর
আহ্লাদে ভরপুর !···
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছি রে,
চাঁদামুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দু’নয়ান ।”

পেচকী-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের এ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে আমরা খুব হাসতে পারি, কিন্তু এরূপ হাস্যকর কাজ আমরা সর্বদাই দেখে থাকি এবং

ক'রে থাকি। সকলেই আমরা নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জগতের যাবতীয় কাজ ও বস্তুকে বিচার করি। পাঁচজনের কাছে যা খুব ভালো লাগে আমার তা খারাপ লাগতে বাধা নেই, এবং এর বিপরীতও ঘটা সম্ভব। পাশের বাড়ির মহিলাটি যখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করেন, তখন আপনি ঝালাপালা হয়ে সশব্দে জানালা বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু সে-সংগীত তাঁর স্বামীর কর্ণে কী সুধাবর্ষণ করছে তা আপনি কেমন ক'রে জানবেন! এইরূপ ব্যঞ্জনাময় কৌতুক-কবিতা 'আবোল তাবোলে'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ধরুন সেই যে বুড়ি — যার

'গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি,
ঝুর্‌ঝুরে্ প'ড়ো ঘরে থুর্‌থুরে বুড়ী।
কাঁথাভরা ঝুলকালি, মাথাভরা ধুলো,
মিটমিটে ঘোলা চোখ, পিঠখানা কুলো।...
ডাকে যদি ফিরিওয়ালা, হাঁকে যদি গাড়ী,
খসে পড়ে কড়িকাঠ, ধসে পড়ে বাড়ী।...
ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।"

সেই 'বুড়ীর বাড়ী'র বর্ণনায় যতই মজা থাকুক, গভীর দারিদ্র্যেও হাসি-মুখ সেই বাড়ীর অধিবাসিনীর জন্য কি একটু বেদনাও মনে জাগে না? 'হাত গণনা' এইরূপ আর একটি কবিতা যেখানে মানবমনস্তত্ত্বের বিচিত্র গতি নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে।

অবশ্য 'আবোল আবোল' এর সব কবিতাই ব্যঙ্গবর্জিত নয়। যেমন, মেয়ের জন্য পাত্র নির্বাচনে "কিন্তু তারা উচ্চ ঘর, কংসরাজের বংশধর" বলে সান্ত্বনা লাভ, অথবা হাতুড়ের কেরামতি, কিংবা ট্যাঁশ্ গরুর স্বভাব-চরিত্র, অথবা 'সাবধান', 'কি মুস্কিল!', 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'ডানপিটে' প্রভৃতি। কিন্তু এ-ব্যঙ্গ এত নির্বিশেষ আর এত বেশি হাসিতে জড়ানো, যে তা কাউকে আঘাত করেনা। অনেক স্থলেই ব্যঙ্গ এরূপ প্রচ্ছন্ন এবং এতই গভীর স্তরের যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এগুলি সম্বন্ধে বলা যায়,

"কিন্তু সেটা এতই সুদূর

এতই সেটা অধিক গভীর
আছে কিনা আছে তাহার
প্রমাণ দিতে হয় না কবির।"

বস্তুতঃ, 'আবোল তাবোলে'র কবিতাগুলিতে অতি-লঘুতার সঙ্গে অতি-গভীরতার যে সমন্বয় ঘটেছে, আপাত-অর্থহীন কৌতুকের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তাৎপর্য যেরূপ আশ্চর্যরূপে মিশে গেছে, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা বিরল। এই কারণে সুকুমার রায়ের কবিতা অপরিণতবয়স্কদের যেমন ভালো লাগে, প্রবীণদেরও তার চেয়ে কম ভালো লাগে না। লঘুচিত্ত ব্যক্তি এগুলি যেমন উপভোগ করতে পারেন, অতি চিন্তাশীল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও এগুলির রসোপভোগ করা ততখানিই সহজ। এ-জাতীয় উদ্ভট আজগুবি খেয়াল রসের রচনার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে যে উদ্বেল কৌতুক ও গভীর তাৎপর্যময় সাহিত্য সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার একটি সুপরিচিত উদাহরণ Lewis Corrollএর *Alice in Wonderland* এবং *Through the Looking Glass*। এই বিশ্ববিখ্যাত বইদুটির জুড়ি পৃথিবীর সাহিত্যে অল্পই আছে। সুকুমার রায়ও 'আবোল তাবোল'এ উচ্ছল অনাবিল কৌতুক ও অতিগভীর তাৎপর্যের সঙ্গে উঁচুদরের কবিত্ব মিশিয়ে এই স্তরের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাজশেখর বসু লিখেছিলেন, "Lewis Carroll-এর *Alice in Wonderland* ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত হলেও সকল পাঠকের সমাদর পেয়ে চিরায়িত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' আরও উচ্চশ্রেণীর রচনা মনে করি। চিত্র আর তক্ষণকলায় যেমন impressionistic style এবং অবাস্তব সংস্থান দ্বারা রসসৃষ্টি করা হয়, সুকুমার রায় তাঁর ছড়া রচনায় সেইরূপ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করেছেন।" (চলচ্চিন্তা)। 'আবোল তাবোল'এর কবিতাগুলির রস প্রকৃতই অতি সূক্ষ্ম, গভীর ও অতুলনীয়। হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও যে গভীর কবিত্ব ও সূক্ষ্ম তাৎপর্যের অবতারণা করা যায়, এখানে তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত হয়েছে। মাঝে মাঝে বর্ণনায় কবিত্বের চমক লাগে,

"যায় না বনের কাছে কিম্বা গাছে গাছে
দখিণ হাওয়ার সুড়সুড়িতে

হাসিয়ে ফেলে পাছে।"

এই 'দখিণ হাওয়ার সুড়সুড়ি' কথাটির মধ্যে যে অপূর্ব ব্যঞ্জনা, তা একমাত্র উঁচুদরের কবির হাতেই সম্ভব হতে পারে।

নিছক হাস্যরসের দিক থেকে দেখতে গেলেও সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'হযবরল', 'পাগলা দাশু', 'ঝালাপালা'র মতো খাঁটি অথচ প্রবল হাস্যরসাত্মক বই বাংলায় অতিবিরল। এই লেখক ব্যক্তিগত জীবনে যে কিরূপ কৌতুকপ্রবণ মানুষ ছিলেন, তার পরিচয় আগেই দিয়েছি। হাসির মাপকাঠিতে বিচার করে তিনি তিন ধরণের মানুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। এক, যারা কারণে-অকারণে হাসে সেই আহ্লাদী জাতীয় লোক। এরা বলে,

"হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই!···
হাসছি দেখে চাঁদের কলা জোলার মাকু জেলের দাঁড়,
নৌকা ফানুস পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ী তেলের ভাঁড়;
পড়তে গিয়ে ফেলছি হেসে ক খ গ আর শ্লেট দেখে—
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।"

আর এক জাতের মানুষ আছে, হাসি যাদের দু'চক্ষের বিষ।

"রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
হাস্‌ব না-না, না-না।
সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
যায় না বনের কাছে, কিংবা গাছে গাছে,
দখিণ হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!···
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।"

আর এক জাতের মানুষ আছে, যারা আরো সাংঘাতিক ! কবি বলেছেন,

"আর যেখানে যাওনারে ভাই সপ্তসাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার !"

এরা নিজেরা হাসুক আর নাই হাসুক, অন্যকে হাসাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

"কোথায় বাড়ী কেউ জানে না, কোন্ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় প'ড়ে।
বিদ্ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্ দেশী,
শুন্লে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশি।
না আছে তার মুণ্ডু মাথা, না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাসতে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।"

এরা যে কেবল বাজে বাজে রসিকতা ক'রে হাসাতে চেষ্টা করে তা নয়, তার উপর আবার

"কুটুৎ ক'রে চিম্টি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।"

জগতে এরকম রসিকপ্রবর কাতুকুতু বুড়োর কোনো অভাব নেই। আমাদের দেশেও এদের অজস্র দেখা গেছে এবং দেখা যাচ্ছে। সুকুমার রায় এদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়ে ভালোই করেছেন !

'আবোল তাবোল'এর অন্তর্গত আরো কয়েকটি কবিতাকে উচ্চশ্রেণীর রচনা বলে মনে করি। যথা 'লড়াই ক্ষ্যাপা', 'ভাল রে ভাল', 'ভুতুড়ে খেলা', 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি। শেষোক্ত কবিতাটিতে কয়েকটি শব্দের চলিত প্রয়োগ অবলম্বন ক'রে কৌতুক করা হয়েছে, সে হিসাবে এটিকে কথার খেলা বলে বর্ণনা করা যায়। এ-কবিতার সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত 'বর্ণমালাতত্ত্ব' কবিতাটির যেন একটু মিল আছে। 'সন্দেশ'এ প্রকাশের সময় কবিতাটির ভূমিকাস্বরূপ আরো কয়েকটি পংক্তি ছিল। কবি নিজেই গ্রন্থ প্রকাশকালে সে-কটি পংক্তি বাদ দিয়েছিলেন। তবু আমার স্মৃতিতে সে পংক্তিগুলি এখনো জেগে আছে। 'সন্দেশ' এখন দুষ্প্রাপ্য। সে অংশটুকু চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে এই আশংকায় স্মৃতি থেকে সেটুকু উদ্ধৃত করছি।

"সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া-ঢাকা ধূলোতে,
চোখকান খিল দেওয়া গিজ্‌ গিজ্‌ তুলোতে,
বহে না ক নিঃশ্বাস চলে না ক রক্ত,
স্বপ্ন না জেগে দেখা বোঝা ভারী শক্ত।
মন বলে 'ওরে ওরে আক্কেলমন্ত,
কান দুটো খুলে দিয়ে এই বেলা শোন্‌ ত'।"

'সন্দেশে' প্রকাশিত 'আবোল তাবোল' বহির্ভূত কবিতাগুলি নিয়ে সুকুমার রায়ের পরবর্তী সংকলন 'খাইখাই' প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছড়াগুলি 'আবোল তাবোল'-এর মতোই উচ্ছ্বসিত হাস্যময়। এর অনেকগুলিতেই কথার খেলা বা বাংলা শব্দের প্রয়োগবৈচিত্র্য নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে। যেমন প্রথম কবিতা সুপরিচিত 'খাইখাই' নামের ছড়াটি। 'দাঁড়ের কবিতা', 'হন্‌ হন্‌ বন্‌ বন্‌' প্রভৃতিও এই জাতীয়। কতকগুলি নীতিমূলক ছড়াও এ-বইটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য সব ছড়াই অল্পবিস্তর কৌতুকাশ্রিত। তবু স্বীকার করতে হবে যে, 'আবোল তাবোল'এর ছড়াগুলির সুগভীর তাৎপর্য 'খাইখাই'র অধিকাংশ ছড়ায় অনুপস্থিত। শুধু এর একটি ছড়াকে অতি উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করি ; সেটি 'কলম ও কালি'।

"নিরীহ কলম, নিরীহ কালি,
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
'বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
বকাট ফাজিল অকাট গাধা।'
আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি যতন করি—
'শান্ত মানিক শিষ্ট সাধু
বাছারে, ধনরে লক্ষ্মী যাদু।'...
মনের কথাটি ছিল যে মনে
রটিয়া উঠিল খাতার কোনে!
আঁচড়ে আঁকিতে আখর কটি!
কেহ খুশি কেহ উঠিল চটি!

রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে।...
শাদায় কালোয় কি খেলা জানে—
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে*।"

'আবোল তাবোলে'র সঙ্গেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'হযবরল' আজগুবি রসের একটী অতুলনীয় কাহিনী। এই কাহিনীটিকেই প্রকৃতপক্ষে Lewis Carroll-এর *Alice in Wonderland*-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এটি বাংলাসাহিত্যে উদ্দেশ্য, ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার-বর্জিত আজগুবি উদ্ভট রসের কাহিনী হিসাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ না হলেও অতুলনীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রীর দেশে'র সঙ্গে 'হযবরল'র পার্থক্য এই যে, অবনীন্দ্রনাথ চলেছিলেন কবিত্বময় কল্পনার পথ ধ'রে, আর সুকুমার রায়ের আজগুবি কল্পনা বাস্তব জগতের চরিত্র, আচরণ ও কার্যকলাপের অলিতে গলিতে বিচরণ করেছে। আজগুলি রসের এই রচনাটি প'ড়ে হাসতে হাসতে হিজিবিজ্‌বিজের মতো মারাত্মক অবস্থায় পৌছয় নি, আবালবৃদ্ধ বনিতার মধ্যে এমন একজনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই অপূর্ব phantasy রচনায় সুকুমার রায় Lewis Carroll দ্বারাই অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি এই অতুলনীয় ইংরেজ লেখকের দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন, 'হযবরল'র কাহিনীটি *Alice in Wonderland* এর মতো আগাগোড়াই একটি স্বপ্ন। তা ছাড়া বেড়ালের ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হাসি Cheshire Cat এর grin এর অনুরূপ, উধো বুধো Tweedledum Tweedledee মতো এবং বিচারের দৃশ্যেও সম্ভবতঃ ইংরেজী বইটির বিচারদৃশ্যের ছায়া পড়েছে। কিন্তু তার ফলে 'হযবরল' বইটির মৌলিকতার কোনো হানি হয়েছে, এমন মনে করা যায় না।

কেবলমাত্র চরিত্রের, বাক্যের এবং আচরণের অসংগতি ও অসলংগ্নতা দ্বারা কত প্রবল হাস্য উৎসারিত করা সম্ভব, এই বইটিতে সুকুমার রায়

*মুদ্রিত গ্রন্থে এ-শব্দটি 'মনে' বলে ছাপা হয়েছে। এটি ভুল মনে করি। এ বিষয়ে 'সন্দেশে' প্রকাশিত পাঠটি তুলনীয়।

তার চূড়ান্ত নিদর্শন উপস্থিত করেছেন। চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ আর রুমালের মা দিয়ে চশমা তৈরি হতে পারে, এটা একেবারেই নূতন কথা। তা ছাড়া গেছোদাদার সঙ্গে দেখা করার জন্য যে সূক্ষ্ম হিসাব দরকার, তাও নেহাৎ সোজা নয়। শুদ্ধভাবে গুণ করতে গেলে যে সময়ের মূল্যজ্ঞান টন্‌টনে থাকা দরকার এই রেলেটিভিটি-তত্ত্বও অভিনব। কিন্তু 'হযবরল'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এর অভিনব কুশীলবগণ। যে "সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন" সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সদা সচেতন থেকে "হিসাবী ও বেহিসাবী খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন" করে, যে কিম্ভূত জন্তটা অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা ক'রে হেসেই অস্থির, ব্যাকরণ সিং বি. এ. যে সকল প্রকার খাদ্য চেখে চেখে 'খাদ্যবিশারদ' উপাধি লাভ করেছে এবং যে গানের রসগ্রহণকালে শিশিবোতল ছাড়া কোনো কিছুই শক্ত বলে মনে করে না, যে নেড়া দু'পকেট বোঝাই করে গানের তাড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এবং কেউ তাকে গান গাইতে অনুরোধ করার আগেই অবশ্যকর্তব্য বিনয়প্রকাশটুকু সেরে নিয়ে গাইতে আরম্ভ করে, এরা সবাই স্বপ্নে দেখা দিলেও কেন জানি এদের একটু চেনা চেনা মনে হয়। আর, ঐ গোমরা-মুখো প্যাঁচা, যে চোখের ব্যারাম আছে বলে চোখ বুজে বিচার করে, আর শাম্‌লা মাথায় শেয়াল আর কুমীর, আর চার আনা দামের সাক্ষী হিজিবিজবিজ, আর অনাহূত রিপোর্টার কাক্কেশ্বর — যার রিপোর্টে ঘটনা আর কথাবার্তাগুলো সব উল্টোপাল্টা তছ্‌নছ্‌ হয়ে যায়, এরা যে একেবারেই অপরিচিত, এমন মনে হয় না। তা যদি হোত, তাহলে অত সহজে "ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজো-মামার মতো" হয়ে যেত কিনা সন্দেহ।

'পাগলা দাশু' ও 'বহুরূপী'তে সংগৃহীত ছোটগল্পগুলিও ছোটদের মনস্তত্ত্বমূলক কৌতুককাহিনী হিসাবে সম্পূর্ণ তুলনাহীন। অনেকেই এ-গল্পগুলির অনুকরণে ছোটদের গল্প লিখেছেন। কিন্তু 'পাগলা দাশু'র অনুরূপ আর একটি অতুলনীয় কিশোর-চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর কেউই উপস্থিত করতে পারেন নি। এই খ্যাপাটে ছেলেটির কৌতুক-বোধ যে কী অদ্ভুত ধরণের তা, যাঁরা এর কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত

না হয়েছেন, তাঁরা ধারণাই করতে পারবেন না। দাশুর কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে তার বন্ধুদের মতো আমাদেরও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, "আচ্ছা, দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে ?"

কিশোর-মনস্তত্ব ও তাদের দুষ্টুমি-উদ্ভাবনী প্রতিভা নিয়ে উপন্যাস লিখে হাস্যরসিক মার্ক টোয়েন পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। বৈচিত্র্য ও পরিসরে *Tom Sawyer* এবং *Huckleberry Finn* এর সঙ্গে তুলনীয় না হলেও স্বল্প-পরিসরে কিশোর-মনস্তত্ব বিশ্লেষণে সুকুমার রায়ও কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। বালকদের কৌতুকজনক দুরন্তপনার বর্ণনা দিতেও তাঁর কুশলতা কম ছিল না। পরিমাণে অল্প হলেও সুকুমার রায়ের কিশোর-কাহিনীগুলির হাসি অতুলনীয়। এ-ধরণের রচনাতেও সুকুমার রায় শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আসলে কবি। ছড়া-কবিতার মধ্য দিয়েই তিনি সবচেয়ে সহজে ও শ্রেষ্ঠরূপে তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন।

গদ্য-পদ্য ছাড়া সুকুমার রায় কয়েকটি কৌতুকনাট্যও লিখেছিলেন। এর মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা' প্রথম জীবনে রচিত। এদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। পরবর্তী কালের 'অবাক জলপান'ও ছোটদের জন্য লিখিত এবং 'সন্দেশে'ই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এ নাটিকাটিতে মানবচরিত্রের যে ব্যঙ্গ-রূপায়ণ ও তজ্জনিত উদ্বেল ও উজ্জ্বল হাসি পরিবেশন করা হয়েছে, তা সকল বয়সের সকল প্রকার পাঠকেরই একান্ত উপভোগ্য। তৃষ্ণার্ত পথিকের সামান্য জল খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হোল এবং প্রায় ট্র্যাজেডির কাছাকাছি গিয়ে পৌছুল, তার কারণ জগতের প্রত্যেক মানুষেরই জগত — সকল চিন্তা, বোধ ও কল্পনা — তার নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিতে আবদ্ধ। কাঁচা আমের ফেরিওয়ালার জগৎ বিক্রয়যোগ্য ফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই 'জল পাই কোথায় ?' এই প্রশ্নে জলপাই নামক ফলটির কথাই তার মনে পড়ে। কবি জল শব্দটিকে কবিতার মিলের দিক থেকেই বিচার করে। দ্বন্দ্বপরায়ণ ও স্মৃতিকণ্ডূয়নরত বাক্যবাগীশ বুড়োরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জল সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য ও বিবরণ উপস্থিত করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে,

আর গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক সামান্য জলকে জটিল বৈজ্ঞানিক ফর্মুলার রূপান্তরিত করাটাই বেশি জরুরি বলে মনে করে থাকে। যার যার নিজস্ব ভাবনার গুরুত্বে সকলের কাছেই এই সহজ কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে যে, একটা লোকের জল তেষ্টা পেয়েছে, সে এক গ্লাস জল খেতে চায়। সংসারে অহরহই এরূপ ঘটে থাকে। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত বড়দের কৌতুকনাট্য 'চলচিত্তচঞ্চরী'তেও মানব-চরিত্র ও মানব-মনস্তত্ত্বের অতি সার্থক ও প্রবল হাস্যময় রূপায়ণ দেখা যায়। বাংলাদেশে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক দলের মধ্যে যে ঝগড়া-দলাদলি ও পারস্পরিক নিন্দা-আক্রমণের ধারা চলে এসেছে, পরবর্তীকালে 'দুই সিংহ' গল্পে রাজশেখর বসু যার ছবি এঁকেছিলেন, তার অতি অপূর্ব ব্যঙ্গরূপ 'চলচিত্তচঞ্চরী'তে দেখতে পাই। একদিকে চিন্তাশীল নেতা সত্যবাহন সমাদ্দার এবং কবি ও ভাবুক নেতা ঈশান বাচস্পতি, আর সাঙ্গ-পাঙ্গ সহ 'সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা'র পাণ্ডাগণ, অপরদিকে প্রতিযোগী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা শ্রীখণ্ড দেব এবং আশ্রমবাসী মাস্টার ও ছাত্রগণ পরস্পরের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এদিকে আবার তারা জিজ্ঞাসু লোক পেলেই নিজের নিজের দলে টানতে ব্যস্ত। এরা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে অতি অমায়িক ব্যবহার করে। যথা,

"জনার্দন। কই, তেমনত কিছুই বলা হয়নি — খালি স্বার্থপর মর্কট বলা হয়েছিল। তা ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন তাতে ওরকম বলা কিছুই অন্যায় হয় নি।

সোমপ্রকাশ। আর যদি insult করেই থাকে তাতেই বা কি? তার জন্য কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন?"

এই দুই দলই হবু গ্রন্থকার, 'চলচিত্তচঞ্চরী' নামক ৮০০ পৃষ্ঠার বিরাট বইয়ের ভবিষ্যৎ-রচয়িতা জিজ্ঞাসু ভবদুলালকে দলে টানতে ব্যস্ত। 'চলচিত্তচঞ্চরী' বইটি অবশ্য এখনো লেখা আরম্ভ হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই হবু গ্রন্থকার আশ্রমে প্রতিষ্ঠানে ক্যানভাসিং শুরু করেছে।

"ভব। আমার "চলচিত্তচঞ্চরী" বইখানা আপনাদের লাইব্রেরীতে

রাখেন না কেন ?

শ্রীখণ্ড। বেশ ত, দিন না এক কপি।

ভব। আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনো বেরোয় নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কি না ; অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন ত ?

শ্রীখণ্ড। ও, এখনো ছাপতে দেন নি বুঝি ?

ভব। না, এই লেখা হলেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখ্‌তে হবে ত ? সেটা কি রকম লিখ্‌ব তাই ভাবছি। খুব বড় বই হবে কিনা !”

ভবদুলাল আশ্রমে-প্রতিষ্ঠানে যে-সব কথা শোনে, তা তার ভবিষ্যৎ গ্রন্থের প্রয়োজনে তার নোট বইতে টুকে রাখে। আশ্রমবাসীগণের কথা-বার্তা তার মুখে ও কলমে কী রূপ ধারণ করে, তার দু' একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়।

সাম্যসিদ্ধান্ত সভায় শ্রীখণ্ড দেবের আশ্রমের একটি ছাত্রকে পাকড়াও করে বলা নিম্নলিখিত কথাগুলি ভবদুলালের শ্রুতিগোচর হয়েছে।

“ঈশান। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে ক'রে চন্দ্রসূর্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে ?”

এই কথা ক'টি শোনবার পর অন্য এক প্রসঙ্গে ভবদুলাল বলছে— “দেখুন তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এ যে তর্ক করে সব চালাচ্ছে, সে কি ভাল কাজ ক'রছে ?” সাম্য-সিদ্ধান্ত সভার ‘সমীক্ষাচক্র’ ভবদুলালের মুখে ‘মক্ষিকাচক্রে’ পরিণত হয়েছে। আর এই দুই সভা ও আশ্রমে সে যা দেখেছে শুনেছে, তা ভবদুলালের নোট বইতে এই রূপ ধারণ করেছে—

“ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে — লাটাই পাকাচ্ছে — আর ঈশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ করে কামড়ে দিয়েছে — চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠ্‌ছে আর পড়ছে — সব ঝাপসা দেখছে—গা ঝিম ঝিম — Nux Vomica 30—” এই অপরূপ শ্রুতলিপির সমর্থনে ভবদুলাল বলছে—“বাঃ, ও গুলো ত আপনাদেরই কথা। শুধু Nux

Vomica-টা আমার লেখা।"

'বিচিত্রা'র প্রথম বর্ষে সুকুমার রায়ের অপ্রকাশিত দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। ভাদ্র সংখ্যায় অসমাপ্ত 'বর্ণমালাতত্ত্ব' প্রকাশের সময় বিচিত্রা সম্পাদক রচনাটির ভূমিকায় লিখেছিলেন, "তাঁহার "দৈবেন দেয়ম্", "ক্যাবলের পত্র", "ভাষার অত্যাচার" প্রভৃতি যে সমুদয় প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যদি কোন দিন তাহা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও সহজ সুন্দর লিখন-ভঙ্গীর একত্র সমাবেশ কত হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। অনাবিল হাস্যরস রচনায় তিনি যে কতদূর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য রহিয়াছে কয়েক বৎসর পূর্বে "প্রবাসী"তে প্রকাশিত "ভাবুক সভা" নামধেয় ক্ষুদ্র কৌতুক-নাট্যখানিতে ও তাঁহার অপ্রকাশিত "চলচিত্তচঞ্চরী" ও "শব্দকল্পদ্রুম" নাটিকাদ্বয়ে। এই দুইখানি নাটিকাই আমরা "বিচিত্রা"র পাঠকদিগকে উপহার দিতে ইচ্ছা রাখি"। 'বর্ণমালাতত্ত্ব' নামক রচনাটি ও প্রবন্ধগুলি সম্প্রতি 'বর্ণমালাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হলেও, তাঁর 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে কৌতুক-নাটিকাটি এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সুকুমার রায়ের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এখন এই দু'টি কৌতুকনাট্য বই হয়ে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন মনে করি।

সুকুমার রায়ের সমসাময়িক 'ভারতী'গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি অবনীন্দ্রনাথের জামাতা এবং শেষের দিকে ইনিই 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। 'কান্তিক প্রেস' নামে সুকিয়া ষ্ট্রীটে এর একটি ছাপাখানা ছিল এবং এ বাড়িরই উপর তলায় 'ভারতী'র বৈঠক বা আসর বসতো। এই আসরের প্রাণস্বরূপ ছিলেন মণিলাল। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় 'মণিলালের আসর' নামে প্রবন্ধে এ বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মণিলালের কাব্যধর্মী গল্প এবং ভূতের গল্পগুলির কবিত্ব ও কল্পনায় অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইনি 'মুক্তার মুক্তি' নামে গীতিধর্মী একখানি নাটক লিখেছিলেন, 'ভাগ্যচক্র'

নামে Louis Couperusএর একটি উপন্যাস এবং 'কাদম্বরী' অনুবাদ করেছিলেন ; তা ছাড়া ছোটদের জন্য কতকগুলি জাপানী গল্প অনুবাদ ক'রে 'জাপানী ফানুস', 'কল্পকথা' ও 'ঝুম্‌ঝুমি' নামে প্রকাশ করেছিলেন। এসব বইয়ের ছড়াগুলি লিখে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। মণিলাল 'খেয়ালের খেসারৎ', 'মহুয়া', 'পাপড়ি', জলছবি', 'আলপনা', ঝাঁপি', 'ভুতুড়ে কাণ্ড' ইত্যাদি অনেকগুলি গল্পের বই লিখেছিলেন। এঁর ভূতের গল্পগুলি বেশ মজার। এঁর কৌতুকরসাত্মক গল্পের মধ্যে 'দুই খাতা', 'হুকার জন্ম', 'উপদেশের তাড়স' এবং 'ভূতগত ব্যাপার' প্রমুখ গল্পগুলির উল্লেখ করা যায়।

আটআনা সংস্করণ গ্রন্থমালায় 'নকল পাঞ্জাবী' নামে একখানি প্রবল হাস্যময় গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এ বইটির লেখক উপেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ও মৃত্যুকাল জানা নেই। 'নকল পাঞ্জাবী' বইটি পরস্পর-সম্পৃক্ত কয়েকটি হাসির গল্পের সমষ্টি। এ বইটিতে লেখক ব্যঙ্গ ও অসূয়াবর্জিত হাস্যরসের সৃষ্টিতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুকুমার রায়ের দ্বিতীয় ভাই সুবিনয় রায়ের (১৮৯০-১৯৪৭) কথা আগে উল্লেখ করেছি। ইনি ছোটদের জন্য মজাদার গল্প-কবিতা সবই লিখতেন। 'রকমারি', 'কাড়াকাড়ি' প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প-কবিতা-ধাঁধার বই ইনি লিখেছিলেন। সেগুলি এখন প্রায় সবই দুষ্প্রাপ্য।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩৫) ছোটগল্প লিখে নাম করেন। কিন্তু আগে তিনি কবিতাও লিখতেন এবং 'সিন্ধুসরিৎ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এঁর গল্পের বই 'বাস্তবিকা', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' ও 'থার্ড ক্লাস' প্রকাশিত হবার পরই ইনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পর 'উদাসীর মাঠ' 'পরাজয়' ও 'নিরঞ্জন' নামে গল্পগ্রন্থগুলি ছাড়া 'দিবাকরী' নামে একটি ব্যঙ্গরচনার সংকলন, 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নাটক এবং 'মায়া বাঁশী' নামে একটি ছোটদের গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইনি 'শনিবারের চিঠি'তে 'দিবাকর শর্মা' ছদ্মনামে ব্যঙ্গরচনা লিখতেন, এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ তৎকালীন অতি-আধুনিক সাহিত্য ও সর্বপ্রকার 'আধুনিকতা'। এ-রচনাগুলিই সংগৃহীত হয়ে 'দিবাকরী' নামে প্রকাশিত

হয়। হাস্যরসাত্মক রচনায় এঁর প্রকৃত কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে এঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত প্রহসন 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এ। বেকার-সমস্যার ফলে প্রয়োজনের খাতিরে যে সব ছোটখাট প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়, তাকে কেন্দ্র ক'রে এ-নাটকটিতে প্রচুর কৌতুক জমে উঠেছে। এ-রচনাটির নাটকীয় গুণও উল্লেখযোগ্য। মঞ্চে ও ছায়াচিত্রে এটি প্রচুর সার্থকতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ছোটদের জন্য মজার মজার ছড়া-গল্প লিখে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭)। ইনি সুকুমার রায়ের অনুকরণে ও অনুসরণেই ছোটদের ছড়া গল্প লিখতে শুরু করেন—এবং এই দু'জাতীয় রচনাতেই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইনি অনেকগুলি ছোট-দের বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'ছন্দ-ঝুমঝুমি', 'ছন্দের টুং টাং', 'হাসির দেশে', 'হেস্তনেস্ত', 'রঙিন হাসি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁর মৃত্যুর পর 'সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে এঁর নির্বাচিত কবিতার একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

ছোটদের গল্পলেখক হিসাবে প্রচুর কৃতিত্ব ও প্রচুরতর সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৪-১৯৩৯)। ছোটদের জন্য ইনি দু'খানি উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা-কাহিনী লিখেছিলেন—'সোনার হরিণ' ও 'পদ্মরাগ'। এঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা বাংলা-প্রবাসী জাপানী 'হুকাকাশি' আমাদের সাহিত্যের কাল্পনিক গোয়েন্দাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানের দাবি করতে পারে। ইনি হুকাকাশির গোয়েন্দাগিরি নিয়ে কয়েকটি ছোট গল্পও লিখে-ছিলেন; এগুলি 'হুকাকাশির গল্প' নামে প্রকাশিত হয়। গোয়েন্দা-কাহিনী ছাড়া ইনি প্রকৃত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন হাসির গল্পে। 'নূতন পুরাণ', 'হাস্য ও রহস্য' ও 'চায়ের ধোঁয়া' এঁর হাসির গল্পের বই। 'নূতন পুরাণে' পুরাণের গল্প ঢেলে সাজা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি অধ্যাপক ছিলেন এবং 'রামধনু' নামক ছোটদের পত্রিকাটি সম্পাদন করতেন। এঁর কনিষ্ঠ ভাই ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণও ছোটদের গল্পরচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন।

এ-ভিন্ন এ-যুগে ব্যঙ্গাত্মক বা হাস্যরসাত্মক রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়ে-ছেন তাঁরা সকলেই জীবিত, এবং অনেকেই এখনো এ জাতীয় রচনা লিখে

চলেছেন। তাঁদের রচনা বা কৃতিত্বের আলোচনার এখন যথার্থ সময় নয়, এবং সেরূপ আলোচনা সঙ্গত বলেও মনে করি না। তবু এখানে তাঁদের উল্লেখ বা সামান্য পরিচয় না দিলে এ-গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকবে। আমরা আপাতত সেরূপ করেই বিরত হলাম। আশা করা যায় ভবিষ্যতে যথা-সময়ে কোনো যোগ্য সমালোচক এঁদের রচনার মূল্যনিরূপণে অগ্রসর হবেন।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রবীন্দ্র-যুগে বা রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসে যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখা গেছে, ইতিপূর্বে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এ যুগে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটেছে, হাস্যরসও তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেই চলেছে। বলা বাহুল্য, এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির যতই বিকাশ ঘটে, হাস্যরসের চাহিদা ততই বেড়ে চলে, এবং তা পরিবেশন ও উপভোগ করবার মতো পরিবেশও সৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ এযুগে রাজশেখর বসু, সুকুমার রায় প্রমুখ অসাধারণ প্রতিভাশালী কয়েকজন হাস্যরসিক লেখকের উদ্ভব হওয়ায় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক রচনার মান উন্নত হয়েছে এবং এ-কালে প্রায় সকল লেখকই তাঁদের রচনায় অল্পবিস্তর কৌতুকের অবতারণা করতে অগ্রসর হয়েছেন।

জীবিত লেখকের এমন দু'একজন আছেন, যাঁরা এককালে অনেক হাসির রচনা লিখেছেন, কিন্তু বেশ কিছুকাল হ'ল তাঁরা এ-জাতীয় লেখা ত্যাগ করেছেন। হাসির লেখক হিসাবে এঁদের নাম এখন বিস্মৃতপ্রায়। এঁদের রচনার কিছু বিস্তৃততর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

যতীন্দ্রকুমার সেন (১৮৮২) চিত্রশিল্পীরূপে সুবিখ্যাত। পরশুরামের রচনার সঙ্গে ছবিতে ইনি যে সঙ্গত করেছিলেন, তাতেই এঁর হাস্যরস-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'চলচিত্তচঞ্চরী'র ছবি-গুলিও ইনিই এঁকেছিলেন।

হাসির ছড়া গল্প ইত্যাদি ইনি আগে প্রায় নিয়মিত ভাবেই লিখতেন। 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ইনি কার্টুন ছবি আঁকতেন, এবং তার নিচে দু' চার লাইন ছড়াও লিখে দিতেন। যেমন, টেবিলে বসা জাঁদরেল চেহারার

মহিলার এক ছবি এঁকে তার নিচে লিখেছিলেন,

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদী পিসী
তার under-এ কলম পিষি॥"

বলা বাহুল্য, তখনো বাঙালী মেয়েদের আপিসে-কারখানায় চাকরি করা শুরু হয় নি। 'মানসী ও মর্মবাণী'র একাদশ বর্ষে (১৩২৫) ইনি 'হাঁচি' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। লেখক কর্তৃক বহুচিত্রে শোভিত এই রঙ্গ-কবিতাটির কিছু পরিচয় দেওয়া গেল।

"যত রকম বাধা আছে সংসারেতে ভাই,
হাঁচির কাছে দাঁড়াবার সাধ্য কারুর নাই।
টিক্‌টিকি বা পেছু ডাক, খালি ঘড়া ঘটি,
যাত্রাকালে ডাইনে মড়া, উল্টে থাকা চটি,
কটা নেউল, মাকুন্দে, বা দ্বারে পাওনাদার,
নাপ্‌তে, ধোপা, হিজড়ে, কলু, শূন্য শবাধার,—
বসন যদি বেঁধে যায়, হোঁচট, 'বিষম' লাগে,
প্রিয়া কেঁদে একটি আঁখি দেখায় অনুরাগে
হাঁচির সঙ্গে এ সকলের তুলনাই নাই।
যাত্রাকালে 'পড়ে' যদি মেনে চলো ভাই।"

হাঁচি না মানলে কি দুর্দৈব ঘটতে পারে, তার তালিকায় আছে,—

"নাহি যদি মান,—পথে কলার খোসায়, দাদা,
পা পিছলে আছাড় খেয়ে মাখতে হবে কাদা!…
ইষ্টিশানে পঁহুছিতেই ছেড়ে যাবে গাড়ী,
মোট প্যাটরা ঘাড়ে করে আসবে ফিরে বাড়ী।
বিয়ের বেলা টাকা নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যাবে,
ঐ কলঙ্কের ফলে আর পাত্রী নাহি পাবে।"…

এই দীর্ঘ কবিতাটির শেষাংশে কোন্ প্রকারের হাঁচির ফল কিরূপ, তা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা

"অবশেষে একটা কথা শুনিয়ে চলে যাই,
কোন্ হাঁচিটা অলক্ষণে জেনে রেখো ভাই,—

যা' নাকে কাঠি, নস্য দিলে, সর্দি হলে হয়,
একসঙ্গে গোটা দশেক, সেসব কিছু নয়।
পড়তে যেটা বেধে যায়, আটকে থাকে নাকে,
ওটা নেহাৎ ভালো নয়, সামলে চলো তাকে।
যেটা পড়ে অকারণে শব্দ করে'—ফ্যাঁচ্‌
ওটা বড়ই সর্বনেশে গ্রহফেরের প্যাঁচ!
ঐ হাঁচিটার তুলনায় অন্য কিছু নাই,
যাত্রাকালে 'পড়ে' যদি মেনে চলো ভাই।"

'মানসী ও মর্মবাণী'র ঐ বৎসরেই 'কামিনী-কুন্তল' নামে একটি চিত্রাঙ্কিত প্রবন্ধে যতীন্দ্রকুমার বহু চিত্রের মধ্য দিয়ে মেয়েদের চুল বাঁধার বিবিধ ফ্যাশানের ক্রম-পরিণতি দেখিয়েছিলেন, এবং 'পাতা কাটা' ও 'অ্যালবার্ট' ফ্যাশানের কল্পিত ভয়াবহ ভবিষ্যৎও উপস্থিত করেছিলেন। যতীন্দ্রকুমারের 'কেরাণীর প্রেম' নামে আর একটি সচিত্র রঙ্গ-কবিতাও 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। ইনি স্বচিত্রিত কৌতুকরসাশ্রিত গল্পও লিখেছিলেন। এঁর 'দুরাকাঙ্ক্ষা' গল্পটি ১৩২৭-এর 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিই বোধহয় যতীন্দ্রকুমারের শেষ প্রকাশিত কৌতুকরচনা। এর অল্পকাল পরেই রাজশেখর বসু সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। সম্ভবতঃ কৌতুকরচনায় বন্ধুর মহত্তর শক্তির পরিচয় পাবার পর যতীন্দ্রকুমার এ-জাতীয় রচনায় বিরত হয়েছিলেন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকার প্রথম বছর থেকেই শ্রীকপিঞ্জল বি. এ. ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন। এঁর রচনায় খুব যে একটা শক্তির পরিচয় ছিল তা নয়। কিন্তু এ-জাতীয় রচনা তিনি অনেক লিখেছিলেন। ইনি কে, এখনো জীবিত কিনা, তা এই গ্রন্থকারের জানা নেই।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪) 'ভারতী'র একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি প্রথমে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং পরে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগীরূপে কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ইনি অনেকগুলি ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসাশ্রিত নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'দশচক্র', 'রুমেলা', 'হাতের পাঁচ', 'শেষবেশ', 'পঞ্চশর', 'লাখ টাকা'

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ভিন্ন ইনি মলিয়ের অবলম্বনে 'যৎকিঞ্চিৎ' নামে একখানি প্রহসন লিখেছিলেন এবং প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান্ জামাতা' গল্পটিকে 'গ্রহের ফের' নামে প্রহসনে রূপান্তরিত করেছিলেন।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬) একাধারে সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি ডাক্তার। ইনি অজস্র ব্যঙ্গকবিতা লিখেছেন এবং সেগুলিকে স্বহস্তে চিত্রিত করেছেন। কৌতুক চিত্রাঙ্কনে এঁর বিশেষ দক্ষতা আছে। ইনি প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষে' লিখতেন এবং এঁর কৌতুকচিত্রগুলি এঁর রচনা সম্বলিত হয়েই সাধারণতঃ প্রকাশিত হোত। লেখা ছাড়া শুধু কার্টুন চিত্র হিসাবেও এঁর কয়েকটি ছবি ছাপা হয়েছিল।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় 'দশচক্র' নামে একটি নাটক ও 'যোগভ্রষ্ট' নামে একখানি উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু এঁর কৌতুক কবিতাগুলি — যার মধ্যে এঁর রচনাশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে বলে মনে করি — এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সেগুলি এঁর আকা ছবি সহ কোনো প্রকাশক এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে অগ্রসর হলে বাংলা সাহিত্য উপকৃত হবে।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, মাস্টার, রাঁধুনী বামুন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাঙালী সমাজের বিবিধ চরিত্রকে কৌতুকময় ছবি ও পদ্যে রূপায়িত করেছিলেন। দু' একটি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

"ডেপুটীবাবু

"রমেশ করেছে দেশলাই চুরি।"
লিখে নিই ওটা রও দেখি।
"রমেশ করেনি দেশ্‌লাই চুরি কখ্‌খনো"
ভাল তাও লিখি।
উকীল শুধায় —"তোম মারা হ্যায়?"
আসামী কহিছে "হাম্ নহি।"
ডাক্তার বলে "মেরেছে বৈ কি।"
সার্টিফিকেটে নাম সহি।
সকলের কথা আমি টুকে মরি,

লেখা এভিডেন্স নিই টুকে,
সকলের কথা শেষ হয় যবে
তখনও লিখি হেঁটমুখে।”

‘বামুন ঠাকুর’ নামে আর একটি কবিতা থেকে একটু উদ্ধৃত করি।

“আমি হোটেলে, টেবিলে, সাহেবের সাথে
খাইনি কারি ও ভাত,
আমি ধর্ম রেখেছি অক্ষত,
আমি অটুট রেখেছি জাত।
ক্রমে ভারত-শুদ্ধ একঘরে হবে,
সকলেই জানে সেটা।
শুধু আমি টি্ঁকে রব হিন্দু সমাজে
আমারে তাড়ায় কেটা?”

প্যারডি রচনাতেও এই কবির বিশেষ দক্ষতা আছে। ‘বঙ্গবাণী’ পত্রিকায় প্রকাশিত এঁর ‘মদনভস্মের পর’ প্যারডিটির একটু পরিচয় দেওয়া গেল।

“কিশোর সেই দেবতাটিরে নিমেষে করি ভস্মরাশ
না জানি প্রভু মোদের কোন কসুরে,—
লেলিয়ে দিলে বাংলাদেশে, মূর্ত মহা সর্বনাশ—
ঘটকবেশী এ কোন বুড়ো অসুরে!···
পঞ্চশরে দগ্ধ ক’রে ভুল করেছ সন্ন্যাসী,
ঘটকরূপে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
বেহাই ভূতের কৃষ্ণছায়া বিশ্বে দেছ বিন্যাসি,
দিয়েছ শুধু বিয়ের দর চড়ায়ে।”

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় কৌতুকচিত্র ও স্বল্প গদ্য মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসকে ‘ঢেলে’ সেজেছিলেন। বিশেষতঃ ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসটি ও ব্রজেশ্বর চরিত্র বনবিহারী বাবুর ‘ঢেলে সাজা’র ফলে যেভাবে উপস্থিত হয়েছিল, তা একান্ত উপভোগ্য। ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত এঁর স্বচিত্রাঙ্কিত ‘ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—’

কবিতাটিও ব্যঙ্গ-রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। চার স্তবকে সম্পূর্ণ এই কবিতাটি থেকে প্রথম ও চতুর্থ স্তবক উদ্ধৃত করছি।

"আরে ছ্যাঃ! হারু চাষ করে!
Civilisation হ'তে বহুদূরে,
Village-এ আবাদে বাস করে।
আপনার হাতে জল, কাদা, মাটি ঘাঁটে সে,
কাদা ও কিচড়ে সদা খালি পায়ে হাঁটে সে,
বলদের সাথে দিবস কাটায় মাঠে সে,
ধিক!— তারে ধিক!
অমার্জ্য তা'র আচার ব্যাভার।
অনার্য তার চারিদিক!…
হারু সন্ন্যাসী! বেশ ত, বাঃ!
কামনা না যাক, কামানো ঘুচেছে
বেড়ে চলে দাড়ি কেশ,—তোফাঃ!
কিচ্ছু না ক'রে বচ্ছর-ভোর খেতে চান,
বাণী না খসায়ে জ্ঞানীর আসন পেতে চান,
বিনা খরচায়, গাঁজা-চর্চায় মেতে যান,
আহা! নম' তায়।
পলাতক ইনি ছাড়ি সুতজায়া,
ছাড়ি যত মায়া মমতায়।"

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০) 'ভারতী' গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট গল্পলেখক। ইনি 'বাজীকর', 'ঝড়ের পাখী', 'দুই রাত্রি', 'অরুণা', 'অচল পথের যাত্রী', 'চাষার মেয়ে', প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পের বই লিখেছেন। ইনি 'মহাস্থবির জাতক' নামে স্মৃতিকাহিনী লিখে মহাস্থবির নামে পরিচিত হয়েছেন। এঁর রচনারীতি বহুলভাবে ব্যঙ্গমিশ্রিত। ইনি কতকগুলি ব্যঙ্গ-গল্পও রচনা করেছেন।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৮৯০) 'সীরিয়াস' কবিতাই বেশি লিখেছেন, কবি হিসাবে ইনি সুপরিচিত। ইনি হাসির কবিতাও অনেক

লিখেছিলেন এবং 'হাসির হল্লা' নামে এঁর একখানি হাসির কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 'প্রবাসী' 'Modern Review' সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১) অল্পই লিখেছেন। তাঁর প্রচুর কৌতুক-বোধ প্রকাশিত হয়েছে 'জগন্নাথ পণ্ডিত' এই ছদ্মনামে লিখিত ছোটদের গল্পগুলিতে। সম্প্রতি 'জগন্নাথের খেয়ালখাতা' নামে এই গল্পগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে।

সুকুমার রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবিমল রায় (১৮৯৭) 'সন্দেশ' 'মৌচাক' প্রভৃতি পত্রিকায় এককালে ভারি মজার মজার গল্প লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয় এগুলি গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয় নি বলে লেখক হিসাবে লোকে তাঁর নাম ভুলে গেছে। এই গল্পগুলি প্রকাশিত হলে বাঙালী পাঠক এঁর প্রতিভার পরিচয় পাবেন।

তৎকালীন অতি-আধুনিক সাহিত্যিক গোষ্ঠীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ১৯২৪ সালে 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয়। যতদূর মনে পড়ে, পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন যোগানন্দ দাস। অবশ্য সজনীকান্ত দাসই এর প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রধান লেখক ছিলেন। পরে পত্রিকাখানি মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটি আশ্রয় করে একদল ব্যঙ্গরচয়িতার উদ্ভব হয়। এই দলের মধ্যে রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায়ের পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, বলাইচাঁদ মুখো-পাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি ছিলেন।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯) অনেককাল 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কিছুদিন পত্রিকাটি সম্পাদনাও করেছিলেন। ইনি প্রধানতঃই কৌতুক ও ব্যঙ্গাশ্রিত গল্প-নাটক লিখেছেন। এঁর 'বুদ্বুদ', 'ট্রামের সেই লোকটি', 'ব্ল্যাক মার্কেট', 'মারকে লেঙ্গে', প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে ও 'দুষ্মন্তের বিচার' ও 'ঘুঘু' নাটকদ্বয়ে তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী' নামে একটি ব্যঙ্গরচনার সংকলন সম্পাদন করেছেন।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা 'বনফুল' (১৮৯৯) একজন সুবিখ্যাত

ঔপন্যাসিক। ইনিও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি ব্যঙ্গ কবিতা অনেক লিখেছেন। কিছুকাল হয় সেগুলি 'বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। প্রথম জীবনে ইনি কবিতা লিখতেন, এগুলি 'বনফুলের কবিতা' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। পরে ইনি গল্প-উপন্যাসেই বেশি মনোযোগ দেন। এঁর গ্রন্থসংখ্যা বহু। তার মধ্যে 'বনফুলের গল্প', 'বাহুল্য', 'বিন্দুবিসর্গ', 'তৃণখণ্ড', 'দ্বৈরথ', 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'ডানা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯) প্রবাসী সাহিত্যিক। ইনি কয়েকখানি উপন্যাস ও বহু গল্প লিখেছেন। ছোট গল্পেই এঁর বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে। এঁর 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ', 'রাণুর তৃতীয় ভাগ', 'রাণুর কথামালা', 'কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার', 'বরযাত্রী' প্রভৃতি বই সুপরিচিত। কৌতুকাশ্রিত গল্পরচনায় এঁর বিশেষ প্রবণতা ও নিপুণতা আছে। এঁর 'বরযাত্রী' এ-বিষয়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। 'গণশার বিয়ে' নামে বিভূতিবাবু এ গল্পটি নাট্যাকারে রূপান্তরিত করেছেন এবং এটি রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াচিত্রে সাফল্য লাভ করেছে। এঁর আর একখানি নাটকের নাম 'বিশেষ রজনী'।

'শনিবারের চিঠি'র প্রধান লেখক ও পরিচালক সজনীকান্ত দাস (১৯০০) ঐ পত্রিকাকে আশ্রয় ক'রে সমসাময়িক লোকদের ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। নিজদল বহির্ভূত সমসাময়িক প্রায় সকল লেখকই অল্প-বিস্তর এঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত এঁর ব্যঙ্গ রচনাগুলি 'অঙ্গুষ্ঠ', 'মধু ও হুল', 'বঙ্গরণভূমে' 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল' প্রভৃতি গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। সমসাময়িক লেখকদের প্যারডি রচনায় ইনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' এঁর গদ্যপদ্য-মিশ্রিত লঘুরচনার বই। ইনি কিছু সীরিয়াস্ রচনাও লিখেছেন। 'রাজহংস' এঁর এ-জাতীয় কাব্যগ্রন্থ। বাংলাসাহিত্য বিষয়ে তিনি গবেষণা এবং আলোচনা গ্রন্থও কয়েকটি লিখেছেন।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১) কবিতা গল্প সমালোচনা সবই প্রচুর লিখেছেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনা ইনি প্রধানতঃ প্র-না-বি নামেই লিখেছেন। 'দেয়ালি',

'বসন্তসেনা', 'প্রাচীন আসামী হইতে', 'বিদ্যা-সুন্দর', 'প্রাচীন গীতিকা হইতে', 'হংসমিথুন', 'অকুন্তলা', 'যুক্তবেণী' এবং 'উত্তরমেঘ' এঁর কাব্য-গ্রন্থ। কয়েকটি ছোটগল্পেও এঁর কৌতুকপ্রবণতার পরিচয় আছে। ইনি কতকগুলি সরস প্রবন্ধও লিখেছেন। তা ছাড়া, 'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'মৌচাকে ঢিল', 'পরিহাস বিজল্পিতম্' প্রভৃতি কতকগুলি প্রহসনও ইনি লিখেছেন। এঁর ব্যঙ্গ সাহিত্য ও রাজনীতি উভয়দিকেই পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে ইনি 'কমলাকান্ত' ছদ্মনামের অন্তরালে থেকে দৈনিক পত্রিকায় ব্যঙ্গরচনার 'আসর' পরিচালনা করেন। ইনি অনেকগুলি সমালোচনাগ্রন্থও লিখেছেন। প্রাবন্ধিক ও সমালোচকরূপে এঁর খ্যাতি অতি বিস্তৃত।

অয়স্কান্ত বক্সী (১৯০১) রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য কয়েকখানি নাটক-প্রহসন রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'ডাক্তার মিস্ কুমুদ', 'অভিসারিকা', 'রিহার্স্যাল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁর প্রহসন 'ডাক্তার মিস্ কুমুদ' এক-সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪) কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচকরূপে সুবিখ্যাত। এঁর কাব্যগ্রন্থ 'রাখী', 'বসন্ত', 'কালের শাসন', 'কামনা-পঞ্চবিংশতি' ও 'নূতনা রাধা'। ইনি বহু গল্প-উপন্যাসের বই লিখেছেন; তার মধ্যে 'মনপবন', 'যৌবনজ্বালা', 'কামিনীকাঞ্চন', 'যার যেথা দেশ', 'অজ্ঞাতবাস', 'কলঙ্কবতী', 'দুঃখমোচন', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'পুতুল নিয়ে খেলা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'তারুণ্য', 'আমরা', 'জীবনশিল্পী', 'দেশকালপাত্র', 'প্রত্যয়' প্রভৃতি, এবং ভ্রমণ বিবরণ 'পথে-প্রবাসে'র নাম সুপরিচিত। কিছুকাল থেকে ইনি ছড়া রচনায় হাত দিয়েছেন এবং এঁর দুখানি ছড়ার বই, 'উড়কি ধানের মুড়কি' ও 'রাঙা ধানের খৈ' প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছড়াগুলি বাহ্যতঃ ছোটদের জন্য লেখা হলেও, এর অনেকগুলি তীব্র ব্যঙ্গাত্মক, এবং সে-ব্যঙ্গ প্রায়শঃই রাজনৈতিক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪) কবি, গল্পলেখক ও উপন্যাসিক রূপে সুবিখ্যাত। ইনি প্রধানতঃ কৌতুককাহিনীর রচয়িতা না হলেও সম্প্রতি

'ঘনাদা' নামক কাল্পনিক এক গাল্পিক চরিত্র সৃষ্টি করে ইনি তার জবানীতে অনেকগুলি tall tale বা আজগুবি গল্প পরিবেশন করেছেন। এগুলি Lord Dunsanyর Jorkens কথিত গল্পগুলির অনুরূপ। ছোটদের জন্য মজার মজার গল্পও ইনি অনেকগুলি লিখেছেন।

'দেশে বিদেশে', 'চাচাকাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', প্রভৃতির জনপ্রিয় গ্রন্থকার সৈয়দ মুজ্‌তবা আলির (১৯০৪) নাম কৌতুকাশ্রিত লঘু নিবন্ধ রচনার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁর গল্পগুলিও কৌতুকে ও লঘুস্বাচ্ছন্দ্যে পরম উপভোগ্য।

প্রচুর কৌতুকাশ্রিত ছড়া রচনায় প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪) বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁর 'তিন্তিড়ী' ছোটদের ছড়ার বই হলেও কৌতুকরসে উপভোগ্য। এঁর অন্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'মুক্তিপথে'।

শিবরাম চক্রবর্তীর (১৯০৫) রচনা ব্যঙ্গবর্জিত কৌতুকে ওতপ্রোত। ইনি প্রথমে কবি এবং প্রাবন্ধিক ও সমালোচকরূপে সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। এঁর সীরিয়াস রচনা 'মানুষ' ও 'চুম্বন'কাব্যগ্রন্থে এবং একটি প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ইনি প্রধানতঃ ছোটদের গল্পই লেখেন, কিন্তু বড়দের গল্পেও ইনি হাত দিয়েছেন। ইনি কৌতুকজনক প্রবন্ধও কয়েকটি রচনা করেছেন। এঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য অসাধারণ pun-প্রবণতা ও pun-কুশলতা। Pun জিনিসটি বস্তুতঃ এক প্রকার উইট্‌। অনেকে এটিকে নিম্নশ্রেণীর উইট্‌-এর মধ্যে গণ্য করেন। তার কারণ, বোধহয়, উইট্‌-এর এই শাখাটিকে দুর্বল লেখক সহজ মনে করে প্রায়ই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক অধ্যাপক ষ্টীফেন লীকক্‌ তাঁর *Humour and Humanity* গ্রন্থে Pun-এর সমর্থনে বলেছেন, "Very often a pun has a much higher saving grace than mere ingenuity. It carries with it a further meaning. It becomes a subtle way of saying something with much greater point than plain matter of fact statement. Indeed it often enables to say with delicacy things which would never do if said outright." শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থসংখ্যা বহু। এখানে সেগুলির নাম

উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

কৌতুকাশ্রিত রম্যরচনা বা লঘুনিবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬)। ইনি 'সংক্রান্তি', 'সঞ্চারী', 'চন্দ্রকলা', 'সম্ভবা' নামে কয়েকখানি কবিতার বইও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এঁর কৌতুকময় রচনাভঙ্গি ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে। এঁর এ-জাতীয় নিবন্ধপুস্তক 'ব্যক্তিগত', 'নিমন্ত্রণ', 'মাঝারি', 'বিপ্রমুখের কথা' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৬) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি ছোটদের জন্য অনেকগুলি কৌতুকরসাশ্রিত গল্প রচনা করেছিলেন। এঁর 'বলি ত' হাস্‌ব না' এবং 'হাল্কা হাসির খাতা' নামে হাসির গল্পের বই দুখানি এখন দুষ্প্রাপ্য।

সুনীলচন্দ্র সরকার (১৯০৭) ছোটদের জন্য লিখিত তাঁর অসাধারণ কৌতুকোপন্যাস 'কালোর বই'র জন্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইনি কবিতার বইও লিখেছেন।

সুকুমার রায়ের কাকা 'বনের খবর' রচয়িতা প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা লীলা মজুমদার (১৯০৮) গল্পলেখিকা ও ঔপন্যাসিকরূপে খ্যাতনাম্নী। এঁর 'মণি-কুন্তলা', 'শ্রীমতী', 'জোনাকি', 'চীনে লণ্ঠন' প্রভৃতি বই সুপরিচিত। ছোটদের জন্য মজার গল্প ইনি অনেক লিখেছেন। সে গল্পগুলি প্রচুর হাস্যরসাত্মক ও শিশুমনস্তত্ত্বমূলক। এ-সব গল্পে তাঁর উপর সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এঁর এ জাতীয় বই 'বদ্যিনাথের বড়ি', 'দিন-দুপুরে' ও 'পদীপিসীর বর্মীবাক্স'।

সুবোধ বসু (১৯০৮) ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকরূপেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর গল্পের বই —'বিগত বসন্ত', 'গল্পলতা' ; উপন্যাস — 'নবমেঘদূত', 'পদ্মা প্রমত্তা নদী', 'মানবের শত্রু নারী', 'পাখীর বাসা' ইত্যাদি। ইনি 'অতিথি' ও 'কলেবর' নামে দু'খানি নাটক রচনা করেছেন। 'মানবের শত্রু নারী' প্রভৃতিতে এঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের (১৯০৮) রচনা প্রায় সবই কৌতুকমিশ্রিত। ইনি

'ঝঞ্ঝা', 'বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট' ও 'মেস নং ৪৯' প্রভৃতি কয়েকখানি কৌতুকনাট্য এবং বিরূপাক্ষের নানাবিধ কৌতুককর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে কয়েকখানি গল্পের বই লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন।

রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লিখে বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯১০) সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছেন। ইনি একজন কৃতী অভিনেতাও বটেন। এঁর 'মাটির ঘর' মঞ্চে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে। এঁর 'তাই তো' প্রমুখ প্রহসনগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কৌতুকাশ্রিত গল্পরচনায় আর যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'সম্বুদ্ধ' বা অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত (১৯১১), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮) চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যে কৌতুকরচনার কেবল প্রাচুর্য ও উৎকর্ষ দেখা যায় নি, সাহিত্যপাঠকও হাস্যরসের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। এ-কালে আমাদের জীবন জটিল হয়েছে, দুঃখ-দুর্দশা-দুশ্চিন্তাও অনেক বেড়ে গেছে। এ-সময়ে শিক্ষার প্রসার ও তজ্জনিত পাঠকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং কৌতুকরসাশ্রিত রচনার প্রাচুর্য আমাদের জীবনের গুরুভার অনেক পরিমাণে লঘু ক'রে দিতে সমর্থ হয়েছে সন্দেহ নেই। এ-প্রসঙ্গে আমরা অ্যারিস্টোফেনিস্-এর উক্তি স্মরণ করতে পারি। এই প্রসিদ্ধ গ্রীক কমেডি-লেখক তাঁর নাটকের দর্শকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা যদি হাস্যরসিক কবির ভাবগুলো শুকনো ফলের মতো যত্ন ক'রে জমিয়ে রাখেন তবে তাঁদের বেশভূষা সারা বছর ধরে জ্ঞানের সুগন্ধে সুরভিত হয়ে থাকবে। সেই সুরভি বাঙালীর সাহিত্যে চিরস্থায়ী হোক।

শুদ্ধিপত্র

বইটির ছাপায় কয়েকটি ভুল রয়ে গেছে। পাঠককে আগেই সেগুলি সংশোধন করে নিতে অনুরোধ করি।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	২—৩	টমাস করুইন একজন	টমাস করুইন নামে একজন
২৬	২১	হিউ ওয়ালপোল	হোরেস ওয়ালপোল
৪০	১৭	এই সুন্দরের কাছ থেকে	এই হীরা সুন্দরের কাছ থেকে
৫১	২৪	তাঁর অসম্ভব ছিল	তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল
৫৩	১	বেকন পড়িয়া পড়ে	বেকন পড়িয়া করে
৮০	১৫	রবীন্দ্রাগজ	রবীন্দ্রাগ্রজ
৮০	২২	'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলি	'আষাঢ়ে' বইটি
৮৯	৮	অথচ যথ	অথচ যথার্থ
১০৮	৯	করিতে	করতে
২৯৫	১২	বঙ্গবাণী	বঙ্গবাসী
৩৩৬	১	একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ	একমাত্র প্রকাশিত কৌতুকাশ্রিত গ্রন্থ

ছোটখাট ভুলগুলির কোনো তালিকা দেওয়া হোল না। পাঠকরা নিজেরাই সেগুলি বুঝে নিতে পারবেন আশা করা যায়।

নির্দেশিকা